# স্বপ্নজীবন

**পুস্তক পরিচয়**

ভগবান রামকৃষ্ণের আদিষ্ট কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বকালীন জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলী যাহা ঠাকুর শ্রীশ্রীঅন্নদা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন উহাই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। আত্মজীবনী হিসাবে যতটুকু শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে ইহাকে তাঁহার জীবনীর পূর্ব্বমাত্র বলা যাইতে পারে। ইহাতে কিরূপ আধারে ভগবানের দর্শন এবং আদেশ পাওয়া যায় তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।




দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ
আদ্যাপীঠ

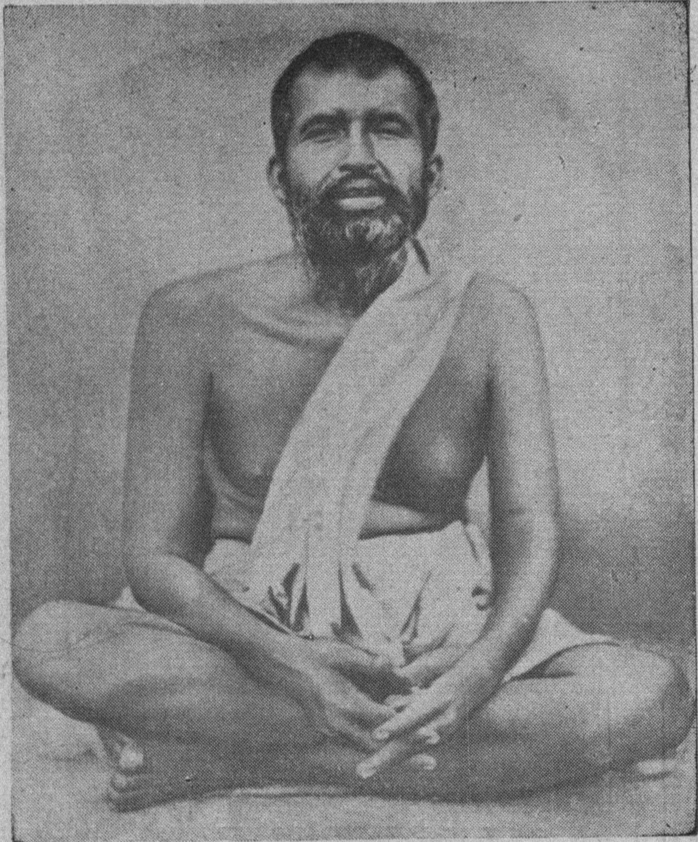
প্রকাশক—
ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর ভাই
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ
আদ্যাপীঠ
কলিকাতা-৭৬

: প্রাপ্তিস্থান :
কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তকালয়গুলি
এবং
১। আদ্যাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭৬

২। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ ; কলিকাতা কেন্দ্র
শ্রীশ্রী৺আদ্যামায়ের বাড়ী
৭/২/ডি, নটবর দত্ত রো,

সুলভ সংস্করণ :
বৈশাখ—১৩৬৭

মুদ্রাকর—
অশোককুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬



শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেব

# ভূমিকা

পূজনীয় শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুরের 'স্বপ্নজীবনে'র ভূমিকা লিখিবার বা পরিচয় প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ং একজন মহাপুরুষ। অনেকদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমার পরম বন্ধু উত্তরপাড়ার সুপণ্ডিত জমিদার পররলোকগত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুর মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আগমন করেন। পরে ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত কয়েকখানি খাতা আমাকে পড়িতে দিয়া তিনি বলেন, খাতায় লিখিত একটি কথাও ঠাকুরের নিজের নহে; তাঁহার স্বপ্নাবস্থায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি সেই খাতা কয়খানির স্থানে স্থানে পড়িয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু আমার পরম দুর্ভাগ্য যে সেই অমূল্য রত্নগুলি জনসমাজে প্রচার করিবার কোন সুবিধাই তখন আমি করিতে পারি নাই। কিন্তু সত্য কখনও লুকাইয়া থাকিতে পারে না; ক্রমে সেই অমূল্য রত্নগুলি 'রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা' নাম লইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুরের নামও প্রচারিত হইয়া গেল। তাহার পর কত স্থানে কত অবস্থায় ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কিন্তু কখনও তাঁহার স্বপ্নজীবন সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই; বোধ হয় এমন সাহস আরও অনেকের হয় নাই। অপর পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী অনেক কথাই লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাই ঠাকুর মহাশয় এত কাল পরে তাঁহার অলৌকিক স্বপ্নজীবন কথা সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। পৃথিবীতে আস্তিক, নাস্তিক, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সন্দেহবাদী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জীব আছেন। তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের এই স্বপ্নজীবন যে ভাবে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন; তাহাতে ঠাকুরের বা তাঁহাকে যিনি জীবনপথে পরিচালিত করিতেছেন তাঁহার কোন ইষ্টানিষ্ট নাই; কারণ তাঁহারা সেই ভাবের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তবে যাঁহারা প্রত্যাদেশ মানেন, বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই স্বপ্নজীবন পাঠ করিয়া অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রী৺আদ্যাশক্তির নিকট প্রার্থনা এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হউক।

কলিকাতা
পৌষ, ১৩৪৪ সাল

শ্রীজলধর সেন
( রায় বাহাদুর )

# প্রকাশকের নিবেদন

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুরের নাম শুনেন নাই এদেশে এখন ধর্ম্মার্থী আজ বিরল। অনেকেই এখন তাঁহার সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে চাহিতেছেন। যাঁহারা কিছু জানেন, তাঁহাদের কেহ হয় ত এক গুণকে দশ গুণ করিয়া বলেন; আর যাঁহারা কিছু জানেন না তাঁহারা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। আমরা জানি যখনই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কোন কর্ম্মী বা প্রচারক ঠাকুরের আদেশ প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তখনই জিজ্ঞাসু ভক্তমণ্ডলী ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশবাণী বিশদভাবে জানিতে চাহিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুরের পবিত্র জীবন সম্বন্ধেও নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইবারই কথা। জগৎ-গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদেশমত যে গুরুতর কার্য্যভার লইয়া পূজনীয় ঠাকুর মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের সম্যক পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করা ভক্ত ও সুধীবৃন্দের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক যে পবিত্র আধারের মধ্য দিয়া যুগাবতার রামকৃষ্ণের আশ্বাসবাণী জীবজগৎকে আশ্বস্ত করিতেছে, যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আজ রামকৃষ্ণলীলার দ্বিতীয় অঙ্ক বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনীত হইতে চলিয়াছে, মাতৃশক্তির পুনর্জাগরণকল্পে যিনি বাংলার প্রসিদ্ধ তীর্থ দক্ষিণেশ্বরে ৺আদ্যামায়ের করুণাকণা বিতরণের পুণ্য আয়োজন করিয়াছেন, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ যে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিতে চাহিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? আমরা দেখিয়াছি সৎসঙ্গপ্রিয় কত জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রায়ই পূজ্য-পাদ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার অতীত জীবন ও স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে কত প্রশ্নই করিয়াছেন। আর এই সকল প্রশ্নের উত্তরে হয় ত ঠাকুর মহাশয়কে একই ঘটনা বহু জনের নিকট বহুবার বর্ণনা করিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে; ইহাও দেখা গিয়াছে যে সচরাচর অন্যান্য মহাপুরুষদিগের জীবনী সম্বন্ধে যেমন হইয়া থাকে সেইরূপ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধেও গল্পপ্রিয় লোকে নানাবিধ ভ্রান্তিমূলক অস্বাভাবিক গল্পের অবতারণা করিতেছে। এই সকল কপোলকল্পিত গল্পের অবতারণায় অনেক সময় কত অমূল্য জীবনের প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয় চাপা পড়িয়া যায় এবং কত সত্যই না বিকৃত অবস্থায় প্রচারিত হয়। মহাপুরুষদিগের জীবনী আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, অধুনা প্রচলিত বহু জীবনী গ্রন্থেই এই দোষ অল্প বিস্তর আছে। মহা-পুরুষের মহৎ জীবন মহিমময় করিয়া প্রচার করিতে গিয়া ভক্ত জীবনীলেখক জন্ম হইতে মহাপুরুষকে মানবীয় মনোভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত একটী ক্ষুদ্র

ভগবান করিয়া তোলেন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আদর্শ ও বাস্তব উভয়ই ক্ষুণ্ণ করা হয়; এবং পাপী তাপী দুঃখীর আশা ভরসার স্থল মহাপুরুষকে অসম্ভব সম্মানের সুউচ্চ শিখরে তুলিয়া মানব সাধারণের নৈরাশ্য বৃদ্ধি করা হয়; ইহাতে জনসাধারণ তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া থাকে। কাজেই এই শ্রেণীর জীবনীতে অনেক সময় সত্যের অপলাপ হয়। এই সকল আশংকা থাকায় ভগবানের আদেশ অনুযায়ী কর্ম্মে ব্রতী পূজনীয় ঠাকুর মহাশয় ভগবানের আদেশ প্রচারের প্রয়োজনে স্বীয় জীবনের দৈবাদেশ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে স্বয়ং লিখিয়া রাখিতেছেন। এই জন্য জীবনী হিসাবে এই গ্রন্থে একাধিক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এক দিকে আজন্ম জীবনের অধিকাংশ বিবরণ অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বোধে বাদ পড়িয়া প্রত্যক্ষভাবে যখন হইতে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত গ্রন্থকার অলৌকিকভাবে যুক্ত হইয়াছেন তখনকার কথা লইয়াই গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে, অন্য দিকে সাধুজীবনের বহু অপ্রকাশ্য গুহ্য রহস্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে হইয়াছে। ফলে সম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ হিসাবে নৈরাশ্য জনক হইলেও ইহাতে ভক্তজীবনে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলার পরিচয় পাইয়া পিপাসু পাঠক পাঠিকা এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন ইহাই আমরা আশা করি। জীবনের যে অংশে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুর স্বপ্নাদেশে পরিচালিত হইয়াছেন সেই অংশের বিবরণ গ্রন্থে মুখ্য স্থান অধিকার করায় গ্রন্থের নাম হইল 'স্বপ্নজীবন'।

পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের ভ্রম প্রমাদ ও বর্ণাশুদ্ধি এই সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধিত হইয়াছে; তৎসত্ত্বেও যে সকল ভ্রম প্রমাদের জন্য পুস্তকের এই সংস্করণ নির্দ্দোষ হয় নাই, আশা করি পাঠক পাঠিকা সেগুলি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে পুনরায় দোষ ত্রুটী সংশোধিত হইবে।

কাগজ, শেলাই ও বাইণ্ডিং এবং ছাপার খরচ অতিরিক্ত বৃদ্ধি হেতু ত্রয়োদশ সংস্করণের প্রতি খণ্ডের মূল্য পনেরো টাকা করা হইল। বলা বাহুল্য যে এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মহৎ কার্য্যেই ব্যয় হইবে।

ইতি

ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন ভাই
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

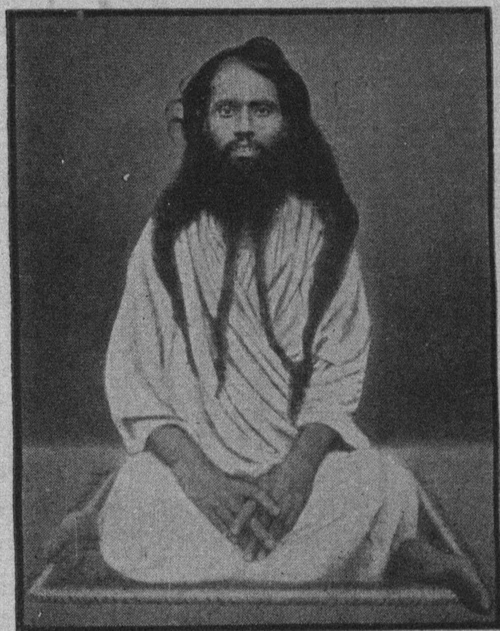
স্বপ্নজীবন

## প্রকাশকের নিবেদন

স্বপ্নজীবন পুস্তকটী আর একবার প্রকাশিত হইল। সঙ্ঘের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন ভাই সভাপতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় বর্ত্তমানে প্রকাশকের দায়িত্ব এই দীনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও পূর্ব্ব সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদনটীও পুনরায় মুদ্রিত হইল। কারণ "স্বপ্নজীবন" এর রচনার কারণ উহাতে লিখিত আছে। পুস্তকটীর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এরূপ অকপট জীবন কথা স্বতঃই সৎ এবং সাধুভাবাপন্নদের চিত্ত আকর্ষণ করে। তাই পুস্তকটী ধার্ম্মিকদের নিকট সমাদৃত।

বর্ত্তমান বাজারে কাগজ ও মুদ্রণের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পুস্তকটী যাহাতে ভক্তসাধারণের নিকট সহজে পেঁছান যায় তাহার জন্য পুস্তকটীর আকার ও মুদ্রণ ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন করিয়া এই সংস্করণ সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—আশা করি ভক্তগণ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পুস্তকখানির প্রচারে সহায়ক হইবেন। বলা বাহুল্য পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ পূর্ব্বের মত দৈবাদিষ্ট দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মহৎ কার্য্যেই ব্যয় করা হইবে।

ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর ভাই



শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর



শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর ( পূর্ব্বাবস্থা )

# স্বপ্নজীবন

## ১

চৈত্র মাস ; বেলা তখন প্রায় দেড়টা ; আমি হ্যারিসন রোড নিবাসী আমার এক বন্ধুর নিকট 'ঝান্সীর রাণী' নামক একখানি পুস্তক শুনিতেছিলাম ; পুস্তকখানি গণেশ দেউস্করের লেখা। বেশ মনোযোগ দিয়াই শুনিতেছিলাম ; এমন সময়ে এক চিমটেধারী সন্ন্যাসী সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসীটিকে দেখিতে মন্দ নয়, মাথায় একখানি নামাবলী-বাঁধা, গায়ে কম্বল, হাতে কমণ্ডলু ছিল কি না ঠিক মনে নাই। সন্ন্যাসীটি একদৃষ্টে আমাদের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দিতে বলিল, 'বাবু! গাঁজা খাওয়ার জন্য আমায় একটী পয়সা দিন ;' একবার, দুইবার, তিনবার, সে এরূপ বলিল ; কিন্তু তাহার কথায় আমরা মোটেই কর্ণপাত করিলাম না ; কেননা পুস্তকের যে অংশ তখন পড়া হইতেছিল, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী।

যাহা হউক সন্ন্যাসীঠাকুর হাসিতে হাসিতে আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোমরা তিন ভাই দুই বোন ; কেমন ? নয় ? আমি কথাটা শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিলাম, কেননা কথাটা সত্য ; আবার মনে ভাবিলাম, এ সব গণনা পাশ্চাত্যদেশীয় ; এখন অনেকেই জানেন। তারপর আমার জন্ম, রাশি, নক্ষত্র, মাস, বার, তিথি এক এক করিয়া সমস্তই বলিতে লাগিল ; আমার পিতামাতা জীবিত তাও বলিল। আমি এসব কথা শুনিতেছি বটে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না ; তারপর সে বলিল, 'তুমি রবিবার মাছ খেও না ; দুবছর বিবাহ করো না।' আমি মনে মনে একটু হাসিলাম, কেননা আমি তখন মাছ মোটেই খাই না এবং এ-জীবনে বিবাহ করিব না ইহাই সংকল্প করিয়াছিলাম। বন্ধুটী এমনই নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছিল যে তাহার দৃষ্টি বোধহয় সন্ন্যাসীঠাকুর একবারের জন্যও আকর্ষণ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা বোধ হয় কিছু কিছু বন্ধুবরের কানে গিয়াছিল ; কারণ সন্ন্যাসীটি বিফলমনোরথ হইয়া যখন চলিয়া যায়, তাহার পরক্ষণেই বন্ধুবর পাঠ শেষ করিয়া একটী দুআনি আমায় দিয়া বলিল, 'ভাই ! সন্ন্যাসীটিকে এটী দিয়ে এস।' বন্ধুটীর আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না হইলেও পুস্তকের গুণে সে সময়টা বন্ধুটীর হৃদয়কে বড় উদার করিয়া তুলিয়াছিল। এই জন্যই সাধুজন বলেন, সদ্‌গ্রন্থ পাঠও জ্ঞানভক্তি লাভের উপায় বিশেষ।

আমি দুআনিটি লইয়া এদিকে ওদিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিলাম ; দুদিকেই কিছু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াও দেখিলাম ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সন্ন্যাসীর আর কোন সন্ধান পাইলাম না। মনে মনে একটু সন্দেহের উদয়

হইল ; সাধুটী হয় ত ভাল লোকও হইতে পারে ; হয় ত ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষও হইতে পারে—ছদ্মবেশী ভগবানও যে হইতে পারে না তারই বা প্রমাণ কি ? মনে মনে নিজেকে দু'একবার ধিক্কার দিয়া বন্ধুর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। পয়সাগুলি দিয়া মিষ্টান্ন কিনিয়া খাওয়া হইল ; কিছুদিনের জন্য সব কথা ভুলিয়া গেলাম।

২

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমি অর্থকরী বিদ্যাভ্যাসের জন্য পশ্চিম হইতে কলিকাতায় আসি তখন স্থির করিলাম কবিরাজী পড়িব। মাননীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ভট্ট মহাশয়ের বাড়ী চট্টগ্রামে আমাদেরই বাড়ীর নিকটে ; তাই তাঁহার কাছেই প্রথম থাকিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বলিলেন, —আমার নিকট পড়াশুনা ভাল হইবে না ; কেননা আমি চিকিৎসা ব্যাপারে এতই বিব্রত আছি যে ছাত্র পড়াইবার মোটেই সময় পাই না ; আপনি অন্যত্র চেষ্টা করুন।—চেষ্টা খুবই চলিল ; সকাল নাই, বিকাল নাই, রাত নাই, দুপুর নাই, কলিকাতার অলি গলি পাতিপাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম ; প্রায় ৫০ জন কবিরাজের নিকট যাতায়াত করিলাম, কিন্তু কোথাও কোন সুবিধা হইল না।

৺কাশীধামে অবস্থান কালে দেশ হইতে আমায় যাঁহারা কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, তাঁহারা আমার কবিরাজী পড়ার কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে ; আমার পিতা পিতামহ জেঠা খুড়া কেহ বা উপাধিধারী কেহ বা ক্রিয়াম্বিত পণ্ডিত পদবাচ্য নিষ্ঠাবান হিন্দু ; আর আমি কি না কবিরাজী শিখিব। একজন সাহায্যদাতা পত্রে লিখিলেন, 'আপনারই ঠাকুরদাদার মুখে শুনিয়াছি 'ব্রাহ্মণং ভেষজং দৃষ্টবা সচেলং স্নানমাপ্নুয়াৎ।' ছি! ছি! আপনি কি পুণ্যশ্লোক পিতৃপিতামহের নাম ডুবাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন ? আমি তাঁহাদের পত্রের আর কোন উত্তর না দিয়া পিতামাতার মতামত জানিবার জন্য বাটীতে চিঠি লিখিলাম। বাবার সম্পূর্ণ মত না হইলেও মাতা ঠাকুরাণীর মতের উপর নির্ভর করিয়াই কবিরাজী শিখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

সেদিন মার আশীর্ব্বাদী পত্রখানি সঙ্গে লইয়াই ঘুরিতে ঘুরিতে কুমারটুলি নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ ৺বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র হেমবাবুর নিকট গিয়া আমার আবেদন জানাইতেই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বিডন স্ট্রীটস্থ কবিরাজ বিরজাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ; এবং বলিয়া দিলেন—আপনি তাঁহাকে বলিবেন যে, নূতন যে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ স্থাপনা হইতেছে, আমি তাহাতেই পড়িব। এবং আরও

বলিয়া দিলেন যে, সম্মুখে একটী বৃত্তি পরীক্ষা হইতেছে ; আপনি সে পরীক্ষাটী দিতে চেষ্টা করিবেন। যদি বৃত্তি পান, আর কাহারও খোসামোদ করিতে হইবে না।

৩

নিরাশার গভীর অন্ধকারে আমি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আশার আলো পাইলাম। ফিরিবার পথে মনে হইল, আমার মত মূর্খ বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইবে, ইহাও কি কখনও সম্ভব ? তখন মার কথা মনে পড়িল ; মা লিখিয়াছেন, 'বাবা তোমার আশা কখনও অপূর্ণ থাকিবে না ; তুমি কবিরাজী শিখিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাই শিখ ; যদি মহেশ বিশ্বাস ও রাজকমল বিশ্বাস তোমায় টাকা নাও বা দেয়, তুমি রসিক দারোগার নিকট সমস্ত খুলিয়া লিখিও ; তিনি অবশ্য তোমায় কিছু কিছু করিয়া সাহায্য করিবেন। আর তিনিও না করেন, ভগবান তোমায় সাহায্য করিবেন ; তুমি সংকল্প ত্যাগ করিও না।'

মার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমি বৃত্তি পরীক্ষায় উপস্থিত হইলাম। পরীক্ষক ছিলেন মাননীয় কবিরাজ তারাপ্রসন্ন কবিরত্ন মহাশয়। ভগবৎকৃপায় ও পিতামাতার আশীর্বাদে আমি বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঝামাপুকুরে মহারাজা ৺দিগম্বর মিত্রের দাতব্য ঔষধালয়ের উপরতলায় অর্থাৎ প্রথম যে গৃহে আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপিত হয় সেই গৃহেই স্থান পাইলাম। আমার মান সম্মান অটুট রহিল ; আমাকে আর কাহারও খোসামোদ করিতে হইল না। তবে এখানে বলা আবশ্যক যে আমি বৃত্তির টাকা গ্রহণ না করিয়া ৺দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের ফ্রি বোর্ডিংএ দুইবেলা খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। হাত খরচের জন্য বাড়ী হইতে কিছুদিন ২৷৩ টাকা করিয়া লওয়ার পর দারোগা শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিশ্বাস ও চট্টগ্রামের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন বিশ্বাস মহাশয় প্রায় বৎসরেক কাল আমায় কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত গৃহে যে দিন কলেজ প্রথম খোলা হয় সেই দিন হইতে প্রায় দেড় বৎসর কাল আমি তথায় থাকিয়া পড়াশুনা করি। তারপর পটলডাঙ্গায় মাননীয় কবিরাজ শরচ্চন্দ্র সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া প্রায় বৎসরেক কাল অবস্থান করি। কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান কালে এক সময় আমার কাপড় জামা ইত্যাদি সমস্ত চুরি যায়। তাহাতে আমি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু যখনই কোন বিপদে পড়িতাম তখনই মনে হইত এবার বুঝি ভগবানের বিশেষ কোন করুণা পাইব ; কারণ জীবনে যতবার বিপদে পড়িয়াছি, ততবারই ভগবানের দয়ায় শেষে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এদিকে বিপদের উপর বিপদ আরম্ভ হইল। আমার

একখানি মাত্র কাপড় ; সেইখানিই স্নানের পর কাচিয়া শুকাইয়া লইতাম এবং পরিয়া মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে খাইতে যাইতাম। গ্রীষ্মকাল ; একদিন স্নানের পর বাহিরের জানালায় কাপড় বাঁধিয়া একদিক ধরিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া শুকাইতেছি এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসীটীর কলেবর ঘর্মাক্ত, মুখ শুষ্ক, কণ্ঠ ক্ষীণ। আমি তাড়াতাড়ি তাহাকে কিছু মিষ্টি ও এক গেলাস জল আনিয়া খাইতে দিলাম। সন্ন্যাসী সানন্দে তাহা পান করিয়া গৃহমধ্যস্থ আমার ছাতাটীর উপর লক্ষ্য স্থির করিল। ছত্রখানি তখন আমার একমাত্র সম্বল ; পটলডাঙ্গা হইতে ঝামাপুকুরে খাইতে আসিবার সময় বৃষ্টি ও রৌদ্রে ঐ ছাতাই একমাত্র সহায়। সেই ছাতাটীর উপর সন্ন্যাসীঠাকুরের দৃষ্টি যখন ঘনীভূত হইতে লাগিল তখন আমার আশংকা হইল—চেয়ে বসেন বুঝি ; ওঁদের ত আর চক্ষুলজ্জা নাই ; বিশেষত সন্ন্যাসীগুলি প্রায়ই ব্রহ্মবাদী। "সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম" সব বস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন ; সমান অধিকার।

আমায় আর ভাবিতে হইল না। সন্ন্যাসী ঠকুরের কি মহিমা! যেন অন্তর্যামী—ঠিক চেয়ে বসলেন—'বাবা! ঐ ছাতাটী আমায় আজকের মত দিতে হবে ; কাল আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দিয়ে যাব।' কথাবার্ত্তা অবশ্যই হিন্দিতেই হইতেছিল এবং লোকটীও হিন্দুস্থানী বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কাল দিয়া যাইবে শুনিয়া আমি কিছু আশ্বস্ত হইলাম ; ভাবিলাম সন্ন্যাসীঠাকুর হয়ত অনেক দূরে যাইবে ; আমি না হয় একবেলা গামছা মাথায় দিয়া খাইয়া আসিব ; আর বৃষ্টি হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না। যাহা হউক তারপর দু'একটী কথা কহিয়া আমি ছাতাটী সন্ন্যাসীঠাকুরকে দিতে উদ্যত হইলে কবিরাজ মহাশয়ের ঝি বলিয়া উঠিল, 'দাদাবাবু! ওরা সব জোচ্চোর ; ওদের কথায় বিশ্বাস করে জিনিষ দিতে আছে ?—ওকে ছাতা দিও না।' তেমন হিতৈষী তখন আর বাসায় কেহই ছিল না। কবিরাজ মহাশয় দেশে গিয়াছিলেন ; ছাত্রদের মধ্যে আমি একা ; আর আমার সম্মুখের ঘরে ঠাকুরদের দেওয়ান অধুনা স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের ম্যানেজার, নলিনীবাবু বাস করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনিও তখন বাসায় ছিলেন না ; কাজেই আমি যেমন ঝিয়ের কথা অগ্রাহ্য করিয়া দাতাগিরি করিলাম, অমনি সন্ন্যাসীঠাকুরও ছাতাটী হাতে করিয়া ধীরে ধীরে চম্পট দিলেন।

একদিন দুইদিন করিয়া এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল ; কিন্তু সন্ন্যাসীঠাকুর আর এমুখো হইলেন না ; অগত্যা মনে করিতে বাধ্য হইলাম যে সামান্য একটি ছাতা লইয়া কি সন্ন্যাসী পলাইবে ? নিশ্চয়ই তিনি রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছেন। এদিকে আমার কষ্টের একশেষ হইতেছে। প্রায় ১৭।১৮ দিন এক কাপড়ে আছি ; তাহার উপর ছাতার অভাবে মধ্যে মধ্যে অনাহারেও থাকিতে হইতেছে। কবিরাজ

মহাশয়ের বাটীতে আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইব, তাহাও আর ঘটিয়া উঠে না; দুরন্ত লজ্জা আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরে। এইরূপ অবস্থায় একদিন মিত্র মহাশয়ের বাটীতে আহার করিতেছি এমন সময় গিরীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে আমার দেশীয় একজন বিদ্যার্থী নিবিষ্টচিত্তে আমার দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আবার খাওয়ার সময় কথা কন না। ইসারায় জানাইলেন পরে বলিবেন। খাওয়ার পর আমাকে তাঁহার বাসায় যাইতে আদেশ করিয়া বলিলেন, বিশেষ দরকার আছে; আমিও স্বীকার করিলাম।

## ৪

এইরূপে দুইজনে ১০০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আসিয়া উপস্থিত। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। একখানা তক্তপোষ পাতা আছে; গিরীশ ভায়া আমাকে তাহার উপর বসিতে আদেশ করিলে আমি সম্মুখে একটী বাবুর উপর দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বসিয়া পড়িলাম। গিরীশ বলিল, 'যতি! নমস্কার কর, ইনি ব্রাহ্মণ;' আমাকে বলিল, ভাই! এই আমার একমাত্র বন্ধু; কলিকাতার আশ্রয়দাতা; এর নাম যতীন্দ্রনাথ বসু; ক্যাম্বেলে পড়ে। যতীন বাবু প্রফুল্লবদন, বেশ শান্ত প্রকৃতির লোক; হাসিয়া আমায় নমস্কার করিল এবং গিরীশকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। অতঃপর নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর গিরীশ বলিল, 'এরই ছোট ভাই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, শ্রীমার শিষ্য; তার অদ্ভুত জীবনী সময়ে আপনাকে বলবে; সম্প্রতি সে হিমালয়ে আছে, সংবাদ পাওয়া গেছে, বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহিমবাবুর সঙ্গে সে বদরীনারায়ণে গেছে বোধ হয় আর দেশে ফিরবে না। দেশে কখনও ফিরলেও আর সংসারে প্রবেশ করবে না। ম্যাট্রিকুলেশ দিয়ে গেছে; ভাল পাশও করেছে।' আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, 'তার নাম শচীন; আপনি দেখলে বুঝতে পারতেন তার অদৃষ্টে কি আছে না আছে।' আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'আমার খুব বিশ্বাশ শচীন ফিরে আসবে; কেন না কর্ম্ম করাই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষা, তপস্যা করা নয়।'

'তাহলেও শচীন এক অদ্ভুত ধরণের ছেলে। ১১ বৎসর বয়স থেকেই তার বিষয় বৈরাগ্য; সে একজন বড় সাধক।'

'বেশ ত; সাধক হলে কি তাকে সংসারে থাকতে নেই? সংসার ত্যাগ করাই কি সাধকের সাধনা?'

'আচ্ছা, এ বিষয় নিয়ে পরে কথা হবে; এ বাড়ীর ছোট বড় সবাই সাধক, সবাই সৎ, সবারই একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি বহু ভাগ্যে এ বাড়ীতে স্থান

পেয়েছি ; আপনি আসা যাওয়া কর্‌লে বুঝ্‌তে পারবেন এঁদের কেমন সুন্দর চরিত্র।'

'আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ' পদ্মরাগ মণির আকরে কখনও কাচ জন্মায় না।

এই কথার পর গিরিশ উঠিয়া উপরে গেল ; আমায় বলিয়া গেল, সে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত যেন আমি না উঠি। আমি বসিয়া বসিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম ; প্রধান ভাবনার বিষয় হইল, শচীন। কবে শচীনকে দেখিব শচীনের সঙ্গে কথা কহিব, ভাব করিব ইত্যাদি। এমন সময়ে গিরীশ এক জোড়া ধুতি চাদর ও দুইটী টাকা হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'ভাই! মায়ের দান ; গ্রহণ কর। মা নাকি গতকল্য স্বপ্ন দেখেছেন একটী ব্রাহ্মণকে কাপড় দান করছেন ; আর আমি স্বপ্ন দেখছি ছাতা দান কর্‌ছি ; সে জন্য এই সঙ্গে তোমায় দুইটী টাকাও দেওয়া হচ্ছে।'

আমি শুনিয়া অবাক হইলাম ; মনে মনে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম ; চক্ষে এক বিন্দু জলও আসিল ; অলক্ষ্যে তাহা মুছিয়া বলিলাম, 'ভাই! কলকাতা সহরে ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের অভাব নাই ; তবে আমাকে কেন?' গিরীশ বলিল, 'আমি যে ভাই তোমাকেই দান কর্‌ছি দেখ্‌লাম ;' আমি আর কোন কথা না বলিয়া দান গ্রহণ করিলাম এবং গিরীশকে বলিলাম, ভাই, তুমি নিজে এসে আমায় একটী ছাতা কিনে দাও ;' গিরীশ তাহাতে রাজি হইল। যতীন বাবু বিদায় নমস্কারান্তে বলিল, 'আবার কবে আস্‌ছেন? 'আস্‌ব বই কি ;' বলিয়া আমি ঘরের বাহির হইলাম। মনে মনে বলিলাম, 'আমি যখন আস্‌ব তখন তোমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌বে।' যতীন বাবু আবার বলিল, 'আসবেন, আমি গিরীশের মুখে শুনেছি আপনি ভাল হাত দেখ্‌তে জানেন ; আর একদিন আস্‌বেন ; হাত দেখাব।' আমি হাসিয়া সম্মতি জানাইয়া বাটীর বাহির হইলাম ; গিরীশ আমার অনুসরণ করিল।

৫

কিছুদিন গত হইলে একদিন গিরীশের মারফত নিমন্ত্রণ পাইলাম যতীনদের বাড়ী যাইতে হইবে। যতীনের শ্বশ্রূমাতা স্বর্গগতা হইয়াছেন, সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন ও আমার নিমন্ত্রণ। আমি অবনত মস্তকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম ; কারণ যে কোন ছলে ও বাটীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাই আমার এক প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে যতীনের বাড়ী উপস্থিত হইলাম ; আরও দুই একজন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। সেই দিন যতীনের পিতা সিদ্ধেশ্বর বসু মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম আলাপ হইল ; মনে হইল

সত্য সত্যই লোকটী ঈশ্বরানুরাগী। তাঁহার মুখে শুনিলাম শচীনের চিঠি আসিয়াছে ; সে আর দেশে আসিবে না ; সংসারও করিবে না। সিদ্ধেশ্বর বাবুর ছয়টী পুত্র ; একটী না হয় সংসার নাই বা করিল বলিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিলাম ; এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বলিয়া আশ্বাসও দিলাম যে, যাহারা মুখে সংসার করিবে না বলে, তাহাদের প্রায়ই সংসারে আবদ্ধ হইতে দেখা যায় ; আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে নানারূপ সৎপরামর্শ দিলেন। সকলের কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবুও বলিলেন, 'তা সংসার না করে নাই বা করলে ; বাড়ীতে আসা যাওয়া করতে দোষ কি ? আপনারা সকলে এই আশীর্বাদ করুন যেন সে বাড়ীর সম্বন্ধ ত্যাগ না করে মধ্যে মধ্যে চিঠি পত্র লেখে এবং কখনও কখনও বাড়ী এসে আমাদের দেখা দেয় ; বিশেষতঃ তার গর্ভধারিণীর জন্যও যেন সে এটুকু করে।'

এর কয়েকদিন পরে গিরীশ আমায় সংবাদ দিল শচীন আসিয়াছে। তাহার পরণে গৈরিক বসন, মস্তক মুণ্ডিত, চক্ষে তীব্র বৈরাগ্যের দীপ্তি। আমি দেখিতে আসিলাম ; যতীন আমাকে দেখিয়া বড় আনন্দ করিল। আজ হাত দেখার পালা ; যতীনের হাত দেখিলাম ; কি যে বলিয়াছিলাম এখন মনে নাই। ক্ষণেক পরে গিরীশ শচীনকে আনিয়া হাজির করিল। শচীন ব্রাহ্মণ দেখিয়া নমস্কার করিল এবং বলিল, 'আপনি হাত দেখতে জানেন শুনলাম ; দেখুন দেখি আমার হাত।' আমি সযত্নে তাহার হাত দেখিতে লাগিলাম, আমি যে একজন ভাল রেখা পরীক্ষক, তাহা নহে ; তবে মোটামুটি কিছু জানি ; তাও পুঁথিগত বিদ্যা নহে—অন্যভাবে।

শচীনের হাত দেখিয়া বলিলাম, 'ভাই ! তোমাকে বিয়ে করতে হবে।' ইহা শুনিয়া শচীনের মুখে অবিশ্বাসের ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'এ ব্রাহ্মণ হাত দেখতে কিছুই জানে না ; কেন না আমি বিয়ে করব না প্রতিজ্ঞা করেই শ্রীমার নিকট দীক্ষিত হয়েছি।' তারপর আমি বলিলাম, 'তোমাকে ডাক্তারী পড়তে হবে ;' শচীন বলিল, 'যদি পড়াশুনা করি ত ডাক্তারীই পড়ব এই ইচ্ছা ; আর সেই জন্যই বাড়ী ফিরে এসেছি। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, মহিম বাবু ও অন্যান্য সাধুরা আমায় পড়তে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আপনি যে বিয়ে করতে হবে বলেন, তা ত অসম্ভব।' আমি বলিলাম, 'বিয়ে অবশ্যম্ভাবী ; হয় ত দুবারও হতে পারে।' 'অসম্ভব—অসম্ভব' বলিতে বলিতে শচীন অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

শচীনের মুখখানি দেখিয়া আমি ভুলিয়াছিলাম ; যেন কত জন্মের চেনা মুখ। তারপর ক্রমশ তাহার নিকট ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম ; শচীনও শুভদিনে শুভক্ষণে সিটি কলেজে আই., এস., সি, পড়িবার জন্য ভর্ত্তি

হইল। ক্রমে ক্রমে তাহার গৈরিক বসন শ্বেত বস্ত্রে পরিণত হইল, পায়ে পুনরায় জুতা উঠিল, মুখেও বেশ একটু প্রেমিকতার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

৬

ঐরূপ সময়ে একদিন বাটীর পত্রে মার খুব অসুখ জানিতে পারিয়া আমি দেশে রওনা হইলাম। যথাসময়ে বাটী পৌঁছিয়া দেখি আমার পরমারাধ্যা জননী সত্যসত্যই রোগশয্যাশায়িতা। তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট; শরীর জীর্ণ শীর্ণ। স্নেহময়ী জননী তাঁহার এই হতভাগ্য সন্তানকে নিকটে পাইয়া বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন এবং ললাটে বারবার চুম্বন করিয়া সজলনেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, 'মা! আপনার কি কষ্ট হচ্ছে বলুন; আমি ত আপনার কাছে এসেছি; যথাসাধ্য উপশম করতে চেষ্টা করব।'

মা বলিলেন, 'হাঁ বাবা! তুমি কবিরাজী পড়ছ, তোমার দ্বারা রোগের উপশম হওয়া অসম্ভব নয়; তবে আমার মনে হয়—এ যাত্রা বোধ হয় আর আমি সেরে উঠ্‌তে পারব না। আমার সর্ব্বদা মনে হচ্ছে এবার আমার বিদায়ের দিন নিকট হয়ে এসেছে।'

'না মা! সে কি কথা? এই দুঃসময়ে যদি আপনিও আমাদের ছেড়ে যান, আপনার এই স্নেহ হতেও যদি আমরা বঞ্চিত হই, তা'হলে বোধ হয় আমরা ঠিক থাক্‌তে পারব না।'

আমার কথা শুনিয়া মার মুখে বিদ্যুতের ন্যায় একটী হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ রহিল না। মা বলিলেন, 'অন্নদা! তুমি জ্ঞানী হয়ে একি কথা বল্‌ছ? যাওয়া না যাওয়া কি মানুষের হাত? মৃত্যু কি মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে কারও হাত নেই। যদি সত্যই আমার মৃত্যু নিকট হয়ে থাকে, তাতে তোমাদের দুঃখ না হয়ে আনন্দ হওয়াই উচিত। কেননা ও'র শরীর যেরূপ দুর্ব্বল হয়ে আসছে—বলিতে বলিতে মার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল; চক্ষু সজল হইয়া উঠিল ও দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইল। আমি মার এই অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মা আমার কি তবে আজ সত্য সত্যই মুক্তি পথের যাত্রী! সত্য সত্যই সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সমস্ত দায়িত্বের বোঝা নামাইয়া দিয়া গন্তব্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন। মায়া মমতা স্নেহ সরলতার পুণ্যপ্রতিমা মা আমার তবে কি আজ সংসারের সমস্ত বন্ধন ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছেন? হায়! কি হইবে? যদি সত্যই তাই হয়, মা যদি আমাদের ছাড়িয়া যান, তবে কিরূপে বাঁচিব? কার মুখ চাহিয়া সমস্ত দুঃখ জ্বালা ভুলিব? এইরূপ



৺সিদ্ধেশ্বর বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী



শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুরের সহধর্ম্মিণী ( পূর্ব্বাবস্থা )

চিন্তায় আমার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতে লাগিল, বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ; আমি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

ধন্য মায়ের প্রাণ! আমার কাতর মুখ দেখিবামাত্র মা যেন বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং সস্নেহে বলিলেন, 'ওকি বাবা! ছি! তুমি সব জেনে শুনে অমন অধীর হচ্ছ কেন?' আমি বলিলাম, 'মা! আপনার কি বাসনা আমায় বলুন ; আমি জানি যাঁরা মুক্তিপথের যাত্রী তাঁদের সকল বাসনা ছিন্ন হওয়া দরকার ; না হলে সেই বাসনাসূত্র ধরে আবার ফিরে আস্তে হয়।' মা বলিলেন, 'বাবা! আমার এমন বিশেষ কোন বাসনা নেই, যাতে আমাকে আবার এই জ্বালাময় সংসারে ফিরে আস্তে হবে। তবে একটী বাসনা মধ্যে মধ্যে আমার মনে জাগে ; আজ তারও যাহোক একটা শেষ কর্‌ব। বাবা! আমিও জানি বাসনাই জন্মমৃত্যুর কারণ ; জড়ভরতের গল্প আমার বেশ মনে আছে।'

'একটী বাসনা মধ্যে মধ্যে আমার মনে জাগে,' এ কথা শুনিয়াই কিন্তু আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিয়াছিল। মাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বলুন মা! সে বাসনাটি কি?' মা অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, 'সে বাসনা হচ্ছে তোমার বিবাহ। তুমি আমার রোগশয্যায় এসে বসেছ ; অবশ্য আমি জানি তুমি আমার কাছে কখনও মিথ্যা কথা বল্‌বে না। তাই বলি তুমি বিবাহ কর্‌বে কি না আজ আমায় স্পষ্ট করে বল্‌তে হবে ; যদি বিবাহ না কর তার উপর আমার কোন কথা নেই। কেননা আমি তোমার ইচ্ছার উপর কখন কোন কথা বল্‌ব না এই আমার প্রতিজ্ঞা। কারণ, আমি জানি তুমি কি জন্য সংসারে এসেছ ; তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি।'

মার কথা শুনিয়া আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম ; কি যে উত্তর দিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! কি উত্তর দেব কিছুই যে খুঁজে পাচ্ছি না।' মা আমার মঙ্গলময়ী ; তাঁহার মঙ্গল হস্ত আমার মাথায় বুলাইয়া সান্ত্বনাবাক্যে তিনি আমায় বলিলেন, 'অন্নদা! তুমি অবিচলিতচিত্তে যা বল্‌বে তাই আমি বিশ্বাস কর্‌ব। যদি তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর এ জীবনে বিবাহ কর্‌বে না, তাতে আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হব না ; বরং আমার দুর্দ্দমনীয় বাসনার হাত থেকে আমি চিরমুক্ত হব ; আমি শান্তিতে মর্‌ব ; আমার শেষ বড় সুখের হবে। আর যদি বিবাহ কর, তাহলে তোমার বিবাহ আমি দেখে যেতে চাই।'

প্রতিজ্ঞা! সেকি! মার অন্তিম শয্যায় বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিব যে এ জীবনে আমি বিবাহ করিব না? তাও কি কখন হইতে পারে? মা আমায় যতই বিশ্বাস করুন না কেন, যতই সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মনে করুন না কেন, আমি যে এ বিষয়ে আমাকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দুর্ব্বল মন, বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়জন্য মন আজ না হয় কোন কারণে বিবাহে বীতস্পৃহ,

দুদিন পরে যে ইহার পরিবর্তন হইবে না, তাহার প্রমাণ কি ? না, তাহা পারিব না ; কিছুতেই পারিব না। মার অবর্ত্তমানে যদি আমাকে বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে পাপী ত হইতেই হইবে ; অধিকন্তু হয় ত যাবজ্জীবন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া যাইতে হইবে ; আমি কিছুতেই শান্তি পাইব না—বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে ? আমি মাকে বলিলাম, 'মা ! জন্ম মৃত্যু বিবাহে কারও হাত নেই ; এ আপনারই মুখের কথা। আমি কি বলব ? আপনার যা ইচ্ছা করুন ; আমার ভাগ্যে যা আছে হবে।' মা আমার যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তখনই দাদাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'অপর্ণা ! অন্নদার জন্য মেয়ে দেখ, এই মাসেই বিবাহ দিতে হবে।' অবিলম্বে দাদা সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন ; এবং মাতৃ-আজ্ঞায়—এমন কি জন্মমাস চতুর্থ রবিতেই আমার বিবাহ হইয়া গেল।

৭

এদিকে মার রোগ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। শ্বশুরবাটীর সকলেই চিন্তামগ্ন ; তাঁহারা সুচিকিৎসক আনাইয়া গোষ্ঠীবর্গ সকলে প্রাণপাত পরিশ্রমে রোগিণীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সকলে চোখের জলে ভগবানের নিকট মার আরোগ্য কামনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে চট্টগ্রামের স্বনামধন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের চিকিৎসায় এবং আমার খুড়শ্বশুর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অদ্ভুত স্বার্থত্যাগে মা আমার ক্রমশঃ রোগমুক্ত হইয়া উঠিলেন। নববধূর মুখে আনন্দরেখা ফুটিয়া উঠিল ; পাড়াপড়শীরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। শ্বশুরবাটীর সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন ; আমারও প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল।

মার আরোগ্যলাভের কয়েকদিন পরেই আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম এবং বিশেষ ঘটনাক্রমে যতীনের আহ্বানে কবিরাজ মহাশয়ের বাটী হইতে যতীনদের বাটীতেই আসিয়া আড্ডা লইলাম। তারপর হইতে শচীন প্রভৃতির সহিত মেলামেশার বড় সুবিধা হইল। সে আমার মুখে নানারূপ গল্প শুনিতে লাগিল ; এবং এই সকল গল্পগুজবে যোগ দিল বর্দ্ধমানের সত্যকিঙ্কর রায়, পাশের বাড়ীর কুমুদকুমার মিত্র, ফণীন্দ্রলাল দেব, মণীন্দ্রনাথ মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীশ সান্ন্যাল, ললিত মুখাজ্জী প্রভৃতি ; তবে শচীনের নিকটে প্রায়ই আমার অতীত জীবনের ঘটনাবলী বলিতাম। কেমন করিয়া আমি ২০বৎসর বয়সের মধ্যে ১৮।১৯টি দরিদ্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম তাহাও শচীনের কাছে গল্প করিয়াছিলাম। সে সব কথা শচীন খুব মনোযোগের সহিত শুনিত এবং মধ্যে মধ্যে অনেক করুণ কাহিনী শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিত।

এইভাবে থাকিতে থাকিতে যখন কবিরাজী পরীক্ষা পাশ করিয়া বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কবিরাজী করিবার কথা বলিলাম, তখন একদিন সিদ্ধেশ্বর বাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ অন্নদা, তুমি ত কবিরাজী পাশ করেছ ; এমন একটি ওষুধ আমায় তৈরী করে দিতে পার, যাতে অম্লরোগ যায়, বাহ্যে পরিষ্কার হয় ? ওষুধটী কেবল গাছ গাছড়া থেকে তৈরী করতে হবে, পুঁথিগত ব্যবস্থা দিলে চলবে না ; আমি সম্পূর্ণ নতুন ওষুধ চাই।' সেই দিন শচীনের মার সঙ্গেও ধর্ম্ম বিষয় লইয়া বিশেষ আলাপ হইল।

আমি নূতন কবিরাজ ; তাহার উপর বন্ধুর পিতার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিবার অধিকার পাইয়াছি ; প্রাণে বড় আনন্দ অনুভব করিলাম এবং অদম্য উৎসাহের সহিত দ্রব্যগুণ খুঁজিয়া গাছ গাছড়া বাহির করিতে লাগিলাম। গুণ, বীর্য্য ও বিপাক অনুসারে প্রায় ২০টি ঔষধি একত্র করিয়া সিদ্ধ করিলাম এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বোতলে ভরিয়া এক বোতল ঔষধ সিদ্ধেশ্বর বাবুকে খাইতে দিলাম। তিনি ৩।৪ দিন ঔষধ খাইয়া খুবই উপকার পাইলেন। কিন্তু গাছ গাছড়ার ক্বাথ বেশী দিন থাকিল না ; ঔষধ নষ্ট হইয়া গেল।

যাহা হউক ঔষধটীর উপকারিতায় আমরা সকলেই আনন্দিত হইলাম। সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন, 'অন্নদা ! তুমি এই ঔষধটী যদি পেটেণ্ট করে বার করতে পার ত অনেকেরই উপকার হয়।' কথায় কথায় তিনি দু' হাজার টাকা ও নিজের মধ্যম পুত্র যতীনকে এই কার্য্যে আমার সহায়ক করিবার কথাও বলিলেন। আমি শুনিয়া বলিলাম, 'আপনি যদি টাকা দেন, আমি আরও নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করতে পারি।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বেদনার কোন ওষুধ করতে পার ?' আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় পারি।' 'জ্বরের ?' 'হাঁ'। এইরূপে ৫।৬টী ঔষধ তাঁহার টাকায় প্রস্তুত করিবার কথা হইল। যতীন বাবু আমার সঙ্গী হইল ; আমরা উভয়ে একদিন বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ডাঃ পি. সি. রায়ের সঙ্গে দেখা করিলাম এবং সমস্ত বিষয় শুনিয়া তিনি দুএকটী উপদেশ দিয়া তাঁহার ম্যানেজারের সহিত আমাদের আলাপ করাইয়া দিলেন। ম্যানেজার মহাশয় খুবই ভদ্রলোক ; তিনি আমাদের সমস্ত কথা শুনিয়া সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। ডিষ্টিলার, ফিল্টার, হাজার হাজার বোতল, ঔষধপত্র প্রভৃতি ভারে ভারে আসিতে লাগিল। আমি কবিরাজ এ. সি. কবিরত্ন ; ম্যানেজার জে. এন. বসু। কারখানার নাম হইল 'অভয়া সুধা কার্য্যালয়' ; কারণ ঔষধের নাম আমার পিতার নামে 'অভয়া সুধা' রাখিয়াছিলাম। লোকজন, এজেণ্ট, ক্যানভাসার সব ব্যবস্থা হইয়া গেল ; ৪।৫ শত টাকার হ্যাণ্ডবিল ছাপান হইল। সিদ্ধেশ্বর ভবনে নূতন আলো, চেয়ার, বেঞ্চি, আলমারি, টেবিল সব একে একে আসিয়া হাজির হইল। ৫।৬টি নূতন ঔষধ প্রস্তুত হইল ; বড় বড়

প্ল্যাকার্ড ছাপান হইল; "হৈ হৈ কাণ্ড! রৈ রৈ ব্যাপার!! অভয়া সুধা আসিতেছে!!!"

৮

এইত সিদ্ধেশ্বরভবনের অবস্থা। তখন সেখানকার আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বন্ধুবর গিরীশ খুব পূজাপাঠ করিত; তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও করিতে আরম্ভ করি; তবে গিরীশ যদি দুই ঘণ্টা বসে, আমি আধ ঘণ্টা। ঐ সময়ে একদিন দোতালায় মা ও বাবার ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর লইয়া খুব তর্ক লাগিয়া গিয়াছে। এরূপ তর্ক আমি খুবই ভালবাসিতাম। তাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। তারপর ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলাম; এক এক সিঁড়ি উঠি আর এক একবার নারদকে স্মরণ করি যেন তর্ক না থামিয়া যায়। মা বলিতেছেন, 'প্রতিমা পূজারও দরকার'; বাবা বলিতেছেন, 'কিছু দরকার নেই, ভগবান সর্ব্বভূতে বিরাজমান; তাঁকে গণ্ডিবদ্ধ করে পূজো কেন? ওসব তোমাদের ভুল ধারণা; 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।' মা বলিলেন, 'তা যদি হয়, কালীকৃষ্ণ কি ব্রহ্ম ছাড়া?' ইত্যাদি অনেক প্রকার তর্ক বিতর্ক হইতেলাগিল; আর নারদরূপে আমি সেই ঝগড়ার মাঝখানেগিয়া উপস্থিত উভয়েই উভয়কে পরাস্ত করিতে চাহেন—কে কাহাকে পরাস্ত করে? মা বলিলেন, 'আচ্ছা ঠাকুর এসেছে; ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর দেখি কি বলে?' মা আমাকে ঠাকুর বলিয়া ডাকিতেন। বাবাও বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরের মুখেই শোনা যাক; তুমি চুপ কর।' তারপর আমাকে সম্বোধন করিয়া পাশে চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! বস; দেখ দেখি আমাদের তর্কের মীমাংসা করতে পার কি না; এ শুধু আজ নয়, তোমার মার সঙ্গে এই নিয়ে প্রায়ই আমার তর্ক হয়। আচ্ছা, বল দেখি—ব্রহ্মজ্ঞানের চেয়ে আর দ্বিতীয় জ্ঞান কিছু আছে কি?'

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম 'না'।

'শুনলে?' বলিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবু যখন মার মুখের পানে তাকাইলেন, মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, 'সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়?'

আমি বলিলাম, 'ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন, পূজো ও তপস্যা।'

মা তখন বাবাকে বলিলেন, 'তুমি এখন বল দেখি এর মধ্যে তোমার কোনটা আছে?'

বাবা বলিলেন, 'কেন? আমি কি তপস্যা করি না? সংসারে থেকে কি তপস্যা হয় না? না আমি শাস্ত্রাধ্যয়ন করি না, পূজো করি না? তোমরা কি বলতে চাও সংস্কৃত অক্ষরে না হলে শাস্ত্র হয় না? না ফুল দূর্ব্বার শ্রাদ্ধ না করলে পূজো হয় না? কি ঠাকুর? তুমিই বলনা? ওরা মেয়েমানুষ; ওদের

কথা ছেড়ে দাও। তুমি আমায় বুঝিয়ে বল দেখি, ব্রাহ্মসমাজ থেকে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব বই বেরিয়েছে, সে সব কি শাস্ত্র নয়? না, সম্মুখে প্রতিমা খাড়া করে ফুল দূর্ব্বা দিয়ে পূজা না করলে পূজা হয় না? বা সংসার ছেড়ে কৌপীন এঁটে বনে না গেলে তপস্যা হয় না?—বল?'

আমি বলিলাম, 'দেখুন বাবা! আপনি যা বলছেন সবই সত্য। কিন্তু একটী কথা; যেমন অর্থকরী বিদ্যা শিখতে হলে নিয়মিতভাবে কলেজে আসা যাওয়া করতে হয়, মাষ্টার প্রফেসর প্রভৃতির আজ্ঞাবহ হয়ে শিক্ষালাভ করতে হয়; তেমনই ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে হলেও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে গুরুমুখী শাস্ত্র অভ্যাস করে নিয়মিতভাবে জীবনযাপন করতে হয়; তাঁদের আদেশ পালন করে চলতে হয়। বিনা ব্রহ্মচর্য্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা ধারণায় আসে না। টিয়াপাখীর মত কতক বচন বা প্রমাণ আওড়াতে পারলেই যে ব্রহ্মবিদ্য লাভ হল তা নয়। ধর্ম্মপথে বৃথা বিবাদ এবং শুষ্ক তর্ক একেবারে বর্জ্জনীয়। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার জন্য ব্যস্ত তাঁদের কোন বিষয়ে গোঁড়ামি থাকে না; আর তাঁরা বলেন না যে—আমি ব্রহ্মবিৎ। শাস্ত্রে আছে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' 'মূকাস্বাদনবৎ' অর্থাৎ বোবার সন্দেশ খাওয়ার মত, আনন্দ শুধু আস্বাদই করেন; স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেন না।'

তখন মা বলিলেন, 'ঠাকুর! তুমি এখন বল দেখি প্রতিমাপূজা প্রথম দরকার কিনা; বিনা প্রতিমাপূজায় ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করা যায় কি না?'

আমি বলিলাম, 'মা! কিসে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করা যায় তা আমার মত অজ্ঞান তো দূরের কথা, এ পর্য্যন্ত কোন মুনি ঋষি শাস্ত্রকারও সে বিষয়ে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করতে পারেন নি। তবে প্রত্যেকেই এক একটী পথ ধরে বলে গেছেন, এই পথে চললে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেও হতে পারে। আর এ পর্য্যন্ত এক জড়ভরত ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞান কারও লাভ হয়েছিল কিনা তার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, জনক ঋষি শুকদেব প্রভৃতি আরও দু একজনের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল।'

একথা শুনিয়া বাবা তেমন আনন্দ পাইলেন না। তিনি বলিলেন, 'ঠাকুর! তুমি কি তবে বলতে চাও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিশ্ববিজয়ী কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, এঁরা কেউই ব্রহ্মজ্ঞানী নন?'

আমি তখন কেমন একটা জোর করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম 'কখনই নন। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এক একটী পথ অবলম্বন করেছিলেন মাত্র; ব্রহ্মবিৎ হলে জড়ভরত হয়ে যেতেন। জড়ভরতের অবস্থাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। শুকদেব নিজেকে খুব উপযুক্ত মনে করে, গুরুকরণ করেন নি বলে তাঁকেও দেবসভায় নির্য্যাতিত হতে হয়েছিল; আর নিজেকে খুব চতুর ও বুদ্ধিমান মনে করার জন্য জনকসভায়ও বিষম অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল। বোধ হয় সে সব

কথা আপনি জানেন।'

কথা শুনিয়া বাবা চুপ করিলেন বটে; কিন্তু ভাব তত ভাল নয়। মা বলিলেন, 'ঠাকুর! তুমি প্রতিমাপূজার কথা চাপা দিলে চল্‌বে না; প্রতিমা-পূজার উপকারিতা সম্বন্ধে এখানে কিছু বল্‌তে হবে। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে; এ বিষয়ে নিশ্চয় কিছু জান।'

আমি বললাম, 'মা! উপাসনা করতে হলে সগুণেরই উপাসনা কর্‌তে হয়; আর তাই করাই শাস্ত্রসম্মত। ব্রহ্ম যখন নির্গুণ, নির্বিশেষ নিরুপাধি ও নিরঞ্জন, তখন তাঁর উপাসনা কেমন করে সম্ভব? মনের দ্বারা যখন উপাসনা, আর ব্রহ্ম যখন বাক্য মনের অগোচর, তখন মন, বুদ্ধি, চক্ষু ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া যেখানে পেঁছুতে পারে না, উপাসকের উপাসনা সেখানে কেমন করে পেঁছুবে? বিশেষতঃ গুরু হবে কে? যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনিই ত ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। পরমহংসদেব বল্‌তেন 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়ে সমুদ্রে নেমে আর ফিরে এল না; সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল।' আবার বিনা গুরু সহায়ে উপাসনা মঙ্গলকর হয় না; এ অবস্থায় প্রতিমাদি সাকারের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মসমুদ্রে প্রবেশ করা ছাড়া জীবের আর উপায় কি? বিশেষতঃ প্রতিমাদির আবির্ভাবও উপাসকের মঙ্গলের জন্য; যাঁরা প্রতিমাদি না মান্‌বেন তাঁরা ঈশ্বরকেও মান্‌তে পারেন না; কেননা ঈশ্বর সগুণ; নিগুণ ব্রহ্ম নন। তা ছাড়া আমরা যাকে মায়া বলছি সেই মায়াই প্রকৃতি; আর মায়া উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর কখনও নিরাকার হতে পারেন না ব্রহ্মই গুণময়ী মায়াকে আশ্রয় করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব উপাধিধারী হয়েছেন এবং সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। যিনি প্রকট ও জ্ঞেয় তিনিই ঈশ্বর; তিনিই জীবের উপাস্য এবং উপসনার ফলদাতা।'

'নিগুর্ণ ব্রহ্ম কি তবে কিছুই নয়?'

'তা কেন? শাস্ত্রে আছে নিগুর্ণ ও সগুণ দুইই সত্য',—

"নিগুর্ণং সগুণঞ্চেতি দ্বিধা মদ্রূপমুচ্যতে।
নিগুর্ণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্‌॥"

'তবে নির্গুণের উপাসনা করা যাবেনা কেন?'

না বাবা! তা যায় না; যেমন করে আপনাকে উপাসনা কর্‌তে হলে আপনার স্থূলভাগকেই উপাসনা কর্‌তে হয়, সূক্ষ্ম প্রাণকে নয়; তেমনি ব্রহ্মের যে ভাব নিষ্ক্রিয় ও নিগুর্ণ, তা উপাস্য নয়। তা যদি হবে, তাহলে সুরাসুরের যুদ্ধে তিনি সাকার হয়ে আবির্ভূতা হতেন না; আর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলিতে যাঁরা অবতার হয়ে আস্‌ছেন তাঁদেরও আস্‌তে হত না। ব্রহ্ম ইচ্ছাতেই যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমন লয়ও হতে পারত। কেবল উপাসকের সুবিধার জন্যই ব্রহ্ম শরীর পরিগ্রহ করে ধরায় অবতীর্ণ হন। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥' ইত্যাদি

বাবা চুপ করিলেন দেখিয়া মা গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। আমিও মাতা-পিতার ভাবে ভরপুর হইয়া বিশ্রামার্থ নীচে নামিয়া আসিলাম।

৯

কিছুদিন পরে একদিন আমার এক অপূর্ব্ব দর্শন লাভ হইয়াছিল; তাহা এই স্থানে প্রকাশ করিব। সেদিন আমি সুকিয়া ষ্ট্রীট ধরিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়াছি এবং মনে মনে চিন্তা করিতেছি কি করিয়া ভগবৎ দর্শন হয়; কারণ সেই দিনই সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সুমতি লালা নামক একটি বন্ধুর সহিত এক মিষ্টান্নের দোকানে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে করিতে এক ফকিরের মিষ্টান্ন ভিক্ষার অবস্থা দেখিয়া প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং মনে মনে ভাবিতেছিলাম মার কাছে যদি সকল সন্তানই সমান হয়, তবে এত প্রভেদ, এত বিচারবৈষম্য কেন? এইরূপ চিন্তার পর স্থির হইল যদি একবার দেখা পাই, ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করি। তাই কি করিয়া দেখা পাওয়া যায় ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতেছি এমন সময় দেখিলাম চারিটী মেয়ের মাথায় একখানি ৺শ্যামা মায়ের উজ্জ্বল মূর্ত্তি; মনে হইল পূজা করা মূর্ত্তি; বিসর্জ্জন দিতে গঙ্গায় লইয়া যাওয়া হইতেছে; অভ্যাসের ফলে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইলাম। একটি বাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন; আমাকে অন্যমনস্কভাবে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন?' আমি বলিলাম, 'আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।'

'আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'নিশ্চয় পারেন; আমি সম্প্রতি কবিরাজী পরীক্ষা পাশ করে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সিদ্ধেশ্বর বসুর বাড়ীতে আছি; সেখানে নিজে রান্না বান্না করে খাই; আমার নাম শ্রীঅন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য; বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে।'

'পূর্ব্ববঙ্গে কোথায়?

'চট্টগ্রামে।'

'আচ্ছা, আপনি হাত জোড় করে কাকে নমস্কার করলেন?'

'কেন? আপনি দেখেন্‌ নি? চারিটী মেয়ে একখানি ৺শ্যামা মায়ের মূর্ত্তি মাথায় করে বিসর্জ্জন দিতে নিয়ে গেল?'

পথিক আমার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'নিশ্চয় আপনি পাগল; কোথায়?—কে ৺শ্যামা মায়ের মূর্ত্তি নিয়ে গেল? আপনার নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমি চারিদিকে চেয়ে দেখেছি; কোথাও ত কাকেও আপনার নমস্য দেখতে পাই নি?'

আর আপনি বলছেন ৺শ্যামামূর্ত্তি ? চলুন ত দেখি, কোথায় ৺শ্যামামূর্ত্তি ?

'সে কি ? আপনি দেখ্‌তে পান্‌নি ?—কি বলছেন ? এমন উজ্জ্বল দিনের আলোয় মায়ের মূর্ত্তি নিয়ে যাচ্ছিল ; আর আপনি দেখ্‌তে পান্‌নি বলছেন ?'

'না মশাই ! না ; রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে দেখ্‌বেন কে দেখেছে ? ঐ ত অনেক লোক আস্‌ছে ; জিজ্ঞাসা করুন দেখি।'

আমি দুচার জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা কেহই ৺শ্যামা মূর্ত্তি দেখে নাই ; আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিতে সে হাসিয়া বলিল, 'আপনি কি উন্মাদ ? আজ বুধবারও নয়, রবিবারও নয়, প্রতিপদও নয় পঞ্চমীও নয়, আর যদি চতুর্দ্দশীতে পুজা হয়, অমাবস্যাও নয় পূর্ণিমাও নয় ; এ অবস্থায় ৺শ্যামামূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে নিয়ে যেতে দেখার কথা আর কাউকে বলবেন না, লোকে উন্মাদ বলবে ; বা তামাসা করছেন মনে করবে।'

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বুকের ভিতর যেন হাতুড়ির আঘাত পড়িতে লাগিল। আমি যেদিক হইতে আসিতেছিলাম, সেইদিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম। মিনিট ৩।৪ আগে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, প্রায় আধ ঘণ্টা খোঁজ খবর করিয়া তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল ; ভাবিতে লাগিলাম, তবে আমি কি দেখিলাম ? আমি ত সত্য সত্যই ৺শ্যামামূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি ; ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিলাম। গিরীশ সন্ধ্যা সারিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া, আমায় চিন্তাযুক্ত দেখিল কি না জানি না ; কিন্তু সে বলিল 'ভাই ! সন্ধ্যা কর্‌তে যাও।' আমি নিরুত্তরে সন্ধ্যা করিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সেই ঘরে কালীঘাটের ৺কালীমূর্ত্তি এবং আরও দুই তিনখানি পট সম্মুখে সাজান থাকিত। আমি আসনে বসিলাম ; গিরীশ যথারীতি ধুনাচি করিয়া ধুনা জ্বালাইতে লাগিল ; ক্রমে ঘর অন্ধকার হইয়া আসিল। আমি আসনে স্থিরদৃষ্টিতে ৺মায়ের পানে চাহিয়া আছি ; গিরীশ আমার ভাব দেখিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল এবং দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল বুঝিতে পারিলাম ; কেননা অতি মৃদুভাবে দুয়ার বন্ধ করিবার শব্দ আমার কানে আসিল। তারপর ক্রমশ আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম এবং আমার সম্মুখে ৺মায়ের অপূর্ব্ব লীলা চলিতে লাগিল। সে লীলার যে কি মাধুর্য্য তাহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব ; বাক্যের দ্বারা বুঝাইয়া বলাও অসম্ভব ; ভাবের দ্বারাও ব্যক্ত করা অসম্ভব। এইরূপ অবস্থায় ৮।১০ দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বন্ধুদের মুখে শুনিলাম আমি পাগল হইয়াছি। খুবই বাড়াবাড়ি হইয়াছিল ; এখন একটু কমিয়াছে। আমি বলিলাম, 'তা নয়, আমি বেশ আছি ; তোমরা দেশে এ খবর দিও না।'

গিরীশ ও শচীন সর্ব্বদা আমার কাছে থাকে ; তাদের ভাব আমার বড়

সুন্দর লাগিত। কুমুদ ও মণি প্রায়ই আমায় দেখিতে আসে শুনিয়াছি যখন বাড়াবাড়ি হইয়াছিল তখন তাহারা আমার কাছে রাতদিন থাকিত। সকলে বলিল গিরীশ মার খাইয়াও আমার যথেষ্ট সেবা করিয়াছে। কেন মারিয়াছিলাম জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, 'তোমায় পূজা করিতে না দেওয়ায়'; আমি তখন একটু অপ্রস্তুত হইলাম। তারপর দেখিলাম, আমি অনেক গান লিখিয়াছি; তাহার মধ্যে পরমহংসদেব সম্বন্ধে এবং ৺মা ও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকটি গান আমার কাছেই পড়িয়াছিল। শচীন ও গিরীশ সে সব গান আমায় দেখাইতে লাগিল; গানগুলি আমার বেশ ভাল লাগিল বটে; কিন্তু একটি বিষয়ে সকলের নিকট, বিশেষ শচীনের নিকট, একটু লজ্জিত হইলাম; কেননা আমি যে রামকৃষ্ণদেবকে মানি বা ভক্তি করি তাহা তখনও তাহার নিকট প্রকাশ করি নাই। আজ উন্মাদ অবস্থায় সমস্ত গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া গেল দেখিয়া আমি বাস্তবিক একটু দুঃখিত হইলাম। এর কয়েকদিন পরে বাবা আসিয়া আমায় দেশে লইয়া গেলেন।

১০

আমি প্রায় মাসাবধি দেশে ছিলাম এবং আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই একমাসের মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আমাদের বাটী আসিয়াছিলেন; আমি সকলের মুখে আধ্যাত্মিক কথা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতাম। এক দিনের একটী সাধুর ঘটনা এইখানে বলিব। বেলা তখন প্রায় দুপুর; আমি অন্দরবাটীর একটী পাইখানা পরিষ্কার করিতেছি; মা সম্মুখের পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। মা তাড়াতাড়ি আসিয়া আমায় সংবাদ দিলেন, বাহিরের উঠানে একটী সাধু আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং হিন্দিতে কি বলিতেছে। মা আমার সে কালের সাদাসিধা লোক, লেখাপড়া জানিতেন না, হিন্দী বুঝিতেন না। আমি সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম; কেননা দুই তিন দিন পূর্ব্বে ৩।৪ জন সন্ন্যাসী একসঙ্গে আসিয়া আমাদের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আজ কোন্ সাধু আসিল?

আমি হাত মুখ ধুইয়া বাহির বাটীতে গেলাম। দেখিলাম, আহা! কি সুন্দর রূপ! আয়ত নয়ন, আজানুলম্বিত বাহু, লম্বিত জটাভার, পরিধানে বাঘছাল, হাতে কমণ্ডলু। দেখিয়া বড়ই ভক্তি হইল; জানু পাতিয়া নমস্কার করিলাম। মা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন; সাধুটী মাকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দীতে বলিল, 'আমি এই মায়ের স্বহস্তে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিব।' আমি মাকে সে কথা বলিলাম। মা বলিলেন, 'সেদিন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ত শুধু দুধ খই আর ফল খেয়েছিলেন; ইনি আমার হাতে অন্ন গ্রহণ করবেন বলছেন। বেশত, তুমি বসাও; আমি স্নান করে আসি।' এই বলিয়া মা সানন্দে

স্নান করিতে চলিয়া গেলেন; আমিও পূজামণ্ডপে সাধুটীকে বসিতে বলিয়া স্নান সারিয়া আসিলাম। সাধুটী আবার বলিল, 'তোমার মাকে রাঁধতে বল; আমি তোমার মার হাতের অন্ন-ভিক্ষা চাই।' আমি বলিলাম, 'তাই হবে।' ডাল তরকারী প্রস্তুত ছিল; মা আসিয়া ভাত নামাইয়া লইলেন। অতঃপর সাধুটী পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার সমাপন করিলেন। তখন বেলা ৪টা; অনেক আলাপের পর সাধুটীকে মা একখানি বস্ত্র ও একটী টাকা দিলেন। সাধুটী আমায় একটী মাদুলী দিয়া গিয়াছিল; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে মাদুলীটী ধারণ করিবার ১০ দিন পরে একদিন সাধুটী আসিয়া আমায় বলিল, 'আমার মাদুলী আমায় ফেরৎ দাও; তোমার আর ধারণ করতে হবে না।' আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, 'যে জন্য তোমায় দেওয়া হয়েছিল তা পূর্ণ হয়েছে; এখন অন্যকে দেব।' আমিও মাদুলী খুলিয়া দিলাম। সকালে সত্য সত্যই দেখি মাদুলীর খোলটি আমার হাতে আছে, ভিতরের জিনিষটা আর নাই। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি খোলটী জলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন; আমিও তাহাই করিলাম।

মা আমার প্রায়ই স্বপ্ন দেখিতেন; স্বপ্নে ঔষধ পাইতেন। এই ঘটনার তিন চার দিন পর একদিন প্রত্যুষে আমায় ডাকিয়া দশভুজা ঘরে লইয়া গেলেন। ৺মাকে প্রণাম করিয়া এবং আমাকে করিতে বলিয়া একটী স্বপ্নাদেশের কথা বলিলেন। সেই স্বপ্নাদেশের মর্ম্ম হইতেছে, মার নিকট দীর্ঘকালের জন্য আমার বিদায় গ্রহণ। স্বপ্নে সেই সন্ন্যাসীটী আসিয়া যেন মার নিকট আমায় ভিক্ষা চাহিতেছেন; আর মার ইষ্টদেব যেন ভিক্ষা দিতে বলিতেছেন। মা তাহাতে রাজী হইলে আমি যেন সন্ন্যাসীটীর সঙ্গেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় মার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ধন্য মায়ের প্রাণ! মা সত্বর শয্যাত্যাগ করিয়া আমায় দশভুজাঘরে ডাকিয়া লইলেন এবং এই সকল কথা বলিতে বলিতে অজস্রধারে দুনয়নে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'মা! আপনি কাঁদছেন কেন?' মা বলিলেন, 'বাবা! সেদিন সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে চিনতে পারিনি; নিশ্চয়ই তিনি মানুষ নন, দেবতা। তিনি এসে আমাদের বাড়ী পবিত্র করে দিয়ে গেছেন; আমরা ধন্য হয়েছি।'

আমি এ সকল কথা আর কাহারও নিকট না বলিবার জন্য মাকে বার বার অনুরোধ করিয়া বলিলাম, 'মা! আপনি ৺মা মঙ্গলচণ্ডীর ভক্ত, আপনার সন্তানের কখনও অমঙ্গল হবে না; সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর আপনার স্বপ্নাদেশে যে বিদায় দেখেছেন, তার ফল বিপরীত; আমি শীঘ্রই আপনাদের কাছে এসে পড়ছি।'

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিলেন, 'তুমিত বলেছিলে কবিরাজী পড়া শেষ করে আমাদের কাছে এসে থাকবে; কিন্তু কই? তেমোর ভাবগতিক দেখে তো

মনে হয় না যে তুমি কল্‌কাতা ছেড়ে শীঘ্র দেশে ফিরবে?'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় আস্‌ব, একসঙ্গে থাকব; আপনি চিন্তা করবেন না।'

আমার আশ্বাসবাণী শুনিয়া মা কতক শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই স্বপ্নাদেশ তিনি একবারে ভুলিতে পারিলেন না। আমিও তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্যই কথাগুলি বলিয়াছিলাম; প্রাণের ভাব তাহা ছিল না। বরং মার স্বপ্নাদেশের মধ্যে যে বিশেষ কোন ভাব লুক্কায়িত আছে তাহাই তখন প্রাণে অনুভব করিয়াছিলাম।

## ১১

এই ঘটনার পর কলিকাতায় আসিয়া আবার কবিরাজী ব্যবসায়ের উদ্যোগ আয়োজনে নিযুক্ত হইলাম। সহরময় অনেক প্ল্যাকার্ড মারা হইয়াছে, 'অভয়া সুধা আসিয়াছে; প্রাপ্তিস্থান ১০০ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট।' হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপান হইতেছে, বিলি হইতেছে। সমস্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে; বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এইবার শুভদিন দেখিয়া ১লা বৈশাখ সেই সজ্জিত ঔষধালয়ে চিকিৎসক সাজিয়া বসা স্থির হইয়া গেল। প্রাণে বড় আনন্দ, অনেক কষ্টের পর বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধের মত অকৃত্রিম ঔষধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নূতন ব্লক প্রস্তুত, ঔষধ রেজিস্টারী, যতীন বাবুর সঙ্গে দেনা পাওনার বন্দোবস্ত প্রভৃতি সবই শেষ; এবার একবার দেশ হইতে পিতামাতার চরণধুলি লইয়া আসিয়া বসিলেই হয়, এই ভাবিয়া দেশে যাওয়া হইল। অবশ্য দেশে যাওয়ার যে অন্য কারণ ছিল না তাহা নহে; দ্বিতীয় বিবাহও একটা প্রধান কারণ।

দেশে যে কয়দিন আছি, খুবই আনন্দে আছি। এবার কলিকাতায় গিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিব; পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীর দুঃখ ঘুচাইব; জীর্ণ গৃহ সংস্কার করিব; মহাজনের দেনা শোধ করিয়া প্রথমতঃ কয়েক বিঘা ধান জমি খরিদ করিব; এই সব চিন্তাই অহরহ মনে উদয় হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কার ছিল না; বরং যাহার সঙ্গে কখনও মিশি নাই তাহার সঙ্গে মিশিতে ইচ্ছা হইতেছে; যাহারা বহুকাল শত্রু হইয়া আছে তাহাদেরও বাড়ীতে যাতায়াত চলিতেছে; এমন কি খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত কিছু বাদ নাই। বোধ হয় উন্নতির আশায় সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উদার হৃদয় সবারই হয়। আমি তখন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' দেখিতে লাগিলাম এবং খুবই স্বার্থত্যাগী হইয়া উঠিলাম। দান করিবার প্রবৃত্তি এতই বাড়িয়া উঠিল যে তাহার জ্বালায় বাড়ীশুদ্ধ সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মা আমাকে 'দাতার জামাই' বলিয়া ডাকিয়া আনন্দ

করিতেন; তিনিও আমার ব্যবহারে সঙ্কুচিতা হইলেন। আমাকে বাজারে যাইতে হইলে তিনি আনন্দের পরিবর্ত্তে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন; কেননা তিনি জানিতেন আমি জিনিষ কিনিতে দর দস্তুর করিব না; যে যাহা চায় দিয়া দিব। তিনি বলিতেন, 'বাবা! আগে রোজগার কর, তারপর খরচ করো; দুহাতে দানধর্ম্ম করো; এখন যে আমরা খেতে পাই না; অত দাতা হলে চলবে কেন?' কিন্তু আমার মনে সে সকল কথা মোটেই স্থান পাইত না। আমি জানিতাম, মা আমার স্বয়ং দাতারামের কন্যা; দান দেখিয়া তিনি কখনও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না, কেননা তাঁহার দান অমানুষিক ছিল; তাঁহার দান শুধু আমাকেই জানিতে দিতেন। আমি জানিতাম এক সময়ে অতি হীন অবস্থায় পড়িয়াও অবস্থার চতুর্গুণ দান তিনি করিয়াছিলেন; সেইজন্য ভিখারীর দল তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিত। আবার এদিকে এতই কঠিন ছিল যে একপোয়া চাল দিয়া ছেলেদের মাছ কিনিয়া দিতে নারাজ হইতেন। সিকি, দুয়ানী, আধুলী হাতে পড়িলে নিতান্ত অভাবে ভিন্ন ভাঙ্গাইতেন না; টাকা ত দূরের কথা। তিনি বাবাকে বলিতেন, 'দান করা ত জমা রাখা; ছেলেপিলের ঘরে দান ধর্ম্ম চাই; নাহলে মঙ্গল হয় না। কে কাকে দান করে? কে কাকে খাওয়ায়। সবাই নিজ নিজ ভাগ্যে খায়' ইত্যাদি।

এইরূপ আনন্দে দিনকতক গেলে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম একজন গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী আমার নিকট আসিয়া বলিতেছেন, 'তুমি শীঘ্র কলকাতায় যাও তোমাকে এইটি দিব;' এই বলিয়া একটী ৺মায়ের প্রতিমূর্ত্তি তিনি আমায় দেখান। আমি মূর্ত্তিখানি ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই; তবে মনে হইল ৺কালীমায়ের মূর্ত্তি। সকালে উঠিয়া স্বপ্নের কথা প্রথমে মাকে জানাইলাম; মা তাহা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'তুমি এযাত্রা কলকাতায় গেলে শীঘ্র আর ফির্‌বে না; এখন দিনকতক থেকে যাও!' সন্ধ্যার সময় দাদাকে ডাকিয়া বেড়াইতে গেলাম এবং এই স্বপ্নাদেশের কথা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া শুধু বলিলেন, 'বেশ ত; মা যখন বল্‌ছেন তখন আর কয়েক দিন থেকে যাও না কেন?' সেইদিন রাত্রে পুনরায় স্বপ্নাদেশ হইল। সেই পূর্ব্বের সন্ন্যাসীটী আসিয়াই আমায় কলিকাতা যাইতে বার বার অনুরোধ করিলেন। আমি কিছুতেই না শুনায় তিনি বলিলেন, 'যদি কাল কল্‌কাতা যাত্রা না কর, মহা বিপদ্‌ ঘট্‌বে।'

আমি সকালে উঠিয়া স্বপ্নাদেশের কথা আর কাহাকেও বলিলাম না। দেখিলাম সত্য সত্যই সেদিন রাত্রে এক বিপদ ঘটিল। অপর বাড়ীর আগুন আসিয়া আমাদের বৈঠকখানা ও গোয়ালঘরখানি পুড়িয়া গেল। অন্যান্য ঘরগুলি অতি কষ্টে বহু পাড়াপড়শীর বিশেষ চেষ্টায় রক্ষা পাইল। তারপর আর কাল বিলম্ব করিলাম না; পিতা মাতা ভ্রাতা ও নববধূর নিকট হইতে বিদায় লইয়া

কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

এবারকার যাত্রায় একটু বিশেষ অভিনয় ঘটিল; কেন না, যে মা আমায় বিদায় দিতে কখনও ব্যাকুলা হন না, এবার তিনিও আমায় বক্ষে ধরিয়া চোখের জলে বলিলেন, 'বাবা! আমাকে মনে রেখ, যেন ভুলে যেও না।' ভ্রাতা ভগ্নী সকলেই কাঁদিল; বাবারও চক্ষে জল দেখিলাম। বাবার চোখের জল আজ নূতন নহে; তিনি প্রত্যেক বারেই এ অধমকে চোখের জলে বিদায় দিতেন। আজ আমি একটু নূতন রকম হইয়া গেলাম। বাটীর প্রায় সকলেই আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল; সম্মুখের পুকুর পাড়ে আসিয়া বাবা বলিলেন, 'তোমার বড়দার উদ্দেশ্যে নমস্কার কর।' বড়দা আমার স্বর্গগত পিতামহ; পুকুরের ওপারে তাঁহার শ্মশান। আমি উদ্দেশ্যে জানু পাতিয়া বসিয়া বড়দাকে নমস্কার করিলাম; এবার আমারও চোখে জল আসিল। বড়দার ছবি আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিতে আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। একে একে বড়দার ভালবাসা, গল্প উপদেশের কথা, গায়ে পড়িয়া আদর যত্ন করার কথা, সব মনে পড়িতে লাগিল। আমার বড়দা পুণ্যশ্লোক সদাশিব ছিলেন। তাঁহার গুণের কথা, দানের কথা, পরোপকারের কথা, আমি বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। দেশের আবালবৃদ্ধের প্রাণে তাহা চির অঙ্কিত আছে।

সে যাহা হউক আমাকে যাঁহারা বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে একে একে গতি সংযত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমার সরল প্রাণ স্নেহের ছোট ভাইটী আমার তল্পী কাঁধে করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিল; আমরা ঘুরিয়া বাড়ীর পিছনে নদীর ধারে আসিলাম। এইখানেই নৌকা পাইবার কথা; কিন্তু আজ সহরে যাইবার নৌকা এপথ দিয়া একখানা আসিল না দেখিয়া বাড়ীর দক্ষিণে বড় নদীতে নৌকা পাইবার আশায় সেইদিকে চলিলাম। সে পথে যাইবার পূর্বে চোখ একবার চাহিয়া দেখিল কে কোথায় আছে। কোথাও বিশেষ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; শুধু দেখিলাম স্নেহের নববধূটী বাটীর পিছনে ঘরের ধারে একটী কলাগাছের নীচে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তখন তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসরের অধিক হইবে না; আমার বয়স ২২ কি ২৩ বৎসর। গত রাত্রের প্রেমাভিনয় ও বিদায়ের অশ্রুর কথা যুগপৎ মনে পড়ায় আমার মন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি তখন ছোট ভাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, 'শ্যাম! তোমার বৌদিকে দেখো; তাকে কাঁদতে বারণ করো; আর সে যাতে সকলের মন যুগিয়ে চলতে পারে সেইরূপ শিক্ষা দিও।' শ্যাম বলিল, 'বৌদি খুব ভাল; তাঁকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দিতে হবে না; বৌঠাকুরাণীর সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়ে গেছে; আর গৃহকার্য্যেও বেশ পটু। মা দুটী বৌ পেয়ে খুবই সুখী হয়েছেন।' আমি বলিলাম, 'যে স্ত্রী পিতামাতার সেবা করতে কুণ্ঠিত হয়, তাদের বাধ্য হয়

না এবং গৃহকার্য্যে অপটু হয়, সে স্ত্রী দুঃখেরই কারণ হয়ে থাকে এবং সেই স্ত্রীপুরুষের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময় হয়ে দাঁড়ায়। অনুতাপ, অনুশোচনা, অশান্তিই তাদের জীবনসঙ্গী হয়। বলিতে বলিতে অদূরে নৌকার শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। শ্যাম বলিল, 'দাদা! ঐ সহরের নৌকা যাচ্ছে; একটু তাড়াতাড়ি চলুন।' কথা বন্ধ হইয়া গেল; তাড়াতাড়ি পথ চলিয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। সে নৌকাখানি আর পাওয়া গেল না; পরক্ষণে এক সামপান আসিল এবং আমি তাহাতে উঠিয়া সহরের পথে চলিলাম। ছোট ভাইটী চোখ মুছিতে মুছিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

১২

পরদিন রাত্রি প্রায় ৮॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলাম। কলিকাতার গাড়ীঘোড়া লোকজন মোটরকার প্রভৃতির কোলাহলে দেশের কথা সব ভুলিয়া গেলাম। ১০০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সিদ্ধেশ্বর ভবনে প্রবেশ করিয়া ডানদিকের ঘরখানিতে নূতন সজ্জিত ঔষধালয় গ্যাসের আলোতে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে দেখিলাম। দেখিয়া প্রাণের ভিতর এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একদিকে স্বপ্নাদেশের বিভীষিকায় নৈরাশ্য উৎপাদন করিতেছে; আর এক দিকে আমি এই ঔষধালয়ের মালিক; এক বৎসরের মধ্যে লক্ষপতি হইব ইত্যাদি জল্পনা কল্পনায় আমাকে আশার উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিমান করিতেছে। আমি বাড়ীর ভিতর যেখানে মা রান্না করিতেছিলেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মা প্রভৃতি ছোট বড় সকলে আমাকে দেখিয়া আনন্দের হাট বসাইল; যতীন বাবু উপর হইতে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে নিজ অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন শুনিয়া একটু ব্যস্ত হইলাম।

মা বলিলেন, 'ঠাকুর! উপরে যাবে? যাওনা—বিমু এখানে আছে; তুমি যাও।'

আমি উপরে যাইতে শচীন আসিয়া আমায় দৃঢ়ালিঙ্গনে আবদ্ধ করিল; তারপর যতীন বাবুর সঙ্গে আলিঙ্গন হইল। অনেক কথাবার্ত্তা হাসিঠাট্টা চলিতে লাগিল এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন, ঠাকুর! খেতে এস।' আমি হাত মুখ ধুইয়া অপর্য্যাপ্ত ফলাহারে তৃপ্ত হইয়া যথাসময়ে শয়ন গৃহে আশ্রয় লইলাম। নিদ্রাদেবী গাঢ় আলিঙ্গনে আমায় বুকে লইলেন। এমন শান্তি সুখ হইতে আজ দুইদিন বঞ্চিত; শ্রান্ত পথিক আজ কয়দিনের সাধ মিটাইয়া ঘুমঘোরে অচৈতন্য; এমন সময়ে আবার সেই স্বপ্ন।

আবার সেই সাধু। পরণে গৈরিক বসন, গায়ে আলখাল্লা, মুণ্ডিত মস্তক, পাতলা গৌরবর্ণ চেহারা; এমন মূর্ত্তি এ জীবনে আর কোথাও দেখিয়াছি

বলিয়া মনে হয় না। সাধু বলিলেন, 'কাল সকালে তোমায় গঙ্গাস্নানে যেতে হবে ; মস্তক মুণ্ডন করতে হবে।'

আমি শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলাম ; বলিলাম, 'কি! মস্তক মুণ্ডন ? কোন্ অপরাধে ?'

সন্ন্যাসী বলিল, 'অপরাধ নয় ; আদেশ।'

আমি বলিলাম, 'কার আদেশ ?'

তিনি বলিলেন, 'গুরুজীর।'

আমি বলিলাম, 'তোমার গুরুজীকে মস্তক মুণ্ডন করতে বলগে যাও ; আমি কারও আদেশ শুনতে বাধ্য নই।'

সন্ন্যাসীঠাকুর অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল ; আমি কিছুতেই সে রাত্রে তাঁহার কথা বুঝিতে চাহিলাম না। রাত্রি প্রভাত হইল ; মস্তক মুণ্ডন ত দূরের কথা, সেদিন গঙ্গায় পর্যন্ত স্নান করিতে গেলাম না। সমস্ত দিন কি একভাবে কাটাইয়া দিলাম ; কাহারাও সঙ্গে তেমন হাসিয়া কথাটী পর্যন্ত কহিতে পারিলাম না। সকলে আমার ভাব দেখিয়া ভয় পাইল ; ঠাকুর আবার না পাগল হইয়া যায়।

সেদিন বাসন্তী সপ্তমী রাত্রি। চৈত্রমাস ; অনেক বাড়ীতে ৺মা বাসন্তী দেবী আসিয়াছেন। রাত্রিতে শুইবার পর নিদ্রা আসিবামাত্র সেই সাধুটীর পুনরাবির্ভাব ; আমি দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। কথা কহিতেই বলিলাম, 'দেখ সন্ন্যাসীঠাকুর! ফের যদি মস্তক মুণ্ডনের কথা বল,—গলাধাক্কা দিতে দিতে ঘর থেকে বের করে দেব।'

সন্ন্যাসী ঠাকুর চাটগেঁয়ে বাঙ্গালের গোঁ দেখিয়া বোধ হয় ভয় পাইলেন। শুষ্কমুখে আমতা আমতা করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি ঘুমঘোরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, এ যাত্রার মত বোধ হয় ঘাড় হইতে ভূত নামিয়া গেল।

ওমা! দেখিতে দেখিতে এ আবার কে ? ইনি যে দেখিতেছি স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। স্বর্গীয় গিরীশ ঘোষ ৺কাশীধাম পুঁটিয়া রাণীর শিবমন্দিরের চৌতারায় বসিয়া যাঁহার মাহাত্ম্য আমায় শুনাইতে শুনাইতে অজস্র ধারায় অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন,—যিনি আমার প্রিয় বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের প্রাণের দেবতা, সাধনার ধন,—ভক্তিমান রাম দত্তের একমাত্র ইষ্টদেব,—সাধু নাগ মহাশয়ের অদ্বিতীয় প্রাণবল্লভ—রাণী রাসমণির ৺মাতৃপূজার পূজক, পূজ্য সাধক—ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মপিতা,—শিবানন্দ সারদানন্দ প্রেমানন্দ যোগানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের সাক্ষাৎ ভগবান, তিনিই যে আজ দীনহীনের কুটীরে সশরীরে উপস্থিত! তাই ত! তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। সদাহাস্য প্রফুল্লবদন ঠাকুর হাসিতে হাসিতে আমায় বলিলেন, 'আমায় চিনতে পেরেছ ত ?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ পেরেছি।'

'আমিই সাধুটীকে পাঠিয়েছিলাম; তুমি তার আদেশ প্রতিপালন করনি কেন?'

'ঠাকুর! আমি ত জানি না; আপনার সাধুটী ত আমায় কিছুই খুলে বলেন নি।'

'আচ্ছা, আমি এখন যা বলি শুনবে ত?'

'নিশ্চয় শুনব।'

'তুমি প্রত্যুষে উঠে মস্তক মুণ্ডন করে গঙ্গাস্নান করে এস; তারপর বিশুদ্ধ আহার করে বিশুদ্ধ শয্যায় শয়ন করে থেকো; কেমন?'

'এরকম কতদিন করতে হবে?'

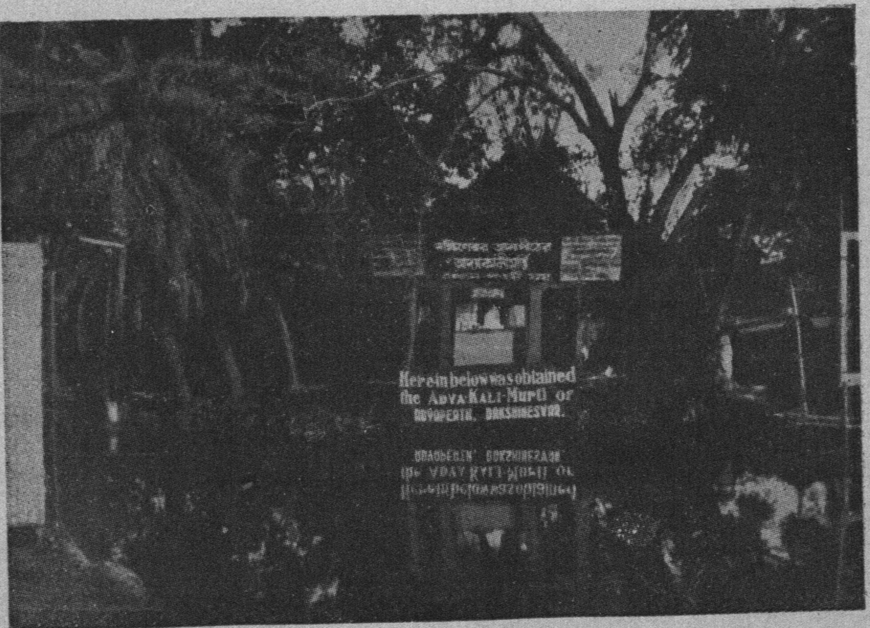
'শুধু আজকের দিন; তারপর যেমন যেমন আদেশ করব সেইমত কাজ করে যেও; আমি এখন চল্লুম।'

এই বলিয়া ঠাকুর গৃহত্যাগ করিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিলাম এবং রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া আর ঘুমাইলাম না। শচীন ঠাকুরের ভক্ত, শ্রীমার মন্ত্রশিষ্য, তাই তাহার নিকট গিয়া স্বপ্নাদেশের সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া বলিলাম। শচীন বলিল, তুমি ভাগ্যবান; এখনই যাও; মস্তক মুণ্ডন করতে এত লজ্জা কেন? আমি ইচ্ছা অনিচ্ছার মাঝে পড়িয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে চলিলাম। ভাবিলাম, ১লা বৈশাখ কবিরাজ সাজিয়া বসিব; আর আজ ২১শে চৈত্র; এসকল কি ব্যাপার? জানি না কি এক আকর্ষণের টানে আমি সকল কাজ সারিয়া লইলাম। বিশুদ্ধ কম্বল শয্যায় রাত্রিতে শুইলাম।

নিদ্রা আসিতে না আসিতে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর আসিলেন, আনন্দ হইল; বসিতে বলিলাম। কিন্তু ঠাকুর যে জীবজগতের নমস্য, তাঁহাকে যে নমস্কার করিতে হয়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম; আর মনে হইতে লাগিল, শচীন, যতীন যেমন আমার প্রিয়বন্ধু, ঠাকুরও সেই রকম আর একজন। অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর বলিলেন, 'তুমি ওঠ; সময় হয়েছে; ইডেন গার্ডেনের যেখানে পাকুড় গাছ ও নারিকেল গাছ একযোগে উঠেছে, তার নীচে যে একটী মূর্ত্তি পাবে সেটী নিয়ে এস; তিনজন ভক্ত সঙ্গে করে নিয়ে যেও; আর তুমি মৌন অবলম্বন করে থেকো। মূর্ত্তিখানি যতদূর সম্ভব গোপন করে রেখো; তারপর যেমন আদেশ হয় সেই মত কাজ করো।'

১৩

ঠাকুর চলিয়া গেলেন। তখন ৪।৫ দণ্ড রাত্রি আছে। আমি ছুটিয়া শচীনের ঘরে গেলাম এবং নীরবে শচীনকে ডাকিলাম ও কাগজে লিখিয়া স্বপ্নাদেশের




কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে এই পাকুর গাছের নীচে আদ্যাপীঠের শ্রীশ্রী৺আদ্যামাকে ১৩২১ সালে রামনবমী তিথিতে পাওয়া গিয়াছিল।



কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে স্বপ্নপ্রাপ্ত শ্রীশ্রী৺আদ্যামূর্ত্তি

কথা জানাইলাম। শচীনের খুবই আনন্দ ; কিন্তু ভক্ত পায় কোথায়। কে ভক্ত তাই বা জানিবার উপায় কি ইত্যাদি চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র শচীনকে ও আমার সহপাঠী সত্যকে নিয়ে গেলে হবে কি ?' আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করাতে শচীন ভক্ত দুইজনকে ডাকিয়া লইয়া ইডেন গার্ডেনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শচীন বলিল, 'ঠাকুর ! তুমি অনেক গাঁজাখুরি স্বপ্নাদেশের কথা আমায় অনেকদিন বলেছ ; এইবার তার পরীক্ষা হবে।' আমি একটু হাসিয়া মাথা নাড়িলাম। ক্রমে লাটসাহেবের বাটীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, কোন্ দিকে প্রবেশ করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম 'জানি না।' অতঃপর মত হইল, লাটসাহেবের বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিম্ কোণ দিয়া যে রাস্তা ইডেন গার্ডেনে প্রবেশ করিয়াছে সেই রাস্তা দিয়াই যাওয়া হইবে ; কাজেও তাহাই হইল।

বাগানের অগ্নিকোণ দিয়া প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে হাইকোর্টের সম্মুখভাগে যে রাস্তায় ঝিলের উপর দিয়া একটী পুল আছে সেইখানে আসিয়া সকলে পৌঁছিলাম। আমাদের একজনের দৃষ্টি পাকুড় গাছে পড়ায় সকলেই সেইদিকে লক্ষ্য করিলাম এবং দেখিলাম এই সেই স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট পাকুড় ও নারিকেল গাছের সংযোগ স্থান। পাকুড় গাছের ভিতর দিয়া নারিকেল গাছটী উর্দ্ধশির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছটীতে অনেক নারিকেলও ফলিয়াছে। আশে পাশে আরও ৮।১০ টী নারিকেল গাছ ; স্থানটী দেখিয়া আমাদের বড় আনন্দ হইল। পুলের পূর্ব্ব প্রান্তে সে স্থান ; সেখানে গিয়া দেখিলাম বড় অপরিষ্কার। এইরূপ অপরিষ্কার ও লোকের অগম্য স্থান ইডেন গার্ডেনে আর আছে বলিয়া মনে হইল না। শৃগালবিষ্ঠা ও শুষ্ক পত্র দ্বারা সমস্ত স্থানটী আচ্ছাদিত। আমরা সকলে শুষ্ক কাষ্ঠের সাহায্যে স্থানটী পাতিপাতি করিয়া খুঁজিলাম ; বৃক্ষকোটর পর্য্যন্ত দেখিতে বাকী রাখিলাম না। কোথাও কিছু মিলিল না দেখিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচাহি করিতে লাগিলাম ; কিন্তু স্থানটীর এমনই মাহাত্ম্য যে শচীনের সমস্ত অবিশ্বাস কোথায় চলিয়া গেল। সে বলিল, 'নিশ্চয় পাওয়া যাবে।' বাস্তবিকই স্থানটী একটি তীর্থস্থান। কেন না শুনিয়াছি শাস্ত্রে আছে যে, কোন ফলন্ত বৃক্ষের সংযোগে যদি অশ্বত্থ, বট বা পাকুড় গাছ সংযুক্ত থাকে, তাহা বড়ই পুণ্যদর্শন হয়। অনেক হিন্দু নরনারী এইরূপ অবস্থায় যাহাতে উভয় বৃক্ষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাহাই করেন। অবশ্য এই পুরাতন পবিত্র প্রথাকে অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষিত মনীষিগণ অন্ধ বিশ্বাসী হিন্দুর অজ্ঞতা বই আর কিছু বলিতে রাজি হইবেন কি না সন্দেহ।

যাহা হউক, ক্ষণেক পরে সত্যকিঙ্কর রায় বলিল, 'বোধ হয় মূর্ত্তি জলে আছে ; কেন না বহুকাল আগে আমাদের দেশে এরকম একটী ঘটনা ঘটেছিল।

শুনেছি সে সময় মূর্ত্তি জলে পাওয়া গিয়েছিল। আর এখানেও যখন নির্দ্দিষ্ট গাছ দুটীর অবস্থান জলের ওপর, এমন কি শিকড়গুলি জলে গিয়ে পড়েছে, তখন জলে পাওয়াই সম্ভব।' এখন জলে নামে কে? যে বাগানে একটী পাতা ছিঁড়িলে ৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা জরিমানা দিতে হয়, সে বাগানের জলে নামিলে হয়ত ফাঁসিও হইতে পারে; বিশেষতঃ আমরা পৌত্তলিক; তার উপর আবার পুতুল দেবতার উদ্ধার।

'আচ্ছা দাঁড়াও—আমি দেখ্‌ছি;' বলিয়া শচীন মালীদের ডাকিতে গেল। তখন সূর্য্যদেবও উঠিয়াছেন; সত্য একখানা কাঠ দিয়া জলে খুঁজিতেছে আর আমার মুখের দিকে এক একবার তাকাইতেছে; আমি বুঝিলাম নিশ্চয় মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তখন আমি আইনের কথা ভুলিলাম; ভালমন্দ বিচার না করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া একলাফে জলে পড়িলাম। জলে হাত বাড়াইতেই হাতে ঠেকিল—আহা কি সুখস্পর্শ! কি পুণ্যস্পর্শ! জলের ভিতর মূর্ত্তিটী যেন মাটীর উপর বসান ছিল।

আমি ক্ষিপ্রহস্তে মূর্ত্তিখানি বুকে তুলিয়া লইলাম; আহা! কি রূপ! কি উজ্জ্বল মধুর মাতৃমূর্ত্তি! মৃদুহাস্যবিমণ্ডিত বদনমণ্ডলের কি অপূর্ব্ব শোভা! শ্যামামূর্ত্তির এমন মুখ ত আর কখনও কোথাও দেখি নাই। মাথার চাদরখানি তাড়াতাড়ি খুলিয়া মূর্ত্তিটী ঢাকিয়া লইলাম পাছে কেউ দেখে; এমন সময় ২।৩ জন মালী লইয়া শচীন আসিয়া উপস্থিত; মালীরা আমাকে সেই অবস্থায় জল হইতে উঠিতে দেখিয়া 'কেয়া হায় বাবু! কেয়া হ্যায়?' বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতিমধ্যেই বুদ্ধিমান শচীনের বুঝিতে আর বাকী রহিল না; সে মুখ ফিরাইয়া কিছু পয়সা দিয়া মালীদের সন্তুষ্ট করিয়া বলিল, 'ও আমাদের ঠাকুর; তোরা কিছু গোলমাল করিস্ নি।' উড়ে মালীরা ২।৪ আনা পয়সা পাইয়াই তুষ্ট; আর বিশেষ কোন খোঁজ খবর না লইয়া তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ভক্তদের আগ্রহে আমি মূর্ত্তিখানি একটু একটু করিয়া খুলিয়া তাহাদের দেখাইলে, তাহারা সত্বর সেস্থান হইতে চলিয়া আসিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি মূর্ত্তিখানি অতদূর নিয়ে যেতে পারবে?'

আমি তখনও মৌন। সংকেতে জানাইলাম, 'কিছুদূর নিয়ে যেতে পারব;' শুনিয়া সকলে আমার সহিত চলিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই দেখা গেল একজন সাহেব সাইকেল চড়িয়া আসিতেছে। এই ভোরবেলা আমাদের তদবস্থায় দেখিয়া বোধ হয় সাহেবের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; তিনি তাড়াতাড়ি সাইকেল হইতে নামিয়া এক হাতে সাইকেল ধরিয়া আমাদের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন। আমরাও তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ২।১ মিনিট থমকিয়া তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু ৺মায়ের কি খেলা! সাহেব কোন কথাবার্ত্তা

না কহিয়া পুনঃ সাইকেল আরোহণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এ যে জীবন্ত মা! এখানে কি আমাদের কোন অমঙ্গল হইতে পারে? নতুবা এই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে, ইংরাজের এই দুঃসময়ে ৩।৪ জন বাঙ্গালী যুবক এইভাবে কি একটী বস্তু লইয়া ভোরবেলা ইডেন গার্ডেন হইতে বাহিরে আসিতেছে। পুলিশের লোকদের একবার তদন্ত করিতে বলিলেই ত হইত; আর পুলিশ ত আশেপাশেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাহেব কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাওয়াতে আমি ৺মাকেই বারম্বার ধন্যবাদ দিয়া অগ্রসর হইলাম। লাটপ্রাসাদ পার হইয়া আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করা হইল। অতঃপর সেই গাড়ীতে করিয়া আমরা নিরাপদে শচীনের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম।

## ১৪

৺মায়ের মূর্ত্তিখানি সযত্নে গাড়ী হইতে নামাইয়া সত্য যে ঘরে থাকিত সেই ঘরে একখানি টেবিলের উপর বসান হইল। বাহিরের দরজা জানালা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। শচীন গিয়া মাকে খবর দিলে মা আসিল; আমি তখন অতি সন্তর্পণে চাদরখানি খুলিয়া লইলাম; মূর্ত্তিখানি ৺কালীমাতার; এক ফুট হইতে কিঞ্চিৎ অধিক উচ্চ; এবং সমস্ত মূর্ত্তিখানি একখণ্ড কাল কষ্টিপাথর হইতে খোদাই করিয়া বাহির করা হইয়েছে। ৺মায়ের মাথার মুকুট হইতে হাতের খাঁড়া, পদ্মাকৃতি প্রস্তর আসন, প্রস্তরাসনে শায়িত শিবমূর্ত্তি প্রভৃতি সমস্তই নিখুঁত; এমন কি শিবের হাতের মালা ও ডমরু হইতে ৺মায়ের ছোট্ট জিভটী এবং হাতের মুণ্ডটীর পর্য্যন্ত কোন হানি হয় নাই। ৺মায়ের চক্ষু দুইটীর মধ্যে কি রত্ন ছিল জানি না; চক্ষু দুটী জ্বল জ্বল করিত; যেন জীবন্ত অবস্থার চক্ষু। কপালে একটী চিহ্ন ছিল; কেহ বলিল তৃতীয় চক্ষুর চিহ্ন; কেহ বলিল, ৺মা বৈষ্ণবী; উহা তিলক চিহ্ন; আবার কেহবা বলিল, ব্রহ্মযোনি চিহ্ন; আমরা তখন এসব কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। দক্ষিণাকালী হইতে মূর্ত্তিখানির এই পার্থক্য ছিল যে ইহার কোমরে হাতের বেড়া বা কেশপাশ আলুলায়িত ছিল না। কেশের পরিবর্ত্তে তিনটী জটা বা বেণীর আকার; দুইটি মূর্ত্তির সম্মুখে গ্রীবার দুইধারে ও একটী পৃষ্টদেশে লম্বিত ছিল।

মা আসিয়া মূর্ত্তিখানি দেখিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, 'ঠাকুর! এ যে দেখ্‌ছি মাটীর নিচে ছিল; অনেক নীচে ছিল কি? কতদূর মাটী খুঁড়ে তবে পেলে? মাকে শচীন আদ্যোপান্ত সমস্ত সংক্ষেপে বলিলে মা বলিলেন, 'নিশ্চয় মাটীর নীচে ছিল; ৺মা কৃপা করে উঠে এসেছেন। দেখ্‌ছ না ৺মায়ের সর্ব্বাঙ্গে কত দিনের মাটী লেগে রয়েছে?' মা তখনই তাড়াতাড়ি গিয়া

জল ও নূতন গামছা লইয়া আসিলেন। আমরা সযতনে মূর্ত্তিখানিকে ধোয়াইতে লাগিলাম ; মাও নিজহাতে অনেক অংশ রগড়াইয়া ধুইয়া দিলেন। সত্যই মূর্ত্তিখানি মাটীর নীচে ছিল ; না হইলে এত পুরাতন মাটী এইরূপভাবে সমস্ত অঙ্গে লাগিয়া থাকিবে কেন ? ৺মায়ের ফটো লওয়ার পরেও আমরা অনেক স্থানে বিশেষতঃ স্কন্ধের দুধারে মাটীর চিহ্ন দেখিয়াছি। যাহা হউক ; মার কথামত মূর্ত্তিখানি দোতালায় লইয়া যাওয়া হইল এবং যতদূর সঙ্গোপনে রাখিতে হয় রাখা গেল।

মা বলিলেন. ঠাকুর! ৺মায়ের পূজা করবে না ? আজ যে ৺মায়ের বিশেষ পূজার দিন ; আজ যে বাসন্তী নবমী—রামনবমী। ৺মা যখন কৃপা করে এ বাড়ীতে এসেছেন, যা পারি কিছু যোগাড় করে দিচ্ছি। তুমি পূজা করে আমাদের বাড়ী পবিত্র কর ; আমাদের ধন্য কর। বলিতে বলিতে মার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। পার্শ্বে আসিয়া বিমলমা দাঁড়াইয়াছিলেন ; তিনিও অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'বিমু! শীঘ্র পূজার আয়োজন কর ; আমি ফলমূল আনতে দিই।' এই বলিয়া মা ডাব, চিনি, দই, সন্দেশ এবং আরও কত কি আনাইলেন ; অবিলম্বে পূজার আয়োজন হইল। মা বলিলেন, ঠাকুর! পূজা কর!'

আমি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। কাহার পূজা করিব ? এ মূর্ত্তি কাহার ? আমি যে পূজার কিছুই জানি না ; ৺মা যে আমায় পূজা শিখান নাই। আমি ইসারায় মাকে বলিলাম, 'আপনি পূজা জানেন ; আপনি পূজা করুন। ফল নৈবেদ্য সব উৎসর্গ করে দিন।'

মা কিছুতেই রাজী হইলেন না দেখিয়া আমি দুটী ফুল লইয়া ৺মায়ের পায়ে দিলাম এবং দুএকটী ফুল নৈবেদ্যে ছড়াইয়া দিয়া বলিলাম, '৺মার খাওয়া হয়েছে ; আপনারা প্রসাদ নিয়ে যান।' তখন আমি যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম তাহা বর্ণনাতীত। আমি যে দিকে দেখি সে দিকেই যেন ৺মায়ের মূর্ত্তি! স্ত্রীলোকগুলি যেন এক একটী জীবন্ত ৺মা ; ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি যেন ৺মায়ের ছোট ছোট মূর্ত্তি ; যে ঘরে ঢুকিতেছে তাহাকেই নমস্কার করিতেছি। এই সব দেখিয়া সকলে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিয়াছে 'ঠাকুর না আবার পাগল হয়।' এমন সময় একগাছি জবাফুলের মালা লইয়া বিমলমা ঘরে ঢুকিলেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া সজল নয়নে বলিলেন, 'ঠাকুর! আমি মালাটী গেঁথেছি ; আপনি ৺মাকে পরিয়ে দিন।'

আমি সংকেতে বলিলাম, 'আপনি পরিয়ে দিন।'

আজ বিমলমার অবস্থা দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। কেননা, প্রায় ২।৩ বৎসর আমি এ বাড়ীতে আসিয়াছি ; কখনও বিমলমার মুখে

দেখি নাই ; আর আজ তিনি একেবারে কথা কহিয়া ফেলিলেন। বিমলমা যতীনবাবুর স্ত্রী। আমি বন্ধুর স্ত্রীকে মা বলিয়া সম্বোধন করি ; তাই নামের পিছনে মা যোগ করিয়া তাঁহাকে বিমলমা বলিয়া ডাকিতাম। বিমলমা সত্য-সত্যই মাতৃমূর্ত্তি। জীবনে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন আমি তাঁহাকে ধর্ম্মমা বলিয়াছিলাম। বিমলমা চোখের জলে ৺মাকে মালা পরাইলেন। মা ৺মাকে মালা পরাইতেছেন দেখিয়া আমি আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলাম ; সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। পাছে পদস্পর্শ করি এই ভাবিয়াই বোধ হয় বিমলমা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমিও ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম।

## ১৫

অনেকক্ষণ দ্বার বন্ধ ছিল ; তারপর মা আসিয়া ডাকিলেন 'ঠাকুর! দরজা খোল।' দরজা খুলিলে মা আমায় কিছু খাইতে অনুরোধ করিলেন ; বলিলেন, 'ঠাকুর! আজ দুদিন তোমার খাওয়া নেই ; কিছু খাও।'

বোধ হয় অনেক বলার পর প্রসাদ হিসাবে কিছু মুখে দিয়াছিলাম। কারণ, কেই বা খাইবে ? তৃপ্তিতে আমি ভরপুর। ক্ষুধা কোথায় যে খাইব ? তখন যে আমি কোথায়, কত উর্দ্ধে কোন রাজ্যে বিচরণ করিতেছি, তাহার কি কোন ঠিকানা আছে ? মানুষ সামান্য অর্থ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হয় ; উন্মাদ হইয়া যায়। আর আমি আজ কি পাইয়াছি ? ৺মায়ের মূর্ত্তি ; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি! আবার কিরূপে ? ঠাকুরের আদেশে। কেমন মূর্ত্তি ? একেবারে জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ; যেন সত্যই চাহিয়া রহিয়াছেন ; সত্যই হাসিতেছেন ; সত্যই ভাবের ভাষায় আমাদের সহিত কথা কহিতেছেন। আমরা যে ভাবহীন মানুষ ; তাই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। ৺বাসন্তী পূজার আজ তৃতীয় দিন, আজ মহানবমী। ঘরে ঘরে মহা আনন্দরোল, শুধু বাংলায় নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে ; কেননা আজই আবার রামনবমী ; হিন্দুস্থানীমাত্রেই রামনবমী উৎসবে মাতিয়াছে। এমন দিনে এমন শুভ মুহূর্ত্তে, এমনই স্থান হইতে এই মূর্ত্তি আসিয়াছে, যে ভাবিতেও পুলকে প্রাণ ভরিয়া যায় ; ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না ; উদর পূরণের জন্য আহার কত তুচ্ছ মনে হয়।

সত্যই কি এই আহার মানুষের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় ? যদি তাহাই হয়, মানুষ এত শীঘ্র মরে কেন ? আর যে সকল সাধু সন্ন্যাসী পাহাড় পর্ব্বতে, বনে জঙ্গলে অনাহারে অনিদ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে তাঁহারাই বা এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে কেন ? বাস্তবিক দেখিতে পাওয়া যায়, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়

তাঁহাদেরই যাঁহারা ভগবৎ প্রেমানন্দে ডুবিয়া আছেন। বুঝিবা এই কারণেই শাস্ত্রকার নিবৃত্তি পথকে শ্রেষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক অকৃত্রিম আনন্দ ত্যাগের পথেই আছে। ভোগের পথে রোগ শোক পরিতাপ, কলহ বাদ বিসম্বাদ এবং হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতির নিত্যলীলা।

বিকালে ৫টার সময় বাবা অফিস হইতে আসিয়া মার মুখে ও শচীনের মুখে আদ্যন্ত সমস্ত কথা শুনিলেন। আগেই বলিয়াছি তিনি ব্রহ্ম উপাসক। তথাপি দূর হইতে আসিয়া মূর্ত্তিখানি একবার দেখিয়া গেলেন; বিশেষ কিছু বলিলেন না; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কে যেন আসিয়া আমাকে বলিল, 'মূর্ত্তিখানি স্থাপন করবার জন্য বাবা বলছেন; বোধ হয় মূর্ত্তি দেখে বাবার আনন্দ হয়েছে।' আমি শুধু শুনিয়া গেলাম; কিছু বলিলাম না। বলিব বা কি? আমি যে তখনও মৌন। মনে মনে ভাবিলাম, ৺মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে; আমাদের কিছু বলিবার বা করিবার কি অধিকার আছে?

## ১৬

রাত্রিতে নির্দিষ্ট বিছানায় শুইতে যাইব; কিন্তু ৺মাকে কোথায় রাখিয়া যাইব? যদি কেহ তুলিয়া লইয়া যায় বা অপর লোক দেখিতে পায়? তাই একটী বড় ট্রাঙ্কের ভিতর তালা বন্ধ করিয়া রাখা হইল। আমিও শুইতে গেলাম। দেখিতে দেখিতে নিদ্রা আসিয়া আমার চক্ষু মুদ্রিত করিল; আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম; মরি! মরি! কি অপরূপ দৃশ্য! ৺মায়ের কী অপূর্ব লীলা! জ্যোতির্ম্ময়ী ৺মা আমার মানবী বেশে ষোড়শী মূর্ত্তিতে দাসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত; কেবল চক্ষু দুটী ঠিক সেই রকম উজ্জ্বল ও তেজোময়। মুখখানি প্রেমমাখা দিব্যজ্যোতি পরিস্ফুট, পরণে রাংগা পাড় শাড়ী, কপালে সিঁদুরের টিপ, পায়ে আলতা, হাতে মাত্র দুগাছি লাল শাঁখা; হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি মাতৃজ্ঞানে নমস্কার করিলাম। কোনরূপ আশীর্ব্বাদ না করিয়া ৺মা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অন্নদা! আমাকে নিয়ে আসতে তোমায় কে আদেশ করলে?'

আমি বললাম, 'তুমিই আদেশ করেছ; আবার কে করবে?'

'সেকি! আমি ত তোমায় কোন আদেশ করি নি।'

'নিশ্চয় করেছ, না হলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব আমায় বলবেন কেন?'

'নিশ্চয় আমি বলি নি; রামকৃষ্ণদেব তোমায় মিথ্যে করে বলেছেন।'

'আপনি মিথ্যে বলতে পারেন, ছেলেকে ছলনা করবার জন্য; রামকৃষ্ণদেব কখনও মিথ্যেবাদী নন; এ আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি।'

'বেশ! এখন তুমি আমার কথা শুনবে? আমি যা বলি তা করবে?'

'যদি আমার মনের মতন হয়, করব।'

'মনের মতন যদি না হয় ?'

'করব না।'

'বাঃ বেশ ছেলে ত তুমি ; মার কথা শুনবে না ?'

'অপ্রিয় হলেও শুনব ?'

'নিশ্চয়।'

'না ; কখনই নয়।'

'তোমাকে শুনতেই হবে, শুনতেই হবে। আমি যা বলি তা তোমায় শুনতেই হবে।'

বারবার তিনবার জোর করিয়া বলাতে আমি বলিলাম, 'বলুন ; কি শুনতে হবে ?'

সহাস্যমুখে ৺মা বলিলেন, 'কাল বিজয়া দশমী ; আমাকে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসবে ; তাহলে আমি বড় সন্তুষ্ট হব।'

আমিও একথা শুনিয়া তেমনই জোরের সহিত বলিলাম, 'না, না, কিছুতেই না ; আমি কিছুতেই বিসর্জন দেব না।'

বিসর্জন দিতে হবে ; 'না হলে অমঙ্গল হবে যে।'

'আমি মঙ্গলামঙ্গল বুঝি না ; মূর্ত্তি কিছুতেই বিসর্জন দেব না।'

'তুমি কবিরাজী করবে, না মূর্ত্তিপূজা করবে ?'

'আবার কবিরাজী ?'

'সেকি ? এত টাকা খরচ,—এত ঔষধপত্র তৈরী,—সব কি জলে যাবে ?'

'চুলোয় যাক ; আমি আর ওসব কথা শুনতে চাই না।'

'দেখ, আমার কথা অমান্য করো না ; তাতে তোমার বিশেষ ক্ষতি হবে ; কাল মূর্ত্তি বিসর্জন দিও ; তোমার মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করো।' এই বলিয়া ৺মা গৃহত্যাগ করিলেন।

আমিও জাগিয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ৺মাকে বিসর্জন দিতে হইবে, একথা ভাবিতে বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। আমি পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়াছিলাম ; ৺মাকে লক্ষ্য করিয়া নমস্কার করিলাম এবং বার বার বলিতে লাগিলাম, 'মাগো! আমি পারব না। তোমার এমন প্রেমময়ী মূর্ত্তি আমি স্বহস্তে জলে ফেলে দিয়ে আসতে পারব না। এমন পাষাণ হৃদয় কে আছে যে আরাধ্যা দেবীর এমন স্বপ্নলব্ধ জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বিসর্জন দিয়ে জীবন ধারণ করতে পারে ?'

হয় ত নিরাকারবাদীরা আমার একথায় বলিবেন, 'ও ত পুতুল ; ও ত পাথরের এক উলঙ্গিনী বিকট মূর্ত্তি। ও মূর্ত্তিতে কি প্রেম—কি আনন্দ আছে ? স্বপ্নে না হয় বাদ প্রতিবাদ করেছ ; এখন কেন নির্ব্বাদে বিসর্জন

দিয়ে এস না ? এ তোমার কি ভুল সংস্কার ?'

আমি তাঁহাদের উত্তরে বলিব, 'এ মূর্ত্তি হতেই ত আমি গুরুর ও ৺মায়ের প্রকট দর্শন পেলাম। যে মা এসে আমাকে দেখা দিলেন, তিনি কে ? কোন্ মূর্ত্তি উপলক্ষ্য করে তিনি আমার সামনে এলেন ; আমায় দেখা দিয়ে ধন্য করলেন ? এই উলঙ্গিনী বিকট মূর্ত্তি অবলম্বন করেই ত মায়ের প্রকট আবির্ভাব—না আর কিছু ? শব্দ আকাশের গুণ ; কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন যেমন রাগ রাগিণীর আলাপ করা যায় না, শ্রুতিসুখকর মধুর শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না ; তেমনই ব্রহ্ম নিরাকার হলেও, মা আমার বিশ্বব্যাপিনী হলেও, তাঁর স্বইচ্ছা অবলম্বিত লীলাময়ী মূর্ত্তি ভিন্ন কিছুতেই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না ; বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না।' যাহা হউক, সে আরও অনেক কথা ; এখানে 'ধান ভানতে শিবের গীতে'র মতই লাগিবে।

১৭

বিসর্জ্জনের কথায় দুঃখিত অন্তরে মায়ের উদ্দেশ্যে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আমি পুনরায় শয়ন করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা আসিল ; আর আসিল রক্তচক্ষু আলুলায়িতকেশা এক ভয়ংকরী মূর্ত্তি। রমণীর ভাব রোষাবিষ্ট ; কোলে একটি সদ্যঃপ্রসূত সন্তান। আমি দেখিয়া এই মূর্ত্তিকেও মাতৃজ্ঞানে নমস্কার করিলাম এবং বলিলাম, 'মা ! এ আবার তোমার কি মূর্ত্তি ?' ৺মা আমার কথার উত্তর না দিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, 'আমায় বিসর্জ্জন দেবে ? না অমঙ্গলের কোপে পড়ে মরবে ? শীঘ্র বল।'

'সে কি কথা মা ! তোমায় রাখলে অমঙ্গল ?'

'হাঁ, হাঁ,—যা বলছি শোন ; না হলে এই রকম করে তোমায় আছড়ে মারব।' বলিয়া কোলের শিশুটীকে মেঝের উপর সজোরে আছাড় মারিয়া ফেলিলেন। শিশুটীর মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া রক্তে রক্তগঙ্গা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

আমি বলিলাম, 'মা ! তুমি যাই কর না কেন, যতই ভয় দেখাও না কেন ;—তোমার ও কথা আমি কিছুতেই শুনব না ! আমি মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে পারব না। আর তোমার ছেলেকে তুমি আছড়েই মার, আর যাই কর,—সে ভয়ে এ ছেলে ভীত হবে না।'

'তুমি কিছুতেই মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেবে না।'

'না।'

'আচ্ছা দেখি দাও কি না ;' বলিয়া মা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি আবার জাগিয়া উঠিলাম এবং পূর্ব্ববৎ অনুনয় বিনয় করিলাম।

মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিব না, একথা বারম্বার উদ্দেশ্যে ৺মাকে জানাইলাম। তখন বাবার ঘরের ঘড়িতে ৪টা বাজিয়া গেল; আর জাগিয়া না থাকিয়া পুনরায় আদেশ পাইবার আশায় শুইয়া পড়িলাম। সংগে সংগে নিদ্রা আসিল।

এবার আমার একজন জানাশুনা মা আসিলেন। এ মা থাকেন ৺কাশীধামে। ইনি সম্পর্কে আমার সেজপিসিমার ছোট জা ৺কাশীবাসী ৺পীতাম্বর বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী। আমি যখন ৺কাশীধামে থাকিতাম তখন তাঁহাকে ছোটমা বলিয়া ডাকিতাম। তিনি আমাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন। দেখিলাম ছোটমার মূর্ত্তিখানিও বেশ সুন্দর, পবিত্র, পুণ্যপ্রতিকৃতি; পরণে একখানি দেশী ঢাকাই শাড়ী, সীমন্তে সিন্দুর, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা; যেন দেবীপ্রতিমা।

'বাছা! বাছা! শুয়ে আছ?' বলিতে বলিতে ছোটমা আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ছোটমা আমায় বাছা বলিয়াই ডাকিতেন এবং এখনও ডাকেন। আমি ছোটমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। 'বাছা! তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক;' বলিয়া ছোটমা আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আমি বলিলাম, 'ছোটমা! তুমি কখন এলে এখানে?'

ছোটমা বলিলেন, 'ভুলে যাচ্ছ কেন বাছা? তুমিই ত ভোরবেলা আমায় নিয়ে এলে।'

মহামায়া এবার আমার জ্ঞান হরণ করিলেন। আমি সত্য সত্যই ভাবিলাম ৺কালীমাই ত আমার ছোটমা। আমি সত্যই ত ইহাকেই সকালবেলা ইডেনগার্ডেন হইতে লইয়া আসিয়াছি। ছোটমার স্নেহে আর সব কথা ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম, 'ছোটমা! কিছু বল্‌বার আছে কি?'

'হাঁ বাছা! আছে; আমায় কাল গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে হবে। বিজয়া দশমীতে আমায় বিসর্জ্জন দিলে তোমার সমস্ত উদ্দেশ্যই পূর্ণ হবে। আমিও এসেছি বিজয়া দশমীতে গঙ্গায় যাবার জন্য। তুমি আমার একখানা ফটো রেখে কাল গঙ্গায় দিয়ে এস।'

'কেন মা? যাবে কেন মা? তুমি থাক; আমি তোমায় পূজা কর্‌ব।'

'আমাকে যেতেই হবে; আমি এক জায়গায় থেকে পূজা পেতে চাই না। একস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক্‌ব না, সকল ভক্তের কাছেই থাক্‌ব। আমায় গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে এস।'

'আমি পূজা জানি না বলেই কি চলে যাবে?'

'তা নয়; আমি কেবল শাস্ত্রবিহিত মতেই যে পূজা পেতে চাই, তা নয়। 'মা খাও, মা পর' ইত্যাদি প্রাণের ভাষায় সকল বস্তু আমায় নিবেদন করে ব্যবহার করলেও আমার পূজা হবে; সরল প্রাণের প্রার্থনাই আমার উপাসনা। আর যদি কোন ভক্ত আমার সম্মুখে আদ্যাস্তব পাঠ করে ত আমি বিশেষ

আনন্দিত হব।'

'তবে মা তোমাকে রাখ্‌তে দোষ কি ?'

'আমি যে তোদের শত্রুশক্তি ; আমাকে রাখ্‌লে তোদের শত্রুশক্তিই বৃদ্ধি হবে ; কার্য্যসিদ্ধি হবে না।'

এইরূপে ৺মা ষোলটী কারণ নির্দ্দেশ করার পরে আমি ৺মার আদেশ মত মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতেই এক প্রকার প্রস্তুত হইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে ৺মাকে জানাইলাম, 'মা! আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আপনার মূর্ত্তিখানি রেখে পূজা কর্‌ব ; কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে তা আর হল না।'

মা বলিলেন, 'দেখ, এই মূর্ত্তি রেখে পূজা কর্‌লে যে তুমি নির্ব্বংশ হয়ে যাবে।'

'সে কি মা! মায়ের মূর্ত্তি পূজা করলে নির্ব্বংশ হয় ?'

'হাঁ, নির্ব্বংশই হয় ; তবে নির্ব্বংশ মানে বংশ ধ্বংস হওয়া নয়, সবংশে উদ্ধার হওয়া ; তোমাদের বংশে এখনও এমন কোন কাজ হয় নি যে এত শীঘ্র উদ্ধার হয়ে যায়। তবে একটী কথা তোমায় বলি শোন ;—'যদি একান্ত এই মূর্ত্তিতে আমাকে পূজা করবার বাসনা তোমার হয়ে থাকে, তবে ৺কাশীধামে গিয়ে একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করে এই মূর্ত্তির অনুরূপ অষ্টধাতুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করো ; কেমন ? তাহলেই আমি সেই মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হব।'

'বেশ কথা মা! আমি তাই করব ; সেই মূর্ত্তিতে তোমার আবির্ভাব হবে ত ?'

'তুমি ভক্তি করে যে মূর্ত্তিতেই আমায় ডাক্‌বে আমি সেই মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হব।'

উপরের ঘড়িতে টং টং করিয়া ৫টা বাজিয়া গেল। ৺মা তাড়াতাড়ি আর ২।১টী প্রয়োজনীয় কথা সারিয়া উঠিলেন। আমিও বিদায় নমস্কার জানাইলাম। ৺মা ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র আমার ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। আমি উঠিয়া বসিলাম এবং ৺মায়ের আদেশ প্রতিপালনে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সকলের নিকট স্বপ্নাদেশ প্রচার করিলাম।

## ১৮

আদেশ শুনিয়া সকলে মর্ম্মাহত হইল। মায়ের দল অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না ; পাড়াপড়শীরা হায় হায় করিয়া উঠিল। ক্রমশঃ ৺মায়ের আগমন ও প্রত্যাগমনবার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল ; আমরাও যথাসম্ভব কাগজে পত্রে লিখিয়া প্রচার করিতে লাগিলাম ; ৺মায়ের বিসর্জ্জনের কথা বাবার কানে

পেঁছিলে বাবা আমাকে ডাকাইলেন ; আমি উপরে গেলাম।

বাবা বলিলেন 'সে কি ঠাকুর ! ৺মাকে বিসর্জ্জন দেবে কি ?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ ; বিসর্জ্জন দেওয়াই ৺মায়ের আদেশ।'

'রেখে দাও তোমার ৺মায়ের আদেশ ; ওসব কথা মুখেও এনো না ; ৺মাকে বিসর্জ্জন দিও না।'

৺মা নিজের ইচ্ছায় এসেছেন ; আবার নিজের ইচ্ছায় যখন যেতে চাইছেন, তখন আমার কি অধিকার—কি সামর্থ্য আছে ; যে ৺মাকে ধরে রাখি ?'

'দেখ, তুমি দরিদ্র ; ৺মায়ের ইচ্ছায় হোক আর যার ইচ্ছায়ই হোক, মূর্ত্তিখানি যখন তোমার হস্তগত হয়েছে, তখন সেখানি স্থাপন কর। তাতে তোমার যথেষ্ট অর্থাগম হবে ; সাংসারিক দুঃখ কষ্ট দূর হবে। এমন সুবিধে হারিও না ঠাকুর !'

৺মা যখন নিজেই এসেছেন এবং নিজেই চলে যেতে চাইছেন, তখন তাঁকে নিজ নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধরে রাখ্তে আমার কোন অধিকার বা ইচ্ছা নেই ; আপনারা আমায় ক্ষমা করুন ; কোন অনুরোধ করবেন না। আমি স্বপ্নে অনেক অনুনয় বিনয় করে দেখেছি ; ৺মা আমাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি থাক্‌লে আমার কোন কার্য্যসিদ্ধি হবে না। এই বলিয়া পূর্ব্বলিখিত ৺মায়ের আদেশ তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম এবং মূর্ত্তি না রাখার আরও কয়েকটী কারণ ৺মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে ; তাহাও জানাইলাম।

বাবা কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিবেন না। বারবার বলিতে লাগিলেন, ওসব সাধনপথের বিঘ্নদায়িকা মায়াশক্তি ; ওরাই সাধককে এইভাবে ভুলিয়ে নষ্ট করে। সে সব কথা যে ৺মায়ের আদেশ, সে কথা তুমি ভুলে যাও।' আমিও নাছোড়বান্দা ; উভয়ে অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক হইল। অতঃপর মা আমার পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে দুইটী দলের সৃষ্টি হইল ; বিসর্জ্জনের পক্ষে খুবই অল্প লোক ; রাখার পক্ষে প্রায় সকলেই। বাবা উঠিয়া ৺মায়ের ঘরে গেলেন এবং ট্রাঙ্ক হইতে ৺মাকে তুলিয়া খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; কোন স্থানে কোন খুঁৎ আছে কি না। ক্ষণেক পরে বলিলেন, 'দেখ, দেখ ; মায়ের চোখ দুটী কেমন জ্বলছে ; অঙ্গভঙ্গী কি চমৎকার ! গড়ন কি সুন্দর ! এমন প্রতিমূর্ত্তি আমি কখনও কোথাও দেখি নি। পশ্চিমেতে অনেক বৎসর কাটিয়েছি। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, একখানি পাথর থেকে খোদাই করা মূর্ত্তি এই নতুন দেখ্‌লাম।' এই বলিয়া তিনি আমায় বুঝাইতে লাগিলেন। আমি আর কোন কথা শুনিলাম না ; নীচে নামিয়া আসিলাম।

বাড়ীতে ক্রমশঃ লোকসমাগম হইতেছে দেখিয়া মূর্ত্তিখানি নীচে বাহিরের ঘরে আনিয়া রাখা হইল। মা নিজে ধূপ ধুনা জ্বালাইতে লাগিলেন ; দুধারে

ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন। রক্তচন্দনমাখা রক্তজবা ৺মার পায়ে শোভা পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কত ফুল কত মালা আসিয়া উপস্থিত হইল। ৺মা আমার ক্রমশঃ নানা ফলে ফুলে সাজিতেছেন দেখিয়া মায়ের আনন্দের সীমা রহিল না। পাড়ার মায়েরাও আসিয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করিলেন। সবারই চক্ষু দিয়া আনন্দধারা বহিতেছে। কেহ কেহ আর্ত্তনাদ করিয়া ৺মায়ের পদতলে লুটাইতেছেন এবং এক একজন অতি বিনয়ের সহিত বলিতেছেন, 'ঠাকুর! ৺মাকে বিসর্জ্জন দিও না; এমন জীবন্ত ৺মাকে গঙ্গার জলে দিয়ে এসো না; আমরা কিছুতেই ৺মাকে নিয়ে যেতে দেব না।'

বাড়ীর আশে পাশে, বর্ত্তমানে সেখানে নতুন সিটি কলেজ দণ্ডায়মান, সেইখানে তখন বহু পতিতা নারীর বসবাস ছিল। তাহারা সকলের দলে দলে দর্শন করিতে আসিল। আহা! তাহাদেরও এক এক জনের কি ভক্তি! কি আকুল ক্রন্দন! কি স্বার্থত্যাগ! সিকি, দুয়ানি, আধুলি, টাকা দিয়াও কেহ কেহ ঠাকুর প্রণাম করিয়া গেল। যত প্রণামী পড়িতেছে, মা সেই সব টাকা পয়সা দিয়া ছানা চিনি ডাব ও সন্দেশ প্রভৃতি আনাইতেছেন ও সে সকল নিবেদিত হইয়া ভক্ত দর্শকদের হাতে প্রসাদরূপে বিতরিত হইতেছে। আমি মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরভবনের বিজয়োৎসব দেখিয়া যাইতেছি। শচীন প্রভৃতি কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব আমাকে সেইদিকে যাইতে একেবারে নিষেধ করিল। কারণ সেদিকে গেলে, 'বিসর্জ্জন দিও না, বিসর্জ্জন দিও না;' বলিয়া লোকে আমায় বিরক্ত করিয়া তুলে। আর আমি বিসর্জ্জনের কথা স্মরণ করিয়া অধীর হইয়া পড়ি; অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না।

১৯

৺মায়ের ফটো তুলিয়া রাখার আদেশ আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ যতীন বাবুর মুখ দিয়া প্রথম সে কথা বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চানন ঘোষ লেনের ফটোগ্রাফার বলাই মিত্রকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিলে যথাসময়ে ছাদের উপর লইয়া গিয়া ৺মায়ের ফটো লওয়া হইল। সিদ্ধেশ্বর বাবুর আদেশেই ৺মায়ের মূর্ত্তি হইতে ফুলের মালা সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল। নতুবা আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফটো পাইতাম না। সবই ৺মায়ের ইচ্ছা; ৺মা আমার এক এক জনের ভিতর দিয়া এক একটী কাজ করাইয়া লইতেছেন মাত্র। ফটো লইবার পর আবার মূর্ত্তি নীচে আনিয়া রাখা হইল।

দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক সমাগম হইল। একদল দর্শন করিয়া যাইতেছে; আর একদল আসিতেছে। এইরূপ আসা যাওয়ার মধ্যে এবার আসিল যাদুঘর হইতে তিন ব্যক্তি। একটী সাহেব, আর ২টী মাদ্রাজী বলিয়া

বোধ হইল। তিন জনই হ্যাট কোট ধারী ; কিন্তু বেশ ভদ্র। তাঁহারা ঘরেও প্রবেশ করেন নাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা উপর হইতে আমাকে ডাকাইলেন। আমি তখন উপরের ঘরেই আবদ্ধ ছিলাম ; কেননা বাহিরে লোকে আমায় ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিয়াছিল। পার্শ্বের ঘরে তাঁহারা বসিয়াছিলেন ; কেহ আমাকে আনিয়া তাঁহাদের কাছে উপস্থিত করিল। আমি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য ভাষা শুনিলাম। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মূর্ত্তি অনেক দিনের পুরাতন ; বুদ্ধের সময়ের মূর্ত্তি। তাঁহারা মূর্ত্তিটী লইয়া গিয়া যাদুঘরে রক্ষা করিতে চাহেন; এবং এই উদ্দেশ্যে মূর্ত্তিটী দিলে উহার মূল্য স্বরূপ যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'নেহি হোগা সাব ; লাখ রুপেয়া দেনেসেভি হাম ছোড়নে নেহি সক্‌তা। হাম গংগাজীমে ছোড়েঙ্গে ; আপ মোগ লেনে সকো ত দরিয়ামে সে উঠা লেও।' উপস্থিত আরও কয়েকজন আমায় অনেক উপদেশ দিলেন। বলিলেন, 'নিজে না রাখলে্ও ক্ষতি নেই, গঙ্গায় দিও না ; যাদুঘরে রাখ্‌তে দাও। নগদ টাকা ত কিছু পাবেই ; তা ছাড়া সাহেব বল্‌ছেন তোমায় কিছু মাসোহারা বন্দোবস্তও করে দিতে পারেন।' আমি আর অন্য কথা না বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নমস্কারপূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলাম। তারপর তাঁহাদের কি কি আলাপ প্রলাপ হইল আমি তাহার সংবাদ রাখি নাই।

বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। বাহির বাটীতে লোক ধরে না। কে একজন আসিয়া খবর দিল, 'ফণীবাবু তোমায় ডাক্‌ছেন।' ফণীবাবুদের বাড়ী সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাড়ীর একখানা বাড়ী পরে উত্তর দিকে অবস্থিত। আমার সংগে আগে থেকেই ফণীবাবুর খুব ভাব ছিল ; তাহাদের বাড়ী যাইব মনে করিয়া ভিড় ঠেলিয়া যেমন রাস্তায় পা দিলাম, অমনি ফণীবাবুর এক বন্ধু ললিত মুখার্জ্জী তাড়াতাড়ি আসিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে মাটীহইতে তুলিয়া ফেলিল এবং তদবস্থায় ফণীবাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত করিল।

সেখানে ৪।৫ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই আমার পরিচিত ; শুধু একজন নয়। ললিতবাবু আমাকেনামাইয়া দিলে সেই অপরিচিত লোকটী আসিয়া আমায় ভক্তিভরে প্রণাম করিল ; পায়ের ধুলা লইতে বাধা দিলেও জোর করিয়া আমার পায়ের ধুলা লইয়া সকলের নিকট সে আমায় লজ্জিত করিল। গংগাবাবু নামে একজন বন্ধু বলিল, 'অন্নদা ! এই লোকটী ফণীর অফিসে কাজ করে ; বড় ভক্তিমান। তোমার ৺মাকে পাওয়ার খবর শুনে দেখ্‌তে এসেছে। ৺মার গলায় যে বেলফুলের বড় মালা দেখছ, সে ইনি দিয়েছেন ; এঁর নাম ভুপেন বাবু ; তুমি এঁর সংগে আলাপ কর ; আনন্দ পাবে।' তখন আমি আর কি আলাপ করিব ? ৺মাকে বিসর্জ্জন দেওয়ার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। দুএক কথার পর ভুপেনবাবু বলিল, 'আপনার যা ইচ্ছা

আমারও তাই ; ৺মায়ের আদেশ যখন বলছেন গঙ্গায় দেওয়া—তখন আর এর উপর কথা কি আছে ?'

আমি ভুপেন বাবুকে দলে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ভুপেন বাবুর সঙ্গে এই অল্পক্ষণের পরিচয় হইলেও মনে হইল যেন কত দিনের কত জন্মের চেনাশুনা ; যেন কত আপনার ; কত ভালবাসার লোক। ভুপেন বাবু আসিয়া আমাদের দলে মিশিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল ; তবু লোকের ভিড় কমে না ; দলের পর দল আসিয়া দর্শন করিতে লাগিল। কলিকাতার হুজুক ; যেখানে একজন রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথা কহিলে ২০ জন ভিড় করে—কি বলে শুনিবার জন্য—সেখানে এরূপ কারণে ভিড় হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আমি অধীর হইয়া পড়িতেছিলাম। যদি কোন বাধা পড়ে, যদি বিজয়া দশমীতে ৺মাকে বিসর্জ্জন দিতে না পারি, ৺মায়ের আদেশ যদি লঙ্ঘন হয়, তাহা হইলে যে সর্বনাশ হইবে ; ৺মায়ের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে। শচীনকে বলিলাম, 'ভাই ! আর দেরী কেন ? এবার মাকে গঙ্গায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।'—'আচ্ছা—হচ্ছে, হবে ;' করিতে করিতে ৯টা বাজিয়া গেল। আমি ভুপেন বাবুকে এ কার্য্যে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলাম।

ভুপেন বাবু প্রমুখ কয়েকটী বন্ধু ভিড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিবে এমন সময়ে একটী গোবরে পোকা ঘৃতের প্রদীপে পড়িয়া প্রদীপটী নিভাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া দ্বিতীয় প্রদীপটীও নিভাইয়া ফেলিল। ঘর অন্ধকার ; মায়ের দল তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা ৺মায়ের চক্ষুর দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, দেখ ; মায়ের চক্ষু দুটী অন্ধকারে কেমন জ্বলছে ! সূর্য্যের রশ্মির মত জ্যোতি বেরুচ্ছে !' কেহ বলিল,—কালো অংশ নীলা ; কেহ বলিল,—সাদা অংশ হীরা ; কেহবা অনুমান করিল, বহুমূল্য জহর মার চক্ষে রহিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আলো জ্বলিয়া উঠিল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে বিষাদ-গ্রস্ত হইলেন। কেহ কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। হায় ! এমন জীবন্ত ৺মাকে কি না এখনই গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইবে ! আমি দুঃখের মধ্যেও আনন্দ বোধ করিতে লাগিলাম। শুধু এক একবার প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিতে লাগিল—এমন জীবন্ত অপূর্ব্ব প্রেমময়ী মূর্ত্তিটী আমার পিতামাতাকে দেখাইতেপারিলাম না। আর দুঃখ হইল সেই গিরীশ ও কুমুদের জন্য ; তাহারা দুই জনই তখন কলিকাতার বাহিরে ছিল। গিরীশ ফরিদপুরে ডাক্তারি করিতে গিয়াছিল। আর কুমুদ তখন রাজদ্রোহ অপরাধে ঢাকায় বন্দী।

২০

"জয় ! কালী মায়ীকি জয় !!" রবে ভুপেন ঘর কাঁপাইয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটী বৃদ্ধ দর্শক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; আর শুধু বলিতে লাগিল, 'ওগো! তোমরা নিয়ে যেও না; আজ রাত্রিটী রাখ; আমি ৺মাকে নয়ন ভরে—আশ মিটিয়ে দেখে নি।' কে একজন বৃদ্ধ ভক্তটীকে বুকে টানিয়া লইয়া বাইরে চলিয়া আসিল। ভুপেন আমার মুখের দিকে তাকাইতে আমি অতি সন্তর্পণে ৺মাকে স্কন্ধে লইলাম। ভিড়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না দেখিয়া ভুপেন ভিড় সরাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপ ৺মাকে লইয়া রাস্তার বাহির হইতেই আকাশ যেন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল; সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও দেখা দিল; বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, কি ভীষণ দুর্য্যোগ! আবার কেহ কেহ শুভ লক্ষণ, পুষ্পবৃষ্টি প্রভৃতি নানা মুখে নানা কথা বলিতে লাগিল।

গলি হইতে বাহির হইয়া আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বড় রাস্তার উপর আসিতে না আসিতে বৃষ্টি কমিয়া আসিল এবং আকাশও পরিষ্কার হইতে লাগিল। ৮।১০ পা অগ্রসর হইয়াই ভুপেনের ঘাড়ে ৺মাকে চাপাইলাম; ভুপেন ভক্তিভরে ৺মাকে মাথায় করিয়া লইল। ভুপেনের মাথায় ৺মা উঠিতেই আকাশ নির্ম্মল ও বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এক রকম শোভাযাত্রা করিয়াই আমরা হাওড়া পুল পর্য্যন্ত আসিলাম। যতগুলি লোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সকলে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আসে নাই; অনেকেই রাস্তা হইতে গৃহাভিমুখী হইয়াছিল। অবশ্য তাহাদের কোন দোষ দেওয়া যায় না; কারণ তাহারা সকলেই বিসর্জ্জনের বিরুদ্ধে ছিল।

গঙ্গার তীরে গিয়া পুলের উত্তর দিকে ঘাটের উপর যখন ৺মাকে নামান হইল তখন সকলের চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছে। সকলে মুখ চাওয়াচাহি করিতে লাগিল; আমি বড় ভয় পাইলাম। ভাবিলাম, ইহারা যদি সকলে বলে বিসর্জ্জন দিয়া কাজ নাই; তাহা হইলে কি উপায় হইবে? আমি একা এই আত্মজনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে কিরূপে ৺মায়ের আদেশ প্রতিপালনে সমর্থ হইব? তখন ভুপেন বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'এখন কি করা যায় বলুন।'

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, 'পোলের উপর নিয়ে গিয়ে মাঝ গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে আসি চল।'

ভুপেন বাবু বলিল, 'তা কি হয়? একখানা নৌকা করা যাক।'

সকলের সেইরূপ মত হওয়াতে ভুপেনবাবু একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া ৺মাকে অতি সন্তর্পণে নৌকায় তুলিল। একে একে সবাই গিয়া নৌকায় উঠিল; আমিও উঠিলাম।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা ক্রমে মাঝগঙ্গার দিকে যাইতে লাগিল। এমন সময় ভুপেনবাবু তাহার স্বভাবমধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

তুমি আমার হৃদয়ে থেকো মা ভবানী। ইত্যাদি ;

গানের ঝঙ্কার গঙ্গাবক্ষে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িয়া ভক্তপ্রাণে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতে লাগিল। আমি কি একরকম হইয়া গেলাম। সকলের নির্দ্দেশমত গানের পর গান চলিল। প্রতি গানটী বড় মধুর, বড় তৃপ্তিপ্রদ বলিয়া বোধ হইল। অকস্মাৎ আমার চৈতন্য হইল ; কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিল,—অন্নদা! এই শুভ মুহূর্ত্ত ; এখন সবাই ভাবে মুগ্ধ ; তোমার কাজ তুমি এই অবসরে সারিয়া লও। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। নৌকাখানি ধীরে ধীরে যেই পুলের দক্ষিণদিকে গিয়া পড়িল, অমনই 'জয় মা করুণাময়ী! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ;' বলিয়া ৺মাকে তুলিয়া একেবারে মাঝগঙ্গায় নিক্ষেপ করিলাম।

'আহা! কি করলে? কি করলে?—অমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন?' ইত্যাদি নানা কথায় সকলে আমায় তীব্র আক্রমণ করিল। আমি কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ৺মায়ের আদেশ পূর্ণ করিতে পারিয়াছি, এই আনন্দে সকলের সকল কথা অনায়াসে হজম করিয়া ফেলিলাম। এইরূপ বিসর্জ্জনান্তে বিষাদের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া সকলে তীরে ফিরিলাম।

নৌকা হইতে তীরে নামিয়াছি ; কিন্তু আমাতে আর আমি নাই। আমার বুক খালি খালি ঠেকিতে লাগিল ; হাত পা অবশ হইয়া আসিল ; চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কোথায় যাইব? কি লইয়া যাইব? কেনই বা যাইব? আমিও কেন ৺মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যাই না? ইত্যাদি ভাবে আমায় জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। সবাই ঠেলিতে লাগিল,—'চল অন্নদা! চল।' ভুপেন হাত ধরিল ; বলিল, 'চলুন।' আমি তখন অতি কষ্টে পা ফেলিতে লাগিলাম। প্রতিক্ষণেই মনে হইতে লাগিল আমি যেন আমার কোন প্রাণের প্রাণকে গঙ্গায় দিয়া চলিয়াছি ;—যেন কি এক অপূর্ব্ব, কি এক পরম আরাধ্য অমূল্য বস্তু হারাইয়া যাইতেছি। সত্য সত্যই আমি চলিতে অক্ষম হইলাম। ভুপেন শচীন প্রভৃতি কয়েকজন আমার ভাব দেখিয়া ভয় পাইল ; তাহারা আমাকে হাতাহাতি করিয়া তুলিয়া লইয়া বাড়ীমুখে ত্বরিৎপদে অগ্রসর হইল।

## ২১

বাড়ীতে আনিয়া তাহারা আমাকে দক্ষিণের বৈঠকখানা ঘরে শোয়াইয়া রাখিয়াছিল। আমি যে কতক্ষণ শুইয়াছিলাম, জানি না। জাগিয়া দেখি মা আমায় কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন ; বলিতেছেন, 'ঠাকুর! আজ

কদিন তোমার খাওয়া হয় নি ; কিছু খাও।' এই বলিয়া গরম লুচি, তরকারী, ভাজা প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য আমার সম্মুখে ধরিলেন ; আর আমি, 'জয় মা' বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতে লাগিলাম। ভোজনের মাত্রা সেদিন বিশেষ বাড়িয়াছিল। বোধ হয় জীবনে আর কখনও আমি সে পরিমাণ আহার করি নাই। পরে শুনিয়াছিলাম আমার সেই দিনকার আহার দেখিয়া কোন কোন বন্ধু ভয় পাইয়াছিলেন।

আহারের পর শয়ন ও নিদ্রা। কতক্ষণ পরে জানি না, দেখিলাম আমার গর্ভধারিণী মা আসিয়া উপস্থিত। হাসিতে হাসিতে আসিয়া মা আমার পাশে বসিলেন ; আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাকে নমস্কার করিলাম। মা বলিলেন, 'অন্নদা! আজ তুমি এক মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ ; ৺মাকে বিসর্জন দেওয়াই ঠিক হয়েছে ; আমি তাতে বড় সন্তুষ্ট হয়েছি।'

আমি বলিলাম, 'মা! আপনি সন্তুষ্ট হলেই হল ; আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।'

দ্বিতীয় রাত্রে আসিলেন আমার সেই ছোটমা। আসিয়াই তিনি বলিলেন, 'বাছা! কালি কলম নাও ; তোমায় সব লিখিয়ে দিয়ে যাই।'

আমি ঘুমের ঘোরে খাতা ও পেনসিল লইলাম। ছোটমা প্রথম বলিলেন, 'আমার নাম হচ্ছে আদ্যাশক্তি। আদ্যামা বলে আমাকে পূজা করতে হবে। আমার স্তব লিখে নাও' ; এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আদ্যাস্তব বলিয়া যাইতে লাগিলেন ; আর আমি লিখিতে লাগিলাম। আমি দুই এক শ্লোক লিখিতে না লিখিতে তিনি অনেক দূর বলিয়া গেলেন ; আদ্যাস্তব শেষ হইল। তারপর পূজার বিধান বলিতে লাগিলেন ; আমি আর না লিখিয়া মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাশীতে কবে যাবে ?'

আমি বলিলাম, আগে টাকার যোগাড় করি ; তবে ত যাব।'

'আগে গিয়ে জায়গা দেখে এস। কোথায় হবে, কত টাকা লাগবে ; তবে ত টাকার যোগাড় ?'

'তাহলে শীঘ্রই যাব।'

এই কথা শুনিয়া ৺মা বিদায় লইলেন ; আমি ৺মাকে নমস্কার করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিব অমনি জ্ঞান হইল। একি! আমি যে সত্য সত্যই দরজা বন্ধ করিতেছি। মাথা ঘুরিয়া গেল ; ঘরে আলো জ্বালিয়া দেখিলাম খাতা পেনসিল বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। খাতায় আমার হাতের অক্ষরেই লেখা রহিয়াছে—

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্ ;
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ ॥
মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে—

কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া ভাবিলাম। তারপর রাত্রি প্রভাত হইলে এ সব কথা সকলকে বলিলাম। ভুপেনবাবু বলিলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দুইশত টাকা দিবেন। শচীনের মা আদ্যামূর্ত্তি প্রস্তুতের সমস্ত খরচ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হিতবাদী বেঙ্গলী ইত্যাদি পত্রিকায় ৺মায়ের প্রতিমূর্ত্তিসহ সমস্ত ঘটনা চারিদিকে প্রচার হওয়াতে কেহ কেহ ডাকযোগে কিছু কিছু টাকা পাঠাইতে লাগিল। এইভাবে টাকার যোগাড় হইতে লাগিল।

## ২২

একদিন ব্রাহ্মণ সভার সেক্রেটারী আমাদের অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হইলে তিনি বলিলেন, 'অন্নদা! বাসা থেকে অনেকেই তোমার ৺আদ্যামায়ের মূর্ত্তি দেখে গেছে; কিন্তু আমি সে সময় এখানে না থাকায় দেখে যেতে পারি নি। যাহোক শুনলাম তুমি এই মূর্ত্তি ৺কাশীতে নূতন মন্দির করে স্থাপন করবার আদেশ পেয়েছ। তাই বলি এক কাজ কর। ২।৩ দিন পরে বীরভুম জেলায় জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্বে ব্রাহ্মণ সভার এক বার্ষিক অধিবেশন হবে। ভক্তপ্রবর রাজা শশিশেখরেশ্বর সেই সভার সভাপতি হবেন। তা ছাড়া সেই সভায় আরও বহু ধনী ও বিদ্বান ভক্তের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা। তুমি কয়েকখানি ৺মায়ের ফটো নিয়ে সেই সভায় উপস্থিত হলে প্রচারও হবে; আর তোমার যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহও হতে পারে।'

এই পরামর্শ আমার যুক্তিহীন মনে হইল না। অতএব বলাই মিত্রের নিকট হইতে দুই ডজন ফটো লইয়া যথা সময়ে সভায় উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য যে ফটোগ্রাফার বলাইবাবু ফটো তোলার জন্য কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই; কেবল তৎকালীন মহাযুদ্ধের জন্য জিনিষ পত্রের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় রং ও কাগজ বাবদ ফটো প্রতি তিন আনা করিয়া খরচ লইতেন।

যাহা হউক ফটো লইয়া ত বীরভুম গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সভার খুবই ঘটা। কেন্দুবিল্বে সুসজ্জিত সভামণ্ডপে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। আমি গিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম। তিনি ২।৪ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আমায় আলাপ করাইয়া দিয়া একস্থানে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত আসন গ্রহণ করিলাম। তিনি বলিলেন, 'তুমি বস; যখন সময় হবে, বললেই তুমি উঠে তোমার বক্তব্য সকলকে শোনাবে।' আমি সেই আশায় বসিয়া রহিলাম।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। অনেক কথা সভায় আলোচনা হইল। অনেক তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইতে চলিল। কিন্তু কই?

আমাকে ত কিছুই বলিতে দেওয়া হইল না। মধ্যে মধ্যে অধীর হইয়া কবিরাজ মহাশয়কে ইঙ্গিত করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি কেবল অপেক্ষা করিতেই বলিলেন। অবশেষে অস্থির হইয়া আমি পার্শ্বস্থ এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়! আমার বক্তব্য কি এ সভায় বলতে দেওয়া হবে না?'

ভদ্রলোক ভ্রূকুটি করিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, 'চুপ কর—চুপ কর; আমি অনেকের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখেছি; ওসব আজগুবি কথা এ সভায় আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। এসব ছেলেখেলার জায়গা নয়।'

কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া রহিলাম। আমার আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে আমি মরমে মরিয়া গেলাম। ধন্য কলিযুগ! ধন্য কলির ব্রাহ্মণ! আর ধন্য তোমাদের সভা! এ সকল কথা তোমরা শুনিবে কেন? স্বপ্নাদেশের কথা তোমাদের আলোচ্য হইবে কেন? কোন সূত্রে কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবে—সমাজের কাহাকে কিভাবে নির্য্যাতিত করিতে পারিবে?—কাহার কোন অপরাধে কি কঠোর দণ্ডবিধান করিবে? সেই সকলই যে তোমাদের আনন্দদায়ক আলোচ্য বিষয়; তোমাদের প্রাণের কথা। হায়! কি দারুণ দুর্দ্দৈব। দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি প্রাণে বড় আঘাত পাইলাম। আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল। চোখ দিয়া জল বাহির হইল। অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিলাম; আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে উঠিয়া পড়িলাম।

কবিরাজ মহাশয় আমাকে উঠিতে দেখিলেন। আমি তাঁহাকে সংকেতে ডাকিয়া বলিলাম, 'কবিরাজ মহাশয়! আপনি কেন আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন? আমার যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। আমি এখন কিছু বলতে পারি কি?'

তখন সভা প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; বহু লোক উঠিয়া গিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় রাজা মহারাজাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আমায় বলিলেন, 'তোমার কথা রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয় নিভৃতে শুনবেন। তুমি স্থির হয়ে বস। এসব কথা সাধারণের তেমন বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তাছাড়া সভার কাজ এখন শেষ হয়ে গেছে। আর কোন বক্তৃতাও তেমন জমবে না।'

কথা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। হায়! কি ভুলই করিয়াছি! কেন আমি এই পবিত্র ভাব ছড়াইতে এখানে আসিয়াছিলাম! কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণসভায় আদ্যামূর্ত্তি প্রাপ্তির কথা—স্বপ্নাদেশের কথা—বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। তবে ব্রাহ্মণ সভার নামে কলঙ্ক দিতে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আলোচনায় হিন্দু ধর্ম্মের অগাধ বিশ্বাসের মূলে আগুন ধরাইতে, এ মহতী সভার অধিবেশন কেন? যাহা হউক, আমি সেই ব্যাপারে অতিশয় রাগিয়া গিয়াছিলাম। রাগের মাত্রা এত অধিক হইয়াছিল যে মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, যাহাতে ব্রাহ্মণ সভা

শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলেন। পণ্ডিত মহাশয় আমায় দেখিয়া বড়ই আনন্দ করিলেন। তাঁহার বিশেষ আনন্দের কারণ এই, যে আমার বয়স অল্প এবং আমি ব্রাহ্মণসন্তান। তাঁহার সহিত কি কি কথা হইল ঠিক মনে নাই; তবে মনে আছে যে তাঁহার মধুর উপদেশে আমি বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে কি না, তিনি জিজ্ঞাসা করায়, আমি যখন বলিলাম, 'আমাকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসেন; কবিরাজ শরচ্চন্দ্র সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের বাসায় থাকতে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপও হয়েছিল।' তখন তিনি আনন্দ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তবে আর ৺মায়ের প্রচারের জন্য তোমার ভাবনা কি? তাঁকে ধরলে তোমার সমস্ত কাজেরই সুবিধা হয়ে যাবে; ইত্যাদি।

## ২৩

আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই তিন চার দিন পরে ৺কাশীধামে যাত্রা করিলাম। শচীনের মা আমায় গাড়ীভাড়া প্রভৃতি সব খরচ দিয়া দিলেন। ৺কাশীধামে যাত্রা করিবার পূর্বে সিদ্ধেশ্বর বসু মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! শুনেছি তুমি ২।১ দিনের মধ্যে কাশী যাত্রা করবে। এদিক্‌কার কি করলে? সাজান ঔষধালয় হল, প্রায় দু হাজার টাকা খরচ করে ঔষধপত্র করলে, চারিদিকে হাজার হাজার বিজ্ঞাপন বিলি হল, সহরের রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় প্ল্যাকার্ড লাগান হল, দেশের দৈনিক সাপ্তাহিক একখানাও বাঙ্গালা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে বাকী রাখ্‌লে না;—তারপর? এদিক্‌কার কি আর কিছু ব্যবস্থা হবে না?'

পিছন হইতে মা আসিয়া উত্তর করিলেন, 'তুমি ঠাকুরকে এখন ওসব কি বল্‌ছ? ঠাকুরের কি এখন মাথার ঠিক আছে, যে কবিরাজী করতে বস্‌বে? যা হবার হবে। এখন ঠাকুর কাশী চলল। তারপর ৺মায়ের ইচ্ছা হয় হবে; আর না হয়, যা যাবার তা গেছে। দৈবের উপর কার হাত আছে?'

আমিও দু এক কথায় বাবাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম; বলিলাম, 'আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর আর কিছু নির্ভর করে না। যিনি আমার ঘাড়ে এসে চেপেছেন· তিনি যখন যে কাজে নিয়োজিত করবেন আমি তাই করতে বাধ্য হব। একটু অপেক্ষা করুন, দেখুন ৺মা আমায় দিয়ে কি করান; ঠাকুরের কি ইচ্ছা।'

যথাসময়ে ৺কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিলাম। কাশীর স্বনামধন্য পণ্ডিত, আমাদিগের অধ্যাপক কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের বাটীতে গিয়া চট্টলার স্বনামধন্য

বন্ধু পণ্ডিত কালীকিঙ্কর স্মৃতিভূষণ মহাশয় প্রভৃতির নিকট সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলাম ; স্মৃতিভূষণ মহাশয় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিনি ৺মায়ের মূর্ত্তিখানি দেখিয়া এবং আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, 'অন্নদা ! এস তোমাকে আলিঙ্গন করে পবিত্র হই ; তুমি যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ।' বলিতে বলিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং উঠিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক বার বার আমার কপালে চুম্বন করিতে লাগিলেন। আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলাম এবং প্রাণে এক স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এমন ভালবাসা এমন প্রেমের সহিত স্বপ্নবৃত্তান্ত গ্রহণ করা, এমন করিয়া ৺আদ্যামাকে মাথায় তুলিয়া লইয়া আনন্দ করা, আমার স্বপ্নজীবনে এই প্রথম দেখিলাম। আনন্দে, প্রেমে আমার বুক ভরিয়া গেল। ভাবিলাম, এমন মহাপুরুষও কলিতে আছেন ! ঠিক এমনই প্রেমময় মহাপুরুষ এ জীবনে আর একটী দর্শন করিয়াছিলাম ! তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য সুপণ্ডিত জমিদার ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়। যথাসময়ে তাঁহার কথা বলিব ; আপনারা শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন।

সে যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র আমার সহপাঠী এবং বন্ধু বিশ্বেশ্বর ভায়া সেই ঘরে আসিল। স্মৃতিভূষণ মহাশয় বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বাবা কোথায় ?' বিশ্বেশ্বর বলিল, 'এখনই নামবেন। কবিরাজ মহাশয় উপর হইতে আসিলে পণ্ডিত মহাশয় সোৎসাহে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'শুনেছ ? অন্নদার স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা—৺আদ্যামূর্ত্তি দেখেছ ? এই দেখ।' বলিয়া ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, 'ওর কাছে সব শোন ; আনন্দ পাবে।'

কবিরাজ মহাশয় ৺মায়ের মূর্ত্তিখানি দেখিয়া উদ্দেশ্যে নমস্কারপূর্ব্বক পণ্ডিত মহাশয়ের পদধূলি লইয়া বলিলেন, 'অন্নদা ! উপরে যাও ; সময়ে সব শুনব। এখন আমার বিশেষ তাড়াতাড়ি ; রোগী দেখতে যেতে হবে। আমি কিছু কিছু স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের কাছে শুনেছি ; পরে সব শুনব ; কেমন ?'

আমি জেঠামহাশয়কে নমস্কার করিয়া উপরে গিয়া জেঠাইমাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত বলায়, তিনি আগ্রহ সহকারে একখানি ৺মায়ের মূর্ত্তি রাখিতে চাহিলেন ; আমিও বোধ হয় দিয়া আসিয়াছিলাম। মন্দির করিবার কথায় কেহ তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না দেখিয়া, আমি আর তাঁহাদের কাছে কোন কথা না পাড়িয়া, মন্দিরের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

আমি ৺কাশীধামে গিয়া পিসীমার বাটীতেই উঠিয়াছিলাম। এই পিসীমার ছোট জা আমার সেই ছোটমা। তখন বাড়ীর কর্ত্তা ছিল শ্রীমান হরিপদ ভট্টাচার্য্য। তাহার ভাই কালীপদ, তারাপদ ও শিবপদ সকলেই ছোট। তাহাদের

বহু ও ছোটমা পিসীমাদের ভালবাসায় দিনের পর দিন বেশ এক রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল। সেই বাড়ীতে আমার আর এক পিসীমা ও পিসামহাশয় থাকিতেন। সেই পিসামহাশয় আবার আমার মার খুল্লতাত ভ্রাতা; তাই তাঁহাকে পিসামহাশয় না বলিয়া মামা বলিয়া ডাকিতাম। ৺অন্নপূর্ণা মন্দিরের সীমানার মধ্যে একপার্শ্বে একটী ছোট মন্দির করিবার মত স্থান নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, এই মাতুল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্যই প্রত্যহ ৺মায়ের পূজা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া আমি অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

২৪

কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু বান্ধবদের সমস্ত কথা খুলিয়া বলায়, মন্দিরের জন্য যিনি যাহা দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে জানান হইল। তাঁহারা সকলেই চাঁদার টাকা লইয়া প্রস্তুত। আজ বুধবার; আমি শুক্রবার রাত্রের ট্রেনে কাশী যাত্রা করিব। এতদবস্থায় রাত্রিতে স্বপ্নে ৺মা আসিয়া উপস্থিত। ৺মা এবার সেই পূর্ব্বর্ণিত ষোড়শী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া বলিলেন, 'অন্নদা! তুমি নাকি শুক্রবার আদ্যামায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কাশী যাচ্ছ?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ; যাচ্ছি।'

'তুমি থেকেই পূজাদি করবে ত?'

'না।'

'তবে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন?'

'কেন? ৺মায়ের আদেশে যে কাশীতে নূতন মন্দির করে তাঁর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

'তুমি ভুলে গেছ; মা তোমাকে তা আদেশ করেন নি। মা বলেছিলেন, তুমি যদি নিতান্ত মায়ের মূর্ত্তি পূজা কর্‌তে চাও তা হলেই ওই ভাবে স্থাপনা করে পূজা কর—এই কথাই ছিল। কেমন? নয় কি?'

'হাঁ; তাই।'

'তবে তুমি এখন পূজা কর্‌বে না বল্‌ছ কেন?'

'আমার জীবন্ত পিতামাতা বর্ত্তমান। আমি তাঁদের সেবা না করে ধাতু-নির্ম্মিত মাতৃমূর্ত্তির পূজা কর্‌তে যাব কেন? আমি তা পার্‌ব না; পিতামাতাই যে সাক্ষাৎ দেবদেবী।'

ঠিক কথা; যাঁর ঔরসে জন্ম, যাঁর জঠরে দশমাস থেকে পুষ্ট হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছ; যাঁদের জন্য তুমি এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে ধন্য হয়েছ; সেই জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মাতার সেবাই তোমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।'

'আমিও তাই জানি মা!'

'পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

'ঠিক বাবা! ঠিক কথা; পিতা এমনই। আবার এই পিতার অপেক্ষা মাতা অধিক বলে শাস্ত্র নির্দ্দেশ করে; যথা—

'পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।
অতোহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরু॥'

হাঁ মা! আমিও তাই জানি;—

'মাতরং পিতরঞ্চোভৌ দৃষ্টবা পুত্রস্তু ধর্ম্মবিৎ।
প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুম্॥'

'ঠিক কথা; পিতামাতাকে এক সঙ্গে এক স্থানে দর্শন করে, ধার্ম্মিক পুত্র আগে মাতাকে নমস্কার করে, তবে পিতাকে নমস্কার কর্‌বে।

'আচ্ছা! এ নিয়ম কেন মা? এর অর্থ কি? এদিকে ত দেখি পিতাই মাতার একমাত্র গুরু। তবে পিতাকে নমস্কারের আগে মাতাকে নমস্কার কর্‌তে বলা হয় কেন?'

'এ আর বুঝলে না? বাবা! গুরুপূজা না করে ইষ্টপূজো হয়? আগে গুরুপূজো, তারপর ইষ্টপূজো যেমন ঠিক; তেমনই আগে মাতাকে বন্দনা করে, তারপর পিতার বন্দনাই ঠিক; কারণ, মাতাই পিতাকে চিনিয়েছেন।'

'ও—বুঝেছি; এতদিনে গুরুতত্ত্ব বুঝ্‌তে পারছি। মাতা গুরু যদি সাক্ষাৎ শিবরূপী পিতাকে না চিনিয়ে দিতেন, তাহলে কে আমার পিতা কি করে জান্‌তাম?—তাই শাস্ত্রে বার বার বলেছে, 'ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ইত্যাদি।'

'হ্যাঁ বাবা! তবে তোমার আর ৺কাশীতে গিয়ে দরকার নেই। এর পর যেমন আদেশ হয় তেমনই করো।'

আমি ভক্তিনম্র হৃদয়ে ৺মাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম, মা! আশীর্ব্বাদ করুন যেন পিতামাতার সেবা করে জীবন ধন্য করতে পারি। পিতামাতার যাতে অন্তে গঙ্গালাভ হয়, তা যেন কর্‌তে পারি। আমি আর কিছু চাই না। আগে একবার ৺কাশীতে রেখে পিতামাতার সেবা করবার ইচ্ছা করেছিলাম; কিন্তু আমার ভাগ্যে তা আর হয়ে উঠ্‌ল না। আমি অতি অধম, অজ্ঞান, পিতামাতার অনুপযুক্ত সন্তান। কৃপা কর মা! যেন এ দীনহীন কাঙ্গাল সন্তানের আশা পূর্ণ হয়; এই বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে আমার প্রতি দয়া করিয়া ৺মা বলিলেন, প্রাণের পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ করেন বলেই ত ভগবানকে কল্পতরু বলা হয়। ইচ্ছাময় তোমার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।'

৺মা চলিয়া গেলেন। আমি জাগিয়া উঠিয়া বন্ধুবর্গকে মন্দিরের জন্য

টাকা লইতে নিষেধ করিলাম। কেহ বা আমার এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন। আর কেহ বা হয়ত বলিলেন, 'এবার অন্নদাঠাকুর মোহে পড়েছে ; এত টাকার ঔষধ পত্র, সম্মান সুযশের হাত থেকে মুক্ত হওয়া কি সোজা কথা? তার উপর বাড়ীতে যুবতী স্ত্রী। তাই আবার এই স্বপ্নের অবতারণা।' অবশ্য আমি স্বয়ং এসব কথা কাহারও মুখে শুনি নাই ; একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এ সকল কথা পরে আমায় বলিয়াছিলেন।

বাবা ডাকিয়া বলিলেন, 'অন্নদা! তোমার এই স্বপ্ন দেখায় আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি ; এখন যাও ঔষধপত্রগুলি দেখ। যতির এতগুলি টাকা আর এত পরিশ্রম কি সব জলে যাবে? আর তা ছাড়া, টাকা উপার্জন না করলে, পিতামাতার সেবাই বা কি করে সম্ভব হবে।'

আমি বলিলাম, 'হাঁ, টাকা রোজগার ত করতেই হবে ; তবে কি উপায়ে করব তা তিনিই বলে দেবেন। কেন না এখন আমার মাথার ঠিক নেই ; আমি চিকিৎসা করে বা ঔষধপত্র প্রস্তুত করে আর টাকা উপায় করতে পারব না। ঔষধের ঘরে বা বাইরের সাজান চিকিৎসালয়ে গেলেই আমার কান্না আসে— ভয় হয় ; নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায়।'

'নিশ্চয় তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে ঠাকুর! তুমি বুদ্ধির দোষে একুল ওকুল দুকুল খোয়াবে দেখ্‌ছি।' এই বলিয়া বাবা আপশোষ করিতে লাগিলেন ; আর আমি ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলাম। কিছুদিন এইরূপ তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়াই কাটিতে লাগিল। আমি তখন সেই বাটী পরিত্যাগ করিব সংকল্প করিলাম। কোথায় যাই, কে আমায় আশ্রয় দেয়,—এই চিন্তায় আমায় আকুল করিল।

## ২৫

একদিন ভুপেন আসিয়া আমার রচিত একখানি গান লিখিয়া লইয়া গেল। গানটিতে সুরসংযোগ করিবার জন্যই সে লইয়া গিয়াছিল। তাহার দুই দিন পরে ১৫নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনে ভুপেনের সহিত দেখা করিতে গেলাম ; উদ্দেশ্য গান শুনিব। ভুপেন স্বভাবমধুর কণ্ঠে তাহারই দেওয়া সুরে গান ধরিল ;—

চোখে চোখে তারে হল না রাখা ;
চোখের পলকে ফিরে পাই না দেখা।
ভাবিনিকো ভাল করে কেমন মুরতি তার ;
কালা কি শুধুই কাল না কিছু আছে বাহার ;

মজায়ে গোপিনীদল প্রেমে বুঝি ঢলঢল,
ও তার, টলমল আঁখিটী বাঁকা।
( আঁখিটী বাঁকা, আনন অমিয় মাখা। )
যবে, মোহন মুরলী করে দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে
ধড়াচূড়া পরা বনমালী ;
পীত বসন শোভা মরি কিবা মনোলোভা
শিখিপুচ্ছ পড়েছে তায় হেলি।

এখন, কোথায় লুকাল সে কেলি করা ?
কোথায় মিশিল সে ভাবে কা'ন্না ?
মোরা ভব ভাবে হয়েছি বিভোরা ;
তারে দেখি দেখি করে পাইনে দেখা।
পাইনে দেখা, ভালে কত কি লেখা॥

এই গানটীই ভূপেন দুই দিন আগে আমার নিকট হইতে লিখিয়া লইয়াছিল। আজ ভূপেন গানটী এক নূতন সুরে গাহিয়া আমার বড়ই মনোরঞ্জন করিল। গান শেষ করিয়া দু'একটী কথাবার্ত্তা হওয়ার পর ভূপেন আমাকে বলিল, 'অন্নদাবাবু! আজ একটী ছেলের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। ছেলেটীর বাড়ী মজিলপুর—আমাদেরই দেশে ; বড় দরিদ্র ; এই বাড়ীর নীচের তলায় একখানা কদর্য্য ঠাণ্ডা ঘরে দুভাই থাকে। একজন মিণ্টে, আর একজন আর্টস্কুলে কাজ করে। বড় ভাই দেশে থাকে, একটু ভক্ত ক্লাসের। গীতা লেখে, ধর্ম্মসম্বন্ধে পত্রিকা বার করছে। আরও কত রকম কত কি করে।' শুনিয়া আমার প্রাণ টানিল; 'আহা! এমন সব ছেলে! এদের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা দরকার।' ভূপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কখন দেখা হবে?' এমন সময় একতালা হইতে মোটা গলায় অথচ ভক্তিমাখা সুরে কে গান ধরিল—

'চোখে চোখে তারে হল না রাখা ;
চোখের পলকে ফিরে পাই না দেখা।'

অমনি ভূপেনবাবু ইসারা করিয়া আমায় বলিল, 'ঐযে পাগলের মত চেঁচাচ্ছে, ওটী হচ্ছে ছোটভাই, ওর নাম হরিভূষণ ; এখানে সবাই 'পাগ্‌লা', 'পাগ্‌লা' বলে ডাকে। ওরই মেজ ভাইয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় করে দেবার কথা বল্‌ছি ; ওরা কটী ভাইই খুব ভাল।'

আমি পাগল হরিভূষণের সঙ্গে দেখা করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ

করিতেছি, এমন সময় খড়ম পায়ে ঠকাস্ ঠকাস্ করিতে করিতে ভুষণভায়া সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ভুপেনের সঙ্কেতে ভুষণভায়া ত্রস্তভাবে পাদুকা ছাড়িয়া আমায় নমস্কার করিল। আমি তাহার পবিত্র স্পর্শে বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এবং মনে হইল আমার বড়ই আপনার; বহুদিনের পরিচিত। তাহার মুখে ভজনের সুরে সেই গানটী শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় সরল-প্রাণ ভুষণভায়া তৎক্ষণাৎ রাজী হইল এবং চক্ষু বুজিয়া গান ধরিল।

গান শেষ হইলে দেখিলাম ৩।৪ জন লোক আমার সম্মুখে বসিয়া আছে। ভুপেন তাহার মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'এরই নাম হরিচরণ; কি হরিচরণ! এঁকে চিনতে পার?'

হরিচরণ ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'হাঁ, ভুপেনবাবু! ইনিই সেই ব্রাহ্মণ সন্তান, যাঁকে দুদিন আগে স্বপ্নে দেখেছি আমার বোনের বিবাহ দিয়ে দিচ্ছেন।'

ভুপেন বলিল, 'তবে আর কি? বগল বাজাও; মনে কর বিবাহ হয়েই গেছে।'

আমি স্থির হইয়া শুনিতেছিলাম; কিছু বলিলাম না। হরিচরণ কথা শেষ করিলে সকলে আমায় প্রণাম করিল; আমি প্রতিনমস্কারান্তে সকলের নিকট সেই রাত্রির মত বিদায় লইলাম।

রাস্তায় আসিতে আসিতে ভুপেন বলিল, 'হরিচরণের এক ভগ্নী আছে। প্রায় ১৫ বৎসর বয়স। হাতে এমন টাকাকড়ি নেই যে দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রেও বিয়ে দিতে পারে। আপনি দয়া করলে নিশ্চয়ই হয়ে যায়। ওরা মজিলপুরের দত্ত; জমিদারের বংশধর; খুবই বনিয়াদি ঘর; আর আপনাকে যখন স্বপ্ন দেখেছে তখন নিশ্চই সুফল ফলবে সন্দেহ নেই।' আমি মনে মনে ভাবিলাম —ভগবান! কাশীতে এই অধমকে উপলক্ষ্য করিয়া যখন ১৮।১৯টী দরিদ্র কন্যাকে উদ্ধার করিলে তখন এইটীরও উপায় কর। কলিকাতায় আমার এমন পরিচিত লোক কোথায় যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাত্র স্থির করিব?

ভুপেন চলিয়া গেল। আমি বাসায় গিয়া সমস্ত কথা শচীনকে বলিলাম। পরদুঃখকাতর শচীন ১৫ বৎসরের দরিদ্র মেয়ের কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেল। সে বলিল, 'আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের বলে, যা করে হোক এর ব্যবস্থা করব; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

শচীন তখন বুঝিল না তাহার প্রাক্তন তখন তাহাকে ভ্রূকুটী করিয়া কি বলিয়া গেল। কেই বা তা বোঝে? পরের কথা পরে; পর দিনের কথা, পর মুহূর্ত্তের কথা কে জানিতে পারে? মানুষ ত ছার,—স্বয়ং কলাসেশ্বরী পার্ব্বতী, গণেশের মুণ্ডচ্ছেদের কথা,—ত্রেতাবতার রামচন্দ্র, সীতাহরণের কথা, লক্ষ্মণবর্জ্জনের কথা, সীতার পাতাল প্রবেশের কথা প্রভৃতি যদি পূর্ব্ব

মুহূর্তেও জানিতে পারিতেন তাহা হইলে বোধ হয় নিয়তির চক্র উল্টা ঘুরিত; অনেকেই রক্ষা পাইত। হয় ত গোঁড়া ভক্ত আমায় বলিবেন, 'তুমি কি করে জানলে যে তাঁরা স্বয়ং ভগবান্ ভগবতী হয়েও, পর মুহূর্তে বা পূর্ব মুহূর্তে কি হবে বা কি হল, তা জানতে পারেন্ নি?' আমি অবশ্য সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিব না। কেবল তাঁহাদের বিশ্বাসের পায়ে কোটী কোটী প্রণাম করিব।

দুই চারি দিন পরে একদিন রাত্রে ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন, 'সরলা শচীনের পূর্বপত্নী; তুমি একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করো না। একবার শুধু দেখে এস মেয়েটী কেমন।'

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভাবিলাম, তাই ত! শচীনের পূর্বপত্নীর সঙ্গে আবার কাহার বিবাহ হয়, একবার দেখিতে হইল। শচীন ত বিবাহ করিবেই না বলিয়াছে; আবার শ্রীশ্রীমাও তাহাকে নিশেধ করিয়াছেন। এই ঘটনার দুচার দিন পরে শুনিলাম শচীনের সেজদার জন্য যতীনবাবু ও ফণীবাবু হরিচরণকে লইয়া সরলাকে দেখিতে যাইবে। তাহারা মেয়ে দেখিয়া আসিল; খুব খাওয়া দাওয়ার গল্প করিল; কিন্তু মেয়ে পছন্দ হইল না। লাভের মধ্যে হরিচরণের কয়েকটী টাকার শ্রাদ্ধ হইল। বেচারারা হয়ত টাকার অভাবে পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধ উঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ভগ্নীকে পাত্রস্থ করিবার জন্য টাকার শ্রাদ্ধ প্রায়ই হইতে লাগিল।

## ২৬

ইতিমধ্যে সেই ১৫নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনে, সেই ঠাণ্ডা নীচের ঘরে আমিও গিয়া অধিষ্ঠিত হইলাম। বড় আনন্দের সহিত আমি সেখানে আশ্রয় লইয়াছিলাম। হরিচরণ একখানি চৌকি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আর একখানিতে তাহারা দুই ভাই থাকিবার ব্যবস্থা করিল। দরিদ্র হইলেও তাহারা খুব উন্নতমনা এবং উদারহৃদয়। তাহারা স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইত। কখনও একটা ঝালের ঝোল, কখনও বা কলায়ের ডাল, কখনও বা শুধু গুড়-তেঁতুল দিয়া, আবার কখনও বা ভাতেভাত খাইয়াই দিন কাটাইত। আমিও ঠিক সেইভাবেই তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। তাহারা সময়মত খাইয়া আফিসে চলিয়া যাইত; তারপর আমিও ভাত নামাইয়া লইয়া খাইতাম; বেশ আনন্দে সহজভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

আমি নূতন নূতন গান বাঁধিতাম। হরিভূষণ সুর দিয়া গাহিতে আরম্ভ করিত; আর হরিচরণ তক্তাপোষ বাজাইয়া সঙ্গত করিত। এইরূপ আমোদে ভগ্নীর বিবাহচিন্তা তাহারা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। যখন আমি সে কথা

উঠাইতাম তখন বলিত, 'আপনি জানেন আর আপনার ভগ্নী জানে; আমাদের কি? আমরা এখন নিশ্চিন্ত।'

আমি হয় ত তাহাতে বলিতাম, 'ভাই! চেষ্টা করাই মানুষের ধর্ম্ম। যত্ন করে দেখেও যদি ফল না পাই, নাই পেলাম। তাতে আর দোষ কি? তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থেকো না। কেন না সত্য নির্ভরতা আসতে আমাদের এখনও ঢের দেরী। যেদিন সত্য সত্যই নির্ভরতা আসবে, সেই দিনই জানবে জীবন ধারণের উদ্দেশ্য ষোল আনাই পূর্ণ হয়েছে। সেই দিন হতে আর তোমার কোন বাসনা, অভিলাষ, সুখ দুঃখ মান অভিমান বোধ থাকবে না। তুমি নদীতীরস্থ বৃক্ষের পাকা ফলটীর মত বন্ধনমুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দময় সাগরের গভীর ঝঙ্কারের মধ্যে আত্মহারা হয়ে মিশে যাবে। তোমার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকবে না। ভাই! আমরা মুখে বলি ভগবান যা করেন হবে; কিন্তু পরীক্ষার সময় সকলেই নিজ নিজ কৌপীন রক্ষার জন্য ছুটাছুটি করি।—ওসব কেবল আমাদের মুখের কথা। যতক্ষণ ভালবাসা জমে নি ততক্ষণই বলি, 'আমি তোমায় ভালবাসি; বল—তুমি আমায় ভালবাস।' আর ভালবাসা যখন গাঢ় হতে থাকে তখন ভাষা চলে যায়। তখন 'ভাবিতেও প্রাণে বহে প্রেম মন্দাকিনী গো!' তখন দেখি বা না দেখি, কাছে থাকি বা দূরে থাকি, সে আমায় ভালবাসুক বা না বাসুক, আমার কিন্তু কেবল তাকেই মনে পড়ে; চারিদিকে তাকেই দেখি; তার শব্দই কানে শুনি; তার সুগন্ধই ঘ্রাণে পশে। তারই রূপে আকাশ ভুবন ভরে যায়; তারই প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকি। তখন আর আমার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।—একবারে তাতে মিশে যাই।'

এরূপ বলিতে বলিতে যখন আমি আমাকে হারাইয়া ফেলি তখন এক ভাই বলিয়া ওঠে, 'থাম ঠাকুর! থাম; আমরা ওসব বুঝিনা। মুখ্যু সুখ্যু লোক—আমরা বুঝি 'দাদা আর গদা।' অমনি আর একজন বলে 'তা বই কি?—ওসব সোনার বালা দিয়ে কি হবে? বেঁচে থাক্ মোর দাড়ী—মোদের দাদাঠাকুর কাছে থাকলেই মোরা নিশ্চিন্ত।'

এই সকল ঠাট্টা তামাসায় আমার আধ্যাত্মিকতা ছুটিয়া যাইত। আমি তখন উচ্ছ্বাস থামাইয়া বলিতাম, 'তবে কি বোনের বিয়ে হবে না?'

'হবে গো হবে; অত ব্যস্ত কেন?' বলিয়া ভুষণভাযা আমার ভালবাসার গান কয়খানি এক নিঃশ্বাসে গাহিয়া ফেলিত। সেই তক্তাপোষের সঙ্গৎ আর ভুষণভায়ার সুরে কি চমৎকার মিলই হইত। আর সেই অপূর্ব্ব ঐক্যতানে এক এক দিন এক এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হইত। বাহিরে রাস্তার লোক জমিতেছে দেখিলে আমি আস্তে আস্তে জানালাটী বন্ধ করিয়া দিতাম। আর ভিতরে কেরাণী বাবাজীরা, 'ওরে! থাম—থাম; তোদের জ্বালায় টেঁকা দায় হল দেখছি!' বলিয়া যখন নানাবিধ মধুর মন্তব্য ছাড়িতেন, তখন আমি ভগ্নে

দুভাইকে থামাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু কে কার কথা শুনে? সবারই মিলিটারী মেজাজ; সবাই স্বাধীন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিবার পর হরিচরণ একটীর পর একটী করিয়া ২।৩টী দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ ৫।৭ ছেলের বাপকে পাত্র স্থির করিতে লাগিল; ইহাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তাহার ভগ্নীর বিবাহের পাকা দেখা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। এগুলি এক এক করিয়া আমি সব ভাঙ্গিয়া দিলাম; অবশ্য শচীন আমার পিছনে ছিল। এই বাধা দেওয়া ব্যাপারে হরিচরণ আমার উপর একটু রাগিয়াছিল। এক স্থানে বিবাহের সব ঠিকঠাক করিয়া পাত্র পক্ষের পাকা দেখা হইয়া গেল। আমাকে লইয়া কন্যাপক্ষ পাকা দেখা দেখিতে গেল; আমি সেই দিন পাত্রের অবস্থা ও ইহাদের ব্যবস্থা দেখিয়া হরিচরণকে খুব বকিয়াছিলাম। তাই বোধ হয় হরিচরণের রাগ। অর্থাৎ আমিও একটা ঠিক করি না; সেও প্রাণপাত পরিশ্রমে যেমনই হউক একটা জোগাড় করে। আর আমি সেটী ভাঙ্গিয়া দিই। আবার বলি, 'চুপ করে বসে থাকলে কি বোনের বিয়ে হয়? এরূপ উৎপাত বেচারা আর কত সহ্য করে?'

ঠাকুর যে আমায় একবার সরলাকে দেখিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন, সে কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। একদিন শচীন আসিয়া বলিল ভাই! তুমি একবার হরিচরণের বোনকে দেখে এস; আমি দুএকটী পাত্রের সন্ধান করেছি যদি নিতান্তই দেখ্‌তে কুৎসিৎ না হয় তাহলে হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।' আমি এক ভাইকে সঙ্গে লইয়া মজিলপুরে গেলাম। মগরাহাট ষ্টেশনে নামিয়া ডোঙ্গায় ৬।৭ মাইল পথ আনন্দে অতিবাহিত করিয়া ভূষণভায়ার বাটীতে পৌঁছিলাম। ভূষণভায়ার মা ও বড় দাদা আমাকে পাইয়া খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন। দেখিলাম সত্যই ব্রাহ্মণের গৌরব এখনও পল্লীগ্রামে আছে।

মজিলপুর গ্রামখানি আমার বড় ভাল লাগিল। 'গঙ্গা মজে' মজিলপুর নাম হয়েছে; সমস্ত জলই গঙ্গাজল; ইত্যাদি কথায় আমার প্রাণে ভক্তির উদ্রেক করিল। তারপর মেয়ে দেখার পালা। শুভক্ষণে আমি সরলাকে দেখিলাম। আমার চক্ষে ভালই লাগিল। রং উজ্জল শ্যামবর্ণ। দেখিতে মন্দ নয়; স্বভাব অতি সুন্দর। কয়েকটী পরীক্ষায় বুঝিতে পারিলাম জীবনও ধর্ম্মভাবে অতিবাহিত হইবে। এ সকল কথা ফিরিয়া আসিয়া শচীনকে ও শচীনের পরিবারস্থ সকলকে বলাতে সরলাকে কলিকাতায় আনাইয়া দেখানই সকলের মত হইল।

## ২৭

সরলা কলিকাতায় আসিয়া একবারে শচীনদের বাড়ীতেই উঠিল। সরলার চাল চলনে সন্তুষ্ট হইয়া মা ও শচীনের দিদি আমার কাছে সরলার খুবই

প্রশংসা করিল। কিন্তু তখন শচীনের সেজ ভাই ধীরেনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। একজন দুইজন করিয়া অনেকেই সরলাকে দেখিতে আসিল। কেহ মেয়ে পছন্দ করেন ত টাকার অভাবে অমত করেন; কেহ বা বিনাপণে সম্মত হন ত মেয়ে পছন্দ হয় না। এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সরলার বিবাহের জন্য শচীন স্বয়ং তিন শত টাকা চাঁদা তুলিয়াছিল; এবং শচীনের পিতাও এই বিবাহে তিনশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ১৫।২০ দিন কাটিয়া গেল।

একদিন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় সাহেব দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় 'কুললক্ষ্মী' প্রভৃতি কাব্য প্রণেতা কবি সুরেন্দ্র রায়ের জন্য, সুরেনবাবুকে লইয়া মেয়ে দেখিতে আসিলেন। দুজনেই সাহিত্য জগতের লোক; আমাদের প্রথম একটু ভয় হইয়াছিল; না জানি কি চোখে দেখিবেন। কিন্তু বেশীক্ষণ আর সে ভয় রহিল না; 'গুণী গুণং বেত্তি।' দীনেশ সেন মহাশয় অনেকক্ষণ নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, মেয়েটী খুবেই সুলক্ষণা ও কোমলস্বভাবা এবং পতির আনন্দদায়িনী হইবে। রায় মহাশয়ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমরাও উপযুক্ত পাত্রে মেয়ে দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। স্বনামধন্য নবীন কবি সুরেন রায় সরলার স্বামী হইবে মনে করিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আনন্দ করিতে লাগিল।

সরলার এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল,যে সে পরের বাড়ী আসিয়াও সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। বাড়ীর চাকর চাকরাণী পর্যন্ত সরলাকে ভালবাসিত; সরলা সৎপাত্রে পড়ুক ইহা যেন সকলেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। আগেই বলিয়াছি ভবিতব্য কেহই খণ্ডাইতে পারে না; এস্থলেও তাহাই হইল। সুরেন বাবুর ষোল আনা ইচ্ছা সত্বেও তাঁহার জননীর অনিচ্ছায় বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। কারণ, তাঁহাদের বাটী ত্রিপুরা জেলায়; সেই জন্য তাঁহার মাতা কলিকাতার দিকের মেয়ে পছন্দ করিলেন না। সকলের আশা ব্যর্থ হইল।

সকল চেষ্টা বিফল হইলে কথায় কথায় একদিন আমি হাসিতে হাসিতে শচীনকে বলিলাম, 'ভাই! তুই সরলাকে বিয়ে করে ফেল। এখন মেয়েদের যে রকম কেরোসিনে পুড়ে মরার ধুম পড়েছে,তাতে সরলা যদি বিয়ে না হয়ে দেশে ফিরে যায়, তাহলে হয় ত সে আত্মহত্যাও করতে পারে। একটী মেয়েকে রক্ষা করতে পারলেও জীবন ধারণ অনেকটা সার্থক হবে। তুইই বিয়ে কর।' কথাটা বোধ হয় কান পাতিয়া শুনিয়াছিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া অনুমতির জন্য জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে পত্র লেখা হইল। মা আমাদের প্রেমময়ী। একটী কন্যাকে উদ্ধার করা হইবে শুনিয়া তিনি লিখিলেন—"বাবা! জীবন দিয়াও যদি একটা জীবন রক্ষা করা যায়, জন্ম সার্থক মনে করি। ইহা ত পরম

মঙ্গলের কথা। আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি বিবাহ কর। তোমার বিবাহিত জীবন আনন্দেরই হইবে।" এইরূপে ২০।২১ বৎসর বয়সে ১৫ বৎসরের সরলার সঙ্গে শুভদিনে শচীনের শুভ বিবাহ হইয়া গেল। শচীন পূর্ব্ব জন্মের স্ত্রীকে লাভ করিয়াছে ভাবিয়া পুলকে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। ৺ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল।

এই বিবাহে বিপুল স্বার্থত্যাগের জন্য বাবাও সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কারণ, এই শচীনকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কন্যা দান করিবার জন্যও ২।১টী কন্যার পিতা প্রস্তুত ছিলেন; আর এক দরিদ্র কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া মাও সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে হয়। আজিও দুরন্ত পণপ্রথা যেরূপ রাক্ষসী মূর্ত্তি ধরিয়া সভ্য সমাজে অবাধে বিচরণ করিতেছে, তাহাতে এরূপ বিবাহ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। জানি না কবে বাংলার এই দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা মুছিয়া যাইবে; করে বাংলার আকাশ মেঘমুক্ত হইবে। এখনও সেই পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারী স্নেহলতার কথা মনে হইলে বুক কাঁপিয়া ওঠে; চোখ ভরিয়া জল আসে; আমাদের সভ্যতার উপরও ঘৃণা হয়। যদি কেহ সভ্য সমাজের মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তবে পণ লইয়া বিবাহ করিও না। পণ লইয়া বিবাহ, অর্থাৎ আত্মবিক্রয় করিয়া বিবাহ, শাস্ত্রসম্মত বিবাহ নয়। হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহই অতি পবিত্র শ্রেষ্ঠ সংস্কার। সেই সংস্কারে আত্মা শুদ্ধভাবে সংস্কৃত না হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না।

ইতিপূর্ব্বে স্নেহলতা ও সমাজের আরও দুই চারিটী মেয়ের প্রসঙ্গ লইয়া পণপ্রথা নিবারণ কল্পে আমি একখানি নাটকও লিখিয়াছিলাম। ভবানী ভট্টাচার্য্য নামে আমার জনৈক বন্ধু সেই পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু মহাশয়ের উৎসাহে সেই পুস্তকখানি অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইতেছিল। ইহা আমার উন্মাদ হওয়ার সময়ের কথা। হঠাৎ আমার মাথা খারাপ হইয়া যাওয়ায় এবং স্নেহলতা সম্বন্ধে সাধারণের মত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় নাটকখানি অভিনীত বা প্রকাশিত হয় নাই। সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা; তাঁহার ইচ্ছা কে অতিক্রম করিতে পারে?

এই সময় অমর কবি ৺ডি. এল. রায় মহাশয়ের সহিতও আমার পরিচয় হয়। স্নেহলতা সম্বন্ধে কিছু লেখা ও একটী গান লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন 'ভীষ্ম' নাটকখানি লিখিতেছিলেন। আমার লেখার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন —'ভীষ্ম' লেখার পর আমি পণপ্রথা নিবারণ সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিব। হায় বাঙ্গালীর অদৃষ্ট! তাঁহার সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত

হইবার পূর্বেই তিনি বঙ্গ জননীর কোল হইতে অপসারিত হইলেন। বাংলার হাহাকার যেমন ছিল তেমনই রহিল। আমি স্নেহলতা সম্বন্ধে যে গানটি লিখিয়া ৺ডি. এল. রায় মহাশয়ের কাছে লইয়া গিয়াছিলাম তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। গানটী—'শ্মশানে স্নেহলতাকে কোলে লইয়া বঙ্গজননীর খেদ'—নাম দিয়া রচিত হইয়াছিল।

## গান

আর কেন কালঘুমে রবে অচেতন!
বারেক, জেগে দেখ কার কোলে করেছ শয়ন ;
কে তোমা করেছে কোলে, চেয়ে দেখ চোখ খুলে
ডাক ওরে! মা মা বলে জুড়াবে জীবন ;
বারেক, দুঃখিনী মায়ের দুঃখ ঘুচাও এখন।
এ নয় শ্মশান ক্ষেত্র ; শ্মশানেতে নও তুমি ;
এ হয় মায়ের কোল জীবের আনন্দভূমি।
ওই হাসে ওই নাচে ওই আসে নিতে তোমা,
বরষি কুসুমরাজি অপরূপ দেববামা ;
দেখ দেখ চেয়ে দেখ, মম মুখ পানে দেখ,
মাগো! আমিও যাইতে চাই তোমারি মতন ;
ছাড়ি বঙ্গ পাপভূমি পবিত্র সদন।
আমি বঙ্গমাতা! মোরে! দেখে নাকো কেহ আর ;
ডাকে নাকো মা মা বলে হল সব একাকার।
আপনার দেহমাংস আপনি বিকায়ে খায়
পরপীড়নেতে রত অনুরক্ত কুসেবায় ;
সতত বিপথগামী হাহাকার দিবাযামী
কাহারে বলিব মোর মরমবেদন?
মাগো! কে আছে শুনিবে মোর করুণ রোদন॥

## ২৮

শচীনের বিবাহের পর আমি আরও ৮।১০ মাস বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে হরিচরণ হরিভূষণের সঙ্গে কাটাইয়াছিলাম। তখন প্রায়ই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে স্বপ্নে দেখিতাম। তাঁহার আদেশ মত অতি গোপনে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর ৺কালীবাড়ীতে যাতায়াত করিতাম ; এমন কি শচীনও একথা জানিত না। অবশ্য ৺মাকে পাইবার পূর্বে একদিন মণি মজুমদারের উৎসাহে

অনেক বন্ধুবান্ধব মিলিয়া দক্ষিণেশ্বর ৺কালীবাড়ীতে গিয়াছিলাম। সে দিনের কথা এ জীবনে কখনও ভুলিব না। সেই আনন্দ কোলাহল, সেই জল-কেলি, সেই ঠাকুরদর্শন, ফলাহার, গান গল্প ভুলিবার নয়। দক্ষিণেশ্বর আমার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে তাহার পর একদিন শচীনকে লইয়াও গিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল ২।১ দিন সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু ৺কালীবাটীতে ত হইলই না; তাহা ছাড়া গ্রামে অনেকের বাটীতে বৈঠক-খানায় ২।১ দিন থাকিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া-ছিলাম।

দক্ষিণেশ্বরে আমি গোপনেই যাতায়াত করিতাম; কেহ কিছু জানিত না। সেখানে বরাহনগরের মহেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে আমার খুবই পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহার মুখে ৺ঠাকুরের অনেক গল্প গুজব শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রথম হইতেই ঠাকুরের নিকট তিনি যাতায়াত করিতেন। তাঁহার ঠাকুরের কাছে যাওয়ার প্রায় সাত বৎসর পরে মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। ৺ঠাকুরের ঘরের সামনের বারান্দায় বসিয়া এই সব গল্প গুজব, রং তামাসা চলিত; অবশ্য অধিকাংশই ৺ঠাকুরকে লইয়া। ইহার মধ্যে রামলাল দাদাও ছিলেন; রামলাল দাদার গান আমার বেশ ভাল লাগিত।

আমি কবিরাজ মহাশয়ের কাছে স্বামিজী সম্বন্ধীয় কথাই শুনিতে চাহিতাম। তিনিও বাড়ী যাইবার সময় আমায় সঙ্গে লইতেন এবং রাস্তায় যাইতে যাইতে স্বামীজির কথায় আমাকে কত আনন্দ দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই সকল কথা, সেই সমস্ত অভিনয়, বিবেকানন্দ জীবনীর কোথাও স্থান পায় নাই। এক দিনের কথা এইখানে বলিব। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—'আমি এক দিন সন্ধ্যার পরেই ৺ঠাকুরের ঘরে গিয়ে দেখি, দরজা দেওয়া; ভিতরে নরেন ঠাকুরের ধ্যানস্থ মূর্ত্তির সামনে বসে দিয়াশালাই জেলে তাঁর চোখ পরীক্ষা করছে। নরেন ঠাকুরের ভালবাসায় পড়ে মধ্যে মধ্যে এমন সময় একা দক্ষিণেশ্বরে আসত। আবার ভোর না হতেই হেঁটে কলকাতায় ফিরে যেত। সেদিন তার কাণ্ড দেখে আমি বুঝলাম, নরেন আজও ঠাকুরকে পরীক্ষা করছে। আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হল, যে লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান ছেলের এ কি সন্দেহ! এতদিন ঠাকুরের সঙ্গ করছে! একটু বিশ্বাস হল না? আর বিশ্বাসও যে হয়নি তাই বা বলি কি করে? কেননা, বিশ্বাসই যদি না হবে, তাহলে এ রকম আসা যাওয়াই বা করবে কেন?

পর পর দুতিনটী কাঠি জেলে নরেন যখন দেখলে ৺ঠাকুরের কোন সাড়া শব্দ, নড়ন চড়ন নেই; সে তখন একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল; তারপর আস্তে আস্তে উঠে পাশের হুঁকো থেকে কলকেটা নিলে। আমার মনে হল, আজও

বুঝি কলকে ছেঁকা দেওয়ার মতলব। তাই আমি বাইরে তৈরী হতে লাগলুম, যদি ঠাকুরের কাছে কলকে নিয়ে যেতে দেখি, তখুনি দরজা খুলে নরেনের হাত ধরে ফেলব। ওঃ! একদিন এমন হয়েছিল; সে আর কি বলব!—ঠাকুরের সমাধি হয়েছে; আর নরেন গড়গড়া থেকে আগুনের মত গরম কলকেটা নিয়ে শুনলুম নাকি ঠাকুরের উরুতে লাগিয়ে রেখেছিল। আমি ছিলুম না; যারা ছিল, তারাও টের পায়নি; না হলে এমন পাশবিক কাণ্ড কখনও হয়? আজ না হয় নরেন বিবেকানন্দ হয়েছে। তখন ত আর তা ছিল না? তখন আমরা নরেনকে এক উদ্ধত প্রকৃতির অবিশ্বাসী ছোকরা বই আর কিছু মনে করতুম না।'

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আমি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। কেননা স্বামী বিবেকানন্দকে আমি এতই ভালবাসিতাম যে ১৪ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার একখানি ছোট ছবি অতি যত্নের সহিত আমার সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম। যাহা হউক আমার চাঞ্চল্য দেখিয়া বুদ্ধিমান কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, 'অন্নদাবাবু! আমি তোমাদের বিবেকানন্দকে নিন্দা করছি না; সত্য ঘটনাই তোমার কাছে বলছি।'

আমি বলিলাম, 'তারপর কি হল বলুন।'

কবিরাজ মহাশয় বলিতে লাগিলেন, 'তারপর নরেন আর সেদিন কলকেটা ঠাকুরের কাছে না নিয়ে গিয়ে নিজের পকেটেই রেখে দিলে। আমি বুঝতে পেরেই হেসে উঠলুম। হাসির শব্দ নরেনের কানে পেঁছুতেই দরজা খুলে আমায় জড়িয়ে ধরে, মুখ বুজে হাসতে লাগল, আর 'চুপ, চুপ' বলে আমাকেই বার বার চুপ করতে বললে। আমি বললুম, 'নরেনবাবু! এখনও আপনার ভুল ভাঙ্গল না? এখনও ঠাকুরকে অবিশ্বাস! এখনও ঠাকুরকে নানারূপ পরীক্ষা!'

নরেন বললে, 'দেখুন কবিরাজ মহাশয়! বাজার থেকে একটা হাঁড়ি কিনতে কবার বাজিয়ে দেখেন বলতে পারেন? সামান্য ওষুধের বড়িটা ঠিক গুঁড়ো হল কিনা, দু আঙ্গুলের মাঝে ফেলে কবার রগড়ে দেখেন মনে আছে কি?—আমার বেলাই বুঝি যত দোষ? আপনাকে শাস্তর খুলে দেখিয়ে দিতে পারি, গরু শিষ্যকে বা শিষ্য গুরুকে একবছর ধরে পরীক্ষা করে তবে পরস্পরকে গ্রহণ করবে। আর, তা ছাড়া, এখনকার দিনে ধর্ম্মের নাম করে অনেক ভণ্ডের ভণ্ডামী বাজারে চলে যাচ্ছে। এতে শুধু আমার লাভ নয়; আসল নকল পরীক্ষা হয়ে গেলে আপনাদের সবারই উপকার হবে না কি?'

আমি বললুম, 'আমার আর উপকারের দরকার নেই। ঠাকুরের উপর আমার যেটুকু বিশ্বাস আছে, ভগবান দয়া করে সেটুকু ঠিক রাখলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

নরেন বললে, আমি আপনাদের ও সব অন্ধ বিশ্বাসের ধার ধারি না। গুরুদেব অর্থ করছেন, 'রামঃ লক্ষ্মণাগ্রজঃ'; অর্থাৎ কি না, 'লক্ষ্মণ রামের অগ্রজ'। আর বিশ্বাসী ভক্তমণ্ডলী ভক্তিগদগদকণ্ঠে 'অহুহঃ' করে চোখ মুছতে লাগলেন।—আপনাদের ভক্তি বিশ্বাস ত কতকটা ঐ ধরণের? আমি ওরকম পছন্দ করি না। এক জন নই বাছুর কিনতে গিয়ে একটা এঁড়ে বাছুর কিনে এনে হাজির। সবাই বললে—'করেছ কি? এ যে এঁড়ে বাছুর?' তিনি তখন মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বুদ্ধিমানের মত উত্তর করলেন, 'মশাই! অত লেজ তুলে দেখা আমার অভ্যেস নেই। ওসব আপনাদের দেখা অভ্যেস থাকে ত নিজেরা গেলেই পারতেন।' তবু লজ্জিত হবে না। নিজের দোষ নিজে স্বীকার করবে না। বুঝলেন? কবিরাজ মশাই! পরীক্ষাটা করে পায়ে লুটানই ভাল। পায়ে লুটিয়ে, নাকে খত দিয়ে, ভক্তির প্রবাহ ছুটিয়ে, শেষে—'দূর শালা ভণ্ড কোথাকার!' বলে পালিয়ে যাওয়া কি ঠিক?

নরেন উদাহরণের পর উদাহরণ দিতে লাগল। আমি হেসে বললুম, 'থামুন, থামুন; নরেন বাবু! আমিও পরীক্ষার কম করিনি। অনেক দেখে শুনে তবে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়েছি; নাকে খত খাচ্ছি।'

নরেন বললে, 'বলুন ত—আপনি কি দেখেছেন? কোন বিশ্বাসে ঠাকুরকে আত্মসমর্পণ করেছেন?'

'এক দিনের কথা শোন তবে;' বলে আমি বললুম, 'একদিন আমি ঠাকুরের সঙ্গে দ্বাদশ মন্দিরের এদিককার সিঁড়িটার উপর বসে কথাবার্ত্তা কচ্ছি, এমন সময় বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর অঞ্চলের কয়েকজন চাকুরে ভক্ত বাগানে বেড়াতে এসে, এই উঠন দিয়ে ৺কালীমন্দিরের দিকে যাচ্ছে দেখলাম। যাবার সময় একজন আর একজনকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলছে, 'ঐ দেখ, রাসমণির পূজারী রামকৃষ্ণঠাকুর।' লোকটা বললে, হাঁ, হাঁ, দেখেছি, দেখেছি;—বড়-লোকের বাড়ীর কুকুরটারও মান আছে। ঠাকর ত ঠাকুর।' অপর দুএকজন বললে, 'ছি, ছি, ও কি কথা! তোমার কি একটু আক্কেল নেই? রামকৃষ্ণ ঠাকুর যে একজন বড় সাধক।' 'ওরে থাম্ না;' বলে আর একজন তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। তারপর তারা ৺কালীদর্শন করে পঞ্চবটীর দিকে গেল দেখলুম। তাদের কথা মনে করে লজ্জায় মাথা নীচু করে ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর চীৎকার করে উঠলেন, 'ওরে—ওরে—ধর—ধর—শালা পড়ে গেল যে; ওঃ—মা—মা—' বলিয়াই সমাধিস্থ হইলেন।

ঠাকুরের হঠাৎ চীৎকারে আমি ভয় পেয়ে শিউরে উঠলুম। দেখলুম, ঠাকুর স্থির, নিশ্চল, পাষাণবৎ; আমি এর কোন কারণ ঠিক করতে পারলুম না। একদৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় দেখি একজন লোককে আর কজনে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এসে, একেবারে ঠাকুরের পায়ের কাছে রেখে

জোড় হাত করে বলতে লাগ্‌লে 'ঠাকুর ! ক্ষমা কর্‌ন, রক্ষা কর্‌ন, প্রাণে বাঁচান।' আমি ত দেখে অবাক্‌ ; যে লোকটী ঠাকুরকে লক্ষ্য করে যা তা বলেছিল তাকেই অজ্ঞান অবস্থায় ওই রকম করে আন্‌তে দেখে আমার আনন্দ ও বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। আমি জিজ্ঞেস করল্‌ম কি হয়েছে লোকটীর ?' একজন বললেন, 'পঞ্চবটী তলায় হোঁচট্‌ খেয়ে উপ্‌ড়ে হয়ে পড়ে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে গেছে ; আমাদের অনেক চেষ্টাতেও কিছ্‌তেই কিছ্‌ হল না। পঞ্চবটীতে একজন সাধ্‌ আছেন। তিনি বললেন, ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাও। তাই নিয়ে এসেছি। ইনি এখন ধ্যানে আছেন ? আপনিও একটু দয়া করে বল্‌ন না যাতে এর জ্ঞান হয়, রক্ষা পায় তাই করতে।' আমি ত কথা শ্‌নিয়া অবাক্‌ হইয়া গেলাম ! তাই ত ! কোথায় পঞ্চবটী ! আর কোথায় ঠাকুর ! ও কি স্‌ক্ষ্ম দ্‌ষ্টি !

আমি এই সব ভাব্‌ছি বাব্‌রা সব হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় ঠাকুর বলে উঠ্‌লেন, 'বেটা, ৺মায়ের প্রসাদ খাবে না ; কি আস্পর্দ্ধা ! বেটাদের ঠাকুর দেখ্‌তে এসেও, কত ভেদাভেদ, জাতকুল বিচার ; দেখ না ? এখন রাসমণির ৺কালী কি বলে ?—যাঃ শালারা—৺মার কাছে নিয়ে যা ; আমি কি কর্‌ব ?' কথা শ্‌নে সবাই একে একে ঠাকুরের পায়ে পড়ল আর আমি ভাবতে লাগলাম, কি আশ্চর্য্য ! কি অলৌকিক দর্শন ! কি অদ্ভুত ভাব ! ঠাকুরের পায়ে পড়ায় ঠাকুর লাফিয়ে উঠে দ্‌রে গিয়ে দাঁড়ালেন দেখে সবাই কেঁদে ফেল্‌লে। ঠাকুর বল্‌লেন, 'দৌড়ে গিয়ে ৺মায়ের প্রসাদ আর চরণাম্‌ত এনে ম্‌খে দে ; মেয়েদের মত কাঁদ্‌লে কি হবে ! ৺মার কৃপা ছাড়া আমার বাবারও শক্তি নেই ওর কিছ্‌ করে।—যা—যা—চরণাম্‌ত খাওয়ালে ভাল হবে ; যা।' একজন ছ্‌টে গিয়ে চরণাম্‌ত আর কিছ্‌ প্রসাদ এনে ম্‌খে গ্‌ঁজে দিতেই বাব্‌টী চোখ চাইলেন ; তখন সবার ধড়ে প্রাণ এল। বল্‌তে বল্‌তে দেখি নরেনের চোখে জল। তার সেই জলভরা উজ্জ্বল বড় বড় চোখ দ্‌টীর অকপট স্থির দ্‌ষ্টিতে যেন আমারও প্রাণ কেমন করে এল। আমারও চোখে জল এল ; জিজ্ঞেস করল্‌ম 'নরেন ! কি দেখ্‌ছ ?—কেমন শ্‌ন্‌ছ ?'

নরেন গম্ভীরভাবে বল্‌লে, 'ধিক্‌ আপনাকে ! আপনি এত দেখেও অন্ধ বিশ্বাসীর মত কাজ করছেন ? আমার যদি কখনও এমন দিন হয়, আমি যদি কখনও ঠিক ঠিক বিশ্বাস করবার মত ঠাক্‌রের কাছে কিছ্‌ পাই, তাহলে দেখ্‌বেন,—ফাটিয়ে দেব। দেশ মাতিয়ে তুলব ;—প্‌থিবীর চোখে এক ন্‌তন আলো ফেলব ;—নাস্তিকতা, ভেদব্‌দ্ধির আর অস্তিত্ব থাকবে না—আর কেউ বলবে না, যে আমি পেল্‌ম না ; কি আমি ব্‌ঝল্‌ম না—সমস্ত প্‌থিবী ঠাকুরের ভাবে ম্‌গ্ধ করে ফেলব। আপনারা কি করছেন ?—'দেহি পদপল্লবম্‌দারম্‌' এর য্‌গ এ নয়,—কৃষ্ণের বাঁশী আর চৈতন্যের অশ্র্‌ বিসর্জ্জনের য্‌গও এ নয়,

—শুধু লীলা খেলায় আর চলবে না ;—এখন সঙ্গে সঙ্গে চক্রকেও স্মরণ করতে হবে।—ধর্ম্মজগতে এক উন্মাদনা নিয়ে আসতে হবে ;—এক অভিনব, অলৌকিক ভাব নিয়ে আসতে হবে ; সমগ্র দেশকে পুরুষোত্তমের ভাবে আলিঙ্গন করতে হবে, তবেই এ দেশের মঙ্গল। তবেই এ দেশে ধর্ম্মের ধ্বজা আবার বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের যুগের মত পৎ পৎ করে উড়তে থাকবে। তখন শান্তির হাওয়া দেশে বইবে ; সাধকের প্রাণের জ্বালা মিটবে।'

আমি হাঁ করে নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে এই সব কথা শুনছি এমন সময় ঠাকুর পিছন থেকে এসে বললেন, 'কে ?—নরেন আর কবিরাজ ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি সব বলছ ?—নরেন !'

নরেন একবার ঠাকুরের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। তার ভাব যেন তখনও বুকের ভিতর গজ গজ করছে। আমি তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে প্রণাম করে ঘরে গিয়ে বসলুম। ঠাকুর নরেনের হাত ধরে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বললেন। নরেন নিঃশব্দে বসে পড়ল। আমি ভাবলাম—কি আশ্চর্য্য ! একবার একটা প্রণামও করলে না ! ঠাকুর না হয় তোমার কাছে সিদ্ধ পুরুষ বা অবতার না হতে পারেন ; ব্রাহ্মণ ত ? আর তুমি ত কায়স্থ ? —এমন সময় ঠাকুর অন্তর্য্যামীর মত বল্লেন, 'কবিরাজ মহাশয় ! মনে করো না যে নরেন আমায় ভক্তি করে না। নরেন খুব ভাল ছেলে, আমায় খুব ভক্তি করে ; না হলে এরাত্রে এখানে আসবে কেন ?' আমি বললাম, 'তা একদিন না একদিন ভক্তি করবে বই কি। কামারের হাতের দা কতক্ষণ ভোঁতা থাকবে ?' ঠাকুর বললেন, 'তা নয় ; আচ্ছা নরেন বাবু ! তুমি আমায় একটু তামাকের ব্যবস্থা করে দাও দেখি।' নরেন কথা শুনে চারিদিকে চেয়ে বললে, 'কল্কে কোথায় ?' ঠাকুর হেসে বললেন, 'তোমার পকেটে ; হাত দাও ; পাবে'খন।' আর যায় কোথা ? নরেন ছুটে গিয়ে ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ; আর বলতে লাগল, ঠাকুর ! আমায় দয়া কর ; আমায় কৃপা করে তোমার প্রতি বিশ্বাস আনিয়ে দাও, আর দুঃখ দিও না ঠাকুর ! সব ঘর ঘুরে তোমার দোরে এসে দাঁড়িয়েছি। শান্তি পাব বলে বড়ই আশা করে তোমার কাছে এসেছি। আর ভুলিয়ে সন্দেশ হাতে দিয়ে তাড়িয়ে দিও না ; এবার কৃপা কর। প্রকৃত জিনিষ দাও ; আমাকে আমায় চিনিয়ে দাও।' ঠাকুর বারবার আমার মুখের পানে চাইতে লাগলেন ; আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলুম।'

এইরূপ গল্প শুনিতে শুনিতে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে চলিয়াছি। কিন্তু আজ বড় মন্থর গতি ; পা আর চলে না। কবিরাজ মহাশয় আবার বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া যান। এদিকে রাত্রিও কম হয় নাই ; নয়টা বাজে। এমন সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী কলিকাতার দিকে চলিয়াছে দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গাড়ীর পিছনে গিয়া

বসিলাম। এইরূপে বিনা খরচে যাইতে যাইতে নিজের তারিফ করিতে লাগিলাম। ভাড়াও লাগিল না; হাঁটিতেও হইল না। নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে একেবারে গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া নামিলাম। তারপরে রাজপথে সুমন্দ সমীরে গা ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাসা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাসায় পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিল।

## ২৯

একদিন শচীনদের বাটী আসিয়াছি। মা আমায় দেখিয়া ব্যথাভরা স্বরে বলিলেন, 'ঠাকুর! চরকার যে খুবই অসুখ।'

চরকা শচীনের ছোট ভাই। আমি মার ভাব ও ভাষায় কারুণ্য লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, 'মা! চরকার এমন কি অসুখ যে আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন?'

'ঠাকুর! খুব শক্ত অসুখ; রক্তবাহ্যের সঙ্গে মাংস পুঁজ পর্য্যন্ত বেরুচ্ছে। সকালে চারু (ডাক্তার) এসেছিল; তার পর্য্যন্ত দেখে ভয় হয়ে গেছে। কি হবে ঠাকুর! কিছু উপায় আছে কি?'

আমি তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বড় ভয় হইল। ভাবিলাম তাই ত! এ আবার ৺মায়ের কি খেলা! যদি চরকার কিছু হয়, তাহা হইলে ত লোকে বলিবে, রাক্ষসী মাকে বাড়ী আনিয়া ছেলেটী গেল। আমাদের এমনই স্বভাব, ভাল যদি কিছু হইল ত নিজের বুদ্ধি এবং সৌভাগ্যের ফল; আর মন্দ হলেই ঐ বেটী সর্ব্বনাশীর কাজ। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কায়মনোবাক্যে ৺মাকে জানাইলাম, মা! এদের বিপদ হলে তোমারও বিপদ জেনো; তোমার পবিত্র নামে কলঙ্ক হবে। আর কেউ তোমার ফটো রাখ্‌বে না; আর কেউ তোমার পূজো করবে না।'

মা নীচে চলিয়া গেলে আমি চরকাকে উদ্দেশ্যে ৺মায়ের স্তব শুনাইতে লাগিলাম। চরকা একবার চোখ মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া অতি কষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আবার চোখ বুজিল। আমি আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রত্যাগমন করিলাম।

রাত্রিতে ঘুমাইয়া আছি এমন সময় জীর্ণবসন পরিহিতা আলুলায়িতকেশা এক বৃদ্ধা রমণী আসিয়া আমায় বলিল, 'আমায় যেমন করে রেখেছে, আমি তার উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি; আমায় পূজো কর্‌বে বলে নিয়ে—অনাদর!—যেখানে সেখানে ফেলে রাখা!—এর ফল যাবে কোথা?' এই বলিয়া বৃদ্ধা রমণী ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

আমি জাগিয়া দেখি তখন ৪টা বাজিয়াছে। স্বপ্নটা অমূলক নয় ভাবিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম; রাত্রি প্রভাত হইলে শচীনের বাড়ী আসিয়া মাকে

সকল কথা জানাইলাম। মা বলিলেন, 'ঠাকুর! আমি ত সজ্ঞানে ৺মাকে অযত্ন করি না তবে দুখানি ফটো আমি নিয়েছিলাম ; একখানি যতী বাঁধিয়ে রেখেছে ; আর একখানি কোথায় গেল খুঁজে পাই নি।'

আমি বলিলাম, 'বোধ হয় সেই ফটোখানি কোথাও অযত্নে পড়ে আছে।'

সকলে ফটো খুঁজিতে লাগিল। দুএকদিন পরে দেখা গেল চরকা যে ঘরে শুইয়া আছে, তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব বারান্দায় কতকগুলি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলীর নীচে একখানি ফটো পড়িয়া আছে। ফটোখানির চারিদিকে উই ধরিয়া কিছু কিছু নষ্ট করিয়াছে। মা ফটোখানি সযত্নে তুলিয়া আঁচলে মুছিতে আমার নিকট লইয়া আসিলেন। আমি বলিলাম, 'শিগ্‌গির বাঁধিয়ে রাখুন ; আর ধূপ ধূনা দিয়ে ৺মাকে পূজা করুন।'

ভক্তিমতী মা তাই করিলেন। আর ধীরে ধীরে চরকাও ভাল হইয়া উঠিল। আজ পর্য্যন্ত সেই উই খাওয়া ছবি মার পূজার ঘরে পূজা পাইতেছে।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে আমি একদিন শচীনদের বাড়ীতে বসিয়া পঞ্চানন ঘোষ লেন নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আদর্শ গৃহস্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। তারকবাবু শচীনের ভগ্নীপতি। অতি সরল প্রকৃতি, সদাহাস্যবদন, সদাশয় ব্যক্তি ; প্রায়ই তিনি আমার সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনা করিতেন।

সেদিন আমরা কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় বাটীর ভিতর হইতে মা আমায় ডাকাইলেন। মার মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার বড়ই আশ্চর্য্যবোধ হইল। মা বলিলেন, 'ঠাকুর! তারক ত দেখছি নির্বিকারচিত্তে তোমার সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনা করছে। ওর বাড়ীর খবর তোমায় কিছু বলেছে কি? মানির যে ভয়ানক অসুখ ; তার ওপর ৭ মাস পোয়াতি। রমেশ ডাক্তার, প্রাণধন ডাক্তার, আরও দুএকজন বড় বড় ডাক্তার তাকে দেখ্‌ছে। সবাই নাকি বল্‌ছে, ওকে বাঁচাতে হলে অস্ত্র করে ছেলে বার কর্‌তে হবে ; নয় ত পো পোয়াতি দুই যাবে।'

বলিতে বলিতে মার চোখে এক বিন্দু জল আসিল। মা অলক্ষ্যে তাহা মুছিয়া লইয়া পুনরায় বলিলেন, 'ঠাকুর! যা হয় একটা উপায় কর ; মানিকে বাঁচাও। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে মানি এ যাত্রায় রক্ষা পায় ; না হলে—'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'কই মা? দিদির এমন অসুখ আমাকে ত একথা আগে কেউ জানান নি? তারকবাবুও ত বেশ লোক দেখ্‌ছি? আচ্ছা, দেখা যাক ৺মায়ের কি ইচ্ছা।—অস্ত্র কর্‌তে হবে কেন?—না, না, সে কি কথা! তারকবাবু ভক্ত লোক ; দিদিও ভক্তিমতী। তাদের কি ৺মা এমন বিপদে ফেল্‌বেন?'

এই বলিয়া তারকবাবুর কাছে আমি ফিরিয়া গেলাম এবং তাঁহার নির্ব্বিকার

প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া বলিলাম, 'জামাই বাবু! আপনি ত বেশ লোক দেখ্‌ছি? সব বিষয়ে কি নিশ্চিন্ত অবস্থা ভাল?

তারকবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনাকে আর বিশেষ করে কি বল্‌ব? আপনি ত সবই বুঝতে পার্‌ছেন। মা বুঝি সেই জন্যই আপনাকে ডাক্‌ছিলেন?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ, দেখুন তারকবাবু! যে যাই বলুক, অস্ত্র করাবেন না; ৺মা নিশ্চয়ই আপনাদের মঙ্গল কর্‌বেন। চরকার কি অবস্থা হয়েছিল বলুন দেখি! কে তাকে রক্ষা কর্‌লে? ৺মা নয় কি? আপনি আজই ৺মার একখানা মূর্ত্তি নিয়ে গিয়ে রাখুন, আর নিয়মিত স্তব পাঠ করুন; নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে।'

তারকবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'সব ঠিক হয়ে গেছে; কালই অপারেশন হবে; এমন অবস্থায়—'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'না না, জামাইবাবু! অমন কাজও কর্‌বেন না; কিছুতেই অপারেশন কর্‌তে দেবেন না।'

'আচ্ছা দেখা যাক।' বলিয়া সেদিনকার মত তারকবাবু চলিয়া গেলে মা বলিলেন, 'ঠাকুর! তুমি একবার যাও না; মানিকে দেখে এস না।'

আমি বলিলাম, 'আজ নয়, কাল যাব; আজ দেখি ৺মা কিছু বলেন কি না!'

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, ৺মা আসিয়া যেন বলিতেছেন, 'ভয় কি? তোমার দিদি ত ভাল হয়ে গেছে।' এদিকে রাত্রি প্রভাত হইতেই তারকবাবুদের ঝি আসিয়া খবর দিল, বৌমা ঠাকুরকে ডেকে পাঠিয়েছেন; কাল রাত্রে কি স্বপ্ন দেখেছেন তাঁকে বল্‌বেন।'

আমি তারকবাবুদের বাড়ী গেলাম; আত্মীয়স্বজন পরিবৃতা দিদিকে দেখিলাম। রোগে কঙ্কালসার দেহ; তাহার উপর সন্তান সম্ভাবনায় বর্দ্ধিতায়তন জঠরভারে তাঁহার কি শোচনীয় অবস্থাই হইয়াছে! আমি দিদির মুখে স্বপ্ন কথা শুনিলাম। দিদি বলিলেন, 'ঠাকুর! স্বপ্ন দেখ্‌লাম আপনি আমায় ৺মায়ের প্রসাদ খেতে দিচ্ছেন; তারপর আমি আপনাকে ফলাহার করাচ্ছি।'

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া ৺কালীঘাট হইতে ৺মায়ের প্রসাদ আনিয়া দিদিকে খাইতে দিলাম এবং চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহারে উদর পূর্ণ করিয়া দিদিকে বলিয়া আসিলাম, 'আর ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন; কিন্তু আদ্যাস্তবটী প্রত্যহ একবার করে পাঠ কর্‌তে ভুল্‌বেন না।'

৺মায়ের ইচ্ছায় দিদি ক্রমে রোগমুক্ত হইলেন এবং দুই মাস পরে নির্ব্বিঘ্নে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এইরূপ ছোট খাট ঘটনা যে কত ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নেই। ৺মা আমার স্বপ্নাদেশ উপলক্ষ্য করিয়া বহু জীবের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

৩০

যতীনবাবু স্বপ্নাদেশের উপর বিশ্বাস করিয়া নিজে মন্দিরের আকারে কার্ড বোর্ড কাটাইয়া ৺মায়ের ফটো বাঁধাইয়াছিলেন। নিজের ঘরে ফটো রাখিয়া তাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে বরাবর পূজা করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিমলমা এক একদিন ফটোখানিকে এক এক রকমে সাজাইতেন। আমি সে সময় তাঁহাদের বাড়ীতে সিঁড়ির ধারে দোতালার ঘরে থাকিতাম। একদিন যতীনবাবু আমায় বলিলেন, 'অন্নদাবাবু! ৺মাকে ত রাখ্‌লুম; আর নিত্য দুজনে দুজনে পূজাও কর্‌ছি। কিন্তু কই? শ্রীমা যে আছেন তার ত কোন প্রমাণ পাচ্ছি না'! কবে পাব অন্নদাবাবু? বল্‌তে পারেন কি?'

আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিয়া উঠিলাম, 'সে কি যতীনবাবু! মা আছেন কিনা তার আবার কি প্রমাণ পেতে চান? ৺মা যখন কৃপা করে আপনাকে আদেশ করেছেন তখন অবশ্য তিনি সেখানে আছেন। আপনি বিশ্বাস করে ৺মাকে পূজা করে যান; ৺মার যেদিন ইচ্ছা হবে সেই দিনই আপনি তাঁর দর্শন পাবেন। আর দর্শনের জন্য অত ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? স্বপ্নে একবার দর্শন পেয়েছেন ত? আপনি ত খুবই ভাগ্যবান।

যতীনবাবু বলিলেন, 'আমি জাগ্রতে একবার দেখ্‌তে চাই, ৺মা সেখানে আছেন; তাহলেই আমায় দৃঢ় বিশ্বাস হবে।'

ইহার প্রায় দিন দুই তিন পরে একদিন মধ্য রাত্রে যতীনবাবু তাড়াতাড়ি আমার ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'অন্নদাবাবু! শিগ্‌গির আসুন; দেখে যান ৺মা কেমন হাসছেন। আমিও কথা শুনিয়া ক্ষিপ্রপদে যতীনবাবুর কক্ষাভিমুখে দৌড়াইলাম।

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি আমার ধর্ম্মপ্রাণা বিমলমা করযোড়ে ৺মায়ের মূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাব নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতেছে এবং ওষ্ঠাধর ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমি যেমন মূর্ত্তি তেমনি দেখিয়া যতীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করায়, যতীনবাবু বলিলেন, 'তাই ত অন্নদাবাবু! আপনি দেখ্‌তে পেলেন না? আহা! আমরা দুজনেই দেখেছি। কি সুন্দর মুখ! কি সুবিমল হাসি! কি আনন্দ দর্শন!'

আমাদের আলাপ শুনিয়া বিমলমা সংযত হইতে লাগিলেন। আমিও ঘরের বাহিরে আসিলাম। ভাবিলাম, যতীনবাবু বড় বিশ্বাসী ভক্ত; তাই ৺মা এরূপ দর্শন দিয়াছেন। সত্যই যতীনবাবু এক আদর্শ পুরুষ; একথা বলিলে তাঁহার অযথা প্রশংসা হয় না। এমন কোমল অকপট ভাব, এমন সরল সুন্দর প্রকৃতি, এমন সদাহাস্য বদন, আমি আর এ জীবনে কাহারও দেখি নাই। উপরে দেখিতে যেমন, ভিতরেও ঠিক তেমনি। আবার ধর্ম্মমতি বিমলমা তাঁহার

সহধর্ম্মিণী; এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ বড় একটা দেখা যায় না; এখানে বিমলমার সম্বন্ধে আর একটী ঘটনা বিবৃত করিয়া আমি আমার বক্তব্য অনুসরণ করিব।

লক্ষ্মীমণি যতীনবাবুর দ্বিতীয়া কন্যা। বয়স দুই বৎসর; দেখিতে সুন্দর; আধ আধ দুএকটী কথা ফুটিয়াছে; বাড়ীর সকলে তাহাকে ভালবাসে। তখন শচীনের ছোট ভাই হারুকু টাইফয়েড জ্বরে বিশেষ ভুগিতেছে। যতীনবাবু কয়লার খনির ম্যানেজারি শিখিতে ঝরিয়ায় গিয়াছেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন লক্ষ্মীমণির জ্বর হইল; জ্বর অতি প্রবলবেগে আসিয়াছিল। তখন শচীন মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। দুইদিন পরে শচীন আমায় জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই! মেয়েটী বাঁচবে কি না বলতে পার?'

সেই রাত্রে কে যেন আমায় স্বপ্নে আসিয়া বলিতেছে—লক্ষ্মীমণি শাপভ্রষ্টা মেয়ে; তাকে রক্ষা করা অসম্ভব। আমি শচীনকে বলিলাম, 'রক্ষা পাওয়া সন্দেহ।'

সেইদিন রাত্রে অবস্থা খারাপ বোধ হওয়ায় শচীনকে বলিয়াছিলাম, 'আজ বিমলমাকে একাকী রেখো না; তোমার ঘরে রেখো।' তদনুযায়ী শচীন খাটে শুইল; এবং মেঝেয় সরলা, বিমলমা ও লক্ষ্মীমণি থাকিল। রাত্রি প্রভাত হইতেই শচীন আসিয়া আমায় বলিল, 'ভাই! এসে দেখ ত মেয়েটী অমন করে রয়েছে কেন?'

আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বিমলমা মেয়েটীর পার্শ্বে শুইয়া স্থির-দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আমি চোখের ভাব দেখিয়া সন্দেহ করিলাম; এবং নাড়ী টিপিয়াই মেয়েটিকে কোলে লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বিমলমা সঙ্গে সঙ্গে আসিতে আসিতে বলিতে লাগিলেন, 'ঠাকুর! লক্ষ্মীমণিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ওকি? বাইরে এনে শোয়াবার ব্যবস্থা করছ কেন?'

'এখন বাইরেই থাকবে; আপনি স্থির হোন।' বলিয়া আমি শচীনকে ইঙ্গিতে বাবাকে ডাকিতে বলিলাম। বাবা আসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, 'হয়ে গেছে?'

আমি বলিলাম, আপনি একবার দেখুন না; আমার ত তাই মনে হচ্ছে।'

বাবা অনেক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'পেটটা গরম আছে; ঠিক বুঝতে পারছি না; শচীন! রমেশ ডাক্তারকে শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়।'

শচীন রমেশ ডাক্তারকে লইয়া আসিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'হয়ে গেছে।' বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বিদায় করিতে চলিয়া গেলেন। মা আসিয়া রোদন আরম্ভ করাতে বলিলাম, 'মা! কাঁদতে হয় নীচে যান; হারুকু শুনলে তাকেও বাঁচান দায় হবে।'

মা নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেলেন। বিমলমা তখন নীচে ছিলেন; আসিয়া বলিলেন, 'মা কাঁদছেন কেন ঠাকুর ?'

আমি বলিলাম, 'বিমলমা ? স্থির হোন; মনে করুন আজ লক্ষ্মীমণির বিবাহ। লক্ষ্মীমণিকে সাজিয়ে গুছিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে; বৃথা কান্নায় কোন ফল নেই।'

ধন্য মায়ের প্রাণ! সহজে কি বিশ্বাস করিতে চায়, যে সন্তান তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে? বিমলমা শচীনের মুখের দিকে তাকাইল। শচীন চোখ মুছিয়া মুখ ফিরাইলে বিমলমা অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে আমায় বলিলেন, 'ঠাকুর! বুঝেছি; আমার লক্ষ্মীমণি আর নেই। আমার বুক খালি করে চলে গেছে।' বলিতে বলিতে চক্ষু মুছিলেন; দুএক মিনিট আর চোখ চাহিলেন না। শচীন যখন বলিল, 'ঠাকুর! আর দেরী করে ফল কি? আমি সত্যকে ডাকি; কেমন?' তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু বলিলেন, 'ঠাকুরপো? একটু সবুর কর; আমি ওর পোষাক ওকে পরিয়ে দিই।' এই বলিয়া চরকাকে সম্বোধন করিয়া তাহার হাতে চাবি দিয়া বলিলেন, ট্রাঙ্ক খুলে লক্ষ্মীমণির কাপড় জামা চুড়ি সব বের করে দাও।

কে যে লক্ষ্মীমণির সাজসজ্জা বাহির করিয়া দিল আমার মনে নাই। বিমলমা চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে জামা কাপড় সব পরাইয়া, অতি সংযত হস্তে কপালে টিপটী পর্য্যন্ত দিয়া লক্ষ্মীমণিকে একবার বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। তারপর কপালে ও ওষ্ঠে বার বার চুম্বন করিয়া শচীনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, 'ঠাকুরপো! কে নিয়ে যাবে?'

কথা শুনিয়া এবং বিমলমার ভাব দেখিয়া আমাদের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; চোখে জল আসিল। সত্যকিঙ্কর ত এই অবস্থা দেখিয়া কেবল চক্ষু মুছিতে লাগিল। শচীন বিমলমার নিকট হইতে লক্ষ্মীমণিকে লইয়া সত্যের হাতে দিল। এইরূপে লক্ষ্মীমণি তাহার স্নেহময়ী জননীর কোল হইতে চির-বিদায় লইয়া এ জীবনের মত সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিল।

তারপর যথাসময়ে আমরা শ্মশান হইতে ফিরিয়া দেখিলাম বিমলমা সাশ্রুনয়নে গৃহকর্ম্ম করিতেছেন; মা-কিন্তু তখনও কাঁদিতেছেন। বিমলমা আমাদের দেখিয়া কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলে সরলা বলিল, 'দিদি চেঁচিয়ে কাঁদেন নি; চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে; তবু সংসারের কাজ করছেন। এখন আপনাদের জল খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন।' আমরা সকলে বিমলমার ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই দিনই আবার বিমলমাকে হারকুর পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত দেখিয়াছিলাম। এইরূপ স্ত্রীকেই সহধর্ম্মিণী এবং আদর্শ গৃহিণী বলা হইয়া থাকে।

## ৩১

হারুকুর রোগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল মহাশয় চিকিৎসা করিতেছেন; কিন্তু কিছুই উপকার হইতেছে না। একদিন খুবই বাড়াবাড়ি হইল; পেট ফাঁপিয়া শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। দেড় মাসের উপর হইয়া গেল, জ্বর আদৌ ছাড়ে নাই; তাহার উপর সেদিন জ্বরের প্রকোপ আরও বেশী। আমি ও শচীন দুই তিন বার কাঞ্জিলাল মহাশয়কে ডাকিতে গেলাম; একবারও দেখা পাইলাম না। যতবার যাই একটু পরে একজন আসিয়া খবর দেন, তিনি বাড়ি নাই। রাত্রি দশটার পর আর একবার গিয়া খবর পাইলাম তাঁহার অসুখ; তিনি সেদিন নীচে নামিবেন না। আমাদের, বিশেষ আমার, সন্দেহ হইল। বাড়ী ফিরিয়া বাবাকে বলায় বাবা বলিলেন, 'এ রাত্রে আর কাকে ডাকব।' ভগবান যা করেন হবে; কাল অন্য বন্দোবস্ত করব।'

রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়াছে। আমি বিশ্রামার্থ শয্যায় আসিয়া বসিয়াছি এমন সময় দরজা খুলিয়া বিমলমা বিষণ্ণ বদনে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'ঠাকুর! আপনাকে আজ কষ্ট করতে হবে; সমস্ত রাত্রি বসে ৺মাকে ডাকতে হবে; ঠাকুরপোকে বাঁচাতে হবে। আমার মনে হচ্ছে ঠাকুরপোও বোধ হয় আমাদের ছেড়ে চলল। শুধু তা নয়; ও ঘরে সবাই বলাবলি করছেন,—এই আদ্যামা হতেই এ বাড়ীতে একটার পর একটা অশান্তি আসছে। আমার বিশ্বাস ঠাকুরপোর যদি কিছু ভাল মন্দ হয়, তাহলে আর এ বাড়ীতে ৺মায়ের পুজা হবে না; আর আপনার উপরও সবাই চটে যাবেন।'

কথা শুনিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম; এবং বিমলমাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, 'বিমলমা! যা হবার হবে; তার জন্য আপনি কিছু ভাববেন না।'

'না ঠাকুর! আপনি ইচ্ছা করলে, আপনি একটু কষ্ট করে ৺মাকে জানালে, নিশ্চয়ই ঠাকুরপো বাঁচবেন; এই আমার ধারণা।'

'আচ্ছা তাই হবে; আপনি যান; একটু বিশ্রাম করুন গে।'

বিমলমা ভক্তিনম্রশিরে আমায় নমস্কার করিয়া বাহিরে গিয়া অতি সন্তর্পণে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন; আমি দুয়ারে খিল দিয়া আসিলাম।

৺মায়ের একখানি ফটো আমার কাছে থাকিত। তখন ফটোখানি আমার বিছানার শিয়রে টাঙ্গান ছিল। আমি একবার ৺মায়ের পানে চাহিয়া বলিলাম, 'মা! তুই কি বিমলমার মধ্য দিয়ে আমায় এ সব কথা শুনিয়ে গেলি? বিমলমা ত কখনও এই রকম গোপনে আমার সঙ্গে কথা কয় নি! কার শক্তিতে বিমলমার বুকে সাহস হল? কে এ সাহস দিলে? নিশ্চয় তুই। নিশ্চয় এ তোর সঙ্কেত। তবে তাই হোক।'

এই বলিয়া আমি বিছানা তুলিয়া মায়ের সম্মুখে স্থির আসনে বসিলাম। জানি না কিভাবে ছিলাম এবং কতক্ষণ বসিয়াছিলাম; তবে কিয়ৎক্ষণ পরে যে আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া আমি যেন দরজা খুলিলাম। দরজা খুলিয়া দেখি, একখানি চাদর গায়ে দিয়া 'ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতেছেন; আমি তখন তাঁহাকে কবিরাজ মনে করিলাম। তিনি যখন আমার সম্মুখে আসিলেন, আমি নমস্কার করিয়া বলিলাম, 'ঠাকুর! তোমার কি মনে হয়? হারুকু কি বাঁচ্‌বে না ?'

ঠাকুর বলিলেন, 'আমায় নিয়ে চল; আমি হারুকুকে দেখ্‌ব।'

আমি ঠাকুরকে লইয়া হারুকুর কাছে গেলাম। ঠাকুর হারুকুর বুকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া আমার মুখের পানে চাহিলেন। আমি বুঝিলাম গোপনে আমায় কিছু বলিবেন। ঠাকুরকে লইয়া আমি পুনরায় আমার ঘরে আসিলাম। ঠাকুর আমার বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং ৺মায়ের মুর্ত্তির দিকে বার বার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।' আমি বলিলাম, 'ঠাকুর! হারুকু কি বাঁচ্‌বে না ?'

'আমি ওষুধ দিলে নিশ্চয় বাঁচ্‌বে, তবে আমার ওষুধের দাম বেশী; দিতে পার্‌বে কি ?'

'কত টাকা বলুন।'

'টাকা নয়; আমি টাকা ছুঁই না। একটী অমূল্য বস্তু—দিতে পার্‌বে কি ?'

'আমায় বল্‌ছেন কেন? আমি যে ভিখারী; আমার আবার অমূল্য বস্তু কি আছে ?'

'আছে; ঐ যে টাঙ্গান রয়েছে। এই বলিয়া অঙ্গুলি সংকেতে ৺মায়ের ফটোখানি দেখাইয়া উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলেন।

আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ঐ ৺মায়ের মুর্ত্তিখানিই যে এখন আমার ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণ। ঐ মুর্ত্তিখানি লইয়াই যে আমি সকল জ্বালা ভুলিয়া আছি; সকল যন্ত্রণার মধ্য দিয়া সকল অভাব অশান্তিকে পদদলিত করিয়া বীরের মত অগ্রসর হইতেছি। ঐ মুর্ত্তিখানিই যে আমার সাত রাজার ধন অন্ধের নয়ন; আমার যথাসর্ব্বস্ব। ঠাকুর বলিলেন, 'কি ভাব্‌ছ? বল; দেবে? তাহলে ওষুধ পাবে; তোমাদের হারুকু বাঁচবে।'

'ঠাকুর! হারুকু বাঁচবে না হয় বুঝলুম। কিন্তু আমার বাঁচবার ওষুধ কি? আমি কি নিয়ে থাক্‌ব? কাকে মালাচন্দন পরাব? কে আমায় বুকে নিয়ে আদর কর্‌বে; ঘুম পাড়াবে? কে আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হবে?—দিনরাত আমার সুখ দুঃখের কথা শুন্‌বে? বলিতে বলিতে আমার

চোখে জল আসিল দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'ওকি ? তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ? আর একখানা ৺মায়ের মূর্ত্তি না হয় বাঁধিয়ে রাখ্‌বে ; তাতে আর হয়েছে কি ? এর জন্যে আবার কান্না ?'

'তোমাকেই আমি একখানা কেন—পাঁচখানা বাঁধিয়ে দিচ্ছি। তুমি তাই নাওনা কেন ? আমার এই ফটোখানির ওপরই বা তোমার এত লক্ষ্য কেন ? এক একটি করে ত সব নিয়েছ। শেষে এই ফটোখানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এও তোমার প্রাণে সইছে না ? এখানিও নেবে ?'

'হাঁ, নেব ; সামান্য একখানি ফটোতে তোমার এত মায়া কেন ?'

'ঠাকুর ! এই না তুমি বল্‌লে—একটি অমূল্য বস্তু দিতে পার্‌বে কি ? —আবার বল্‌ছ সামান্য ফটো ?'

'হাঁ, আগে বলেছিলাম তোমার ভাব দিয়ে ; আর এখন বল্‌ছি আমার ভাবে।'

'তোমার কাছে সামান্য হতে পারে ; আমার কাছে অসাধারণ।'

'তোমার কাছে অসাধারণ বলেই ত অমূল্য সঞ্জীবনী সুধার মূল্য স্বরূপ ওখানি তোমার কাছে চাচ্ছি। তুমি আর একখানি মূর্ত্তি বাঁধিয়ে নিও ; তাহলেই ত হল।'

'তা আমার আর মূর্ত্তির দরকার নেই—এই তোমায় দিচ্ছি আমাকে ওষুধ দাও।' বলিয়া যেই ফটোখানি স্পর্শ করিলাম অমনি আমার চৈতন্য হইল ; আবার আমি জীবভাব পাইলাম। একি ! ঠাকুর কোথায় ? চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম ; কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অনুভব করিলাম মুক্ত দরজা দিয়া মৃদু মন্দ প্রভাত বায়ু ঘরে আসিয়া আমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর যেন আমায় বলিতেছে, 'অরুণোদয়ের আর অধিক বিলম্ব নাই ; তুমি শীঘ্র দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে রওনা হও।'

আমি ৺মায়ের মূর্ত্তিখানি চাদরে ঢাকিয়া লইয়া নীচে আসিলাম। বাহিরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দেখি, বাড়ীর চাকর 'বিদেশী' মাত্র দুয়ার খুলিয়া রাস্তায় নামিল। আমি বিদেশীকে বলিলাম, 'দেখ্‌ বিদেশী, মাকে বলিস্‌ আমি এবেলা আস্‌ব না ; কখন আস্‌ব কিছু ঠিক নেই। আমার জন্য কেউ যেন কিছু চিন্তা না করে।' বলিয়াই রুদ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে আহিরীটোলা ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম।

## ৩২

ষ্টীমার ঘাটে ত আসিলাম ; কিন্তু টিকিটের পয়সা কোথায় ? টিকিটের কথা মনে হইতেই ত আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এখন উপায় কি ? অনেকক্ষণ

ভাবিয়াও যখন কোন উপায় করিতে পারিলাম না, তখন 'মা! মা! মাগো! —কি হবে মা?' বলিয়া দুই তিনবার চীৎকার করিয়া উঠিলাম। অবশ্য ভক্তিতে নয়; জ্বালায় যন্ত্রণায়, মর্ম্মন্তুদ প্রাণের বেদনায়। এমন সময় ঘাটের দক্ষিণ দিকে উপবিষ্ট তিন চারটী বাবুর উপর দৃষ্টি পড়িল। আমি ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলাম ভাবিলাম, যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ পরিচিত থাকে, তাহা হইলে হয় ত উপায় হইতে পারে। তাঁহাদের নিকট গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা যে এ অবস্থায় শুনিতে পাইব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তাঁহারা আমার এই আদ্যামূর্ত্তি প্রাপ্তির ঘটনাই আলোচনা করিতেছেন। একজন বলিতেছেন, 'আমি হিতবাদী পত্রিকায় সেই মূর্ত্তি দেখেছি; আর প্রাপ্তির বিবরণও পড়েছি। চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে সে ঘটনা প্রচার করে অন্যায় করেছেন, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না।'

আর একজন বলিতেছেন, 'বঙ্গবাসীতে বিহারী সরকার মহাশয় কিন্তু প্রচার করা অন্যায় হয়েছে বলেই প্রকাশ করেছেন। আমি নিজে বঙ্গবাসীর সে লেখা পড়েছি।'

'তা তুমি পড়তে পার; বা বঙ্গবাসীর সম্পাদকও লিখতে পারেন; কিন্তু প্রচার করা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে আমার মনে হয়।'

বাকী দু একজন প্রচার করার পক্ষ সমর্থন করায় দ্বিতীয় ব্যক্তিটী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা একপক্ষে ঠিক বটে; হিতবাদীর দৌলতে অনেকে সে মূর্ত্তি দর্শন করতে পেরেছে ত?'

'নিশ্চয়; মূর্ত্তিখানি দেখলে তুমিও সর্বান্তঃকরণে বলতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ঠিকই করেছে।

'আচ্ছা সেই মূর্ত্তি এখন কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়?'

'তা ভাই, আমার ঠিক মনে নেই; একশ না কত নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বোধ হয়। লোকের মুখে শুনেছি সেখানে গিয়ে সেই সাধক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করলে একখানি মূর্ত্তি দিয়ে দেয়; দাম লাগে না। তাঁর প্রতি নাকি আদেশ আছে, যে কেউ ভক্তি করে চাইবে তাকেই যেন মূর্ত্তি দেওয়া হয়। বেশ মূর্ত্তিখানি ভাই! অনেক দিনের পুরাতন নিখুঁৎ প্রতিমূর্ত্তি।'

অপর ব্যক্তি সেই মূর্ত্তি দেখিতে পান নাই বলিয়া যখন আপশোষ করিতেছিলেন, তখন আমি আপন হইতে বলিলাম, 'আপনি সেই মূর্ত্তি দেখতে চান ত আমি দেখাতে পারি; আমার কাছে আছে।'

আমার কথা শুনিয়া সকলেই ৺মায়ের মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আমি চাদরের ভিতর হইতে ফটোখানি খুলিয়া তাঁহাদের হাতে দিলাম। তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অনিমেষ নয়নে ৺মায়ের মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর আমি কোথায় যাইব, এই মূর্ত্তি আমি কোথায় পাইলাম,

ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি শুধু আমাকে বাদ দিয়া সকল কথা সংক্ষেপে তাহাদিগকে বলিলাম। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর দর্শনে যাইতেছি, ইত্যাদি শুনিয়া একজন অতি বিনয়সহকারে আমায় বলিলেন, 'মহাশয়! একটী অনুরোধ রাখ্‌বেন?' আমি স্বীকার করিলে ভদ্রলোকটী আমায় চারিটী পয়সা দিয়া বলিলেন, 'এই চারিটী পয়সায় আপনি যা হয় কিছু কিনে খাবেন।' তাঁহার দেখাদেখি আর একজন চারিটী পয়সা এবং অপর একজন দুইটী পয়সা আমার হাতে দিয়া আমায় প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনি শিগ্‌গির যান; ঐ ষ্টীমার ঘাটে লাগ্‌ছে।' আমি ছুটিয়া গিয়া ছয় পয়সায় একখানি টিকিট লইয়া ষ্টীমারে উঠিতেই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

ষ্টীমার হইতে সেই ভদ্রলোকদিগের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাঁহারা আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি বারবার তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম, 'এ কার খেলা? কে আমায় এমন করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাচ্ছে? আর কেনই বা আমি যাচ্ছি? সেখানে কি ঠাকুর বসে আছেন, যে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব?—তাঁকে ৺মায়ের মূর্ত্তি দিয়ে হারুকুর জন্য ওষুধ আনব? তবে কোথায় যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি?—তাই ত! আমি কি উন্মাদ হয়েছি!'

দেখিতে দেখিতে বেলুড় মঠ দেখা দিল। অনেকে উদ্দেশ্যে ষ্টীমার হইতে প্রণাম করিল। আমি ভাবিলাম, 'তাই ত! বেলুড় গেলেও যাহোক ঠাকুরের দেখা পাই না পাই, তাঁর পবিত্র চিতাভস্ম পরিপূর্ণ পাত্রটী দেখ্‌তে পেতুম' আবার মনে হইল, 'এ আমার কি ভ্রম! ঠাকুর কি কখনও মর্‌তে পারেন? না, ঠাকুরের দেহ সম্বন্ধ নিয়ে বিচার করতে আছে? যিনি ঠাকুর তিনি ত সর্ব্বত্রই আছেন। তাই গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন,—তোদের ঠাকুরের সৎকার তোরা কর্‌গে যা; আমার ঠাকুর মরেন নি; আমায় তাঁর সৎকার কর্‌তে যেতে হবে না।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শিবতলায় আসিয়া পেঁাছিলাম।

ষ্টীমার হইতে নামিয়া আমি একেবারে কালীবাড়ী গিয়া উঠিলাম। দুটী পয়সা দিয়া দুই মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। আহা! কি মধুর পবিত্র স্থান! যিনি যেমনই হউন না কেন, একবার ঠাকুরের ঘরে গিয়া বসিলে, এ পবিত্রতার আস্বাদ তিনি পাইবেনই। ভক্তিমতী লক্ষ্মীমা তখন ঠাকুরসেবায় ব্যাপৃতা ছিলেন; উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আমি বসিয়া ভাবিতেছি এখন কি করা যায়, এমন সময় বাহিরে একজন গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

'তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া দুখ
তোমারই দেওয়া বুকে তোমারই অনুভব।' ইত্যাদি।

গানটী আমার শ্রবণে সুধা বর্ষণ করিল। প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সেই ব্যক্তির অনুসরণ করিলাম। লোকটী পঞ্চবটীতে গিয়া গান শেষ করিল এবং যেন আমাকেই উদ্দেশ্য করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল—

'আপনাকে লয়ে বিব্রত রহিতে আসি নাহি কেহ অবনীপরে।
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ৷'

লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া আর একজন বলিল, 'কিরে পাগ্‌লা, কি বকছিস্‌? তোর সাম্‌নে কে দাঁড়িয়ে—দেখেছিস্‌? পুলিশের লোক; ধরে নিয়ে যাবে।'

একথা শুনিয়া আমি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিলাম, 'ওকি মহাশয়! আপনি ওরকম কর্‌ছেন কেন? উনি পাগলই হোন আর যাই হোন, আপনার তাতে কি?'

বাস্তবিক লোকটীকে পাগল বলায় আমার বড়ই রাগ হইয়াছিল। আমার পরুষ বচন শুনিয়া ভদ্রলোকটী হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ক্ষমা কর্‌বেন মহাশয়! ওর কথা যে আপনার ভাল লাগ্‌ছে, আমি তা বুঝ্‌তে পারি নি; তাহলে আর বলতুম না।—তবে আমরা জানি ও বাস্তবিক পাগল; এখানে প্রায়ই আসে, আর যা তা বকে; যা তা গান গেয়ে যাত্রীর ভাব নষ্ট করে। তাই বল্‌ছিলাম।'

'তা আপনার পক্ষে যা তা হতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে অতি আনন্দ-দায়ক ও উপদেশপূর্ণ বলেই বোধ হল। যে গানটী ও গাইতে গাইতে এদিকে এল সেটী সাধক কবি রজনী বাবুর রচিত; আর যে কবিতাটি আওড়ালে সেটী কামিনী রায়ের লেখা।'

'তা হতে পারে; কিন্তু একদিন ঠিক এমনি সময়ে আমি নাইতে এসে দেখি, পাগলাটাকে কতকগুলি যাত্রী গলা ধাক্কা দিতে দিতে এখান থেকে ঐদিক পানে সরিয়ে দিচ্ছে।' বলিয়া ভদ্রলোক আমায় শান্তিকুটীরের পূর্ব্ব দিকে দেখাইলেন।

আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া পাগলের মুখের দিকে তাকাইতে পাগল হাসিয়া বলিল, 'বাবু! ওরা পাগল বলে আমায় ওই রকম করেছিল; আমি কোন দোষ করি নি। বাবুরা সব যুবতী মেয়েদের নিয়ে হাওয়া খেতে এসেছে। আমার দেখে ভাব হল। আমি গান ধর্‌লুম—

ওঠা নামা প্রেমের তুফানে;
তর্‌ তর্‌ তর্‌ ভাসিয়ে নে যায় কোন টানে তা কে জানে?

—একি বাবু মন্দ গান? এখানে ভদ্রলোকের ছেলেরা 'বিল্বমঙ্গল' থিয়েটার করেছিল। আমি দেখ্‌তে গিয়ে শিখে এসেছিলুম—আপনি বল—মন্দ গান কি?'

হাসিও পায়—দুঃখও ধরে। বাবুটী তো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, 'তা গান তো খুব ভাল হতে পারে; কিন্তু যে যা না বুঝবে, তার কাছে তা গাইলেই যে মুস্কিল।'

'হাঁ বাবু তুমি ঠিক বলেছ। ঘোড়াকে দানা না দিয়ে দুধ খেতে দিলে কি তার ভাল লাগে?' বলিয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, এ ভবের পাগল নয়; ভাবের পাগল।

৩৩

অল্পক্ষণের মধ্যেই পঞ্চবটী জনহীন হইল। আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পঞ্চবটী তলায় বাঁধা আসনের উপর শুইয়া পড়িলাম। একটু তন্দ্রা আসিতেই দেখি, একজন সাধু আসিয়া আমায় বলিতেছেন, ৺মায়ের ফটো নিয়ে এসেছ ঠাকুরকে দিতে? তা ঠাকুরের ঘরে দিয়ে এস না?—তাহলেই তা হল।'

এই সাধুটী সেই স্বপ্নদৃষ্ট প্রথম সাধু। আমি তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনাকে কি ঠাকুর পাঠিয়েছেন?'

'হাঁ; তিনি না পাঠালে কি আমি এখানে আসতে পারি?'

'ঠাকুর এখন কোথায় আছেন?'

'লক্ষ্মীদিদির বাড়ী; রামলালদাদার ঘরে; তুমি জান না? রামলালদাদার যে বড় অসুখ।'

আমি এবার সাধুটীকে যেন চিনিতে পারিলাম। যেন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি কোথায় টাঙানো দেখিয়াছি। যেন এই সাধুটী স্বামী যোগানন্দ হইবেন। আমি সাধুটীকে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছি দেখিয়া সাধুটী আস্তে আস্তে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চারিদিক চাহিলাম। কোথাও কেহ নেই; কেবল একজনমাত্র গুপ্ত সাধক সেই বাঁধানো অশ্বত্থবট মূলে আপন মনে বসিয়া আছেন এবং চোখের জলে ভাসিতেছেন। স্বপ্ন দেখা তখন আমার একরূপ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আমি আর কোন কথা না ভাবিয়া একেবারে রামলালদাদাকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ী অভিমুখে চলিলাম। রামলালদাদার বাটী আমি সেই প্রথম যাইতেছি। বাড়ীর দরজায় গিয়া 'রামলালদাদা! রামলালদাদা!' বলিয়া ডাকিতেই একটী স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তাঁর বড় অসুখ, আজ দুদিন খুবই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।'

আমার আর আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমি বলিলাম, 'আমি তাঁকে দেখব।'

'আসুন' বলিয়া তিনি নীচের একটি ঘরে আমায় দেখাইয়া দিলেন। ঘরের সম্মুখে গিয়াই দেখি, দরজার উপর ঠাকুর বসিয়া; অবশ্য চিত্রপটে। সেই চিত্রখানি আমি নূতন দেখিলাম। ঠাকুরের ভাব তাহাতে অবিকল পরিস্ফুট। ঘরের ভিতরে গিয়া দেখিলাম জ্বরের প্রাবল্যে রামলালদাদা ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। আমায় বোধ হয় চিনিতে পারিতেছেন না; শুধু বলিতেছেন, 'দাদা!—প্রাণ যায়; আর সহ্য হয় না; কি করি বল?' আমি মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলাম, 'চিন্তা কি দাদা? ঠাকুর আপনার কাছেই আছেন; আজই আপনার জ্বর কমে যাবে।

'বল দাদা! বল; যেন তাই হয়। ওঃ—আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না।' বলিয়া অতি কষ্টে শয্যায় শয়ন করিয়া চুপ করিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়াই মনে করিলাম, ৺মায়ের মূর্ত্তিখানি দাদাকে দেখাইলে ভাল হইত না? ভাবিয়াই আবার ঘরে ঢুকিলাম। দাদা আমাকে আবার দেখিয়া বলিলেন, 'কী মনে করে দাদা?'

আমি বলিলাম, 'এই ৺মায়ের মূর্ত্তিখানি একবার দর্শন করুন! এ ঠাকুরের আদেশে পাওয়া। আবার ঠাকুরের আদেশেই ফটোখানি নিয়ে এসেছি; তাঁর ঘরে রেখে যাব।'

'হাঁ, হাঁ, তাই কর দাদা! আহা! ঠাকুরের অপার মহিমা! বেশ; বেশ; ঠাকুরের ঘরেই ৺মাকে রেখে যাও। আমি ভাল হয়ে পরে সব শুনব।'

'ঠাকুরের ঘরে টাঙ্গালে কেউ কিছু বল্‌বে না ত?'

'না না; কে কি বল্‌বে? লক্ষ্মী বোধ হয় এখন ঠাকুরের ঘরে আছে। তাকে না পাও নকুলকে বলে রেখে যেও; নকুল যত্ন করে রাখবে।'

আমি আনন্দমনে দাদাকে নমস্কার করিয়া বাগানে চলিয়া আসিলাম। ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই। কালীমন্দিরে গিয়া বোধ হয় নকুলবাবুকে ধরিলাম। নকুলবাবু আমার সঙ্গে আসিয়া ঠাকুরের ঘরে একস্থানে ৺মাকে টাঙ্গাইয়া দিলেন। আমি মনে মনে ঠাকুরকে বলিলাম, 'ঠাকুর! তোমার আদেশ মত কাজ ত হল; এখন আমায় ওষুধ দাও; আমি পঞ্চবটীতলায় যাচ্ছি।'

ধীরে ধীরে পঞ্চবটীতলায় গিয়া বসিলাম। বেলা তখন প্রায় একটা। পিপাসা বোধ হইতে লাগিল; ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছে। এমন অবস্থায় সুনিদ্রা কিরূপে হইতে পারে? আবার সুনিদ্রা না হইলে ত ঠাকুরের দেখা পাইব না? সঙ্গে দুইটীর বেশী পয়সাও নাই। কি করিব? দুই পয়সায় কি বা খাইব? ইত্যাদি ভাবিতেছি, এমন সময় সন্ন্যাসীবেশধারী খাজাঞ্চী মহাশয় শান্তিকুটীরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইবামাত্র আমায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি এখানে প্রসাদ পেতে চান?'

আমি উত্তর করিলাম, প্রসাদ যদি পাই, কেন চাইব না ?'

'আচ্ছা আমার সঙ্গে আসুন ;' বলিয়া আমায় প্রসাদ পাইবার স্থানে লইয়া গিয়া একজন পাচককে বলিলেন, 'এই ব্রাহ্মণের ছেলেকে দুটী প্রসাদ দিতে পার ?'

উত্তর হইল, 'আজ্ঞা, তা দেখি।'

তারপর 'আসুন' বলিয়া সে ব্যক্তি আমায় ডাকিয়া লইয়া গেল।

আমি তাহার সহিত যথাস্থানে প্রসাদ পাইতে চলিলাম। খাজাঞ্চী মহাশয়ও চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে অনেকে প্রসাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছিল। আমি যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনরায় পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসিলাম এবং যথাপূর্ব্ব কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

দেখিতে দেখিতে নিদ্রা আসিল। আর হাসিতে হাসিতে প্রাণের ঠাকুর আমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরের হাতে যেন কি রহিয়াছে। চোরের যেমন বোচ্‌কার দিকেই মন, আমারও তেমনি ঠাকুরের হাতের দিকেই দৃষ্টি। আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। ঠাকুর বলিলেন, 'কি দেখ্‌ছ ? আমি কি মিথ্যাবাদী ? তুমি মাকে এনে দিলে আর আমি ওষুধ দেব না ; এই নাও ; তোমার কাপড়ের খুঁটেই বেঁধে দিচ্ছি। তুমি এখানে খুলো না ; একেবারে নিয়ে গিয়ে রাঙ্গা কাপড়ে জড়িয়ে হারুকুর গলায় বেঁধে দেবে। অসুখ ভাল হলে সোনার মাদুলী করে রাখ্‌তে বলো খুব সাবধান ! যদি কোনরূপ অশৌচ, অবিশ্বাসের আঁচ লাগে ত ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত দিনে ভাল হবে ?'

'তা ক্রমশঃই হবে। একটী জীবন গিয়ে আর একটী নূতন জীবন আস্‌বে। সহজে কি কর্ম্মভোগ শেষ হয় ?'

'তা হলে ওর পিতা মাতার পুণ্যেই দেহটা রক্ষা হল বলুন ?'

'ওর পিতা মাতার পুণ্য ত বটেই। তা ছাড়া, শচীন ও তোমার বিমলমার প্রার্থনাও একটা প্রধান কারণ।

'আমি ত এখন মনে করুছি আপনিই প্রধান কারণ ; আর সব গৌণ কারণ।'

'তা রোগী মনে করে বৈ কি, বৈদ্যই আমায় বাঁচালে ;' বলিয়া ঠাকুর হাসিয়া ফেলিলেন। আর দু একটী কথার পর আমি ঠাকুরকে বিদায় নমস্কার জানাইলে তিনি শান্তিকুটীরে প্রবেশ করিলেন। আমি তখনও গভীর নিদ্রায় অচেতন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আমার শিয়রে বসিয়া সেই পাগল গান ধরিয়াছে—

'বেলা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন ?
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন ? ইত্যাদি।

গানটী অল্প অল্প আমার কানে যাইতেছিল। যখন শেষ হইল, আমি জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, পাগল আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে আর বলিতেছে, 'আজ যাবে,—না এইখানে থাক্‌বে ?'

আমি স্বপ্নের স্মৃতি অনুসরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাপড়ের আঁচল দেখিতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য্য! কে বিশ্বাস করিবে? কে এমন বিশ্বাসী ভক্ত আছেন যে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন না করেন? ৺তারকনাথে হত্যা দেওয়া, ঔষধ পাওয়ার কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এইভাবে, এমন অনায়াসে, দৈব ঔষধ আর কখনও কেহ পাইয়াছেন কি না জানি না। আমার মা অনেক সময় অনেক ঔষধ স্বপ্নে পাইয়াছেন, কিন্তু সকল সময় উহা বস্তুনির্দ্দেশরূপে পাইয়াছেন। এইভাবে কাপড়ে বাঁধিয়া ঔষধ পান নাই। আমার মামা শ্রীযুক্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদর্শ গৃহস্থ। তিনিও শুনিয়াছি স্বপ্নে দুই একটি ঔষধ পাইয়াছেন; আজও সেই ঔষধ লোককে দিয়া থাকেন। কিন্তু উহাও বস্তুনির্দ্দেশ। এমন কাপড়ে বাঁধিয়া দেওয়া ঔষধ নয়। যাহা হউক, আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম এবং অতি সন্তর্পণে ঔষধ বাঁধা বস্ত্রাংশ হাতের মুঠায় লইয়া রুদ্ধশ্বাসে ষ্টীমার ঘাটের দিকে ছুটিলাম।

ষ্টীমার ঘাটে পেঁছিয়াই দেখি একখানি ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহাই কলিকাতা যাইবার শেষ ষ্টীমার। একজন পারের যাত্রীর পরামর্শে ট্রেণে করিয়া হাওড়া যাইবার অভিপ্রায়ে আমি খেয়াঘাট দিয়া উত্তরপাড়ায় আসিলাম। পরে আসিয়া মনে হইল, সকালে ৺মা যে পয়সা দেওয়াইলেন, তাহা ত ফুরাইল। আবার এখন তাঁহাকে এই তুচ্ছ পয়সার জন্য ডাকিব? না, হাঁটিয়াই যাইব। একান্ত না পারি বেলুড় মঠে রাত্রিটা কাটাইয়া যাইব। ভোরে গিয়া, হারুকে ঔষধ পরাইয়া দিব। ঔষধ যখন পাইয়াছি তখন আর চিন্তা কি?

৩৪

আমি নিরুদ্বেগে পথ চলিতে লাগিলাম। গতি বড় মন্থর নহে; ঘণ্টায় চারি মাইলেরও অধিক চলিয়াছি। বেলুড় গ্রামে যখন পেঁছিলাম, তখন আকাশে আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে, দক্ষিণে বেশ মেঘ জমিয়াছে, একটু একটু একটু ঝড়ও উঠিতেছে; আমি মনে করিলাম, ঠাকুরের বোধ হয় ইচ্ছা নয় যে, আজ বেলুড় ছাড়িয়া যাই। অন্তর্য্যামী ঠাকুর বোধ হয় আমার অন্তরের ভাব বুঝিয়াছেন। তাই আজ রাত্রির মত তাঁহার পুণ্য আশ্রমে রাখিয়া আমায় ধন্য করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ায় চোখে জল আসিল। আহা! পরের জন্য এমনি করিয়া নিজেকে

বিলাইয়া দিতে, এমন দীনদুঃখীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে, অবসাদ কলঙ্কিত এই দেশের মরা গাঙ্গে কর্ম্মের প্রবাহ বহাইতে এ যুগে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ পারেন নাই। যুগধর্ম্ম প্রচারক বঙ্গবীর বিবেকানন্দ যে মহাব্রত লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার অম্লান গৌরবে বাঙালী চির গৌরবান্বিত। সেই মহাত্মার পবিত্র স্মৃতিতে আমার প্রাণ আজ প্রেমে পরিপূর্ণ। আনন্দে আমার চোখে জল আসিতেছে। চোখ মুছিতেছি আর পথ চলিতেছি।

বেলুড় মঠে আজ রাত কাটাইব; এ কথা ভাবিতে যে আনন্দ অনুভব করিতেছি তাহা বর্ণনা করিবার নয়। দেখিতে দেখিতে মঠে আসিয়া পেঁাছিলাম। কিন্তু আমার সকল আশা ব্যর্থ হইল; আমি বিফল মনোরথ হইলাম। স্বদেশী আন্দোলন ও জার্ম্মান যুদ্ধের সেই যুগে লোকে রাষ্ট্রীয় ভাবে পরস্পর পরস্পরকে এরূপ সন্দেহের চক্ষে দেখিত যে, মঠের সন্ন্যাসীগণ পর্য্যন্ত অজানা লোককে রাত্রে আশ্রয় দিতে শংকা করিতেন। আমি সেই জন্য মঠে আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইয়া দুর্য্যোগের মধ্যেই কলিকাতার পথে চলিলাম।

দেখিতে দেখিতে ঝড় আসিল; যেন সেই মুহূর্তেই প্রলয় উপস্থিত। মুহুর্মুহু গর্জ্জন ও শিলাবৃষ্টিতে পথিকের পথ চলা দায় হইল। ঝড়ের বিরুদ্ধে আমি দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছি; অথচ পা বাড়াইবার সাধ্য নাই। পথের সম্বল সেই কম্বলখানি মুড়ি দিয়া অতিকষ্টে অগ্রসর হইতেছি। রাস্তার সেইখানে এমন স্থান নাই যে একটু আশ্রয় গ্রহণ করি। অতি কষ্টে একটী বাগান বাড়ীর ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাড়াতাড়ি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি টালির ঘরে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেইখানে আরও কয়েকজন আশ্রয় লইয়াছিল। জল ঝড় কমিলে আবার পথ চলিতে লাগিলাম। শালকিয়া বাঁধাঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখি নিরুপায়। ষ্টীমার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নৌকার মাঝিরাও আপন আপন কাজ সারিয়া রান্না খাওয়া করিতেছে। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় আমারই মত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত আর একজন ভদ্রলোক আসিয়া জুটিলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয় কি পারের যাত্রী?'

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে হাঁ, পারের যাত্রী বটে। কিন্তু পারের কর্ত্তাকে যে খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সঙ্গে পয়সা কড়ি কিছু বেশী আছে ত?'

পোড়া মুখে হাসি আসিল; আমি বলিলাম, 'বেশী ত পরের কথা; সিকি পয়সাও সঙ্গে নেই।'

'তবে যাওয়া হবে কি করে?'

'ভগবান জানেন,' বলিয়া আমি একটী মাঝিকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ও মাঝি! পারে যাবে?'

মাঝি কথাও কয় না। দোষই বা কি? পোড়া পেটের জন্য বেচারা হয় ত সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়াছে; জল, ঝড়, রৌদ্রে, দিনের কর্ম্ম শেষ করিয়া হয় ত একটু বিশ্রাম করিতেছে; আর আমি হাঁকিতেছি 'পারে যাবে?' উত্তর দেওয়া ত পরের কথা, কেহ একবার আমাদের দিকে তাকাইল না। শ্রান্ত হইলে বোধ হয় সবারই এই দশা হয়। ভাল কথাও মন্দ লাগে; অমৃতে অরুচি হয়। যাহা হউক সংগী বাবুটী অনেক ডাকাডাকির পর একজন মাঝিকে পাইলেন। মাঝি বলিল, 'বাবু! দুজনে দুটাকা দিলে পার করতে পারি। এখন গংগায় ভারি তুফান; যেতে বড় কষ্ট হবে।' বাবুটী আট আনা দিতে স্বীকার করিলেন; আর আমি আমার সেই ধতীনবাবুর দেওয়া আড়াই টাকা মূল্যের চাদরখানি দেখাইলাম। চাদরখানি কিছুদিন ব্যবহার করিয়াছিলাম; যাহা হউক মাঝি চাদরখানি খুলিয়া দেখিয়া পার করিতে রাজি হইল। আমরাও নৌকায় উঠিলাম॥

নদী পার হইয়া তীরে উঠিলাম। নৌকায় বসিয়া এবং তীরে উঠিয়া রাস্তায় যাইতে যাইতে সংগী ভদ্রলোকের সহিত সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। কথায় কথায় ভদ্রলোক বলিলেন 'সংসারের আপাতমধুর ভোগ বাসনা হতে যিনিই পৃথক থাকতে পারেন তাঁকেই সাধু বলা যেতে পারে।'

আমি বলিলাম, 'তা বটে। তবে একটী কথা; যিনি আসক্তি মুক্ত তিনিই প্রকৃত সাধু; নচেৎ 'মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।' গীতায় তাকে মিথ্যাচার বা কপটাচরণ বলে।'

'হাঁ তাও ঠিক;' বলিয়া ভদ্রলোক মৌনাবলম্বন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি বলিলাম, কলিকালে আদর্শ গৃহীকেই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। তন্ত্রমতই কলির শ্রেষ্ঠমত; তন্ত্রে আছে কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষেধ। স্বয়ং শংকরাচার্য্য শেষে তন্ত্র মতেই সাধনা করে গেছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মনীষিগণ, বৈষ্ণব হয়েও তন্ত্র মতেই সাধনা করেছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও তন্ত্র মতকে শ্রেষ্ঠ মত বলে স্বীকার করেছিলেন। তন্ত্র মতই যে কলিতে শ্রেষ্ঠ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তান্ত্রিক গুরু সাধকশ্রেষ্ঠ আগমবাগীশ, সাধক গুরু রামপ্রসাদ সেন ও সর্ব্ববিদ্যা বংশধরগণ। আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও একজন প্রধান তান্ত্রিক ছিলেন।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমরা বিডন বাগানের উত্তর পূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত আসিয়াছি, এমন সময়ে আমার মুখে উক্ত কথাগুলি শুনিয়া ভদ্রলোক থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনার কথা আমি মোটেই শুনতে চাই না। আপনি কোন রাস্তায় যাবেন যান; আমি এই দিকে চল্লুম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি হঠাৎ রেগে উঠ্‌লেন যে ?'

'দেখুন মহাশয় ! পূর্ববর্তী সাধকদের কথা আমি জানি না ; তাঁরা কি করেছেন না করেছেন তাও জানি না ; তবে চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে অনেকের মুখেই শুনেছি, তিনি রীতিমত কৌল ছিলেন।'

'সে কথা ত খুবই সত্য ; কেন না কৌল লক্ষণ মহাপ্রভুতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।'

'আপনি জানেন কৌল লক্ষণ কি ?'

'জানি বৈ কি'—

'অন্তঃ শাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবঃ পরঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে ॥'

'আচ্ছা ; সে কথা যাক ! কিন্তু রামকৃষ্ণদেব যে কখনও মদ্য মাংস নিয়ে সাধনা করেন নি, তা আমি খুব ভাল লোকের মুখেই শুনেছি।'

ভদ্রলোকটীর কথায় আমি বলিলাম, 'আপনি যে আসলে ভুল কর্‌ছেন। ওকি একটা কথা হল ? মদ্য মাংস নিয়ে সাধনা কর্‌লেই তান্ত্রিক হয় ; না হলে হয় না ? তান্ত্রিক হলেই কি গোঁড়া বামাচারী সাধক হতে হবে ? কৃষ্ণ নাম কর্‌বে না ; বা অন্যমতে উপাসনা কর্‌বে না ? তন্ত্রশাস্ত্রে কি বলেছে জানেন ? তন্ত্রে বলে—

'যথা দুর্গা তথা বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ।
এতত্রয়মেকমেব ন পৃথগ্ ভাবয়েৎ সুধীঃ ॥
যঃ পৃথগ্ ভাবয়েদেতান্ পক্ষপাতেন মূঢ়ধীঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং রৌরবং পাপপুরুষঃ ॥'

বুঝ্‌লেন মহাশয় ? 'তন্ত্রেরই মত, 'সমত্বং যোগ উচ্যতে'। আর আপনাদের ঠাকুরের মতও কি তাই ছিল না ? 'যত মত তত পথ।'—এ কার কথা ? কোন্ শাস্ত্রের কথা ? জানেন ? বিশুদ্ধ তান্ত্রিক ও তন্ত্রের কথা।'

একথা শুনিয়া ভদ্রলোক নরম হইলেন। মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে—

'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥'

—এ কোন্ শাস্ত্রের মত ?

আমি বলিলাম, 'এও তন্ত্র শাস্ত্রের মত। তবে তন্ত্রের দুটী শাখা ও বহু প্রশাখা আছে। একটী শাখা হচ্ছে দক্ষিণাচারী মতের ; আর একটী শাখা বামাচারী মতের। আপনি যদিও কটাক্ষ করে শ্লোকটী উদ্ধৃত কর্‌ছেন, তবু তার অর্থ চমৎকার। আপনি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবেন।'

'আচ্ছা, থাক মহাশয় ! আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। যদি বরাতে থাকে

আর আপনার সঙ্গে কখনও দেখা হয়, তখন শুনব ; এখন আসুন।' বলিয়া ভদ্রলোক নমস্কার করিলে আমি প্রতিনমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলাম।

যখন বাসায় পেঁাছিলাম তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা। আমাকে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইল। শচীনের অল্প জ্বর ছিল, তথাপি সে আসিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞসা করিল, 'কিছু পেয়েছ ?'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয়, কিন্তু তুমি কি করে জানলে আমি কি উদ্দেশ্যে, কোথায় গেছি ?'

শচীন বলিল,'আমার প্রাণ তা বলে দিয়েছে, তুমি যে হারুকুর জন্যই কোথাও গেছ তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।'

বিমলমা আসিয়া সাশ্রুলোচনে দরজার পাশে দাঁড়াইলেন। মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে ঠাকুর ? তোমায় না দেখতে পেয়ে আমাদের ভয় হয়েছিল। আমি মনে করেছিলুম বুঝি হারুকু বাঁচবে না জানতে পেরে তুমি আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে। আজ কি ভাগ্য যে বিকেল থেকে হারুকুর জ্বর একটু কমেছে ; আর সন্ধ্যার আগে 'ঠাকুর কোথায় গেল' বলে তোমায় খুঁজেছিল।

আমি শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম এবং মাকে বলিলাম, 'মা! আর ভয় নেই ; হারুকুর ওষুধ পেয়েছি। ঠাকুর দয়া করে দিয়েছেন ; পরে সব বলব। আগে একটু লাল সালু নিয়ে আসুন। এই কাপড়ের খুঁটে ওষুধ বাঁধা আছে ; লাল সালুতে বেঁধে হারুকুর গলায় পরিয়ে দিতে হবে।'

মা তাড়াতাড়ি সালু আনিতে গেলেন। আমি সংক্ষেপে কিছু কিছু শচীনকে বলিলাম। আমার স্বপ্নের কথা, প্রাণের কথা, শচীনকে না বলিলে আনন্দ পাই না, তাই সকল কথা শচীনকে বলি। মা সালু লইয়া আসিলে আমি সন্তর্পণে কাপড়ের আঁচল খুলিলাম। কি ঔষুধ দেখিবার জন্য সকলে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। ঔষধ বন্ধনমুক্ত হইল। আমরা সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ঔষধ অন্য কিছুই নয়। ৺মায়ের পায়ের রাঙ্গা জবাযুক্ত পবিত্র অর্ঘ্য। মা সাশ্রুলোচনে অর্ঘ্যটী সালুতে বাঁধিয়া অবিলম্বে হারুকুর গলায় পরাইয়া দিয়া আসিলেন। সকলের মুখ প্রসন্ন হইল; বাড়ীতে একটা আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

৩৫

হারুকু ক্রমশঃই আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমার জীবনের সেই সময়কার দু একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা যতদূর স্মরণ হয় এই স্থানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। ৺মাকে পাইবার পর আমার কয়েকটি নূতন বন্ধু

জুটিয়াছিল। অবশ্য আমি তাহাদের কাহারও বন্ধু হইবার যোগ্য নই। তাহারা প্রত্যেকেই বিদ্বান, উন্নতিশীল এবং সচ্চরিত্র। তাহারা প্রত্যেকেই আমায় ভালবাসিত এবং আমার সুখদুঃখের ভাগ লইত। আমি যাহাতে মানুষ কই, পিতামাতার সেবার জন্য কিছু কিছু উপার্জ্জন জরিতে পারি, অনেকে তাহার উপায় চিন্তা করিত। ইহাদিগের মধ্যে নির্ম্মল, শিশির, ইন্দু, শচীন, সত্য, অমূল্য, উমা ও মণি উল্লেখযোগ্য। এই কয়জনের প্রথম তিন জন এখন উকিল এবং পরের পাঁচ জন মেডিক্যাল কলেজের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তার। তখন অবশ্য সকলেই ছাত্র ছিল। বন্ধুদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ভালবাসার বন্ধন এমনই দৃঢ় ছিল যে দুই একদিন কাহারও দেখা না হইলে অস্থির হইয়া পড়িত।

আমাদের মিলনস্থান ছিল মানিকতলা খালের ধারে, অথবা এখন যেখানে পর্দা পার্ক হইয়াছে, তখনকার সেই গ্রীয়ার স্কোয়ারে। কখনও বা হেদুয়া কিম্বা গোলদিঘীতেও সকলে জমায়েৎ হইত। অধিকাংশ সময়ে খালের ধারেই মিলন বৈঠক বসিত। নানারূপ সমালোচনা ও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ হইত। যখন কেবল আমি ও শচীন থাকিতাম, তখন শচীন আমার অতীত জীবনের ঘটনাবলী শুনিতে ভালবাসিত বলিয়া আমি তাহাকে তাহাই শুনাইতাম।

এদিকে কমলার বিবাহ সম্বন্ধীয় আমার অতীত জীবনের এক মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা শচীনকে শুনাইতেছি এমন সময় আমার এক নব-পরিচিত বন্ধু আসিয়া তাহার কিয়দংশ শুনিয়াছিল। তখনও ঘটনার শেষ হয় নাই; কপালকুণ্ডলার জলে পড়িয়া অন্তর্ধানের মত কমলার ৺কাশী হইতে অন্তর্ধান পর্য্যন্তই হইয়াছিল। তাহার পর কমলার কি হইল তখনও কিছু জানা যায় নাই। বিবরণ শেষ হইলে আমার নব-পরিচিত বন্ধুটী বলিলেন, 'অন্নদাবাবু! এতখানি স্বার্থত্যাগ, এতদূর উপেক্ষা কি মানুষে কখনও সম্ভব হয়?'

শচীন কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই অন্নদা! এঁকে ত চিনতে পারছি না।'

আমি বলিলাম, 'চিনতে পারবে না; বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে থাকতে এর সঙ্গে আলাপ; ইনি আমায় খুব ভালবাসেন।'

দুএকটি কথার পর শচীন কার্য্যান্তরে যাইলে বন্ধুটী আমায় বলিলেন, 'অন্নদাবাবু! আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। এখন না হয় আপনি ৺মাকে পেয়েছেন; ধর্ম্মেও একটু মতিগতি হয়েছে। কিন্তু তখনও অর্থাৎ সেই সতর আঠার বৎসর বয়সেও যে আপনি এত পবিত্র অন্তঃকরণ ছিলেন তা আমার মনে হয় না; কেননা আপনার চেহারা দেখে ত মনে হয় না যে ঐ বয়সে আপনি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে চলতেন।'

সত্য সত্যই তখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ। বুকের জ্বালা ও প্রস্রাবের

পীড়া এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে পাছে আমি মারা যাই এই ভাবিয়া শচীনের মা আমার একখানি ফটো তুলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, 'ভাই! আমার শরীর সত্যই এখন খুব খারাপ। কিন্তু আমার তখনকার ফটো দেখলে তুমি বুঝতে পারবে আমার স্বাস্থ্য কি সুন্দর ছিল।'

'তোমার সেই বয়সের ফটো আছে?'

'আছে; কাল আমার বাসায় যেও; দেখাব।'

পরদিন বাসায় আমার ফটো দেখিয়া বন্ধুবর প্রথমে চিনিতেই পারেন নাই যে আমিই সেই ব্যক্তি। তারপর চিনিতে পারিয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য্য! তোমার এই দেহ, গড়ন, এখন গেল কোথায়? আচ্ছা, সে যাই হোক, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তুমি আজ রাত্রে আমার বাড়ী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে?'

'কোন উপলক্ষ্য আছে না কি?'

'না।'

'তাহলে পারি। ব্রাহ্মণের ছেলে নিমন্ত্রণের নাম শুনলে লাফাতে থাকে; তা জান না? কখন যাব?'

'সন্ধ্যার পর।'

'আচ্ছা; তাই হবে।'

বন্ধুটী তখন চলিয়া গেল। আমিও যথাসময়ে তাহার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আমি তাহার বাড়ী যাই নাই। বাড়ী পৌঁছিলে, আমাকে বাহিরের একটী ঘরে বসাইয়া বন্ধু বলিল, 'ভাই? এখানে নিরিবিলিতে বসে তোমার সঙ্গে কথা কইব।' আমি একটু হাসিয়া ঘরের ভিতরে গেলাম। ভিতরে গিয়া দেখিলাম সম্মুখে একটী উজ্জ্বল দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে। তাহারই দু'পাশে দুটী—ছি! ছি! কি নিকৃষ্ট রুচির উলঙ্গিনী প্রতিমূর্ত্তি। চিত্রিত মূর্ত্তি দুটির হাবভাবও অতি কদর্য্য এবং এইরূপ জঘন্য চিত্র কোন ভদ্রলোকের গৃহে প্রকাশ্যভাবে স্থান পাইতে পারে ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, এ ব্যক্তির প্রকৃতি কি এতই জঘন্য! এতই নীচ! আর কেনই বা এ ব্যক্তি আমাকে এত ভালবাসে? আমি বসিয়া বসিয়া এই সব ভাবিতেছি এমন সময় বন্ধুটী ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বলিল, 'অন্নদাবাবু! সব সত্য কথা বলবে ত? কিছু গোপন করবে না?'

আমি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম, 'না।'

'কি ভাবছ বল ত?'

'তুমি আগে বল দেখি, ঐ ছবি দুখানি এ ঘরে কেন রেখেছ?'

দুই একবার মাথা চুলকাইয়া আমার পানে চাহিয়া বন্ধুবর বলিল, 'কেন? কি হয়েছে?—মূর্ত্তি দুটী কি খারাপ?—তোমার চোখে খারাপ ঠেকছে?'

আচ্ছা তুমিই বল দেখি মার বা বাবার সামনে বসে তুমি মূর্ত্তি দুটীর পানে চেয়ে থাকতে পার ?'

'তা কি পারা যায় ?'

'তোমার স্ত্রীর কাছে বসে ? সত্য বলবে।'

'না।'

'কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের কাছে বসে ?'

'না।'

'কোন সাধু সন্ন্যাসীর সামনে বসে ?'

'হ্যাঁ ; নিশ্চয় পারি।'

'পার ? সত্য বলছ পার ?'

'বলাবলির কি আছে। দেখতেই ত পাচ্ছ কেমন চেয়ে রয়েছি।'

'আমি বুঝি সাধু সন্ন্যাসী ?'

'নিশ্চয় ; আমি তোমাকে সাধারণ বন্ধু বলে মনে করি না। তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু। তা না হলে সাধারণ বন্ধুর কাছে বসে এ মূর্ত্তির দিকে আমি চেয়ে থাকতে পারি না ; লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে।'

'এই দুটী দেখবার জন্যই কি আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলে ?'

'এক রকম তাই।'

'এ মূর্ত্তি কোথায় ছিল ?'

'বলব ? আর কারও কাছে প্রকাশ করবে না ত ? না—তুমি করবে না ; তোমায় বলতে পারি।—আমার একটী রক্ষিতা আছে ; তার কাছেই ছিল।

'সেকি ! তোমার রক্ষিতা কি হে ?'

বন্ধুটি অকপটভাবে বলিল 'হাঁ, আমার একজন রক্ষিতা আছে। তুমি আশ্চর্য্য হয়ো না ভাই ! কলকাতায় এমন হাজার হাজার লোকের রক্ষিতা আছে। তুমি কি তা জান না ?'

আমি বলিলাম, 'তা জানি ; কিন্তু তুমিই যে আমায় বলেছ তোমার স্ত্রী তোমার খুবই সোহাগের। তোমার স্ত্রী পতিব্রতা, সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা। তবে ? সে কি সব মিথ্যা কথা ?'

'মিথ্যা হবে কেন ? আমি মিথ্যা কথা বলি না। এই যে বাড়ী দেখছ এ আমাদের নিজেদের বাড়ী নয়। আমার মেসোর ভাড়াটে বাড়ী ; আমার মেসোমহাশয় সপরিবারে এ বাড়ীতে থাকেন ; আমিও এখানে থেকে চাকরী করি। মাঝে মাঝে বাড়ী যাই।'

'কত দিন অন্তর ?'

'প্রায় সপ্তাহে সপ্তাহেই যাই ; তবে কাজ কর্ম্ম বেশী পড়লে দুএক সপ্তাহ বাদও যায়।'

'সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ী যাও ; তার ওপর রক্ষিতা ?'

'কি কর্‌ব বল ; অনেক চেষ্টা করেও ছাড়্‌তে পারি-নি। তোমার শক্তি আছে ? ছাড়িয়ে দিতে পার ?'

'না ভাই ! আমার শক্তি নেই ; তবে ৺মার শক্তি আর ঠাকুরের ইচ্ছায় কি না হয় বল ?'

'দেখ, আমি ওসব কথা ভালবাসি না ; ভাল বুঝ্‌তেও পারি না। ৺মার শক্তি বা ঠাকুরের ইচ্ছা আমি জানি না ; আমি তোমাকেই জানি। যাক্ সে কথা পরে হবে। এখন, আমার কথার উত্তর দাও। —আচ্ছা ! বল দেখি, তুমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়া এজীবনে কুভাবে আর কখনও কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করেছ কি না ?'

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর্‌বে ?'

'পরীক্ষা করে নেব ; বাজিয়ে নেব ; তবে বিশ্বাস কর্‌ব ?'

'না।'

'ভাল কথা ; অন্য রকমে কখনও বীর্য্য নষ্ট কর নি ?'

'জীবনে একদিনের কথা মনে আছে ; সেও আত্মরক্ষার জন্য।'

'সে আবার কি ? আত্মরক্ষা কি রকম ?'

'ধর্ম্ম রক্ষাও বল্‌তে পার ;—বা কোন কামাতুরা হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও বল্‌তে পার।'

'একদিন ত ? যাক্ সেকথা পরে শুনব ; আচ্ছা—তোমার স্বপ্নদোষ হয় না ?'

'বিবাহের আগে হয় নি ; পরে একবার হয়েছিল ?'

'আদ্যামাকে পাওয়ার পর আর হয়েছে ?'

'না।'

'তা না হলে আর ৺মার মাহাত্ম্য কি ?'

এমন সময়ে কে আসিয়া দরজার কড়া নাড়িয়া বলিয়া গেল, 'খাবার দেওয়া হয়েছে।' তাহা শুনিয়া সকল কথা চাপা দিয়া বন্ধুবর উঠিয়া ছবি দুখানি খুলিল এবং একখানি চাদরে মুড়িয়া এক পার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক বলিল চল, 'ভাই ! খেতে যাই ; পরে কথা হবে।'

৩৬

দুই জনে খাইতে গেলাম। প্রচুর আয়োজন ; ঘিভাত হইতে শুরু করিয়া ছানার পায়স পর্য্যন্ত কিছুই আর বাকী ছিল না। মাসীমা স্বয়ং পরিবেশন করিতেছিলেন ; আহার করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। বন্ধুটী পঞ্চমুখে আমার

গুণগান করিতেছিলেন আর আমি শুনিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম। খাওয়া শেষ হইলে আমরা যখন হাত মুখ ধুইয়া একটী ঘরে গিয়া বসিলাম, তখন একটী ষোড়শী বিধবা একটী কৌটা ভরা পান আমার হাতে দিয়া বলিল, 'পান খান; আমি নিজের হাতে সেজেছি।'

'বন্ধুটী বলিলেন, 'যা যা মশলা এনে দিয়েছিলুম সব দিয়েছিস্?'

'হাঁ দিয়েছি' বলিয়া একটু হাসিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আমি সেই বিধবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বন্ধু বলিল, 'আমার মেসোর প্রথম স্ত্রীর মেয়ে; সম্পর্কে আমার ভগ্নী হয়; মেয়েটী খুব চালাক। ব্রাহ্ম স্কুলে থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিল; আর সুন্দরী কেমন দেখ্তেই ত পেলে? কিন্তু এর অদৃষ্ট এমন যে আজ এক বৎসর আগে ওর বিবাহ হয়েছিল; আর বিবাহের তিন মাস পরেই বিধবা হয়েছে! আবার ওর যদি গান শোন ত মুগ্ধ হয়ে যাবে। শুনবে? —ডাক্‌ব?'

আমি বলিলাম, 'তা শুনতে আপত্তি কি? তবে এখন খাওয়া দাওয়ার সময়; খাবে দাবে না?'

'তুমিও যেমন? ওর আবার খাওয়া দাওয়ার ভাবনা? ও অত ধর্ম্মের ধার ধারে না। হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের আইন কানুন মেনে চলে না। আমার মেসোই ওকে সে বিধান দিয়েছেন। এর মধ্যেই ওর অনেক বার খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি যখন বাড়ী ঢুকছিলে তখনই ওরা চা আর গরম গরম হালুয়া চলছিল।'

আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, 'মেসো কি এর আবার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন?'

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, 'তাও ইচ্ছা আছে।—ভাল কথা; তোমার ত অনেক বন্ধু বান্ধব আছে। একটী পাত্র জুটিয়ে দিতে পার? দেখ না যদি জোগাড় করে দিতে পার ত বড় ভাল হয়।'

এই বলিয়া 'চারু' 'চারু' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বন্ধু ঘরের বাহিরে গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম চারু দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু বন্ধু বাধা দিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া দুই তিন মিনিট তাহাকে কি বলিল। তারপর 'যা শিগ্‌গির হারমোনিয়ামটা নিয়ে আয়;' বলিতে বলিতে পুনরায় ঘরে আসিয়া সহাস্যে বন্ধু বলিল, 'আজ আর তোমার যাওয়া হচ্ছে না। কেমন? থাক্‌বে ত?'

আমি বলিলাম, 'তা আমাকে রেখে তোমরা যদি আনন্দ পাও—থাক্‌তে পারি।'

'হাঁ; তাই হোক।' বলিয়া বন্ধু তাকের উপর হইতে রবিবাবুর 'গান' বইখানি আমার হাতে দিয়া বলিল, 'তোমার যেটা পছন্দ হয় বললেই গাইবে।'

চারুবালা হারমোনিয়াম লইয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল এবং একধারে হারমোনিয়মটী রাখিয়া বেশ সুবিধা করিয়া বসিয়া লইল। তাহার পর হারমোনিয়মে সুর দিয়া দুএকটী পর্দা টিপিতে টিপিতে বলিল, 'কি গাইব দাদা? বল; রবিবাবুর গান গাইব না রজনী সেনের?'

আমি বলিলাম, 'ডি, এল, রায়ের কোন গান জানা থাকে ত গাইতে পার।' ভাবিলাম, ডি, এল, রায়ের গানের মধ্যে অনেক রকম ভাবের গান আছে; তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া গাহিলে গায়িকার রুচির পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিধবা কামিনী গান ধরিল—

'নীল আকাশে অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে দেছে চাঁদের আলো।' ইত্যাদি।

গৃহস্থের মেয়ের কণ্ঠে এমন সুমধুর সঙ্গীত আমি এই প্রথম শুনিলাম। ইহার পর সে গাহিল—

'তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।' ইত্যাদি।

এবং শেষে—

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।' ইত্যাদি।

গানটী গাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোনটা আপনার ভাল লাগল?'

আমি বলিলাম, 'প্রত্যেকটা।'

'ডি, এল, রায়েরটা সব চেয়ে ভাল লেগেছে; না?'

'ডি, এল, রায়ের ওগানটী আমি এই প্রথম শুনলুম; এর আগে কখনও শুনি নি।

মেয়েটী হাসিল; আর কিছু বলিল না। তার পর একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, ডি, এল, রায়ের একটা জানা গান গাচ্ছি; শুনুন। বলিয়া গান ধরিল—

'মহাসিন্ধুর ওপার হতে
কি সঙ্গীত ঐ ভেসে আসে।' ইত্যাদি।'

গান শুনিয়া আমি মোহিত হইয়া গেলাম। সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলাম। তারপর কখন যে আমি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিছুই মনে নাই। এক ঘুমের পর হঠাৎ আমার পায়ে যেন কাহার কোমল স্পর্শ অনুভব করিলাম। জাগিয়া দেখি বন্ধুর সেই বিধবা ভগ্নী চারু আমার পায়ের কাছে নত মস্তকে বসিয়া; তাহার মস্তক অনাবৃত; কেশপাশ আলুলায়িত; হাত দুখানি আমার দুপায়ের উপর ন্যস্ত, যেন অতি ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'এ কি করছেন!

হাত সরান ; পায়ে হাত দেবেন না।'

এই বলিয়া আস্তে আস্তে পা গুটাইতে লাগিলাম। কিন্তু চারু কিছুতেই পা টানিয়া লইতে দিবে না, সজোরে চাপিয়া ধরিল। আমি বলিলাম, 'ওকি! ছেড়ে দিন।'

চারুবালা বলিল, 'আমি যাই করি না কেন, তাতে আপনার ক্ষতি কি? আপনি শুন্ না।'

'সে কি কথা? এত রাতে আপনি একা আমার কাছে বসে আমার পা টিপ্‌বেন; আর আমি নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ঘুমোবো? তাতে আমার যথেষ্ট ক্ষতি আছে; আমার অমঙ্গল হবে। আপনারা যে মাতৃজাতি।'

'ঈশ্! থামুন না; মাতৃজাতি ত বটেই। আপনার স্ত্রীও কি মাতৃজাতি নন? আমি ত আপনার স্ত্রীর বয়সী; আপনার ছোট ভগ্নীর বয়সী; অমঙ্গল হতে যাবে কেন?'

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, 'আপনার সাহস ত খুব?'

'কেন সাহস হবে না? আমি কি অজ পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মেয়ে? যে ভয় পাব?' বলিতে বলিতে পা ছাড়িয়া পাশে আসিয়া আমার হাতখানি ধরিল এবং 'দেখুন না আমার বুকে হাত দিয়ে; ভয়ের লেশও নেই;' বলিতে বলিতে বুকে লইবার জন্য হাতখানি তুলিতেই আমি সজোরে হাত ছিনাইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'মা! আমায় রক্ষা কর। আমিই তোমার ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বল সন্তান। আমায় আর পরীক্ষা করো না।'

এ উক্তি মন্ত্রের মত কার্য্য করিল। চারু সংযত হইয়া লজ্জায় মাথা নত করিল এবং অপরাধিনীর মত কত কি চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় অট্টহাস্য করিতে করিতে দুয়ার খুলিয়া বন্ধুটী ঘরে প্রবেশ করিতেই চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উচ্চহাস্য করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বুঝিয়া লইলাম এবং ক্রুদ্ধভাবে বন্ধুটীকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিলাম, 'নির্ব্বোধ! যদি আমায় পরীক্ষাই কর্‌তে হয়, তোমার রক্ষিতাকে দিয়ে বা বড় জোর তোমার স্ত্রীকে দিয়ে না করে বিধবা ভগ্নীকে দিয়ে করা কেন? কাপুরুষ! তোমার কি কিছু মাত্র ধর্ম্ম ভয় নেই? আজ যদি আমি তোমার ভগ্নীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে না পারতুম তা হলে তুমি আর আমার বেশী কি কর্‌তে? না হয় দুবার ভণ্ড বল্‌তে বা দুঘা বসিয়ে দিতে; এই ত? কিন্তু বিধবা ভগ্নীর ধর্ম্ম, এক নারীর সতীত্ব ত চিরদিনের মত যেত? ছি—ছি—ছি! তুমি নেহাৎ কাপুপুষ! তোমার সঙ্গে কথা কহাও পাপ!'

এইরূপ ভর্ৎসনা করিতে করিতে আমি শান্ত হইলাম। বন্ধুটী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অন্নদা! ক্ষমা কর। অবশ্য ভগ্নীকে দিয়ে পরীক্ষা

করা আমার অন্যায় হয়েছে। তবে কি জান, আমি আমার ভগ্নীকে ভাল করে জানি বলেই তোমার কাছে পাঠাতে পেরেছি। সে যা হোক, এখন তুমি আমায় কৃপা কর।'

বন্ধুবর কথাগুলি বলিয়া 'চারু' 'চারু' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। চারুমা ঘরে আসিলে পুনরায় বন্ধু বলিল, 'চারু! ভাল করে পায়ের ধুলো নে! প্রার্থনা কর যেন তোর ওপর ঠাকুরের দয়া হয়; তুই আর সংসার করতে না পেলেও যেন সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারিস্।'

চারুমা ঠিক তাহাই করিল এবং শিখান কথাগুলিকে আমায় শুনাইল। আমি বলিলাম, 'যাও মা! তুমি এখন শোওগে, ঠাকুর অবশ্য তোমার মঙ্গল করবেন।'

মহা অপরাধীর মত করুণ দৃষ্টিতে একবার মুখের পানে তাকাইয়া চারু বাহির হইয়া গেল। চারু চলিয়া গেলে বন্ধুটী আমার পা চাপিয়া ধরিয়া সাশ্রুনয়নে পুনরায় বলিতে লাগিল, 'ঠাকুর! দয়া কর; আজ তুমি আমার ঠাকুর; আমার প্রাণের দেবতা। আমি আর কিছুই চাই না। যেন রক্ষিতার হাত থেকে মুক্তি পাই; যেন স্ত্রীকে ষোল আনা ভালবাসতে পারি; আর ভক্তি বিশ্বাস দিয়ে বাপ মার সেবা করতে পারি।'

আমি তখন তাহাকে যথাসাধ্য উৎসাহ ও আশ্বাস দিলাম। অধিক আর কি বলিব এই ঘটনার মাসেক পরে যখন একদিন বন্ধুটীর সহিত দেখা হইল, তখন দেখিলাম তাহার পায়ে আর দশ টাকা দামের জুতা নাই; সেই বেশ বিলাস বাবুয়ানা কিছুই নাই। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বলিল, 'স্বপ্নে ঠাকুরের দর্শন পেয়েছি; মন্ত্রও পেয়েছি।—রক্ষিতা ছেড়েছি; সেই মেসোর বাড়ী ছেড়েছি; আর দেখতেই পাচ্ছ আরও কি কি ছেড়েছি; ভাই! আমি নূতন জীবন পেয়েছি। মনে করেছি দাসত্বও আর করব না। দেশে গিয়ে যে ধান জমিটুকু আছে, তাই নিয়ে চাষ বাস করে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে কোন রকমে চালিয়ে দেব।'

বন্ধুবরের সঙ্গে সেই শেষ দেখা; আজ কয় বৎসরের মধ্যে আর দেখা হয় নাই।

## ৩৭

তখনও আমি শচীনের বাটীতেই থাকিতাম। একদিন ঘরে বসিয়া আপন মনে সখ্য ভাবের একটি গান রচনা করিতেছি। গানটি এই :—

সখা! তোমার দেখা পায় নি যারা ওগো এ জীবনে;
তাদের কাছে তোমার কথা বল বলি কেমনে?

ভাব ও গাথা গাইলে পরে, তোমার প্রেমের ব্যাখ্যা করে,
সখা! তারা যে কুতর্ক করে ( আমি ) সহি কোন্ প্রাণে ?
আমি, সইতে নারি জ্বলে মরি তাই, কাঁদি নিশিদিনে।
ওগো! কর জোড়ে নত শিরে মিনতি করে,
বল্‌ছি সখা! একবার দেখা দাও না তাদেরে ;
তোমার কাছে তাদের রেখে, থাক্‌ব আমি মনের সুখে,
রাখ্‌বে সদা হৃদে এঁকে হৃদয় ধনে ;
তুমি, হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর্‌বে সমানে ।
একবার কৃপা কর কৃপাময় নিজগুণে ॥

গানটা লিখিতেছি এমন সময় শচীনের এক মাতুলভ্রাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সিধুবাবু কোথায় ?'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন ?'

'আমার একটু দরকার আছে ;—আপনি দাদাবাবুকে জানেন ত, অন্নদাবাবু ? তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীটে এসে রয়েছেন। একদিন দেখ্‌তে যাবেন।'

'দাদাবাবু কে ?'

'ঝামাপুকুরের নৃপেনবাবুর নাম শোনেন নি ? তিনি যে একজন খুব বড় সাধু ; অনেক গণ্য মান্য লোক তাঁর কাছে যান। আপনি একদিন সিধুবাবুর সঙ্গে যাবেন ; তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে।'

নৃপেনবাবু—খুব বড় সাধু ; দুইটী কথাই যেন পরস্পর বিরোধী। সে যাহা হউক, আমি যথাসময়ে সিদ্ধেশ্বর বাবুর নিকট এ প্রস্তাব করিলে তিনি অতি আগ্রহের সহিত আমায় লইয়া চলিলেন। যতীন বাবুও সঙ্গে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন নৃপেন সাধুর সঙ্গে দেখা হইল না। তিনি কোথায় কোন শিষ্যের বাড়ী গিয়েছিলেন। আমরা পুনরায় পরদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। সেদিন তিনি বাড়ীতেই ছিলেন। দেখিলাম আমাদের মত আরও দুই চারি জন ভক্ত তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে বুঝিলাম তিনি আসিতেছেন। আমি সংযতভাবে বসিয়া রহিলাম।

নৃপেনসাধু ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই ; পরিধেয় বস্ত্রের এক অংশ গায়ে দেওয়া ; হাতে একটী কাগজের তাড়া। তিনি আসিতেই সকলে প্রণাম করিল। প্রতিনমস্কার করিয়া সাধু আসন গ্রহণপূর্বক বলিলেন, 'আমি গোবর্দ্ধনধারণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছি ; শুনুন।' এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন। সকলে মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল। আমি কিন্তু সাধুর হাবভাবই বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

সাধুটির হাবভাব ও ভাষা বড়ই মধুর। অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে একটি আধ্যাত্মিক সংকেতের চিহ্নই ফুটিয়া উঠিতেছিল। দেখিয়া শুনিয়া আমার যথেষ্ট ভক্তির উদ্রেক হইল। কিন্তু ৺মাকে পাওয়ার বিষয় আমার আদৌও বলিতে ইচ্ছা ছিল না। তাই আসিবার সময় সিধুবাবুকেও রাস্তায় বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম, যেন, ৺মাকে পাওয়ার ঘটনা সাধুর নিকট গল্প না করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই, যে সাধু হইলে তিনি নিজেই চিনিয়া লইবেন; কারণ সাধু সাধুকে চিনে এই ধারণাই আমার আশৈশব বদ্ধমূল ছিল। ইহাতে অবশ্য অনেকে মনে করিবেন যে আমি নিজেকে একজন সাধু বলিয়া প্রচার করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; কারণ সে চেষ্টা বৃথা। যেহেতু সকলেই জানেন,—যিনি সাধু তিনি কখনও নিজেকে সাধু বলিয়া পরিচয় দেন না। যিনি ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি নিজেকে ব্রহ্মবিৎ বলিয়া পরিচয় দেন না। তাই তত্ত্বদর্শীরা বলেন যিনি ব্রহ্মকে জানেন না স্বীকার করেন, তিনিই জানেন; আর যিনি জানেন বলিয়া বলেন, তিনি জানেন না। কথাটা পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও তাহা নহে; কথাটা ঠিক। কেননা যে পর্য্যন্ত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান পৃথক পৃথক ভাবে সাধক উপলব্ধি করেন, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম তাহার নিকট অজ্ঞাত থাকেন। আর যখন সব এক হইয়া যায় তখনই ব্রহ্ম জ্ঞাত হন। 'অহং মমেতি' জ্ঞান লুপ্ত না হইলে ব্রহ্মবিৎ হওয়া যায় না। কেননা যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনি ব্রহ্মেই পরিণত হন।

তাই শাস্ত্রে বলে, 'ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি।' অতএব আমি সাধু এইরূপ প্রচার করিতে চেষ্টা করিলে আমি যে সাধু নহি তাহাই প্রতীয়মান হইবে। তবে আমি যে কোন পরম সাধুর দাসানুদাস এবং আমি যে জগদ্‌গুরু পরমহংসদেবের আজ্ঞবহ ভৃত্য একথা কেন বলিব না? যাহা হইক, অনেকক্ষণ অনেক কথার পর নৃপেন সাধু সিদ্ধেশ্বর বাবুর নিকট আমার পরিচয় পাইয়া আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমার মন এখন খুব চঞ্চল; নয়?—স্থির হও—স্থির হও; তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

—তুমি কি কর?

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম,—'কিছুই করি না।'

'সে কি! কিছুই কর না কি রকম?'

তখন অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। আমিও উঠিব উঠিব করিতেছিলাম এমন সময় সিদ্ধেশ্বর বাবু আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, 'মহাশয়! এই ব্রাহ্মণসন্তানের জীবনে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে।' এই বলিয়া আমার নিষেধ সত্ত্বেও সিদ্ধেশ্বর বাবু অতি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলিলেন, নৃপেন সাধু ৺মাকে বিসর্জ্জন দেওয়ার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, 'করেছেন কি আপনারা! ৺মাকে বিসর্জ্জন দিয়ে

দিলেন! আমায় একবার খবর দিলেন না ?'

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিল। সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন, 'আপনি ত এখানে ছিলেন না।'

'কেন আমায় তার কর্‌লেন না ? সে যে আমার মা! তা জান্‌তেন না ? —মা!—মা!—আমায় ফাঁকি দিয়ে পালালি !' বলিতে বলিতে সাধু কাঁদিয়া ফেলিলেন। চোখের জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল। আমি ত ব্যাপার দেখিয়াই অবাক! সিদ্ধেশ্বর বাবু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, 'আপনি আপ্‌শোষ কর্‌বেন না। ৺মার ফটো আছে; আপনাকে আনিয়ে দেব।'

'ফটো আছে ? আমার একখানা চাই;' বলিয়া তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখ, তুমি কাল নিশ্চয় আমায় একখানা ফটো এনে দেবে।'

'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেদিনকার মত আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে ৺মায়ের ফটো লইয়া নৃপেন সাধুর নিকট উপস্থিত হইলাম। বোধ হয় যতীন বাবুও সঙ্গে ছিল। সাধু পরম আহ্লাদে ৺মায়ের ফটো গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভক্তিঅশ্রু বিমণ্ডিত বদনমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছিল। ভক্তিমান সাধু নির্নিমেষ লোচনে ৺মায়ের প্রতিমূর্ত্তি কিছুক্ষণ দর্শন করিয়া আমাকে লইয়া ভিতর বাটীতে তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আহা! কি পবিত্র মধুর দর্শন! সাধনগৃহের কি অপূর্ব্ব শোভা! কি সাত্ত্বিক ভাব! নৃপেন সাধু যে পরমহংসদেবের একজন প্রধান ভক্ত তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। কেননা, প্রত্যেক মূর্ত্তির উপর ঠাকুরের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। গুরুতে যে তাঁহার মানব বুদ্ধি নাই তাহা বেশ অনুভব করিলাম। বাস্তবিক গুরুই ত ইষ্ট। ইষ্টই ও গুরুর মধ্য দিয়া ভক্তের দৃষ্টি সুমার্জ্জিত করেন; অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া সাধক ভক্তকে তৎপদ দর্শন করান। কিন্তু নৃপেন সাধু যে একনিষ্ঠ গুরুভক্ত বা গুরুর উপাসক নহেন তাহাও দেখিলাম। কারণ ৺মায়ের চরণে ভক্তি অর্ঘ্য দেওয়া রহিয়াছে, তাহাও চোখে পড়িল। একখানি অতি সুন্দর ৺কালীমূর্ত্তি সম্ভবতঃ অষ্টধাতুর, তাঁহার উপাসনা গৃহে নিত্য পূজা হইত। আমার ঠিক মনে নাই, বোধ একটী ঘটও ৺মায়ের সম্মুখে স্থাপিত ছিল। সাধু ৺আদ্যামায়ের মূর্ত্তিখানিও পূজামন্দিরে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন; এবং আমাকে আসনে বসিয়া স্থির ভাবে ধ্যান করিতে বলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

আমি ধ্যানে বসিলাম। স্থানের গুণেই হউক, আর সাধকের কৃপাতেই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক, আমি পরম আনন্দে তন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। কিছুক্ষণ অবস্থান করিতে না করিতেই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। আমার যজ্ঞোপবীত জ্বলিয়া উঠিল। স্থির দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি গলা

হইতে যজ্ঞোপবীত খুলিয়া লইলাম। আমার মন বুঝি কি এক রকম হইয়া গেল। আমি প্রজ্বলিত যজ্ঞোপবীত হস্তে লইয়া বাহির বাটীতে যেখানে ১৫।২০ জন ভক্ত সঙ্গে নৃপেন সাধু ভগবৎ প্রসঙ্গ করিতেছিলেন সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং অর্দ্ধদগ্ধ যজ্ঞোপবীতটী সাধুর উদ্দেশ্যে সজোরে নিক্ষেপ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখি আমি সাধুর কোলেই শুইয়া আছি এবং সাধু রসসঙ্গীতে সকলকে আনন্দ দান করিতেছেন। তারপর অনেক নৃত্যগীত হইল। ভাবের প্রবাহে অনেকে অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। তখনকার সে আনন্দদৃশ্য অবর্ণনীয়; যে যেন ভাবের বৃন্দাবন। সেখানে সাংসারিক ভাব নাই; বৈষয়িক কথা নাই; বাদ বিসম্বাদ ঈর্ষা দ্বেষের স্থান নাই; সকলেই আধ্যাত্মিক ভাবে ভরপুর; সকলের প্রাণেই আনন্দ; সকলেই যেন শান্তি তৃপ্তির শীতল ছায়ায় বসিয়া সমস্ত জীবনের শ্রান্তি অপনোদন করিতেছেন। জীবনে সে একটী দিন আমি পাইয়াছিলাম, যাহার অতুল আনন্দের কথা ইহজীবনে ভুলিবার নয়।

বেলা তখন প্রায় বারটা। আমি কিছুতেই বাসায় ফিরিব না। অনেকের চেষ্টায় আমার মত হইলে আমি আসিবার সময় নৃপেন সাধু বলিয়া দিলেন, 'তুমি তিন দিন আর এসো না; ঘর থেকে বেরিও না; আর কাহারও সঙ্গে কথা কয়ো না। অনেক জিনিস পাবে; অনেক কথা জানতে পারবে। যা পাবে বা জানতে পারবে সমস্ত লিখে রেখো।'

৩৮

বাড়ী আসিয়া তদবস্থায় তিন দিন কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু বড়ই কষ্ট বোধ হইয়াছিল। তৃতীয় দিন রাত্রে নৃপেন সাধুর জীবন সম্বন্ধে স্বয়ং ঠাকুর অনেক কথা শুনাইলেন; আর আমি লিখিয়া লইলাম। জাগিয়া উঠিয়া খুবই তন্ময় অবস্থায় উহা লিখিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ঘুমাইয়াছি; আবার উঠিয়া লিখিয়াছি। এইরূপেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়াছিল।

প্রভাতে সেই লেখা লইয়া নৃপেন সাধুর নিকট আসিলাম। সাধু সেই দিন তাঁহার অনেক ভক্তকে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই বড় ঘরখানিতে তিলমাত্র স্থান নাই; আমাকে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন। এক পবিত্র আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আমি সাধুর আদেশে তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলাম। সকলে মনোযোগ সহকারে জীবনী শুনিতে লাগিলেন। আহা! সাধকের জীবনী কি মধুর! কি উচ্চ ভাবাপন্ন! পড়িতে পড়িতে একটী স্ত্রীলোকের কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম, স্ত্রীলোকটী শূদ্রাণী। নৃপেন সাধুও নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিলেন। শূদ্রাণী শুনিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—'না—না—সে

স্ত্রীলোকটী মেথরাণী।'

আমি বলিলাম, 'তাই লেখা আছে ; এত লোকের মধ্যে বলেই শূদ্রাণী বললাম।'

পাঠ শেষ হইলে সাধু সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমি প্রায় ৫।৬ বছর আগে এই জীবনী গোপনে শরৎ বাবুকে বলেছিলাম ; আর কেউ জানতে না। দেখলেন ঠাকুরের কৃপায় এই ব্রাহ্মণসন্তান কেমন নিখুঁত ভাবে সব জানতে পেরেছে ?'

শরৎ বাবু সাধুর পরম ভক্ত ; সুকিয়া ষ্ট্রীটের 'শশিকণা' নামক বাড়ী খানির মালিক। শরৎ বাবুও আমার মুখে এই জীবনী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

ইহার পর সকলকে শুনাইয়া আমি বলিলাম, 'ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত সাধুকে আমি একটি পরীক্ষা করব। সেই পরীক্ষায় যদি সাধু উত্তীর্ণ হন তাহলে জানব সাধুর জীবন ঠিক পথেই চলছে।'

নৃপেন সাধু বলিলেন, 'আমি প্রস্তুত ; কি পরীক্ষা করতে হয় কর। আজ প্রায় স্ত্রী পুরুষে শতাধিক লোক এ বাটীতে উপস্থিত ; এমন সুযোগ আর তুমি কবে পাবে ?

আমি বলিলাম, 'আমাকে একখানি কাপড় দিন। আমি এখানে কাপড় ছেড়ে সেই পরিষ্কার কাপড় পরে পূজার ঘরে যাব। তারপর যখনই আমি একটী জিনিষ পাব তখনই আপনি গিয়ে দরজায় ঘা দেবেন ; না হলে ব্রহ্মহত্যা হওয়ার সম্ভাবনা।'

অনেকে ভাবিলেন, 'কি ভীষণ পরীক্ষা !' একজন বলিলেন, 'আচ্ছা, উনি যদি ঠিক সময় গিয়ে না পেঁছান, কে তোমায় রক্ষা করবে ?'

আমি বলিলাম, 'জানি না কে আমায় রক্ষা করবে ; বা কেউ মোটেই রক্ষা করবে কি না। তবে ইনি যদি অসাধু প্রমাণিত হন তাহলে আমার বেঁচে না থাকাই ভাল।'

কথামত একখানি কোষের বসন আসিল। আমি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া এক বস্ত্রে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া পবিত্র আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ঠাকুরের আদেশ মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। সম্মুখে কোশাকুশী ; পার্শ্বে তাম্রকুণ্ড এবং তাম্রকুণ্ডে অল্প গঙ্গাজল ছিল। কতক্ষণ পরে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, দেখিলাম একটী যজ্ঞোপবীত উপর হইতে লম্বমান হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাম্রকুণ্ডে পড়িল। আমি অবাক হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম। ঘেই অন্ধকারে দেখিলাম, শুধু আমি আছি ; আর আমার সম্মুখে যজ্ঞোপবীতযুক্ত তাম্রকুন্ডটী রহিয়াছে। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছি ; এমন সময় কে দরজায় আসিয়া ঘা দিল। আমার

জ্ঞান হইল, সেই সাধু আসিয়াছেন ; অমনি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর আলো আসিল। নৃপেন সাধু হাসিয়া বলিলেন, 'কি ? ঠিক এসেছি ত ?'

আমি উন্মত্তের মত যজ্ঞোপবীত হাতে লইয়া বাহির বাটীর দিকে ছুটিলাম এবং ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত সকলের সম্মুখে সাধুকেই যজ্ঞোপবীত পরাইতে গেলাম। সাধু এবারও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি দীনহীন ব্রাহ্মণের দাসই থাক্‌তে চাই ; ব্রাহ্মণ হতে চাই না।'

আনন্দে আমার বুক ভরিয়া গেল। সাধুর আদেশে সেই যজ্ঞোপবীত তখন আমিই ধারণ করিলাম ; তিন দিন পরে আজ আবার আমার দেহে যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতে লাগিল। প্রাণ জুড়াইয়া গেল। প্রেম ও পবিত্রতায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিল। জানি না কোন অনুরাগের মোহন আবেশে আমার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। শিথিলাঙ্গ হইয়া আমি বসিয়া পড়িলাম। সকলে একবার আমার মুখের পানে, একবার সাধুর মুখের পানে তাকাইতে লাগিল ; এবং কিছুক্ষণ সকলে নীরব নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একজন করজোড়ে আমায় বলিলেন, যদি বল্‌তে বাধা না থাকে—এই দৈবপ্রাপ্ত যজ্ঞোপবীত কেনই বা আপনি সাধুকে পরাতে এলেন, আর সাধুই বা কেন নিজে না পরে আপনাকে পরালেন ? এতে সাধুর কি পরীক্ষা হল—খুলে বলে আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন।'

একথা শুনিয়া আমি সাধুর মুখের পানে তাকাইতে সাধু বলিলেন, 'বল, বল অন্নদা! সব খুলে বল ; কিছু গোপন করো না। এতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

সাধুর আদেশে আমি তখন বলিতে আরম্ভ করিলাম :—

'এই যে সাধুটী দেখ্‌ছেন, ইনি গত ছয় জন্ম কঠোর সাধনা করে আস্‌ছেন ; তা তাঁর জীবনীতেই শুনেছেন। গত জন্মের পূর্ব্ব জন্মে ইনি গয়া জেলার কোন এক পাহাড়ে একটী মাতৃমন্দিরে উপাসনায় ব্রতী হন ; আমি তখন সেই মন্দিরের পূজারী ছিলাম। আমি সকল সময় তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতাম না ; কেন না সেই জন্মে তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন। একদিন তিনি বলেন, 'আমি ব্রহ্মতেজ লাভ করেছি ; এখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুযায়ী যজ্ঞোপবীত ধারণ কর্‌ব। আপনি আমায় উপবীত দান করুন। আমি ব্রাহ্মণ হয়ে এই ৺মায়ের বিধিবিহিত পূজার অনুষ্ঠান কর্‌ব।' আমি তখন তাঁর সমস্ত কথাই উপেক্ষা করেছিলাম ; তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করি নি ; পূজার অধিকারও দিই নি। কয়েক বৎসর পরে আমি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন

সাধুর সাধনলব্ধ যোগবল দেখে আমি প্রায়ই মুগ্ধ হতাম। সাধু তখন আমার খুবই সেবা করেছিলেন। একদিন তাঁর ব্রহ্মতেজ দেখে আমি বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম—আমার মৃত্যুর পর তুমিই ৺মায়ের পূজা করো। আমি এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত; না হলে তোমার নির্দ্দেশমত আমিই তোমাকে যজ্ঞোপবীত দান করতাম। আমি যদি বেঁচে উঠি, তোমার বিধিমত উপনীত করব। কিন্তু আমি সে যাত্রা আর রক্ষা পেলাম না। আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হল না। সেই আপশোষ নিয়েই আমি দেহত্যাগ করলাম। সেই ঋণ শোধ করবার জন্যই এ জন্মে এই দৈবপ্রাপ্ত যজ্ঞোপবীত পেয়ে তাঁকে পরাতে এসেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর স্বপ্নে বলে দিয়েছিলেন—'যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করাই নৃপেনের সাধুত্বের পরিচায়ক জানবে।' এখন বুঝলেন ত পরীক্ষাটী কি,—আর উত্তীর্ণই বা সাধু কেমন করে হলেন?'

কথা শেষ হইতেই সাধু আমায় বলিলেন, 'তার পরের ঘটনাও বল; আমি ৺মার পূজা করে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলাম বল।'

আমি তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, 'তবে শুনুন;—যে মাতৃ-মূর্ত্তি আমি ইডেন গার্ডেনে পেয়েছিলাম এবং যার প্রতিকৃতি আপনারা সাধুর পূজার ঘরে দেখেছেন সেই মূর্ত্তিই পূর্ব্বকথিত ৺গয়াধামের মাতৃমূর্ত্তি।' এই সাধুটী আমার মৃত্যুর পর সেই মূর্ত্তি শাস্ত্রসঙ্গত আচার মত পূজা করতে ব্রতী হবার প্রায় মাসেক পরে স্থানীয় পাহাড়িয়াদের মধ্যে এক ভীষণ মড়ক উপস্থিত হয়। দিন দিন শত শত লোক মরতে আরম্ভ করে। চিতাধূমে চারিদিক যখন অন্ধকার হয়ে উঠল তখন একদিন হাজার হাজার পাহাড়িয়া ৺মায়ের মন্দিরে সমবেত হয়ে বললে,—'সাধু! ৺মায়ের পূজা কর; তিন দিনের মধ্যে যদি মড়ক না যায়, ঐ ৺মাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আমরা চিতানলে দগ্ধ করব।' তাদের এই রকম ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা দেখে শুনে সাধু ভয়ে ভয়ে ৺মায়ের পূজা করতে বসলেন। দুদিন দুরাত্রি কেটে গেল। তৃতীয় দিনও বেলা যায় যায়, মড়কের প্রাবল্য কিন্তু কমল না। সাধু উৎকণ্ঠিত হলেন।—হায়! সত্য সত্যই কি তবে মা আমার চিতানলে দগ্ধ হবেন! মায়ের মন্দির খালি করে মা কি আমার চিরদিনের মত চলে যাবেন! এই রকম ভাবতে ভাবতে সাধু তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হলেন। তখন তাঁর উপর আদেশ হল—'আমি আর এ অঞ্চলে থাকব না। যদি আমায় বাংলায় নিয়ে যেতে পারিস্ তবেই আমার মূর্ত্তিটী রক্ষা করতে পারবি; না হলে কালই পাহাড়ী ভক্তদের বিষম প্রহারে চূর্ণ হয়ে যাবে। সাধু অবিলম্বে ৺মাকে বুকে নিয়ে বাংলা অভিমুখে প্রস্থান করলেন এবং কয়েকদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলায় এসে কোথায় কোন নিভৃত স্থানে ৺মাকে লুকিয়ে রেখে পূজা পাঠ সাধনা করবেন তাই খুঁজতে খুঁজতে, এখন যেখানে ইডেন গার্ডেন হয়েছে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন চতুর্দ্দিকে জঙ্গল ও একটী

খাদের মত ছিল এবং তারই এক প্রান্তে একটী সাধকের পুণ্য সাধনকুটীর অবস্থিত ছিল। সাধু এসে সেই সাধনকুটীরে আশ্রয় নিয়ে কিছুকাল সেখানে থেকে সাধন ভজন করলেন। ৺মাও সেই জঙ্গলের মধ্যেই রইলেন। তারপর কালে সাধকদ্বয় সেখানে সমাধিলাভ করলেন; সেই ৺মাই আজ এই দীনহীনের উপর কৃপা করে আবার বাংলায় প্রকাশ হয়েছেন—'এখন বোধ হয় আপনারা বুঝতে পারছেন এই সাধুর সঙ্গে আদ্যামায়েরই বা কি সম্বন্ধ?'

সকলে নিবিষ্ট চিত্তে ঘটনাটী শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সাধক ও সাধনার জয় জয়কার উঠিল। কেহ কেহ বা ভক্তি অশ্রু মুছিতে মুছিতে সাধুরও দীনহীনের পাদবন্দনা করিতে লাগিলেন। সাধুও তখন প্রেমে ভরপুর হইয়া মধুর অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন।

৩৯

দিনের পর দিন আনন্দেই কাটিতে লাগিল। আমার সময়ের বেশ সদ্ব্যবহার হইতে লাগিল। আমি যেখানে যাহাকে পাইতাম সকলকে আনিয়া নৃপেন সাধুর চরণাশ্রয়ে পেঁছাইয়া দিতাম এবং সকলে সাধুসন্দর্শনে আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত। পথে ঘাটে, ঘরে বাহিরে, সকল স্থানেই নৃপেন সাধুর মাহাত্ম্য শ্রুত হইতে লাগিল। আমিও ক্রমশঃ একটীর পর একটি করিয়া সাধুর পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। সাধুর পরীক্ষা করা আমার স্বভাব। কাশীতে যখন ছয় বৎসব ছিলাম তখনও কোথায় কে সাধু আছে খুঁজিয়া বেড়াইতাম এবং এক এক জন করিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়া ছাড়িতাম। একবার ৺দুর্গাবাড়ীর প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে এক সাধুর তপোবনে সবান্ধবে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম সাধুটী প্রায়ই মাটীর নীচে এক গহ্বরে থাকিতেন। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন তিনি উপরেই ছিলেন। উন্নত সাধক; ভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। প্রথম কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া কেবল দুএকটী অবস্থা দেখিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরে আর একদিন একাকী সেই আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আমার এক বন্ধু পিতৃহীন হইয়া মস্তক মুণ্ডিত করায় আমিও মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছিলাম। সেই মুণ্ডিত মস্তকে একটী হিন্দুস্থানী টুপি, গায়ে একটী ভাল আলষ্টার, পায়ে পাম্পসু ও হাতে একগাছি ছড়ি লইয়া ফিট বাবু সাজিয়াই সেদিন গেলাম। কারণ প্রথম দিন দেখিয়াছিলাম, সাধুটী বাবু দেখিলে একটু বিশেষ সম্মান করেন এবং জলযোগের ব্যবস্থা করিতেও আদেশ করেন। শুধু তিনি কেন, এখনকার দিনে অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীই ঐ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত। ঐরূপ বাবুবেশে আমি যাওয়া মাত্র চেলা চামুণ্ডারা এদিক ওদিক

ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কেহ বসিতে আসন দেয়, কেহ পাখা দেয়, কেহবা সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করে; দেখিয়া শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, সেদিনের উপেক্ষা আর এদিনের এই আদর; কি বিশদৃশ অবস্থা! এদিন আবার ভাগ্যক্রমে সাধুটী গৃহাতেই ছিলেন। যথাসময়ে আগমন সংবাদ তাঁহার কানে পেঁাছিলে আট দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি আসিয়া আমায় সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন; আমিও আধা বাংলা আধা হিন্দীতে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলাম। জলযোগেরও সেদিন সুন্দর আয়োজন হইয়াছিল। জলযোগের পর যখন আমায় ইঙ্গিতে জানান হইল যে— আশ্রমে সাধুর বহু ভক্ত আছে,—বহু লোকে প্রসাদ পায় এবং—অনেক খরচ পত্র হয়—আপনি কিছু—। আমি তখন আমার অবস্থা খুলিয়া বলায় সাধু ও সহচরদের যেরূপ মুখের ভাব দেখিয়াছিলাম তাহাতে আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে সাধু কত দূর উন্নত বা তাঁহার চেলা চামুণ্ডারা কিরূপ উদার ও উৎসাহী সাধক।

যাহা হউক, আমাদের নৃপেন সাধুর সেই গুণটুকু কখনও দেখি নাই। কেনই বা দেখিব? রামকৃষ্ণদেবের ভক্তের যদি সেই দোষ থাকে তাহা হইলে যে ঠাকুরের পবিত্র নাম কলঙ্কিত হইবে। তবে মধ্যে মধ্যে নৃপেন সাধুকে গৃহস্থ ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, 'তোরা রাজার ছেলে; রাজার হালে থাকবি। ছেঁড়া কাপড়, রিপুকরা চটি, আর ডাল চচ্চড়িতে সন্তুষ্ট হবি কেন?' একদিন সকলকে ৺লক্ষ্মীর বীজ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই তোদের ইষ্ট দেবী; এই তোদের নিত্য ধ্যেয় দেবতা। যাতে লক্ষ্মীবান হোস্, রাজার হালে থাকতে পারিস্—তাই করবি।—আমাদের দুঃখচেটে ভগবানের দরকার নেই।'

এ সকল কথায় কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। কেননা আমি জানি, বিষম বিষয় বিষে যে আকৃষ্ট, কিসে বিষয় হবে এই ধ্যান নিয়ে যে সর্ব্বদা থাকে, আর সত্য সত্যই বিষয়বৃদ্ধির জন্য যে ধ্যান ধারণা করে, সে ভগবৎ প্রেম হইতে বহু দূরে অবস্থান করে। গ্রাসাচ্ছাদনের মত যৎসামান্য বিষয় থাকাই আমি যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। এই কথার প্রতিবাদ করিয়া কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন, ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

ইহার উত্তরে আমি বলিব, যদিও অর্থার্থী ভক্ত বিষয় লাভের জন্যই তাঁহার আরাধনা করেন, তথাপি ঐ উদ্দেশ্যে ভগবৎ আরাধনায় কাহাকেও নিয়োজিত করা সদ্‌গুরুর কার্য্য বলিয়া মনে হয় না; ওরূপ আরাধনা কখনও উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। ভোগত্যাগ ও ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত হইয়া যিনি তাঁহার ভজনা করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ভক্ত। যেহেতু ভোগের দ্বারা কখনও কামের

নিবৃত্তি হয় না ; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তাহার বৃদ্ধিই হয়, সেইরূপ বিষয়ভোগদ্বারাও বাসনা বৃদ্ধি হইতে থাকে। গীতাতেই আছে—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ 'যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া জীবনের উপর মমতাশূন্য হইয়া 'আমি আমার' ভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক উপাসনারাজ্যে বিচরণ করেন তিনিই প্রকৃত শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে ; উপভোগের নিমিত্ত যিনি যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই সেইরূপ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আর যিনি আত্মধর্ম্ম অবগত হইয়া বিষয় বিতৃষ্ণাপূর্ব্বক উপাসনায় ব্রতী হন, ইহজন্মেই তাঁহার কর্ম্ম শেষ হইয়া যায় ; পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হয় না ; ইহাই শাস্ত্রমত। যাহা হউক আমি জানি, আমায় ধন দাও, আমায় পুত্র দাও, করিলেই যে ইহজন্মেই আমি ধনবান পুত্রবান হইব, আর আমার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে, তাহা হইতে পারে না ; আর তাহা হইলে রাস্তার ভিখারীরা কিছুদিন পরে এক একটা ধনী হইয়া যাইত ; অপুত্রক ধনীদিগেরও আর পুত্রের অভাব থাকিত না। দেশের দুঃখ দারিদ্র্যও ঘুচিয়াই যাইত। কিন্তু তাহা হইতে পারে না ; এই উপাসনা কেবলমাত্র যাতায়াতের জন্যই কর্ম্মফল সঞ্চয় করে। আমি পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি সেরূপ ফল আমায় ভোগ করিতেই হইবে।—

'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।'

শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রে ইহাও বলে যে—

'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি।'

অর্থাৎ 'একজন্মে না হয় বহু জন্মে, কোটীকল্পকালেও কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন নিস্তার নাই ; জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় নাই।'

যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধুবাবার ঐ সকল কথাগুলি আমার রুচিবিরুদ্ধ হইত ; তাই এত কথা বলিতে হইল। সাধুর সহিত এতদূর মিশামিশির পর একদিন ৺ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি আমায় আটজন ভক্তের নাম করিয়া বলিলেন, 'এরা আমার জন্মান্তরের ভক্ত ; এক সময় তোমার সঙ্গে এদের মিলন হবে। নৃপেনের কাছে যে একজন দাড়িওয়ালা গৌরবর্ণ লোক আসে, তাহার নাম যোগীন ; তুমি তাকে তোমার সমস্ত কথা বলো। সেও আমার একজন ভক্ত। আর একজন ভক্ত কৃষ্ণধন। তার বাড়ী বাগবাজার ; তুমি তার বাড়ী গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে এসো।'

এই দুইজনের কাহারও সহিত ইতিপূর্ব্বে আমার আলাপ ছিল না। ৺ঠাকুরের আদেশ মত ইহাদের সহিত আমি আলাপ করিয়াছিলাম। যোগেনদা সে সময় হইতে আমায় বিশেষ ভালবাসিয়া আসিতেছেন ; এবং কৃষ্ণধনের সহিতও

ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছি। একদিন কয়েকজন বন্ধুর সহিত কৃষ্ণধনের বাড়ী গিয়াছিলাম। আমার বেশ মনে আছে সেদিন তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে তত্ত্ব আসিয়াছিল। আমরা তাহার শ্বশুরবাটীর আম ও সন্দেশ খাইয়া আসিয়াছিলাম। তখন কৃষ্ণধনের সহিত তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নাই; পরে যে ভাবে হইয়াছিল যথাস্থানে বিবৃত করিব।

৪০

একদিন সাধুবাবার ওখানে গিয়া দেখি শ্রীশবাবুর সহিত তিন চারি জন ভদ্রলোক দৈব ও পুরুষকার লইয়া ঘোরতর তর্কযুদ্ধ লাগাইয়াছেন। শ্রীশবাবু বড় ভাল লোক। সুকিয়া ষ্ট্রীটেই বাড়ী; জ্ঞান ও ভক্তিতে সাধুর ভক্তদিগের অগ্রণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি আমায় যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং আজও তাঁহার ভালবাসার এক তিল কমে নাই।

আমি ভদ্রলোকদিগের বাক্‌যুদ্ধের মধ্যে আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। শ্রীশবাবুকে বার বার শান্ত হইতে বলায় তিনি কার্য্যের ভাণ করিয়া সে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলেও অবশিষ্ট কয়জনের মধ্যেই সেই তর্কযুদ্ধ ভীষণাকার ধারণ করিল। কেহ দৈবকে উচ্চে স্থান দিতেছে; কেহবা পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছে। আমি বলিলাম, 'মহাশয়! আপনারা দয়া করে চুপ করুন। সাধুর আশ্রমে, শান্তিস্থানে এসে এরকম তর্কবিতর্ক করা বড়ই দুঃখের কথা।'

একজন বলিল, 'আচ্ছা, আপনাকেই না হয় মধ্যস্থ করা হল; আপনি যা হয় একটা মীমাংসা করুন।'

'আমি বলিলাম,' দৈব ও পুরুষকার আমার নিকট দুই সমান; কেহ ছোট নয়, কেহ বড় নয়। জীবের মায়ার আবরণে দৈব ও পুরুষকার দুইই আবৃত; মায়ার আবরণ কেটে গেলে দৈব ও পুরুষকারের কোন ক্রিয়া থাকে না। একটী বীজ যেমন আবরণের মধ্যে দুই অংশে যুক্ত থাকায়, কৃষক কর্ত্তৃক রোপিত হলে ফল উৎপাদনের নিমিত্ত অঙ্কুরিত হয়; সেইরূপ দৈব ও পুরুষকার দুই অংশে এক হয়ে জীবের মায়া আবরণের মধ্যে এমন ভাবে অবস্থান করছে, যে জীব যখনই অহংচালিত হয়ে কাজ করে তখনই দৈব ও পুরুষকার জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে সুফলদানের নিমিত্ত কার্য্যকরী হতে থাকে। বীজের এক অংশ না থাকলে যেমন অপর অংশ অঙ্কুরিত হয় না, তেমনিই কেবল দৈব বা কেবল পুরুষকার কর্ম্মফল প্রদান করে না। আবার বীজ যদি ভর্জ্জিত বা আবরণযুক্ত হয়; তাহা হইলেও যেমন অঙ্কুরিত হয় না তেমন জীব বিবেকী ও মায়ামুক্ত হলে আর দৈব-পুরুষকারের কোন সম্বন্ধ থাকে না।

তখন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তরা করোমি' এই বাক্যের সার্থকতা সম্পন্ন হয়।'

একজন বলিয়া উঠিলেন, 'আপনার উদাহরণটা আমি ভাল বুঝতে পারলাম না।'

আমি তখন একটু হাসিয়া বলিলাম, 'শাস্ত্রের দোহাই না দিলে, দুএকটা শ্লোক না বলতে পারলে জ্ঞানীরা সহজে কথা গ্রহণ করতে পারেন না। শাস্ত্রে বলে কি জানেন?

'যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥'

অর্থাৎ, একটী চাকায় যেমন রথ চলে না, তেমন কেবল দৈব বা কেবল পুরুষকার দ্বারা জীব কর্ম্মফল লাভ করতে পারে না।'

'তবে কি আপনি বলতে চান দুয়েরই প্রয়োজন? এই জগতে দুই ছাড়া আর কিছু নেই?'

'না; দুয়ের সংযোগ ছাড়া কিছু হয় না। অন্ধকার আছে বলেই আলো আছে; দুঃখ আছে বলেই সুখ আছে; নরক আছে বলেই স্বর্গ আছে; মন আছে বলেই আত্মা আছে; অজ্ঞান আছে বলেই জ্ঞান আছে; অবিদ্যা আছে বলেই বিদ্যা আছে; অসৎ আছে বলেই সৎ আছে; প্রকৃতি আছে বলেই পুরুষ আছে। এক কথায় বলতে গেলে যেমন সৃষ্টি আছে বলেই প্রলয় আছে, তেমন পুরুষকার আছে বলেই দৈব আছে। সৃষ্টিকে বাদ দিলে যেমন প্রলয় বলে কিছু থাকে না, তেমন পুরুষকার বাদ দিলে দৈব বলে কিছু থাকে না। পুরুষকার কর্ম্ম, দৈব কর্ম্মফল। দুইই জীবেতে ওতঃপ্রোতভাবে রয়েছে। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের বাইরে গিয়ে যদি কেউ দাঁড়াতে পারে তার পক্ষে কিছুই নেই। সেই বলতে পারে 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

এমন সময় সাধু আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলে চুপ করিলাম। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কথা বার্ত্তা হচ্ছে?'

শ্রীশবাবুর এক গোঁড়া ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, 'অন্নদাবাবু শ্রীশবাবুকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে মীমাংসা করছেন; এঁদের বুঝাচ্ছেন দৈব ও পুরুষকার দুই এক।'

একথা শুনিয়া সাধু আমার দিকে চাহিলে আমি বলিলাম, 'উনি মোটেই শুনেন নি। দুই এক, একথা আমি একবারও বলি নি। আমি বলেছি দুই সমান।'

ভক্তপ্রবর বলিলেন, 'ওই তার নামই তাই। যাকেই বলে শিলা তাকেই বলে শালগ্রাম।'

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিলাম। অন্যান্য ভক্তেরাও আর তাঁহার

কথার উপর কোন কথা বলিল না দেখিয়া সাধু বলিলেন, শ্রীশবাবুর উপর কথা কওয়া মুর্খামি বৈ আর কি বল্‌বে ? দেখ অন্নদা ! তুমি এখানে এসে চুপ করে বসে থেকো ; কে কি বলে শুনে যেও ; পাণ্ডিত্য দেখাতে যেও না ; তাতে সবারই নিন্দে হবে। কে কি ভাবে আসে জান না ত ?' এইরূপ মিঠেকড়া দুই চারি কথা বলিতে বলিতে সাধু চলিয়া গেলেন।

সাধুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রস্থান করিলাম। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম,—শ্রীশবাবু 'যোগবাশিষ্টখানি চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছেন ; আর আমি ত অজ মুর্খ। সত্যই ওরূপ সভায় আমার কথা-কওয়া ঠিক হয় নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম—আর কখনও সাধু বাবার বাড়ী জ্ঞানের চর্চ্চা করিব না।

৪১

কয়েকদিন আবার সাধুবাবার বাটী না যাওয়ায়, একদিন স্বপ্নে দেখি সাধুবাবা ও ঠাকুর আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। সাধুবাবার ম্লান মুখে অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিয়াছে ; এবং ঠাকুরেরও ভাবে ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ অন্নদা ! নৃপেন খুব ভাল চিত্রকর মনে করে তাকে ৺মায়ের মূর্ত্তিখানি আঁকতে দিয়েছিলাম ; কিন্তু কি ছেলেমানুষি করেছে 'দেখেছ ?' এই বলিয়া একখানি কালিমাখা ৺মায়ের মূর্ত্তি আমায় দেখাইলেন।

আমি বলিলাম, 'একি ! এতে কালি ঢাল্‌লে কে ? সাধুবাবা ত খুব যত্ন করেই এঁকেছিলেন দেখেছিলাম।'

'তুমি দেখেছিলে ত কেমন হয়েছিল ? তারপর অবুঝের মত কি কাণ্ড করেছে দেখ না ? কি এক সামান্য কথার উপর রাগ করে ৺মায়ের সুন্দর মূর্ত্তিখানির উপর এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়ে কি করেছে দেখ না ?'

হঠাৎ সাধুবাবা কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া ঠাকুর আমায় বলিলেন, 'আজ ওর বাড়ী একবার যাস্‌ ত।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনিও যাবেন ?'

'হাঁ ! আমি ত ওর বাড়ীতেই আছি ;' বলিয়া তাঁহার হাতের মূর্ত্তিখানির দিকে তাকাইয়া 'হায়। হায় ! এমন মূর্ত্তিখানি ! এমন সুন্দর মায়ের মূর্ত্তিখানি ! কি কর্‌লে দেখ্‌লে ? বলিতে বলিতে ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম অনেকক্ষণ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বহু চিন্তার পর স্থির করিলাম, সাধুবাবার বাড়ী যাইতে

হইবে। তখন বেলা দশটা। রাস্তায় বাহির হইয়া সাধুবাবার দ্বিতীয় পুত্র সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। দেখা হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অন্নদাবাবু! আজ দুতিন দিন আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি যে?'

আমি বলিলাম, 'মন ভাল ছিল না; তাই যাই নি।'

'আপনাদেরও আবার মন খারাপ হয়? আচ্ছা আসুন; বলিয়া নমস্কারান্তে তিনি নিজকার্য্যে চলিয়া গেলেন।

আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আজ আর যেন পা চলে না; একপা অগ্রসর হইতে যেন দুইপা পিছাইতে হয়। সামান্য পথটুকু যেন আর ফুরাইতে চাহে না। এইভাবে যাইতে যাইতে সুকিয়া ষ্ট্রীটে বসন্ত চিকিৎসক এস. গাংগুলী মহাশয়ের বাড়ীর নিকট সাধুবাবার প্রথম পুত্র সন্তোষবাবুর সংগে দেখা হইল। সন্তোষবাবু আমাকে দেখিবামাত্র নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'খবর কি অন্নদাবাবু? অনেক দিন দেখি নি যে?'

প্রতিনমস্কার করিয়া আমি বলিলাম, 'আপনি কি শচীনের কাছে কিছু শোনেন নি?'

'হাঁ, হাঁ; আপনার ভগ্নীর বিবাহের কথা ত?—তার কি হল?—মনোমোহন পাঁড়ের সংগে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন?'

আমি বলিলাম, 'তাঁর বাড়ীতে যাই নি; তবে কালীবাবু কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে এটর্ণী গণেশবাবুর বাড়ীতে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন; ওখানে মনোমোহনবাবু প্রায়ই সকালে আসেন; সে আপনাদের বাড়ীর কাছে, বেশী দূর নয়।'

'তা আমি জানি; তারপর! কথাবার্ত্তা কি হল?—কালীবাবুটী কে?'

'কালীবাবু নির্ম্মলের জেঠতুতো ভাই; 'ডেলি নিউজে'র এডিটর। তাঁর সংগে একদিন মিনার্ভা থিয়েটারের অপরেশবাবুর কাছেও গিয়েছিলাম। কালীবাবু বড় ভদ্রলোক; আমার জন্য অনেক খেটেছেন; এমন কি একদিন সেই বইখানির জন্য মনোমোহন থিয়েটার হলে নিয়ে গিয়েও আমায় মনোমোহন-বাবুর সংগে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।'

'তারপর? ফলে দাঁড়াল কি বলুন?'

'মনোমোহনবাবুও দেখ্‌লাম বড় উদার; তিনি আমার দারিদ্র্যের কথা শুনেই কালীবাবুকে বল্‌লেন 'একমাস পরে আমি এঁকে একটী সাহায্য রজনী দেব।' তারপর আমায় জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—'কেমন? আপনার বন্ধু-বান্ধব আছে ত? প্রাইভেট সেল কর্‌তে পারবেন ত?—আমি বল্‌লাম, 'তা পার্‌তে পারি।'

সন্তোষবাবুর অকৃত্রিম ভালবাসার কথা এ জীবনে ভুলিবার নয়। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'আমাকে পঞ্চাশ টাকার টিকিট দেবেন, বিক্রি

করে দেব।' আমি শুনিয়া বড় সুখী হইলাম এবং সত্য সত্যই পরে যখন আমি সাহায্য রজনী পাই, তখন এই সন্তোষবাবু ও সুধীরবাবু দুভায়ে প্রায় আশী টাকার টিকিট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আমার পুরাতন বন্ধু শচীন, নির্ম্মল, ইন্দু প্রভৃতি দ্বারাও প্রায় তিন শত টাকার উপর টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। আমি ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে মোট চারিশত আটানব্বই টাকা সাহায্য রজনী হইতে সাহায্য পাইয়াছিলাম; তাহাতে আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, সন্তোষবাবুর সহিত এই সকল কথাবার্তা হইবার পর সন্তোষবাবু চলিয়া গেলে আমি ধীরপদবিক্ষেপে সাধুবাবার বাড়ী গিয়া পেঁৗছিলাম। বৈঠকখানা ঘরে গিয়া দেখিলাম সাধুবাবা, শরৎবাবু ও পরেশবাবু বা অন্য একজন, মোটের উপর তিনজন লোক রহিয়াছিল। সাধুবাবা আমায় দেখিয়া বলিলেন, 'এতদিন আস নি কেন?'

'আপনি না টানলে কি করে আসি? বলিয়া আমি আসন গ্রহণ করিলে শরৎবাবু প্রফুল্লবদনে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'অন্নদাবাবু! আপনি যে সাধুবাবার আশ্রম হবে বলে আদেশ পেয়েছিলেন, তা বোধ হয় কার্য্যে পরিণত হতে চলল; আজ তার প্লান করা হচ্ছে।'

আমি একটু বিস্মিত হইলাম। কেননা ঠাকুর বলিয়াছিলেন, বার বৎসর পরে সেই আশ্রম স্থাপিত হইবে। মনে মনে ভাবিলাম,—তাই ত! ঠাকুরের কথাও কি তবে মিথ্যা হয়? সাধুবাবা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ভাবছ? এমন একটি আশ্রম হবে যে তার লম্বা হল ঘরে যেন দৌড়াদৌড়ি করা যায়।'

আমি বলিলাম, 'বাবা। এখন ত তার দেরী আছে; কেননা ঠাকুর বলে-ছিলেন বার বৎসর পরে সেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা হবে।'

কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধভাবে 'কে বলেছে? কোন ঠাকুর? ঐ ঠাকুর?' বলিয়া সাধু সম্মুখস্থ ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তির দিকে দেখাইয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে এমন কয়েকটী অকথ্য কথা প্রয়োগ করিলেন যে তাহা শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ঠাকুরকে গালাগালি দেওয়া সাধুবাবার এই নূতন নয়। তাঁহার লিখিত 'ওপারের কথা' নামক পুস্তকখানি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা সেরূপ গালাগালি বা কুকথার সহিত ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত। আমি কিন্তু এ দিনের ব্যাপারে অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সাধুবাবার মুখে সেই মর্ম্মন্তুদ কথা শ্রবণ করিয়া আমি ভয়ে ভয়ে ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তির দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। আমার মনে হইল যেন সেই আঘাত ঠাকুরের বুকে বিষম বাজিয়াছে। সেই প্রতিমূর্ত্তিতেই দেখিলাম যেন তাঁহার ভাব মলিন ও দৃষ্টি কাতর হইয়া আসিতেছে; যেন তিনি কাঁপিতেছেন।

আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ভালমন্দ কিছু বলিতে না পারিয়া আমি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কম্পিতপদে সেইস্থান ত্যাগ করিলাম। বাহিরে আসিয়া পূর্ব্বরাত্রের স্বপ্নকথা স্মরণ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! একি হইল! একি শুনিলাম! নৃপেন সাধু ত ৺মাকে বা ঠাকুরকে কতদিন কত গালাগালি দিয়াছেন। কিন্তু কই? তাহা শুনিয়া ত কখনও এমন গ্লানি হয় নাই; এত আঘাত লাগে নাই; অসন্তোষের এমন সৃষ্টি ছাড়া দৃষ্টি ত আর কখনও নয়নে পড়ে নাই। হায়! একি ভীষণ অভিসম্পাত! আজ আমার কি ভীষণ দুর্দ্দিন! ভাবিতে আমার চক্ষে জল আসিল। আমি যেন আজ কত লাঞ্জিত, কতই লাঞ্ছিত হইয়াছি। আমি যেন আজ সত্য সত্যই সাধুবাবার বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইলাম। জীবনের মত বহিষ্কৃত হইলাম। হায়! কেন আজ আমি এখানে আসিলাম? কেন ঠাকুর আমায় এখানে পাঠাইলেন? কেন আমি আদেশের কথা বলিতে গেলাম? আর কেনই বা এমন অপ্রিয় কথা শুনিলাম? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতেছি আর ফিরিয়া দেখিতেছি কেহ ছুটিয়া আমায় বাধা দিতে আসিতেছে কি না—ভগ্নহৃদয়ে আমায় ফিরিয়া যাইতে নিষেধ করিতে আসিতেছে কি না। চলিতে চলিতে অন্তরের সহিত ভগবানকে জানাইতেছি, যেন কেহ আসিয়া আমায় আবার সাধুবাবার বাড়ী ধরিয়া লইয়া যায়। আমি আবার সাধুবাবার বাড়ী যাই; সাধুবাবার সঙ্গে কথা কই; সাধু-বাবার মুখে অনুতাপের কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াই;—আমি যেমন ছিলাম তেমনই থাকি। কিন্তু কই? কেহ ত আসিল না?

ধীরে ধীরে আমাহার্ষ্ট ষ্টীটের মোড়ে আসিয়া পেঁছিলাম। সাধুবাবার বাটী হইতে কেহ আসিতেছে কি না দেখিবার জন্য এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে দেখিলাম একজন আসিতেছেন। তিনি অন্য কেহ নহেন, শ্রীমানী বাজারের মালিক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানী মহাশয়। তিনি তখন প্রায়ই সাধুবাবার নিকট যাতায়াত করিতেন। আমি মনে করিলাম, তিনি বোধ হয় আমাকে সাধুবাবার বাটী ধরিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইল না। তিনি আমারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার বাসাতেই যাইতেছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল একখানি ৺আদ্যামায়ের ফটো সংগ্রহ করা। আমি তাঁহাকে বাসায় লইয়া গেলাম। বৈঠকখানায় তাঁহাকে বসাইয়া একখানি ৺মায়ের ফটো আনিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। ফটো দেখিয়া সাশ্রুনয়নে ভক্তি সহকারে তিনি ফটোখানি মাথায় ও বুকে ঠেকাইলেন এবং ৺মায়ের কথা শুনিতে শুনিতে ভক্তি গদগদকণ্ঠে 'মা—মা!' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের চোখের জলে আমার সমস্ত ব্যথা ধুইয়া মুছিয়া গেল। আমার বুক হালকা হইয়া গেল; আমি বেশ একটু আনন্দ পাইলাম। এইরূপে বেলা অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শ্রীমানী মহাশয় বিদায় লইলেন। আমিও স্নানাহারে গেলাম।

৪২

একদিন সন্ধ্যার সময় খালের ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখি শচীন অপেক্ষাকৃত একটী নিশ্জর্ন স্থানে একাকী বসিয়া আপন মনে গান ধরিয়াছে

আকুল ভবসাগর বারি পার কে হবি তোরা আয় রে আয়।
শ্রীগুরু ভবকাণ্ডারী হয়ে মোর ভগ্ন তরী বেয়ে যায়॥ ইত্যাদি।

আমি ধীরে ধীরে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইলাম ; ক্রমশঃ গানও শেষ হইল। শচীনের গণ্ডস্থল বহিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল। দৃষ্টি স্থির ; যেন কোন গভীরভাবে বিমুগ্ধ ; দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইতে লাগিল। শচীনের মত ভক্তের সংগে আমি মিলিতে পারিয়াছি ভাবিয়া আমারও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। অতি সন্তর্পণে আমি শচীনের সম্মুখীন হইলে শচীন আমাকে দেখিয়া চক্ষু মুছিয়া পুনরায় গান ধরিল—

কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে।
ফেলিস্ নে মা! ধুলো কাদা মেখেছি বলে। ইত্যাদি।

শচীন ত প্রায়ই এই সকল গান গায়। কিন্তু এমন মধুর, এমন সুন্দর ভাবোন্মেষ হইতে ত আর কখনও দেখি নাই!

শচীনকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, 'ভাই! আজ তুমি কোন ভাবে বিভোর হয়ে এই গান দুটী গাইলে আমায় বল্‌তে হবে।'

মৃদু হাসিয়া শচীন বলিল, 'ভাব টাব কিছু বুঝি না ভাই! তবে চারিদিকের হাহাকার যেন আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না। মনে হচ্ছে পড়ে শুনে আর কি হবে? কাজে লেগে যাই। যাতে একটীও দরিদ্রের দুঃখ ঘোচাতে পারি তাই করি। তুমি কি বল?'

আমি শচীনের ভাব দেখিয়া ভাবিলাম, শচীনের বুকের রোগটা বোধ হয় আবার বাড়িয়াছে। কারণ আমি জানিতাম বুকের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার ঠিক থাকে না ; কেমন এক রকম হইয়া যায়। আমি বলিলাম, 'ভাই! সামান্য কারণে চঞ্চল হয়ে উঠো না ; যা কর্‌তে এসেছ তাই কর। আগে পূর্ব্ব জন্মের বাসনার শেষ করে নিজেকে নিজে মুক্ত কর ; তারপর ভগবান যা করান করে যেও।'

এখানে বলা আবশ্যক যে আমি নৃপেন সাধুর সঙ্গে মিশিবার পর হইতে অনেকের পূর্ব্ব জন্ম জানিতে পারিয়াছিলাম। সাধুবাবাই বোধ হয় আমাকে সে শক্তি দিয়াছিলেন। কারণ একদিন তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, 'অন্নদা! তুমি এখন থেকে অনেকের পূর্ব্ব জন্ম জান্‌তে পার্‌বে। তখন হইতেই তাঁহার কথা কিছু কিছু ফলিয়াছে। তাঁহার প্রধান ভক্ত শরৎবাবুর ছোট ভাই চারুবাবুর জীবনী জানিতে পারিয়াছিলাম। শচীনের পূর্ব জন্ম ভালভাবেই জানিয়াছি। শচীনের মার এবং এপর্য্যন্ত আরও অনেকের জীবনী জানিতে

পারিয়াছি। তাই শচীনকে তাহার পূর্ব্ব জীবনের বাসনার শেষ করিয়া লইতে বলিয়াছিলাম ; কেননা, যতক্ষণ পূর্ব্ব জন্মের বাসনা, ভোগের দ্বারা শেষ বা বিচারের দ্বারা ত্যাগ না হয় ততক্ষণ নূতন কর্ম্ম অনুষ্ঠানে আনন্দ পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব জন্মের যে ভাব চিত্তে চিত্রিত আছে তাহা বিনা ভোগে যাইবার নয় ; জন্ম জন্মান্তরেও যায় না। রৌদ্র ছায়ার মত পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শচীনের জন্মান্তরীণ বাসনা ছিল মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তার হওয়া। তাই তাহাকে বার বার আগে ডাক্তারিটা পাশ করিয়া লইতে বলায় সে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাধনার দ্বারাও কি জন্মান্তরীণ বাসনা ক্ষয় হয় না ?'

আমি বলিলাম, 'কতক হয় বটে ; সম্পূর্ণ হয় না। তা যদি হত, তা হলে জড়ভরতের এত সাধন বল থাকা সত্বেও হরিণযোনি প্রাপ্তি হয় কেন ? বিশেষতঃ অধ্যয়নও সাধনা। জ্ঞান ও পরোপকারের জন্য যে অধ্যয়ন তাকেও তপস্যা বলে। শাস্ত্রে আছে—'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ।' তুমি খুব মনোযোগের সহিত ডাক্তারি পড়াটা শেষ করে নাও।' তারপর অনেক কাজ করতে পারবে। তোমার দ্বারা অনেকের অনেক উপকার হবে।'

শচীন বলিল, 'জানি না ভাই ! আমার প্রাণে এই তুমুল সংগ্রাম কে এনে দিলে ? আমি একটা কিছু না করে স্থির থাকতে পারছি না। তুমি বল কিসে জীবের মঙ্গল হয়। আমি যে শুধু আধ্যাত্মিক মঙ্গলের কথা বলছি তা নয় ; দুবেলা দুমুঠো খেয়ে যাতে আনন্দে থাকতে পারে এখন তাই বল।'

আমি বলিলাম, "ভাই ! আগে মানুষ হও। সবার কাছে মানুষ নামের যোগ্য হও। তোমার মনুষ্যত্বের আলো আগে সাধারণের চোখে পড়ুক। তারপর তুমি কাজে দাঁড়াতে পারবে। এখন তুমি ছোট ছেলে ; দেখায় তোমায় আরও ছোট। তার উপর এখনকার মতে বি, এ, পাশ না করলে ত শিক্ষিত বলে কেউ স্বীকারই করে না ; এমন অবস্থায় সামান্য মানুষ তুমি এই জনসমুদ্রের মধ্যে কি উপায় করতে পার, যাতে দীন দুঃখীর দুঃখ ঘোচে ? ঠাকুর কি বলে গেছেন মনে নেই ? বিনা চাপরাশে যতই হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কর না কেন, কেউ তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না ; হয় ত পাগল বলেই উড়িয়ে দেবে। আগে চাপরাশ পাও ; তখন দেখবে উড়িয়ে দেওয়া ত দূরের কথা, সমালোচনা করতেও লোকে ভয় পাবে। ঠাকুর নরেনকে বলেন নি ?'—সমুদ্রের তীরে যে সব চিটি কাঁকড়াগুলি দৌড়াদৌড়ি করে তোরাও এক একটা তাই ; ভেবে বল্ দেখি সমুদ্রের মধ্যে যে অসংখ্য জীব জন্তু আছে, তোরা তাদের কি উপকারে আসতে পারিস্ ? দুটো হাসপাতাল, দুটো দাতব্য চিকিৎসালয়, কি দুটো পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করে বড় জোর না হয় দু একজনকে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক কষ্টের হাত থেকে অব্যাহতি দিলি ; তাতে আর জীবের কি হল ?

দুঃখের কী লাঘব হল? জীবকে যদি এমন কিছু দিতে পারিস্, এমন কোন ভাবের ভাবুক করে তুলতে পারিস্ যাতে একজনও ত্রিতাপ জ্বালার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হয়, একটী অনাথও সত্য সত্যই সনাথ হয়, একটী জীবও অষ্টপাশমুক্ত হয়ে আনন্দরাজ্যের দিকে ধাবিত হয়, তবেই ত তোদের শ্রম সার্থক হয়; পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা হয়; নিষ্কাম ধর্ম্মের মহাব্রত সত্য হয়।'

আমার কথা শুনিয়া শচীন বলিল, 'ভাই! তবে কি বিবেকানন্দ যা করে গেল সবই মিথ্যা?'

আমি উত্তর করিলাম, 'না, না;—তা কেন? মিথ্যা হবে কেন? বিবেকানন্দ যে চাপরাশ পেয়ে সমস্ত কাজ করে গেছে। বিবেকানন্দ ত শুধু দেহরোগ সারাবার ব্যবস্থা নয়, আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে যাতে জীব আধ্যাত্মিক ভাবে ভরপুর হয়ে যায় তার জন্যও যথেষ্ট করে গেছে। বিবেকানন্দের উপদেশ, তার জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ ও রাজযোগের ব্যাখ্যা যে এক নতুন ছাঁচে ঢালা। বিবেকানন্দ যে ভাবের বীজ সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল, দেখ্বে যখন সে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফলপুষ্পশোভিত হয়ে উঠ্বে, তখন দেশের অবস্থা কি উন্নত ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হয়। ভাই! আমাদের দৃষ্টি স্থূল; তাই শুধু বেলুড়মঠ ও মঠবাসীদের বাহ্যিক ভাবটাই চোখে পড়ে। বিবেকানন্দের একটুও ভাবের আগে অধিকারী হও; তারপরে তুমি কাজে ব্রতী হয়ো। আগে নিজের দুঃখ ঘোচাও; তারপর পরের দুঃখ ঘুচিও। আগে নিজের অভাব দূর কর; তারপর পরের অভাব দূর কর। আগে নিজে উপযুক্ত হও; তারপর সবাইকে উপযুক্ত করতে চেষ্টা করো। অন্ধ হয়ে অন্ধকে পথ দেখাতে যেয়ো না। তাতে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি ও অনুতাপই লাভ হবে; পরিণামে কেবল অনুশোচনা ও হতাশ্বাসই সার হবে।'

শচীন চুপ করিয়া রহিল। আর কিছু বলিল না দেখিয়া আমি মনে করিলাম বুঝি শচীন রাগ করিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করায় শচীন হাসিয়া বলিল, 'না, না; রাগ কর্‌বে কেন? তোমার কথায় কি কখনও রাগ হয়? আমি ভাব্‌ছি চাপরাশ মেলে কিসে?'

'চাপরাশের জন্য ভাব্‌ছ কেন ভাই? পড়াশুনা শেষ কর; তারপর যখন শ্রীমার কৃপা পেয়েছ তখন আর চাপরাশের বাকি রইল কি? আগে উপযুক্ত হও; তারপর সকল আশাই পূর্ণ হবে। রাজার ছেলে যখন তুমি তখন রাজসিংহাসন ত একদিন তোমারই হবে; রাজদণ্ডও একদিন তোমারই হাতে শোভা পাবে। এখন আদর্শ গৃহীর মত চল তাহলেই হবে।

'আদর্শ গৃহী মানে কি? কি কি কাজ কর্‌লে আদর্শ গৃহী হওয়া যায় বল্‌তে পার?'

'হাঁ ; কিছু কিছু পারি বৈ কি।'

'তবে আজ আমায় কিছু বল।'

'দেখ ভাই! এদিককার লোকের খাওয়ার বিচার বড় কম ; সে জন্য সবাই তমোগুণাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। আহার শুদ্ধি দ্বারাই যে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তে সাত্ত্বিক ভাব আসে, একথা এদিককার লোক মোটে মানতে চায় না ; তাই ক্রমশঃ ধর্ম্মহারা হচ্ছে ; গুরু উপদিষ্ট কাজে শ্রদ্ধা হচ্ছে না ; পুরাণাদি শাস্ত্রও আর বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি কে, একথা যতক্ষণ না জানতে পারছি— ততক্ষণ আমার ধর্ম্ম কি, তা কেমন করে বুঝব ? আমি কে, জানতে হলে চিত্ত-শুদ্ধির প্রয়োজন। কারণ মার্জ্জিত দর্পণে যেমন লোকের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ শুদ্ধচিত্তেই আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে ; কাজেই চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আত্ম-দর্শন ঘটে না। সেই চিত্তশুদ্ধি দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণে প্রকাশ পায়, যথা—

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥'

এই সকল ধর্ম্মলক্ষণ আবার বিশুদ্ধ পানভোজন হ'তেই ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। কাজেই প্রথমতঃ বিশুদ্ধ পান ভোজনের দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

আদর্শ গৃহস্থ নিষিদ্ধ তিথিতে নিষিদ্ধ বস্তু আহার করবে না।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ পানীয় দ্রব্য কখনও পান করবে না।

নিষিদ্ধ তিথিতে, জন্মবারে, পর্ব্বদিনে ও রবিবারে স্ত্রী সঙ্গ করবে না ; কদাপি রজঃস্বলা নারীতে উপগত হবে না। ঋতুর ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, ও ষোড়শ দিনে যদি বার তিথি শুদ্ধ থাকে তবে প্রতি মাসে উক্ত যে কোন এক, দুই বা তিন দিন গমন করতে পারবে ; কখনও দিবাভাগে স্ত্রীসঙ্গ করবে না।

পানভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ীতেই প্রশস্ত। আমাদের যখন বাম নাকে শ্বাস প্রশ্বাস বয় তখন ইড়া অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ী, যখন ডান নাকে শ্বাস প্রশ্বাস বয় তখন পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্যনাড়ী, আর যখন দুই দিকেই শ্বাস প্রশ্বাস বইতে থাকে তখন সুষুম্না ক্রিয়াশীল হয়। পূজা পাঠ বা কীর্ত্তন ইড়া বা চন্দ্রনাড়ীতে এবং ধ্যান বা জপ সুষুম্নাতে করাই বিধেয়।

অতিথিসেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। আয়ের অর্থাৎ সংসারে খরচের পর উদ্বৃত্ত অর্থের এক চতুর্থাংশ দান করতে হয়। প্রত্যেক বস্তু নিবেদন করে আহার করবে আর যা নিজের ভক্ষ্য নয় তা দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন করবে না ; নিবেদন না করে ভোজন করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।'

শচীন বলিল, 'তাই বুঝি আদ্যামা আদেশ করেছেন, 'মা খাও মা পর' বলে সমস্ত নিবেদন করে ব্যবহার করলে ৺মা সন্তুষ্ট হবেন ?'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় ; ৺মা কি অশাস্ত্রীয় কথা বলেন ? 'অন্নং বিষ্ঠা

পয়ো মূত্রং যদ্দেবায়ানিবেদিতম্‌' অর্থাৎ অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা আর জল মূত্রতুল্য। চিত্ত যাদের বিষাকৃষ্ট, ভোগ বাসনা পরিপূর্ণ, তারাও ইন্দ্রিয় ভোগ্য সকল বস্তু যদি জগদম্বাকে নিবেদন করে ব্যবহার করে তাতেও ক্রমশঃ তাদের চিত্ত শুদ্ধ হবে; মন প্রবৃত্তির পথ থেকে নিবৃত্তির পথে ফিরবে। এ আমার মুখের কথা নয়; শাস্ত্রেই আছে—

'বিষয়াকৃষ্টচিত্তস্য যন্মহৌষধমুচ্যতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্যবস্তূনাং ভগবত্যৈ সমর্পণম্‌।'

গীতায়ও আছে—

'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।'

বুঝলে ভায়া? তাই ৺মা আমাদের দয়া করে প্রচার করতে বলেছেন—'মা খাও, মা পর' বলে সমস্ত বস্তু আমায় নিবেদন করলেও আমার পূজা হবে। আমি কেবল শাস্ত্রবিহিত মতেই পূজা পেতে ইচ্ছা করি না।—ভাই? ৺মা কি আর বোঝেন না যে কলির জীব উদারান্নের চেষ্টাতেই ঘুরে মরছে; কি উপায়ে পরিবারবর্গকে দুবেলা দুমুঠো খেতে দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করবে তাই ভেবেই আকুল। তাদের যদি এখন বলা যায় যে তোমরা সকলে শাস্ত্রীয় মতে ৺মায়ের পুজো কর; না হলে চিত্তশুদ্ধি হবে না, সব নরকে যাবে! তাহলে কি তারা সে কথা শুনবে? কখনই নয়। কথায় বলে, 'আত্ম রেখে ধর্ম্ম।' তারপর আদ্যাস্তবের কথা বলা হয়েছে। তাতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ দূর হবে। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আমাদের কি দুর্গতিই না করছে! শুধু এক শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষ বহ্নিতেই দেশটা জ্বলে গেল। এখন ধর্ম্ম কর্ম্ম সব লোপ পেতে বসেছে; যত দলাদলির সৃষ্টি হচ্ছে ততই শক্তি কমে আসছে। সরলতা স্বার্থত্যাগ সব চলে যাচ্ছে; জীব যেন সর্ব্বদাই প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধ হচ্ছে। এ অবস্থায় কি করেই বা ভগবৎ উপাসনা হয়? আর কি করেই বা জীব শান্তি তৃপ্তি আনন্দের আস্বাদ পেতে পারে?'

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই! আদর্শ গৃহীর বাক সংযম কিরূপ হওয়া দরকার?'

আমি উত্তর করিলাম, 'গৃহীর বাক্‌ সংযম অসম্ভব। তবে যা বলবে তা যেন সত্য হয়, খাঁটি হয়, আর সুচিন্তিত হয়; বৃথা বাক্‌ বিতণ্ডা বা গল্প গুজব আদৌ করবে না। অবশ্য যে গল্পে শিক্ষার বিষয় আছে সে গল্প দোষের নয়।'

'আচ্ছা; সত্য কথায় যদি কারো অপকার হয়?'

'আমার বিশ্বাস সত্য কথায় কারো অপকার হয় না।' তবে শাস্ত্রে কি বলে জান?—

'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌।'

'অপ্রিয় সত্য কাকে বলে? যদি অপ্রিয় সত্য বলা অন্যায় হয়, তাহলে যে বিচার চলে না?'

'আমি তা বল্‌ছি না। চোর চুরি করেছে সে কথা তোমাকে বল্‌তেই হবে; না হলে তার চৌর্য্যদোষ কখনও দূর হবে না।' তাকে অপ্রিয় কথা বলে না; তাতে উভয়তঃ উপকার সম্ভব। অপ্রিয় কথা কেমন জান? মনে করে তোমায় একজন খেতে নিমন্ত্রণ করেছে; কিন্তু তুমি খেতে গিয়ে দেখলে সে কার্য্যগতিকে স্থানান্তরে চলে গেছে। তার পরিজনবর্গ তোমাকে তেমন আদর করে খাওয়ালে না। পরে তোমার সেই বন্ধু এসে যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে, 'ভাই! আমাদের বাড়ী খেতে গিয়েছিলে ত? খাওয়া ভাল হয়েছিল ত?' তখন তুমি—'হাঁ গিয়েছিলাম; বেশ খাওয়া হয়েছিল' ভিন্ন আর কিছু বল্‌বে না। এই মন্দের স্থানে ভাল বলাটা মিথ্যা বলা নয়; অপ্রিয় সত্য গোপন করা মাত্র। এতে মিথ্যা বলার পাপ হবে না।'

'আচ্ছা; সঞ্চয় কি গৃহস্থের ধর্ম্মের অন্তর্গত?'

'নিশ্চয়; 'কর্ত্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং কর্ত্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ। কিছু কিছু সঞ্চয় প্রত্যহ বা প্রতিমাসে করা উচিত। কিন্তু অতিরিক্ত সঞ্চয় করা উচিত নয়।'

'যার অতিরিক্ত আয়, সে কি কর্‌বে?'

'কেন? ব্রত অনুষ্ঠান, পূজা, পাঠ, হোমাদিতে ব্যয় কর্‌বে। বিবেকানন্দ বলে গেছেন, 'দরিদ্রনারায়ণের সেবা'—তাই কর্‌বে। সে ত ব্যয় নয়—সে জমান; শ্রেষ্ঠ জমান—এক গুণ কোটী গুণ হয়ে থাক্‌বে।'

'কোন দান শ্রেষ্ঠ?'

'দান মাত্রই শ্রেষ্ঠ; তবে সকাম নিষ্কাম ভেদে ফলের তারতম্য আছে। ভোগের দ্বারা সকাম দান ক্ষয় হয়; আর নিষ্কাম দান অক্ষয়। নিষ্কাম দান হতে ক্রমশঃ ভোগ বাসনা দূর হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়, প্রাণে শান্তি আসে; ত্রিতাপ জ্বালার নিবৃত্তি ঘটে।'

৪৩

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা; শাক্ত বৈষ্ণবাদি ভেদে উপাসনার যে পাঁচটী স্তর নির্দ্দেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে কোন্ স্তরের সাধক শ্রেষ্ঠ?'

আমি উত্তর করিলাম 'যে, যে, স্তরের, তার পক্ষে সেই স্তরই শ্রেষ্ঠ; কারণ প্রত্যেক জীবকেই প্রত্যেক স্তর দিয়ে গন্তব্য স্থানে যেতে হয়। গন্তব্যে পেঁছুলে স্তরের অতীত হয়; তখন আর ভেদাভেদ থাকে না। যেমন ছাদে উঠ্‌তে হলে প্রত্যেক সিঁড়িটা দিয়ে উপরে উঠ্‌তে হয়, সেই রকম আধ্যাত্মিক জগতে আত্মতত্ত্বে পেঁছুতে হলে সাধনার প্রত্যেক স্তর দিয়েই যেতে হয়। কোন স্তরই

কারো চেয়ে ছোট নয়, সকল স্তরই সমান।'

'আচ্ছা; ধর্ম্মশাস্ত্রে শাক্ত শৈবাদি কেবল পাঁচটী স্তর নির্দ্দেশ করা হল কেন? ব্রহ্ম উপাসনাও ত একটী স্তর?'

ব্রহ্ম উপাসনা বলে যে একটী পৃথক উপাসনা আছে, তা আমার মনে হয় না। সব উপাসনাই কি ব্রহ্ম উপাসনা নয়? কারণ, ব্রহ্ম ছাড়া ত কিছুই নেই; আর নির্গুণ ব্রহ্মেরও উপাসনা হয় না; উপাসনা করতে হলেই সগুণের অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে। তাই বেদান্তসারে বলেছেন—

'উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি।'

'যেহেতু নির্গুণব্রহ্ম 'অবাঙ্মনসগোচরম্' অর্থাৎ বাক্য মনের অতীত; যাবতীয় ইন্দ্রিয় অগোচর। শুধু কি তাই? চিত্তবৃত্তি তন্ময় করার নামই উপাসনা; আবার বিনা অবলম্বনে চিত্তের তন্ময়তা আসে না। যাঁর প্রকৃত স্বরূপ মানুষের ভাব ও ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; আকাশের মত যিনি ওতঃপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান; চক্ষু কর্ণ মন বুদ্ধিও যাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না;—যিনি জ্যোতির্ম্ময় প্রেমময় দয়াময় প্রভৃতি সংজ্ঞার ভিতরও আসেন না;—শাস্ত্রকারও যাঁর স্বরূপ নির্ণয় করতে পারেন নি; মুনি ঋষি সিদ্ধ পুরুষের কাছেও যিনি অব্যক্ত;—কি উপায়ে সাধক সেই নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করে উপাসনা করতে পারেন? আর এমন গুরুই বা কে আছেন যিনি সেই ব্রহ্ম উপাসনার উপদেশ দিতে পারেন?'

'তবে কি ব্রহ্ম উপাস্য নন?'

'সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরই উপাস্য; নির্গুণ ব্রহ্ম নন।'

'তবে কি নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান কারও হয় না?'

'সগুণের উপাসনা করতে করতেই নির্গুণের জ্ঞান লাভ হয়।'

শচীন হাসিয়া বলিল, 'বেশ; তাই যদি হয়,—সগুণের উপাসনা দ্বারাই যদি নির্গুণের জ্ঞান লাভ হয়,—তবে সেই রকম করে যাঁরা নির্গুণের জ্ঞান লাভ করেছেন—তাঁরাই উপদেশ দেবেন।'

'না ভাই! তাও হতে পারে না; যেমন নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমে সমুদ্র মেপে সমুদ্রের খবর দিতে পারে না, সেই রকম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মভাব প্রচার করতে কেউ যায় না। তাই বলে—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'; অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রহ্ম স্বরূপে নিজ পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে জড়ভরত সেজেছেন। নদী যেমন সাগরসঙ্গমে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে জীব ব্রহ্মস্বরূপে লীন হয়ে যায়। তখন কে কার খবর দেয়! এখনকার দিনের ব্রহ্মজ্ঞান কথাটা আমাদের দেশের একটা কথার কথা; ধারণার কথা নয়। দুষ্ট ছেলেকে যেমন চাঁদ পেড়ে দেব—চুপ কর' বলে শান্ত করে, এও তেমনই একটা স্তোক বাক্যের মত চলতি হয়ে গেছে।'

'এ তোমার অন্যায় কথা'; তোমার একগুঁয়ে এক চোখো গোঁড়ামি। কারণ ঠাকুরই বলেছেন, 'যত মত তত পথ'।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'না, ভাই! তা নয়; এতে একটুও গোঁড়ামি নেই! আর ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' বাক্যেরও কিছুমাত্র অমান্য এতে হয় না; কারণ এ শাস্ত্রসঙ্গত কথা। আর ঠাকুরের কথা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, সেই কথা কথাই নয়; সে কথা আমি মান্‌তে চাই না। তাছাড়া যুক্তিপূর্ণ কথা যদি গোঁড়ামি বা একচোখো কথা হয়, তাহলে 'যুক্তিমূলং হি শাস্ত্রম্' বাক্যের সার্থকতাও থাকে না। 'ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও টের পাবে না'—এই নীতির ব্রত যদি সত্য ব্রত হয় তাহলে আমার কথা যে একচোখো হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আচ্ছা তুমি ভেবে দেখ দেখি যারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সমাজ-ভুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভেচ্ছা কতদূর; আর তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কেমন উপযুক্ত অধিকারী। মুখে বল্‌লেই ত হল না? কাজেও দেখাতে হবে। ভোগবিলাসে গা ঢেলে দিয়ে, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, আচার বিচার ত্যাগ করে, ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তিও যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে,—তাহলে সাধু সন্ন্যাসী মুনি ঋষি প্রভৃতি মনস্বী মনীষিরা এমন কঠোরতা অবলম্বন করে, বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহং মমত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, এমন কি জীবনে পর্য্যন্ত বীতস্পৃহ হয়ে, বনে জঙ্গলে বসে জপ তপ কর্‌তে কর্‌তেই কালের কোলে লয় হতে চাইতেন না।'

'তবে কি তুমি বল্‌তে চাও, ব্রাহ্মসমাজের কোন আবশ্যকতা বা সার্থকতা নেই?'

'তা কেন থাক্‌বে না? আমি ত একথা বলি, যে ব্রাহ্ম সমাজ মায়ের ইচ্ছায় হয়েছে। হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা কর্‌বার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি; ৺জগদম্বার ইচ্ছায়ই এসব হয়েছে। ঘর পড়ে যাবার মত জোরে ঝড় উঠ্‌লে গৃহস্বামী যেমন নানা উপায়ে ঘরখানি রক্ষা করেন এও ঠিক সেই রকম। অনুকরণপ্রিয় মনুষ্যত্বহীন হয়ে তখন আমাদের সমাজ সাহেব সাজ্‌বার বাসনায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে যেতে লাগ্‌ল, পিতৃপিতামহ প্রভৃতি কত মহাজনের কত জন্মের বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ভাবকে পদদলিত করে নূতন প্রেমে গা ভাসাতে লাগ্‌ল, তখন ইচ্ছাময়ী ৺মায়ের ইচ্ছায় তাঁর কয়েকটী উপযুক্ত সন্তান হিন্দুর পতোনোন্মুখ সমাজ ও ধর্ম্মকে রক্ষা কর্‌বার জন্যই অস্থায়ী খুঁটির মত ভার গ্রহণ কর্‌তে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। তারপর যেমন নূতন নূতন স্থায়ী খুঁটি বস্‌ছে, ঘরও হচ্ছে, অমনই এক একটি অস্থায়ী খুঁটি উঠে যাচ্ছে। আর যাঁরা অস্থায়ী খুঁটি জড়িয়ে ধরে-ছিলেন, তাঁরা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়্‌ছেন। জেনো ভাই! ভাব না থাক্‌লে লাভ হয় না। আমি অবশ্য বল্‌ছি না যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর কেউ ভাবুক নেই।'

'ভাবুকের লক্ষণ কি?'

'প্রধান লক্ষণ তিনটী ; নির্বিবাদিতা, নিরহঙ্কারিতা ও নিঃস্বার্থপরতা।'

'তুমি এমন লোক ব্রাহ্মসমাজে দেখেছ ?'

'দেখেছি ; এই খালের ধারে বেড়াতে দেখেছি। আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেও বড় আনন্দ লাভ করেছি। কিন্তু সমাজে তিনি বড় একটা যাতায়াত করেন না ; বৎসরান্তে একবার কি দুবার যান।'

'তুমি ত প্রায়ই ব্রাহ্ম সমাজে দু বাড়ীতেই যেতে ; সেখানে এ রকম লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয় নি ?

'না।'

'তবে যেতে কেন ?'

'নববিধানের কীর্ত্তন আর সাধারণ সমাজের দু একটী মেয়ের গান আমার বেশ লাগত ; তাই যেতাম।'

শচীন হাসিয়া বলিল, 'তুমি তাহলে মেয়েদের গান শুনতেই যেতে ?'

'নিশ্চয় ; 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরম্'। গান শোনাতে পারি না বটে, শুনতে বড় ভালবাসি ; বিশেষ আবার মায়েদের গলায় বড় মিষ্টি লাগ্‌ত।'

'এতই যদি ভাল লাগ্‌ত ত এখন যাও না কেন ?'

'দেখ আঙ্গুর বড় মধুর ; কিন্তু দুটী সন্দেশ খেয়ে আঙ্গুর খেলে কি আর তেমন লাগে ?'

'আচ্ছা, যাক্ সে কথা ; উপাসনা সম্বন্ধে আর দুএকটী কথা জিজ্ঞেস কর্‌ব। ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে প্রতিমাদিকে সাধকের কল্পনা বলে নির্দ্দেশ করেন সেটা কি ঠিক কথা ?'

'ভুল ; সম্পূর্ণ ভুল ; এতে সাধকের কোন কল্পনা নেই। যিনি নিরাকার, নির্গুণ তাঁকে উপাসকেরা কেমন করে উপাসনা কর্‌বে ? তাই তিনি স্বেচ্ছায় উপাসকের উপাসনার জন্য শরীর ধারণ করেছেন।

'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥'

'এই ত 'রূপকল্পনা' রয়েছে।'

'না ভাই! এ কল্পনা সাধকের কল্পনা নয় ; কারণ 'ব্রহ্মণঃ' শব্দটা কর্ত্তায় ষষ্ঠী। এখানে বলা হয়েছে তিনি নিজেই রূপ ধারণ করেছেন। ঠাকুর বল্‌তেন না ?—'তিনি নিরাকারও বটেন ; সাকারও বটেন।' দেবতার বা মানুষের কার্য্যসিদ্ধির জন্য বা ধর্ম্মরক্ষার জন্য তিনি রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।'

'তুমি ত কোন শাস্ত্র পড় নি বল। এসব কোথা থেকে জান্‌লে ?'

'পড়ে কি প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় ? এসব সাধুসন্তের মুখে শুনেছি ; এ শুধু পুরাণের কথা নয় ; তন্ত্রের কথা। উপনিষদের কথা।'

শুনিয়া শচীন হাসিয়া বলিল, 'আমার কাছে পুরাণও যা, তন্ত্র উপনিষদও তাই ; অন্ধের কিবা রাত্র কিবা দিন। আচ্ছা ; ওসব কথা এখন থাক। তুমি যে নির্ম্মল দত্ত নিবারণ দত্তের সঙ্গে দেখা করবে বলেছিলে—তার কি হল ?'

'রাত হয়ে গেল। চল, যেতে যেতে বলব ;' বলিয়া শচীনকে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম। যাইতে যাইতে বলিলাম, 'দেখ শচীন! যোগেনদা ত বললে—মনোমোহন বাবু নির্ম্মল দত্তের ক্লাসফ্রেণ্ড ; নির্ম্মল দত্ত বলেছে —বইখানি মনোমোহন বাবু নিতে পারেন।'

'বেশ ত, দেখ না ; যদি হয়—ভালই ত।' এইরূপে দু একটী কথা কহিতে কহিতে আমরা বাড়ী পৌঁছিলাম। সেদিন আর বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। পরদিন প্রত্যুষে আমি নির্ম্মল দত্তের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিডন ষ্ট্রীট অভিমুখে অগ্রসর হইলে পথে যে ঘটনা ঘটে এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব।

## ৪৪

বেলা আন্দাজ সাতটা হইবে। আমি হেদোর উত্তর পশ্চিম কোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছি। সম্মুখের ট্রামখানি চলিয়া গেলেই ও ফুটপাথে গিয়া উঠিব, এমন সময় এক সাধু আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। সাধু আমার নিকট গাঁজা কিনিবার জন্য একটী পয়সা চাহিল। আমি বলিলাম, 'আমার কাছে পয়সা নেই ; তুমি আমার সঙ্গে এস ; দুচার খানি বাড়ীর ওদিকেই এক জমিদার-বাড়ীতে আমি যাচ্ছি। তাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তোমায় দেব।'

আমি ধূমপানের বিরোধী হইলেও সাধুর সত্য কথার জন্য তাহাকে পয়সা দিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু কাছে পয়সা না থাকায় নির্ম্মল দত্তের নিকট হইতেই লইয়া দিব এই উদ্দেশ্যে সাধুকে আহবান করিলাম। সাধু কিন্তু তাহাতে স্বীকৃত হইল না। সে বলিল, 'আমি বড়লোকের বাড়ী ভিক্ষা করি না। তোমার কাছে পয়সা না থাকলে আমার দরকার নেই।'

কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম—এখনও আছে ; ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধু সন্ত একেবারে লোপ পায় নাই। তারপর সাধু আমায় বলিল, 'তুমি বিবাহ করেছ ; না ? হাঁ, দেখে ত তাই মনে হচ্ছে ; কেমন আছ বল দেখি ?'

আমি বলিলাম, 'বিবাহিত জীবন এখনও আমার বন্ধনের কারণ হয় নি ; আমি বিবাহ করে বেশ আনন্দেই আছি।'

'তুমি ত বিবাহ করবেই না স্থির করেছিলে ?'

'হাঁ।'

'তবে করলে কেন ?'

'মার একান্ত ইচ্ছায় ; বিবাহের আগে আমি যখন বাড়ী যাই তখন আমার মা রুগ্নশয্যাশায়িনী ছিলেন। একদিন তিনি আমায় ডেকে বল্লেন, 'অন্নদা ! তুমি বিবাহ কর্বে কি না সত্য করে বল ; যদি জীবনে বিবাহ না কর, আমার কোন আপত্তি নেই। আর যদি সে রকম প্রতিজ্ঞা না থাকে ত তোমাকে এই মাসেই বিবাহ কর্তে হবে ; কেননা আমার মনে হচ্ছে—আমি হয় ত বাঁচ্ব না। এক্ষেত্রে যদি তোমার বিবাহ দেখ্বার বাসনা নিয়ে মরি তাহলে আমায় আবার জন্মাতে হবে।' মার কথা শুনে আমি একটু বিমর্ষ হলাম। কারণ বরাবর বিবাহ না করার সংকল্প থাকা সত্বেও ভবিষ্যতে কখনও মতি পরিবর্ত্তন হয় কিছুই না জানা থাকায়, মার সে অবস্থায় মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ভাল মনে হল না। আমি আর আগু পিছু না ভেবে মাকে সন্তুষ্ট কর্বার জন্যই মাকে বল্লাম, 'আপনার যা খুসী করুন।' মাও দাদাকে ডাকিয়ে সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন কর্তে বল্লেন ; যথা সময়ে আমার বিবাহ হয়ে গেল।'

'বেশ, বেশ ;' বলিয়া সাধু একটু হাসিলেন। আমিও রাস্তা পার হইবার জন্য অগ্রসর হইলাম। মাঝ রাস্তা না যাইতেই একখানি মোটর গাড়ী সশব্দে আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। পিছু হটিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এই ঘটনা ঘটিতে বোধ হয় আধ মিনিটও লাগে নাই ; কিন্তু সাধু কই ? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম ; কই ? সাধুকে ত কোথাও দেখিতে পাইলাম না ? তাই ত—এ সাধুটী কে ? অমনি সেই প্রথম দিনের সাধুর কথা মনে হইল।—এ ত সেই ! সেই ! সেই পুরাতন সাধু ! সেই গাঁজার জন্য পয়সা চাওয়া !—যে আমার অতীতের সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছিল ; আমায় দুবৎসর বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। এই ত সেই সাধু ! হায় ! হায় ! কোথায়—কোন দিকে গেল ? ছুটাছুটী করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম। আমার সহিত সে পূর্ব্বমুখী হইয়া কথা কহিতেছিল মনে হওয়ায় সেদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলাম ; কিন্তু কিছুতেই সাধুকে খুঁজিয়া পাইলাম না। সেই দিনকার মত আজও সাধু নিরুদ্দেশ।

হতাশ হইয়া ফিরিলাম। নিবারণ দত্তের বাড়ী যাইব সংকল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। কাজেই ধীরে ধীরে নিবারণ বাবুদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। দরদালানের একখানি ছোট তক্তাপোষের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া নিবারণ বাবু কি কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়া ব্রাহ্মণসন্তান জ্ঞানে ধার্ম্মিকপ্রবর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বসিতে বলিলেন এবং আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি যোগেনদার পরিচিত ; কই তিনি ত এখনও আসেন নি।'

নিবারণ বাবু বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে যোগেনদার নিকট আমার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই আর বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নিবারণ

বাবু বলিলেন, 'ছোট বাবুর সঙ্গে আজ দেখা হয় কি না সন্দেহ ; কারণ সে খুব ভোরে কি বিশেষ দরকারে কোথায় বেরিয়ে গেছে ; যাক্ আমার সঙ্গে দেখা হল ত ?—আপনার কি দরকার ?'

আমি তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে লক্ষ্য করিতেছিলাম তাঁহার পিছনে মাথার উপরে দেওয়ালে পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

'খাটীবারে আসিয়াছি খাটিতেছি নাথ !
ফলাফল যাহা কিছু সব তব হাত ।'

তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম, 'দরকার একখানি নাটক তাঁকে দেখান ; যাতে মনোমোহন বাবু বইখানি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন তারই চেষ্টায়।'

'কি নাটক ?'

'খান কয়েকই আছে। তার মধ্যে 'মীবারলক্ষ্মী' নাম দিয়ে যে মীরাবাঈয়ের জীবনী নাটকাকারে লিখেছি সেইখানাই প্রথম দেখাবার ইচ্ছা আছে।'

'বাঃ বেশ ত ? এই অল্প বয়সেই আপনি কয়েকখানা নাটক লিখে ফেলেছেন ?' বলিয়া কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, 'দেখুন, আমি আগে খুবই অভিনয়প্রিয় ছিলাম ; অভিনয় করেছিও। 'মেঘনাদ বধ' এ আমি রাবণ রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। এই বলিয়া তিনি রাবণের উক্তি খানিকটা আবৃত্তি করিলেন ; শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল এবং ভাবিলাম এবারকার চেষ্টা বোধ হয় বিফল হইবার নয়।

দেখিতে দেখিতে যোগেনদা আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল দত্তও আসিলেন দেখিয়া নিবারণ বাবু বলিলেন, 'এই যে যোগেনবাবু, ছোটবাবু সব হাজির ; দেখ যদি মনোমোহন বাবুকে বলে কিছু সুবিধা করতে পার।' তারপর আমার দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, 'আচ্ছা ততক্ষণ খানিকটা পড়ে শোনান না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রস আপনার ভাল লাগবে ?'

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'এখন ত বয়সও হয়েছে, এখন সব রসই ভাল লাগে ; আপনার যেখান থেকে ইচ্ছা পড়ুন।'

আমি কুম্ভসিংহের মর্কটবৈরাগ্য সম্বন্ধে কিছু পড়িলাম। বইখানির সেই অংশ অমিত্রাক্ষরে লেখা ছিল। শুনিয়া নিবারণ বাবু আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তারপর আমি নির্ম্মল দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে ২।৪টী কথা বলিয়া সে দিনের মত ফিরিয়া আসিলাম। দুই এক কথায় নির্ম্মল বাবু নাটক সম্বন্ধে মনোমোহন বাবুকে অনুরোধ করিতে তেমনি রাজি নহেন দেখিয়া তাঁহাকে আর সে বিষয়ে অনুরোধ করিলাম না। অভিনয়ের চেষ্টাও তখনকার মত সেখানেই স্থগিত রহিল।

ইহার কিছুদিন পরে যোগেনদার কার্য্যতৎপরতায় চোরবাগানে দত্ত মহাশয়দিগের সুবৃহৎ ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট করিয়া এক ছাত্রাবাস স্থাপিত

হইল। উক্ত ছাত্রাবাসে সামান্য বেতনে সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত থাকিয়া আমি কিছুদিন কাজ করিয়াছিলাম; উদ্দেশ্য ছিল বাটীতে কিছু সাহায্য করা। এই কার্যে একমাত্র যোগেনদাই আমায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল পরিদর্শক সুধানাথ বাবুর সহিত আমার পরিচয় হইয়া গেল। সুধানাথ বাবু তখন স্টার থিয়েটারের নিকট একটি গলির মধ্যে থাকিতেন। তিনি তখন পীড়িত থাকায় একদিন একখানি ৺মায়ের ফটো ও একখানি স্তব লইয়া তাঁহাকে দিতে গিয়াছিলাম। সুধানাথ বাবু বিশেষ আগ্রহের সহিত ৺মায়ের মূর্ত্তি মাথায় ঠেকাইয়া রাখিয়া দিলেন।

৪৫

সুধানাথ বাবুর বাসা হইতে ফিরিবার পথে আমার এক পুরাতন লম্পট বন্ধুর সহিত দেখা হইল। ভায়াকে দেখিলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাঁহার গুণ ছিল অশেষ। চতুর্দশ বৎসর বয়স হইতে সেই সময় প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত বোধ হয় একদিনের জন্যও মদ বেশ্যা ছাড়েন নাই। যখন রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিতেন তখনও তাঁহার মুখে বেশ্যাবাড়ী ও সুরাপানের গল্পই লাগিয়া থাকিত। এই গুণধর বন্ধুটি যখন ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য আমার জনৈক অধ্যাপক কবিরাজ মহাশয়ের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। তাহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে ঔষধপত্র দিতাম এবং আগ্রহের সহিত তাঁহার অদ্ভুত কাহিনী শুনিতাম বলিয়া ভায়া আমায় বড় ভালবাসিত। ধনীর সন্তান; দেখিতে সুন্দর; তাহাতে যৌবনের জোয়ারে ভাসিয়াছেন; তাহার উপর আবার মূর্খ। শুধু তাহাই নহে—সমস্ত সম্পত্তি নিজেরই হাতে; নগদ টাকায় পরিণত; কোম্পানীর কাগজ করিয়া রাখিয়াছেন; মাথার উপর কোন অভিভাবক নাই; আবার স্বয়ং অবিবাহিত। এই কলিকাতায় সহরে এমন উপযুক্ত পাত্র যে গণিকা মহলে একজন বড় কাপ্তেন বলিয়া পরিগণিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে অঞ্চলে তাঁহাকে চিনিত না এমন বেশ্যা অতি অল্পই ছিল।

দুরন্ত রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার পর ভায়াকে ঐ কুৎসিত পথে যাতায়াত করিতে নিষেধ করিলে যে বলিত, 'আমি যখন অবিবাহিত, আর আমার কেউ নেই, তখন আমি কি করে থাকব? তুমি কি আমায় বিবাহ কর্তে বল?'

আমি বলিলাম, 'তুমি যদি লাখপতিও হতে আমি তোমায় বিবাহ কর্তে বল্তাম না। আমি বলি, তোমার অধিকাংশ টাকা কোন সৎকার্য্যে দান করে ধর্ম্মের আশ্রয় নাও। আর যদি একান্ত স্ত্রীলোক ছাড়া থাক্তে না পার,—তোমরা ত হরিভক্ত? বৃন্দাবন গিয়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে ভেক্ নাও।'

ভায়া তখন হাসিয়া বলিল, 'নেড়া নেড়ীর দলে গিয়ে মিশতে বল্‌ছ ? তা পারব না ভাই ! নেড়ীদের ঢং দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

মধ্যে মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলে। একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় মেছুয়াবাজারের মোড়ে এটর্ণী চারুবাবুর বাটীর সম্মুখে ভায়ার সঙ্গে দেখা হইলে, ভায়া ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার প্রিয়াকে দেখিতে যাইতে হইবে ; এবং বলিলেন, তুমি যদি তাকে দেখেও ছাড়্‌তে বল—আমি নিশ্চয় তাকে ছেড়ে —তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।' ভায়ার পীড়াপীড়িতে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে দিন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, 'একদিন দিনের বেলা গিয়ে তোমার প্রেয়সীকে দেখে আস্‌ব।'

তারপর এই সুধানাথ বাবুকে দেখিয়া ফিরিবার পথে তাহার সহিত দেখা হইল। আর যায় কোথা ?—ভায়া ধরিয়া বসিল ; তখনই তাহার সহিত যাইতে হইবে। হাত ধরিয়া রহিল ; কিছুতেই ছাড়ে না ; বলিল, তার প্রেয়সীর বাসা সেশ্যান হইতে বেশী দূর নয়। আমি আর কি বলি ? একদিন স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছি। তাহা ছাড়া ভাবিলাম হতভাগাকে যদি ফিরাইতে পারি, একবার দেখিই না কেন ? এই মনে করিয়া মৌন সম্মতি দিলে, একখানি গাড়ী করিয়া বন্ধুবর আমাকে লইয়া গিয়া কিছু দূরে এক গলির ভিতরে একখানি সুন্দর বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামাইল। তারপর আমায় ভিতরে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইল। আমি চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম ; চতুর্দ্দিকে দেব দেবীর ছবি ; সবগুলিই মূল্যবান এবং পবিত্র ভাব উদ্দীপক। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ছবি দেখিতেছি আর ভাবিতেছি—তাই ত ! একি বেশ্যাবাড়ী ! ততক্ষণে ভায়া উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম উপরে গিয়া প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'কুঞ্জ ! তুমি একবার নীচে এস ; আমার একজন বন্ধু এসেছে তোমাকে দেখ্‌বে ; কিংবা তুমি যদি বল তাকে উপরেও নিয়ে আস্‌তে পারি। দেখ্‌লে, কথা কইলে তুমি চমৎকৃত হবে ; খুব ভাল লোক। কি বল ? উপরে নিয়ে আস্‌ব ?—না তুমি যাবে ?'

কথাগুলি স্পষ্টই আমার কানে আসিতেছিল। আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলাম। বন্ধুবরের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রেয়সী উত্তর করিল, 'তুমি যে কি বল্‌ছ আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। এদিকে বল্‌ছ ভাল লোক ; আবার বল্‌ছ তোমার বন্ধু ;—আবার আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে। শুধু তাই নয়,—আবার আমি বল্‌লে তুমি তাঁকে উপরেও নিয়ে আস্‌তে পার ;—এ সব কথার মাথা মুণ্ড আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।—তোমার ব্যাপারখানা কি বল ত শুনি ?'

'না—গো—না ; আমি ঠিক কথাই বল্‌ছি। মাৎলামি কর্‌ছি না—আর মাৎলামিই বা কর্‌ব কি ?—সে পথে ত তুমিই কাঁটা দিয়েছ। তবে যদি বল

কল্‌কাতার কলের জলেও মাতাল হয়, তাহলে অবশ্য আমি নাচার; কেননা রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে খানিকটা কলের জল খেয়েছি, এ কথা সত্যি।'

'কেন? কলের জল খেলে কেন? দোকান থেকে বরফ জল বা সোডা লেমনেড খেলে না কেন?'

'তুমি যে বারণ করেছ, দোকানের জিনিস খেতে; কি করে খাব? শেষে কি ছাই পাঁশ খেয়ে পেটের গোলমাল বাধাব?'

প্রেয়সী অট্টহাস্য সহকারে কাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'ওলো—ও গৌরী! শুনছিস তোদের বাবুর কথা?—আমি তোদের বাবুকে লেমনেড বরফজল খেতেও বারণ করেছি? না মাথার দিব্যি দিয়েছি?—আমি ত বলেছি বাজারের জিনিষ খেলে অসুখ করে। আমার মাথা খাও—ওসব খেও না; তোমার যা খেতে ইচ্ছে হবে আমায় বলো; আমি নিজে হাতে তৈরী করে দেব।—আর তোদের বাবু কি বল্‌লে শুনলি?—মাগো!—কোথা যাব মা!—'

ভায়া বলিয়া উঠিলেন, 'আচ্ছা গো আচ্ছা! এবার থেকে তাই হবে। তবে কি জান—ভয় হয় তেষ্টার সময় কোন দোকানে যেতে কোন দোকানে গিয়ে উঠি।—চিরকেলে অভ্যেস কি সহজে ছাড়া যায়—ভুলে যদি কিছু অন্যায় করে ফেলি, কিছু বল্‌বে না ত?'

'কি অন্যায়?'

এই যদি সাদা জলের বদলে লাল জল খেয়ে ফেলি;—সাদা চোখে না এসে যদি লাল চোখে হাজির হই?'

প্রেয়সী অমনি গানের সুরে বলিয়া উঠিলেন,—

'তখনই হইবে সকল দুয়ার রুদ্ধ; ওগো! রুদ্ধ;
তখনই দেখিবে কুঞ্জের দ্বার বন্ধ; ওগো! বন্ধ।'

গৌরী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া গান করিতেই 'চুপ চুপ' করিয়া ভায়া বোধ হয় তাহাকে নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে তখন মনিবের কথা শুনিবে কেন? কুঞ্জের দ্বার রুদ্ধ হইবে শুনিয়া যে তাহার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে; তাহার হৃদয় দুয়ার তখন খুলিয়া গিয়াছে। অতএব সে গান ধরিল—

আমি শ্যামকে ফিরিতে দিব না।
কুঞ্জের দ্বার হউক বন্ধ, তবু আমি তাকে ছাড়্‌ব না;
ওগো! আমি তারে কভু ছাড়্‌ব না।
যদি কোন অপরাধে, (রাধে!) অপরাধী হয় পদে;
দণ্ড দিও শ্যামচাঁদে, (ওগো!) আমি তুলে লব হৃদে।
হৃদয় জুড়ান ধনে, কে পারে ছাড়িতে জানে?
ছাড়ে ছাড়ুক কোন জনে, (ওগো) আমি ত তারে ছাড়্‌ব না।

গানটি আমার বড় সুন্দর, বড় মধুর লাগিয়াছিল ; তাই পরে লিখিয়া লইয়াছিলাম। গান শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই গৌরীটী আবার কে ? এমন সময় ভায়া মৃদু হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমায় সাদর আহ্বান করিলে আমি এক রকম উৎসর্গীকৃত পশুর মতই কম্পিত পদে অগ্রসর হইলাম। উপরে উঠিতে উঠিতে গৌরীর চোখে চোখ পড়িতেই সে হাসিয়া ফেলিল। কুঞ্জবালা কিন্তু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আমার গতি লক্ষ্য করিতেছিল। কুঞ্জবালাকে দেখিতে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলিয়াই বোধ হয়। বেশ সুরূপা ; সুন্দর গঠন ; চোখ দুটী কলঙ্কহীন ; দৃষ্টি শান্ত সরল ; বয়স প্রায় ২৫।২৬ বৎসর। গৌরীর বর্ণ গৌর ; মুখ বিবর্ণ ; চোখ দুটী দুষ্টামি ভরা ; বয়স আন্দজ ৩২।৩৩ বৎসর।

আমি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলে কুঞ্জবালা সসম্ভ্রমে আমায় ঘরে যাইতে অনুরোধ করিল। আমি একটী ঘরে ঢুকিতেই গৌরী তাড়াতাড়ি একখানি আসন আনিয়া বসিতে দিল। আমি বসিলে কুঞ্জবালা বলিল, 'আজ আমার বাড়ী পবিত্র হল।'

গৌরী বলিল, 'হবে না ? এরকম মানুষ কি আর এ সব বাড়ীতে আসে ? দেখলে ভক্তি হয় ; কেমন সাদাসিদে চাল চলন—না ভাই ?'

কুঞ্জবালা তখন ইঙ্গিতে গৌরীকে অন্যত্র যাইতে বলিলে, গৌরী চলিয়া গেল। আমার আদেশে কুঞ্জবালা আসন গ্রহণ করিল। ভায়াটীও লক্ষ্মী ছেলের মত আমার পাশে বসিয়া পড়িল।

দুএক কথার পর আমার সঙ্কুচিত ভাব লক্ষ্য করিয়া ভায়া বলিলেন, 'ভাই ! এ শ্বশুর বাড়ীতে নবপরিণীতার সম্মুখে বসা নয় ; একে বলে বেশ্যাবাড়ী। কুঞ্জবালা বেশ্যা ;—তুমি তারই সামনে বসে আছ।—অত লজ্জা কেন ?—দেখ —আমার কুঞ্জকে ভাল করে দেখ ;—কুঞ্জর সঙ্গে ভাল করে কথা কও। তবে ত বুঝবে আমি এখন কেমন আধারে বিরাজ করছি।—নাও ; তোমার পাণ্ডিত্যটা এইবার ফলাও ; একটু দেখি।'

ভায়ার কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে আমি বলিলাম, 'ভাই ! আমার পাণ্ডিত্য এখানে প্রকাশ পাবে না ; তোমরাই এখানে তোমাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ কর ; আমি শুনে যাই।'

কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে আমি পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতে পারি ?'

আমি বলিলাম, 'না মা ! পায়ে হাত দেবেন না।'

'তুমিও যেমন ? নমস্কার করবে, তা আবার জিজ্ঞেস করে ? দাও তুমি পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার কর।'—বলিয়া ভায়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, 'তুমি চুপ কর ভাই।'

কুঞ্জ আমায় নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমি বড় আশ্চর্য্য হচ্ছি আপনার মত

পবিত্র লোকের সঙ্গে এ'র বন্ধুত্ব কি করে হল। যিনি আমাদের বাড়ী মাড়াতে কাঁপেন, তাঁর সঙ্গে কিনা এক মদের পিপে বেশ্যাগত প্রাণ ধর্ম্ম কর্ম্মহারা মানুষের বন্ধুত্ব!'

ভায়া। তার আর আশ্চর্য্য কি? রামচন্দ্রের সঙ্গেও ত রাক্ষস হনুমান বানর চণ্ডাল প্রভৃতির বন্ধুত্ব হয়েছিল।

কুঞ্জ। আহা! কি উপমাই দিলেন?—শুনলেন আপনার বন্ধুর বিদ্যের দৌড় কত দূর?—আচ্ছা! তুমি ঐ কটির মধ্যে কোনটীর সমান হতে চাও শুনি?

ভায়া। চাঁড়ালের সঙ্গেও কি সমান হতে পারি না?

কুঞ্জ। না, কখনই নয়; জাতে চাঁড়াল হলেও তবু না হয় স্বজাতি বলে গৌরব করলেও শোভা পেত।—গুহক চণ্ডাল কি যে সে ভক্ত ছিলেন?

ভায়া। আমি যে ভক্ত নই তা তুমি কি করে জানলে?

কুঞ্জ হাসিয়া বলিল—শুনছেন? উনি আবার ভক্ত; তা মদ বেশ্যার ভক্ত ত তুমি বটেই।

ভায়া। আর ত আমি মদ বেশ্যার ভক্ত নই;—তোমার পাল্লায় পড়ে আমার তাও ত গেছে।

একথা শুনিয়া আমি একটু হাসিলে ভায়া পুনরায় বলিল, 'তুমি হাসছ কেন ভাই? সত্য কথা;—এই মোহিনীর ভালবাসায় পড়ে আমি সব ছেড়েছি; বড় বড় হোটেলের খাওয়া পর্য্যন্ত ছেড়েছি; আর মদ বেশ্যার ত কথাই নেই।'

কুঞ্জ। উনি সে জন্য হাসেন নি; তুমি বেশ্যাভক্ত নও—এই কথা শুনেই হেসেছেন।

এই কথা বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন? নয় কি?'

আমি। হাঁ।

কুঞ্জ। কেমন?—শুনলে?

ভায়া। তা—আমি আর বেশ্যাভক্ত কিসে? তোমাকে আমি বিবাহিতা স্ত্রীর মতই দেখি; আর তুমিও ত আমাকে স্বামীর মত মান। পরপুরুষের সংসর্গ পর্য্যন্ত কর না।

কুঞ্জ হাসিয়া বলিল, 'ঈশ! শুনলেন? আমি ও'কে মানি;—আবার স্বামীর মত—'

বলিতে বলিতে কুঞ্জর মুখ লাল হইয়া আসিল; চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, দৃষ্টিও স্থির। আমি সহজেই ব্যাপার বুঝিয়া লইলাম। কুঞ্জ যে বেশ্যার মেয়ে বেশ্যা নয়, ইহা আমার স্থির সিদ্ধান্ত হইল। কুঞ্জবালা অলক্ষ্যে চোখ মুছিতে চেষ্টা করিলে আমি দেখিয়া ফেলিলাম।

ভায়া। কি ভাই! কি দেখ্‌ছ?—এমন রত্নকে ছেড়ে যেতে বল? এখনই প্রস্তুত। বল দেখি—এমন কজনের ভাগ্যে মেলে?

বুঝিলাম ভায়া আমার সহজে এ ফাঁদ কাটাইতে পারিবেন না। ভাবিলাম এরূপ লোকের পক্ষে এ অতি শুভ সংযোগ। পাঁচ দুয়ারে আসা যাওয়া অপেক্ষা এ বরং ভাল।—এ ভালবাসার পরিণামে মঙ্গল হইতে পারে; মনে হইল বোধ হয় এইবার ভায়ার সুসময় আসিয়াছে।

৪৬

কুঞ্জবালা বলিল—'আপনি কি আপনার বন্ধুকেও আপনার পথে টান্‌তে চান? শুদ্ধ পবিত্র করে রাখ্‌তে চান?—তা আপনার বন্ধু যদি সৎ হয়ে সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করেন ত বড়ই আনন্দের কথা; তাতে আমার কোন বাধা নেই;—তবে এও জান্‌বেন যে আপনার বন্ধু বই আমারও আর দ্বিতীয় কেউ নেই; আমি আর দ্বিতীয় কোন লোককে ভালবাসতে পারব না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কেন?'

কুঞ্জ। তবে শুনুন;—কিন্তু আপনি বিশ্বাস কর্‌বেন কি? আমি ভদ্রলোকের মেয়ে,—বিবাহিতা। আমার স্বামী গ্রাজুয়েট;—বোধ হয় এখনও বেঁচেই আছেন। আমার বয়স যখন ১৬।১৭ বৎসর, তখন তিনি কল্‌কাতায় থেকে এম, এ পড়্‌তেন। সেই সময়, বয়সের দোষে নয়, অদৃষ্টের দোষেই আমি এক দুষ্ট লোকের চক্রান্তে বাড়ীর বার হয়ে পড়ি। দিন দশ বার পরে আমি সুযোগ পেয়ে যখন পালিয়ে আসি, তখন শ্বশুর বাড়ীতে আর আমার স্থান হল না,—এক মাস শ্বশুরের বাড়ী গিয়ে উঠে বাবার কাছে চিঠি লিখি। বাবা তখন লোক পাঠিয়ে তাঁর কর্ম্মস্থল আসামে আমায় নিয়ে গেলেন।

আমার দুর্ভাগ্য যে কুসংসর্গে আমি পোয়াতি হয়েছিলুম। প্রথম দুমাস জান্‌তে পারি নি; তারপর টের পেলে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলুম যাতে গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়,—দুষ্ট গর্ভ নষ্ট হওয়াই ঠিক মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে তাও হল না। লুকিয়ে স্বামীর কাছে চিঠি লিখ্‌লুম; স্বামী উত্তর পাঠালেন—'আমি সব শুনেছি, তুমি ব্যভিচারিণী হবে তা আগেই টের পেয়েছিলাম। তুমি এতদিন পরের কাছে ছিলে;—এ অবস্থায় আমি তোমায় কি করে গ্রহণ করি? মধ্যে মধ্যে তোমায় মনে পড়ে বটে; কিন্তু তা হলেও সমাজ ও সংসারের পাঁচ জনের নিন্দার ভয়ে তোমায় গ্রহণ কর্‌তে পারব না। অতএব তুমি আমার আশা ছাড়।'

আমি আবার চিঠি লিখ্‌লুম; অনেক করে লিখ্‌লুম—একবার আমায় দেখা দিয়ে যাবার জন্য। তাতে স্বামী এলেন বটে, কিন্তু চার মাস পরে; তখন

আমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী আমার বুদ্ধিমান ছিলেন; —আমায় দেখেই সব টের পেলেন। আমি তার পায়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করলুম; তিনি কিছুতেই শুনলেন না। ঘরের বাইরে যাবার ছল করে আসাম ছেড়ে চলে এলেন; আসবার সময় ডাকে বাবার নামে একখানি চিঠি দিয়ে এসেছিলেন। তাতে লেখা ছিল—আপনার কন্যা দ্বিচারিণী; পরপুরুষ কর্ত্তৃক গর্ভবতী হওয়ায় আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

বাবা চিঠি পেয়ে রেগে লাল; তার উপর সৎ মা তাঁর সহধর্ম্মিণী। দুজনে পরামর্শ করে তামাসা দেখতে যাবার নাম করে আমায় নিয়ে গিয়ে এক নিবিড় বনে ফেলে এলেন। প্রাণ হাতে করে এক গাছে উঠে রাত কাটালুম। তারপর জীবনে ধিক্কার এল। মরবার ইচ্ছায় একটি নদীতে ঝাঁপ দিলুম। ঝাঁপ দিলুম বটে, কিন্তু মৃত্যু হল না; একখানা কাঠের নৌকায় লোকজন আমায় রক্ষা করলে। তারপর সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত এক কাঠুরিয়া বাড়ীতেই কাটল। সন্তান হল; কিন্তু মরা। কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে লুকিয়ে ষ্টেশনে এলুম। আসবার সময় কাঠুরিয়া বধূর জন্য আমার হাতের চারগাছি চুড়ি রেখে এসেছিলুম; সে আমায় বড় ভালবাসত। ষ্টেশনে যখন এলুম তখন আমার দুহাতে দুগাছি চুড়ি গলায় একছড়া হার ছিল।

ষ্টেশনে আমার পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হল না বটে; তবে এর পরে যিনি আমার বিপদের বন্ধু, সাথের সাথী হবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হল; তাঁকে দেখে আমার সমস্ত দুঃখের কথা তাঁকে জানাতে ইচ্ছা হল। তাই আমি বিনা টিকিটে সেই বাবুটীর কামরায় সেকেণ্ড ক্লাসে গিয়ে উঠলুম। বাবুটী কলকাতার একজন বড় ব্যবসাদারের ছেলে; বাপের অগাধ সম্পত্তি; আসামে জমি কিনতে গিয়েছিলেন। আমার দুঃখের কথা শুনে তাঁর প্রাণ কাঁদল। আমাকে অভয় দিয়ে তিনি বললেন, 'আজ হতে তুমি আমার; তোমার আর কোন ভয় নাই।' তাঁর সঙ্গে তখন কলকাতায় এলুম। একটী বড় হোটেলের উপর তলায় আমায় রেখে তিনি বাড়ী চলে গেলেন। তিন দিন পরে একেবারে আমায় এই বাড়ীতে এনে তুললেন। পরে বাড়ীখানি তিনি আমার নামেই লেখা পড়া করে দেন।

আজ ছমাস হল বাবুটী আমার সংস্রব একেবারে ছেড়েছেন। বোধ হয় এত দিনে তাঁর স্ত্রীর বরাত ফিরেছে; তাই আমার উপর হঠাৎ এত বিরাগ। সে যাই হোক, তারপর আমি অনেক সাধনার ফলে আপনার এই বন্ধুটীকে একদিন রাস্তায় দেখতে পাই। এঁর চেহারা ঠিক আমার স্বামীর মত; স্বামীকে কতকাল দেখি নি; এঁকে দেখে আমার ভ্রম হল। আমি কেঁদে পা জড়িয়ে ধরে বারবার আমায় ক্ষমা করতে অনুরোধ করতে লাগলুম। আপনার বন্ধুও খুব বুদ্ধিমানের মত রাস্তায় আর কিছু না বলে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আমায় নিয়ে এই বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। তার পর আমাকে ওঁর সত্য পরিচয় দিলেও

ও'র চেহারা আমার স্বামীর মত দেখে, আমি ও'কে এতই ভালবেসে ফেলেছি যে উনিও সহজে আমার মায়া কাটিয়ে যেতে পার্‌ছেন না। এই ত অবস্থা। এখন উনি আপনাকে ধরেছেন; আপনি যা করেন তাই হবে। আপনি যা বলেন উনি তাই কর্‌বেন। আমায় ছাড়তে বলেন, ছেড়ে যাবেন;—আর না হয়—।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুঞ্জ চুপ করিলে ভায়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমায় বলিলেন,—'কি ভাই! কি বল্‌বে—এখন বল তুমি?'

আমি বলিলাম,—'তুমি এ'কে নিয়ে যদি জীবন কাটিয়ে দিতে পার, তাহলেই তোমার যথেষ্ট মঙ্গল মনে করি। তোমায় যোগ যাগ, জপ তপ, কিছুই কর্‌তে হবে না, শুধু প্রকৃতিটাকে একমুখী কর্‌তে চেষ্টা কর; তাহলেই তোমার সমস্ত কর্ম্ম শেষ হবে; তুমি শান্তি পাবে।'

ভায়া। তবে তুমি কুঞ্জকে না ছাড়্‌বার কথাই বল্‌ছ; কেমন?

আমি। নিশ্চয়; যদি স্ত্রীলোক নিয়েই তোমায় থাক্‌তে হয়, ত ইনিই তোমার সহধর্ম্মিণী হয়ে থাকুন; এই আমার ইচ্ছা।

ভায়া। কি কুঞ্জ? তোমার আর কিছু বল্‌বার আছে?—থাকে ত বলে ফেল; এমন সুযোগ আর হবে না; এমন দয়াল আর পাবে না।

এই বলিয়া সে আমায় বলিল, কেমন ভায়া? বলেছিলাম না?—এই মায়াবিনীকে দেখে কিছুতেই তুমি আমায় নেড়ানেড়ীর দলে গিয়ে মিশ্‌তে বল্‌বে না।—কেমন? কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফল্‌ল ত?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কুঞ্জ তখন বলিল, 'আপনার বন্ধুর অনেকগুলি টাকা আছে। তাই আমার মধ্যে মধ্যে ভয় হয় ঐ টাকার অহঙ্কারে—'দূর শালি! টাকা খরচ কর্‌লে তোর মত অমন ঢের ঢের মেলে'—বলে না কোন দিন আমায় ছেড়ে চলে যান। তাই বল্‌ছিলাম কি—ঐ টাকাগুলি আমার নামে করে রাখুন। আপনি কি বলেন?'

আমি এবার বিষম সমস্যায় পড়িলাম। ভায়ার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম কুঞ্জবালার কথায় তিনি কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন কি না; দেখিলাম ভায়া পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল রহিয়াছেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এক্ষেত্রে টাকাটা কুঞ্জবালার নামে রাখাই ঠিক। কেননা যদি কুঞ্জবালা তাহাকে বঞ্চনাও করে, তাহা হইলেও ভায়ার লাভ; কারণ তিনি অসৎ সঙ্গে মিশিতে পারিবেন না। অনুতাপ আসিবে—হয় ত বিল্বমঙ্গলও হইয়া যাইতে পারেন। আর যদি কুঞ্জ তাহাকে ভালবাসিয়া বরাবর স্বামীর মত সেবা করে, তাহা হইলেও লাভ; কেননা আর অন্য কাহারও প্রলোভনে পড়িয়া ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া মরিতে হইবে না। তাহা ছাড়া আপন বলিতেও কেহ নাই। এক বড় ভাই না কে আছে; সেও ভাইয়ের কোন সম্পর্কে থাকে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম—টাকাটা কুঞ্জর হাতে যাওয়াই ঠিক; তাই বলিলাম, 'ভাই! টাকাটা

কুঞ্জমার নামেই করে রাখ; তোমার পরকালের কাজ দেবে; আর তুমিও এই নারীর সংসর্গে থেকে সুখে দিন কাটাতে পারবে; তোমার এ একটা মস্ত সুযোগ।'

ভায়া। ভাই! এ বেশ্যার প্রেম;—বিশ্বাস কি? যদি লেখা পড়ার পর কলা দেখিয়ে গলাধাক্কা দিতে দিতে দূর করে দেয়;—তখন দাঁড়াব কোথায়?

আমি। তোমার কুঞ্জবালা ত আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্তা নির্ব্বাসিতা নিরাশ্রয়া ছিল।—কে তার সহায় হয়ে তাকে এই অট্টালিকার মালিক করে দিয়েছে?—কে তোমাকে তার সঙ্গে মিলিয়েছে? কুঞ্জবালার এত ভালবাসা যদি ভাণমাত্রে পরিণত হয়, যদি সে তোমাকে প্রবঞ্চনাই করে, তখন সেই ভাগ্যনিয়ন্তা, সেই অনাথনাথই তোমার উপায় করবেন। তুমি দেখই না—ভালবাসার জুয়া খেলেই একবার দেখ না—কার ভাগ্যে কি আছে?

ভায়া। আমার কত টাকা আছে জান? ষোল হাজারের বেশী।

আমি। ষোল হাজারই হোক, আর ষোল লাখই হোক, তোমার টাকা এই-ভাবে ছাড়া অন্যভাবে খরচ হবে না; তুমি যে জাল জোচ্চুরি করে এই টাকার মালিক হয়েছ, সে সব ত তোমারই মুখে শুনেছি; আর তোমার কাছে অনেক সৎ কাজের নামও করেছি;—তোমার ত সেদিকে মতি হয় নি; তবে এখানে ছাড়া আর কোথায় তোমার টাকা খরচ করবে?

ভায়া। বেশ ভাই! তোমার কথাই মানলুম; সব টাকাই আমি এই প্রেয়সীর হাতে অর্পণ করব; এই প্রাণপ্রিয়াকেই আমার সর্ব্বস্ব দেব; কিন্তু ভাই! দোহাই তোমার! সে সব কথা যেন আর কারও কাছে গল্প করো না; তাহলে আমি ধনে প্রাণে মারা যাব।

এমন সময় 'আমি কিছু পাব না?' বলিয়া গৌরী ঘরে প্রবেশ করিল। ভায়া আমার উদার হৃদয়। তখনই বলিয়া ফেলিলেন, গৌরী যদি তাহাদের বাধ্য হইয়া চলে, তাহাকেও এক হাজার টাকা দেওয়া হইবে। গৌরী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এবার উভয়ে তাহাকে গান গাহিতে অনুমতি দিল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম তাহার উপরেই ঠাকুরের একখানা বড় ছবি ছিল। গৌরী সেই দিকে চাহিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে 'জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ' বলিয়া গান ধরিবার পূর্ব্বে নমস্কার করিতেই আমার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। সেইরূপ সুন্দর ছবি বাজারে অতি অল্পই দেখা যায়। ছবিখানি ভাল ফুলের মালা দিয়া বেশ সাজান ছিল। আমিও তাহা দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। যাহা হউক, গৌরী গান ধরিল,—

'সাধের এ কুঞ্জবনে নিয়ত কর বসতি;
দেখিবে না কোথা আর এ মধুর মূরতি। ইত্যাদি'

গানটী শেষ হইলে ভায়া কুঞ্জবালাকে বলিল, 'তুমি আমার বন্ধুকে একটা গান শোনাও।' কুঞ্জ বিনয় সহকারে গান ধরিল,

'ঠাকুর! তেঁই শরণাহি আয়া।

উতর গয়া মেরা মনকি সংশয় যব তেরে দরশন পায়া; ইত্যাদি।'

কুঞ্জবালার গান শেষ হইলে, বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। সকলে সসম্মানে আমায় গাড়িতে তুলিয়া দিল। অনেক নিষেধ সত্ত্বেও ভায়া আমার সঙ্গে চলিল। গাড়ী আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া থামিলে আমি শচীনের বাটী হইতে চোরবাগানের বাসায় আসিলাম।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে একদিন গঙ্গার ঘাটে রক্তবসন-পরিহিতা ভৈরবী-রূপিণী গৌরী ও কুঞ্জবালাকে দেখিয়া ঐরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কাঁদিয়া বলিল, 'আমার কপাল ভেঙ্গেছে; আপনার বন্ধু আজ দিন পনর হল হার্টফেল করে আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে গেছেন।' আমি শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলাম। কুঞ্জবালা আরও বলিল, 'তিনি সব টাকা আমার নামে করে দিয়েছিলেন। তার সদ্ব্যবহার কি করে হয়, আমি এখন তাই ভাব্‌ছি। তবে আপাততঃ স্থির করেছি সেই বসত বাড়ীতে একটা ৺রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর্‌ব। দীন দুঃখী কাঙ্গালেরা সেখানে প্রসাদ পাবে; আর আমি দেশভ্রমণ করে বেড়াব মনে করেছি। এখন ঠাকুরের ইচ্ছা।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কে ঠাকুর?'

উত্তর হইল, 'আর কে? অগতির গতি—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ! তিনিই আমাদের গুরু; আমাকে স্বপ্নে দীক্ষা পর্য্যন্ত দিয়েছেন।'

'বৈষ্ণবমতে দীক্ষা পেয়ে রক্তবস্ত্র পরিধান করে ভৈরবী সেজেছ কেন?'

'ঠাকুর এই সাজেই দেশভ্রমণ কর্‌তে স্বপ্নে আদেশ করেছেন।'

বন্ধুবরের কথা স্মরণ করিয়া ভাবিলাম 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।' আরও ভাবিলাম, পতিতার প্রতি ঠাকুরের কি অসীম দয়া! কি অপূর্ব্ব প্রেম! কি অপার স্নেহ!

৪৭

আর একদিনের আর একটী পতিতা সংক্রান্ত ঘটনার কথা বলিব। আমি যখন ঝামাপুকুরে ৺দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের দাতব্য ঔষধালয়ের দোতলায় থাকিতাম, তখন একদিন মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে আহারান্তে দরজায় দাঁড়াইয়া কাঙ্গালীদের ভিড় দেখিতেছিলাম। দেখিলাম কাঙ্গালীর দল বাটীতে প্রবেশ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে আর একজন দ্বারবান এক একজনকে গলা ধরিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। পাঁচজন কাঙ্গালীকে প্রত্যহ খাইতে দিবার

নিয়ম ; আর আসিয়া জমা হয় প্রায় কুড়ি জন ; কাজেই এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। যাহা হউক, সেদিন পাচক আসিয়া পাঁচ জনকে বাছিয়া লইয়া গেল। একজন সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ কৃশকায় কাঙ্গাল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, 'বাবু। এই কি তোমাদের বিচার ? আমি আজ ৫।৬ দিন এসে এসে ফিরে যাচ্ছি ; আর তোমরা বেছে বেছে যাদের গায়ে জোর আছে, যারা মেয়ে মানুষ, দেখতে সুন্দর, তাদের নিয়ে যাও ;—এই কি রাজাবাবুর হুকুম ? —এমন অবিচার করলে হবে না ;—আজ আমাকে দুটী খেতে দিতেই হবে !' এই বলিয়া লোকটা বিনা অনুমতিতেই প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায়, প্রথম গালাগালি, তারপর গলাধাক্কা, তারপর চড়, লাথি ইত্যাদি অবাধে তাহার উপর চলিতে লাগিল ; শেষে ইহাতেও যাইতে চায় না দেখিয়া একজন দ্বারবান তাহাকে এমন সজোরে ঠেলিয়া দিল যে, লোকটা একেবারে রাস্তায় পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

আমি দেখিয়া শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটী পতিতা নারী নিকটবর্ত্তী বাজারে বাজার করিতে যাইতেছিল। সে কিন্তু এই অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। দৌড়িয়া গিয়া বৃদ্ধকে সযত্নে তুলিতে তুলিতে বলিতে লাগিল, 'মুয়ে আগুন মুয়ে আগুন—মুখপোড়ারা !—এ চুলো ছাড়া কি তোদের আর মরবার জায়গা হয় না ? এখানে কেন মরতে আসিস্ ?—আমি ত রোজই এই কাণ্ড দেখি।'

বৃদ্ধ উঠিতে উঠিতে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বেশ্যাটির পা জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। পতিতা নারীর হৃদয় যে এত কোমল হয়, তাহা জানিতাম না। সে অনায়াসে তাহার বাজারের সমস্ত পয়সাগুলি কাঙ্গাল বৃদ্ধটীর হাতে দিয়া বলিল, 'যা—ঐ পরটার দোকান থেকে পরটা কিনে খেগে—নয় ত ঐ দিকে হোটেল আছে সেখানে যা ; পয়সা দিলে তারা যত্ন করে খেতে দেবে।'

আনন্দোৎফুল্লবদনে জয় জয়কার করিতে করিতে ভিখারী চলিয়া গেল। পতিতার দয়া দেখিয়া আমার কঠিন প্রাণও বিগলিত হইল। আমি তাহার মুখের পানে বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, ধন্য প্রাণ ! আমার উপর দৃষ্টি পড়ায় পতিতা সঙ্কেতে আমায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি ত বাবু এ বাড়ীতে খাও ? রোজ রোজ যে এই কেলেঙ্কারী হয়, এঁদের বলতে পার না ?—কেন ? প্রথম যে পাঁচ জন আসবে, তাদের ভেতরে বসিয়ে রাখলেই হয়। সবাই আশা করে ১২টা ১টা পর্য্যন্ত বসে থেকে শেষে গালাগালি আর গলাধাক্কা খেতে খেতে ফিরে যায়। এতে কি বাবুদের পৌরুষ বাড়ে ? না ধর্ম্ম হয় ? বলো বাবু ! আমার অনুরোধ—যদি এর কিছু ব্যবস্থা হয় ; একবার উপরে জানিও।

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আমি জানাব ; কিন্তু এসব বিষয় ওঁদের নজরে

পড়ে কিনা সন্দেহ।'

'বাবুরা কত লোককে খেতে দেন?'

'প্রায় ষাট জনকে এঁরা খাওয়ান।'

'তা বাবু তুমি একবার বলে দেখো যদি কোন উপায় হয়; বলিয়া বেশ্যাটী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে আমি বলিলাম, 'আপনি বাজার করবেন না?'

'হাঁ করব; আবার পয়সা নিয়ে আসি।'

'আপনার আর পয়সা আনতে ফিরে যেতে হবে না; আমিই এনে দিচ্ছি; আমি এই উপরেই থাকি। কত পয়সা দিলে আপনার হবে?'

পতিতা রমণী আমার মুখের পানে ক্ষণেক তাকাইয়া বলিল, 'তুমি আমায় বিশ্বাস করে পয়সা দিতে পার?'

আমি বলিলাম, 'কেন পারব না? আপনার মত করুণাময়ী মাকে দুচার আনা পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করবার ক্ষমতাও কি আমার নেই?'

'তবে সাড়ে তিন আনা পয়সা আমায় এনে দাও; ছপয়সা আমার নিজের বাজার; আর দুআনা পরের।—এই চৌদ্দ পয়সা আমার হাতে ছিল।'

আমি দৌড়িয়া গিয়া পয়সা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, 'মা! এ পয়সা আপনাকে ফেরৎ দিতে হবে না।'

হাসিয়া—'তাকি হয়?' বলিতে বলিতে রমণী চলিয়া গেল। আমি বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া তাহার ব্যবহারের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

পর দিন আটটার সময় সেই পতিতা আমার সন্ধানে আসিল। আমি নিকটে যাইতেই পাঁচটী বড় ল্যাংড়া আম আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, 'আমি তোমার পয়সা ফেরৎ দিতে আসি নি। কাল তুমি একবার আমায় 'মা' বলে ডেকেছিলে। সেই স্নেহে পড়েই আমি এই পাঁচটী আম এনেছি তোমায় খেতে দিতে। কিন্তু তোমার এই মা পতিতা,—তা জেনেও যদি গ্রহণ কর ত বড় সুখী হব।'

তাহার সজল চোখের করুণ দৃষ্টি ও স্নেহের বিনয়বচনে আমারও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, 'মা! তার জন্যে তুমি কিছু মনে করো না। আমার চোখে তুমি মা। আমি তোমার মাতৃরূপ দর্শন করেই মুগ্ধ হয়েছি। তোমার এ দান আমি গ্রহণ করলুম। তবে মা একটী কথা;—ছেলেকে না দিয়ে যেমন মা খেতে পারে না, দুখিনী মাকে না দিয়েও তেমনি ছেলে খেতে পারে না; তাই এই দুটী আম ছেলের দান মনে করে তুমি যদি নাও, আমিও সুখী হব।' এই বলিয়া দুটী আম সেই স্নেহময়ীর হাতে তুলিয়া দিয়া ধন্য হইলাম। পতিতা মা আমার—চোখ মুছিতে মুছিতে আম দুটি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, নিশ্চয় এ জন্ম

জন্মান্তরের কারও অভিসম্পাতের ফলেই বেশ্যাকুলে জন্ম লইয়াছে। ইহার আচার ব্যবহার দেখিলে ত কিছুতেই ইহাকে বেশ্যা বলিয়া মনে হয় না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম—ভগবান! এই পতিতাকে শাপমুক্ত কর। তাহার পাপরাশি আমায় দিয়া তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে তাহাকে স্থান দাও।

কিছুদিন পরে এক ক্ষৌরকার আমার ক্ষৌরকার্য্যে আসিলে, সেদিন তাহার আসিতে বিলম্ব হইল কেন জিজ্ঞাসা করায়, সে দুঃখিতভাবে বলিল, 'বাবু! কি বল্‌ব? লজ্জার কথা আপনার কাছে বল্‌তে সাহস হয় না; তবে দেরী হল কেন জিজ্ঞেস কর্‌ছেন তাই বলি। আমি ঐ আগের গলিতে একটী মেয়ে মানুষকে ভরণ পোষণ দিয়ে রেখেছিলুম। আগে সে বেশ্যাবৃত্তি কর্‌ত বটে; কিন্তু বিশেষ কারণে ইদানিং সে সব একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। মানুষটা দেখ্‌তে শুন্‌তে যেমন মন্দ ছিল না, প্রাণটাও তেমন ছিল। বল্‌ব কি বাবু! তাকে নিয়ে আমি এক রকম সুখেই ছিলাম; কিন্তু এ পোড়া বরাতে তাও সহ্য হল না। দুদিনের জ্বরে কাল রাত্তিরে হঠাৎ সে মারা গেল।' বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল; বেচারা কাজ বন্ধ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

আমার সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার সেই মেয়ে মানুষটী বাজার কর্‌তে আস্‌ত কি?'

ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল 'হাঁ।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তার গায়ের রং হলুদের মত; মুখের ডান দিকে একটা আঁচিল ছিল; মাথার চুল খাটো, কোঁক্‌ড়ান কোঁক্‌ড়ান;—কেমন, তাই না? বয়স আন্দাজ বোধ হয় ২৮।৩০ বছর।'

ক্ষৌরকার অবাক হইয়া আমার কথা শুনিতেছিল; আর তাহার বিস্মিত দৃষ্টি আমায় চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল; আমি বলিলাম, 'বল? যা যা বল্‌লুম —ঠিক?'

সে তখন আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'বাবু! আপনার সব কথাই মিলেছে। বলুন,—বলুন,—আপনি কি একদিন তাকে মা বলে ডেকেছিলেন?'

আমার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ আর কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি বলিলাম, 'আমি যে তাকে মা বলেছিলাম তা তুমি কি করে জান্‌লে?'

উত্তরে সে বলিল, 'বাবু! তবে শুনুন,—ঠিক মর্‌বার আগেই সে আমাকে ডেকে বল্‌লে—'দেখ, আমি বোধ হয় আর বাঁচ্‌ব না,—মরি তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু একদিন একটী ছেলে—আমায় মা বলে ডেকেছিল।—আমার একবার তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে;—তুমি একবার আমায় তাকে এনে দেখাতে পার?'

বল্‌তে বল্‌তেই কথা বন্ধ হয়ে এল ; আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। ঘরে 'সাধনা' বলে একখানি ঠাকুরের ছবি ছিল। শুধু ইসারা করে সেই ছবিখানি পেড়ে দিতে বল্‌লে। কি বল্‌ব বাবু ! পুণ্যাত্মাও এমন সজ্ঞানে মরে না। ছবিখানি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে সে যেন মনে মনে বল্‌লে—'আমায় স্থান দাও ; আর অমনি চক্ষু কপালে উঠ্‌ল ; হাত থেকে ছবিখানি বুকের ওপর পড়ে গেল ; আমি আস্তে আস্তে ছবিখানি নিয়ে মাথার কাছে রেখে দিয়ে দেখি—সব শেষ।'

পতিতা মার মৃত্যুকাহিনী শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমি যেন কেমন এক রকম হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে ক্ষৌরকার্য্য শেষ করিয়া উপরে গিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ঠাকুরের ছবিখানি পর্য্যন্ত যাহার ঘরে থাকে, তাহারও উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। আমাদের প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের এমনই অসীম দয়া !

৪৮

ছাত্রাবাসের সহকারী তত্ত্বাবধায়কের কাজ আর ভাল লাগিতেছিল না। এখনকার শিক্ষিত ছেলের দল স্বভাবতঃই অবাধ্য। তাহার উপর যোগেনদা আমাদের উচিত বক্তা ; খোসামুদি মোটেই জানেন না। দেখিয়া শুনিয়া ঐ সংসর্গে অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। ইহার উপর একদিন ঠাকুর আসিয়া স্বপ্নে বলিলেন, 'অন্নদা ! 'অন্নদা ! চাকরী কর্‌লে মনুষ্যত্বহীন হয়ে যেতে হয় ; নিজের স্বাধীনতা ক্রমশঃ লোপ পেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনটা অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।' শচীনকে এই সকল ব্যাপার জানাইলে সেও বলিল, 'তোমার ভাল না লাগে ছেড়ে দাও ; এর আর কথা কি ?' এই সকল কারণে ছোট ভগ্নীর বিবাহের উদ্যোগ করিবার ওজর করিয়া আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

বাড়ীতে আসিয়া মনটা ভালই আছে। কেবল মধ্যে মধ্যে ভগ্নীর বিবাহের জন্য এক একবার ভাবনা হয়। ভগ্নীটি আমাদের সকলের ছোট ! সকলের প্রিয় ; নাম ছিল প্রিয়দা। আমাদের তিন ভায়ের পর দুই বোন ; নীরোদা ও ক্ষীরোদা। পাঁচ বৎসর বয়সে ক্ষীরোদা ওলাউঠায় আমাদের ছাড়িয়া যায় ; তাহার পর মার অনেক কান্নাকাটিতে সে আবার ফিরিয়া আসে। সেই জন্য সে আমাদের সকলের, বিশেষতঃ মার প্রিয় হইয়াছিল ; তাই তাহার নাম হইয়াছিল প্রিয়দা। দেখিতে আমাদের কয় ভগ্নীর মধ্যে প্রিয়দাই সুন্দরী ছিল ; স্বাস্থ্য এবং গঠনও সুন্দর থাকায় সকলের কাছেই সে সুন্দরী বলিয়া অভিহিত হইত। তাহার স্বভাবও খুব শান্ত এবং নির্ম্মল ছিল। প্রিয়দার সংসারে আসা সম্বন্ধে সুন্দর একটী গল্প আছে ; যথাসময়ে আপনারা শুনিতে পাইবেন।

সেবার যখন প্রিয়দার বিবাহের নাম করিয়া বাড়ী গিয়াছিলাম তখন তাহার

বয়স ১১ বৎসর। আমি একদিন প্রিয়দাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'প্রিয়দা! তোর বর খ‍ুঁজে খ‍ুঁজে যে আমরা হয়রান হয়ে গেল‌ুম; তুই ৺মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে জানাতে পারিস্‌ না? যেন একটী ভাল ছেলে জোটে।

কথা শ‍ুনিয়া প্রিয়দা দৌড়িয়া পলাইল। মা আসিতেছিলেন; তিনি দৌড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রিয়দা বলিল, 'মেজদা ভারী দ‌ুষ্টু; দেখ না, কি বল্‌ছে।'

মা হাসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অন্নদা! প্রিয়দাকে তুমি কি দ‌ুষ্টুমির কথা বলেছ? সে যে দৌড়ে পালাল?'

প্রিয়দাকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা শ‌ুনাইলে মা বলিলেন, 'অন্নদা! প্রিয়দা ৺মাকে খ‌ুব ডাকে; ল‌ুকিয়ে ল‌ুকিয়ে অন্ধকারে ৺মঙ্গলচণ্ডীর ঘটের সামনে বসে চোখের জলে কত কথাই বল্‌তে থাকে। কাল আমি স্বকর্ণে শ‌ুনেছি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ৺মাকে সে বল্‌ছে 'মা! তুমি এমন বিম‌ুখ হয়ে রইলে কেন? দাদাদের এত কষ্ট দিচ্ছ কেন? মাকে বাবাকে এত ভাবাচ্ছ কেন? তোমার অসাধ্য কি আছে মা? 'দোহাই তোমার! যাহোক একটা উপায় করে দাও।' বলিতে বলিতে মারও চোখে জল আসিল; অঞ্চলে চক্ষ‌ু ম‌ুছিতে ম‌ুছিতে ম‌ৃদ‌ু হাসিয়া মা আবার বলিলেন, 'অন্নদা! প্রিয়দার কথা ত তুমি সব জান; সে কি তেমন মেয়ে? সে আমাদের কখনও কষ্ট দেবে না; দেখ্‌বে হঠাৎ সব ঠিক হয়ে যাবে। এই ত টাকার ভাবনা, মস্ত ভাবনা ছিল; তা ত ৺মার দয়ায়, আমার প্রিয়দার ভাগ্যে মিটে গেল? এখন চাই একটী ছেলে; তা সময় হলে তাও জ‌ুটে যাবে; তুমি অত ভেবো না।'

মা এইর‌ূপ বলিতেছেন, এমন সময় আমার এক জ্ঞাতি বৌদি ব্যস্তভাবে আসিয়া মাকে বলিলেন, 'মা! তুমি কি পোড়ার ওষ‌ুধ জান একটু দাও না; মেয়েটা হাত প‌ুড়িয়ে ছট্‌ফট করছে।'

'এ্যাঁ! হাত পোড়ালে কি করে? তোমরা বাছা—ছেলে মেয়েদের ওপর নজর রাখ না'—বলিতে বলিতে মা গ‌ৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

আমি বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা যে পোড়ার ওষ‌ুধ জানেন, তা আপনি কি করে জান্‌লেন?'

বৌদি বলিলেন, 'তা না জান্‌লে আর ছ‌ুটে এসেছি? আপনি ব‌ুঝি জানেন না? তবে শ‌ুন‌ুন;—দিন কতক আগে শৈলদি পায়ের ওপর গরম ফেন ফেলে ত একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল; পা দ‌ুটো ফোস্কা পড়ে গোদের মত হয়ে উঠ্‌ল; আর যেমন ছটফটানি তেমনই কান্না। কত ডাক্তার বদ্যি এল, কত ওষ‌ুধ পত্তর নষ্ট হল; কিছ‌ুতেই কিছ‌ু হল না। তখন আবার আপনাদের সঙ্গে ওঁদের ঝগড়া; এমন কি কথাটি পর্যন্ত ছিল না। মা কিন্ত‌ু স্থির থাক্‌তে পারেন নি; বোধ হয় ৺মঙ্গলচন্ডীর কাছে খ‌ুব কান্নাকাটি করেছিলেন। সেই

রাত্রিরেই স্বপ্নে ওষুধ পেয়ে তখনই কত আপনার মত গিয়ে সেই ওষুধ লাগাতে লাগ্‌লেন। আমরা ত দেখে সকলে অবাক! শৈলদি যন্ত্রণার চোটে তখন সব ভুলে গিয়েছিল। মা বল্‌লেন, 'এই ওষুধ আর দুবার লাগালে সব ভাল হয়ে যাবে।' কি আশ্চর্য্য! ওষুধ লাগাতে লাগাতে জ্বালা থেমে গেল; তার পরদিন ফোস্কা বসে গেল; আর দুএক দিনের মধ্যে অত বড় পোড়া ঘা একেবারে শুকিয়ে ভাল হয়ে গেল। তারপর মাকে জিজ্ঞেস কর্‌তে মা বল্‌লেন 'এ স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ; শৈলর কান্না শুনে এ ওষুধ ৺মা আমায় দিয়েছেন।

বৌদির কথা শেষ হইতে না হইতে মা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন এবং বৌদির সহিত গিয়া ঔষধ লাগাইয়া আসিলেন। আমি হাসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ওষুধ দিলেন মা?'

মা বলিলেন, 'বাবা! এ তোমাদের শাস্ত্রীয় ওষুধ নয়; এ ৺মায়ের দান; আমি আরও ৪।৫টী ওষুধ স্বপ্নে পেয়েছি; তা সময়ে তোমায় বল্‌ব।'

আমি মনে মনে ভাবিলাম স্বপ্নে যদি ৺মায়ের প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঔষধ পাওয়া যাইবে না কেন? মাও বলিলেন, 'অন্নদা! ৺মাকে পেয়ে ত তোমার সে অবিশ্বাস গেছে? এখন একবার কালাচাঁদ ঠাকুরকে একদিন গিয়ে দেখে এস।'

আমাদের বাড়ী হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে হাওলা নামক একটী গ্রামে কালাচাঁদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন; কালাচাঁদ ঠাকুর শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। দেখিতে অতি সুন্দর; বড় জাগ্রত দেবতা। বন্ধ্যাকে পুত্রদান করিতে এমন মুক্তহস্ত দেবতা বোধ হয় ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। তারকেশ্বরে হত্যা দিয়া যেমন দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ পাওয়া যায়, ৺কালাচাঁদ ঠাকুরের কাছে হত্যা দিয়া তেমনই অপুত্রা পুত্রলাভ করে। প্রতি অন্নপ্রাশনের তিথিতে সেখানে অসংখ্য পুত্রবতী জননীর সমাগম হয়। মায়ের কোলে দেবতার দান গোপালমূর্ত্তি দেখিতে যাঁহাদের সাধ, তাঁহারা সে স্থানে যাইলে বড় আনন্দ পাইবেন। সেখানে হত্যা দিয়া যাঁহারা পুত্রলাভ করেন তাঁহারা পুত্রের অন্নপ্রাশন দিতে সেইখানেই আসেন; তাঁহাদের প্রতি নাকি সেইরূপ আদেশও আছে। এমন জাগ্রত দেবস্থান কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে দর্শন করি নাই; তাহার কারণ, ইহার মূলে ছিল স্বপ্নাদেশ। স্বপ্নাদেশ আমি তখন বিশ্বাস করিতাম না। মার মুখে ৺কালাচাঁদ ঠাকুরের যে ইতিহাস আমি শুনিয়াছিলাম, তাহা এইরূপ :—

চট্টগ্রামের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ গ্রামের প্রান্তভাগে কালাচাঁদ নামে জনৈক বৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর নিকট একটী প্রকাণ্ড দীঘি ছিল। ভক্ত বৈষ্ণবের প্রতি একদিন আদেশ হয়,—'তুমি যদি দীঘির ধারে নিম্ববৃক্ষের নিম্নে প্রত্যূষে গিয়া কীর্ত্তন করিতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে স্বয়ং ৺লক্ষ্মীনারায়ণ

তোমার নিকটে আসিবার জন্য ঐ দীঘির জলে ভাসিয়া উঠিবেন ; তুমি তখন তাঁহাদের তুলিয়া লইও।' স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস করিয়া কালাচাঁদ অতি প্রত্যুষে দীঘির ধারে সেই নিম্ববৃক্ষের নীচে গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেই দেখিতে পাইল, সত্যসত্যই দীঘির জলে দুই মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিয়াছে। দীঘির চারিধারে পদ্মবন ছিল। ভক্ত সেই কণ্টকবন অতিক্রম করিয়া মূর্ত্তির নিকট গিয়া বামহস্তে লক্ষ্মী ও দক্ষিণহস্তে নারায়ণের মূর্ত্তি ধরিতেই—দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক বা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হউক—স্পর্শমাত্র সুবর্ণময়ী লক্ষ্মীমূর্ত্তি জলে ডুবিয়া অন্তর্হিত হইল।

অতঃপর বৈষ্ণব দুই হস্তে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অতিকষ্টে তীরে আনিয়া নিম্ববৃক্ষের নিম্নে রাখিলেন ; এবং ৺মা আবার ভাসিয়া উঠিবেন এই আশায় পুনরায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পরও যখন ৺মা আর ভাসিয়া উঠিলেন না, তখন 'মা! মা!' বলিয়া ভক্ত বৈষ্ণব দীঘির জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে, দৈববাণী হইল—'তুমি বাম হস্তে প্রথম মাতৃমূর্ত্তি স্পর্শ করিলে বলিয়া ৺মা অন্তর্হিতা হইলেন। তুমি এখন আমাকে ঘরে লইয়া যাও ; বৃথা অনুশোচনা করিও না।' বৈষ্ণব কালাচাঁদ নিজেকে বহু ধিক্কার দিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তিখানি নিজগৃহে লইয়া গেলেন।

বৈষ্ণবের বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রাপ্তি বড় আনন্দ ও শান্তির কারণ হইল। দিনের পর দিন কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময় কালাচাঁদের হাওলা নিবাসী এক শিষ্যের প্রতি স্বপ্নযোগে আদেশ হইল ;—'তোমার গুরুর নিকট হইতে আমাকে তোমার বাড়ীতে আনিয়া রাখ ; এবং তোমার গুরুর নামে আমার নামকরণ করিয়া স্থাপন কর।' ভক্ত কালাচাঁদের প্রতিও তদনুযায়ী আদেশ হইলে কালাচাঁদ স্বয়ং শিষ্যালয়ে গিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক সপ্তাহকাল মধ্যে বৈকুণ্ঠলাভ করিলেন। গৃহে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর কালাচাঁদ-শিষ্যের এক একটী করিয়া ছয়টী পুত্রসন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর শেষ পুত্রটী রোগশয্যাশায়ী হইলে শিষ্য পুত্রশোকে উন্মত্ত হইয়া সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিকে কুঠারের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে বিষ্ণুমণ্ডপ হইতে মূর্ত্তিখানি উঠানে আনিয়া রাখিল ; এবং কুঠার লইয়া একটী আঘাত দিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্—দেখে যা ; গুরুদেব এসে আমায় আলিঙ্গন দিয়েছেন।' তাঁহার চীৎকারে চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া দেখিল, কুঠার হস্তে অবশতনু কালাচাঁদ শিষ্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; সম্মুখে সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি। দেখিতে দেখিতে কুঠার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল ; এবং 'আমি গুরুদেবের সঙ্গে চলিলাম' বলিয়া তিনি নিজেও ঢলিয়া পড়িলেন। এদিকে অন্দর বাটীতেও ক্রন্দনের রোল উঠিল ; কাহারও বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। সকলে ধরাধরি করিয়া শিষ্যটীকে স্থানান্তরে লইয়া গেল ; পরীক্ষা করিয়া

দেখা গেল জীবনের চিহ্নমাত্র নাই।

শিবাটীর বংশে কেহ রহিল না দেখিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থের দল বলিতে লাগিল, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা করায় এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। অতঃপর গ্রামবাসী সকলে সেই বাটী হইতে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থানান্তরে লইয়া গেল এবং বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা করাইতে লাগিল। দুই এক দিবস পরে ৺কালাচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং স্বপ্নাদেশ করিলেন—'আমি এখানে থাকিব না; আমি যেখানে ছিলাম আমায় সেইখানেই রাখিয়া আইস। আমি সেই দৈবজ্ঞ পাড়ায় সেই জন-কোলাহলের মধ্যেই থাকিতে ভালবাসি।' তদনুযায়ী ঠাকুরকে সেইস্থানে পুনঃ-স্থাপিত করা হয়। আজিও ৺কালাচাঁদ ঠাকুর সেই হাওলা গ্রামে, সেই দৈবজ্ঞ-পাড়ায় নির্ব্বংশ ভিটায় বিরাজ করিতেছেন।

৪৯

আমার যখন ১৩।১৪ বৎসর বয়স তখন আমি মার মুখে কালাচাঁদ ঠাকুরের ঘটনা শুনিয়াছিলাম; এবং ইহা গল্প বলিয়াই হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম। এখন আমার সেই ভ্রম সংশোধন হইয়াছে। মার আদেশে আমার এক মাতুল ভ্রাতার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমি ৺কালাচাঁদ ঠাকুর দর্শন করিতে গেলাম। কি উজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি! কি আনন্দময় বিগ্রহ! কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিয়া মার নিকট সমস্ত বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিলাম। শুনিয়া ভক্তিমতী মা আমার অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না; চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'অন্নদা! কালাচাঁদ ঠাকুরের কাছে যা প্রার্থনা করে-ছিলাম এতদিনে তা পূর্ণ হয়েছে। তোমার জীবনে ঐ রকম অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটুক; আর তুমি সব বিশ্বাস কর। আজ তা পূর্ণ হয়েছে।'

মার চোখের জলে আমার পাষাণ প্রাণ দ্রবীভূত হইল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন; বলিলেন 'অন্নদা! তুমি যে মায়ের মূর্ত্তি পেয়েছ —সে মূর্ত্তিখানি, তোমার সেই খুব অসুখের সময় যে ৺মায়ের কৃপায় তোমায় পেয়েছিলাম, ঠিক সেই মাতৃমূর্ত্তির মত। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই মৃদু-মধুর হাসি; ঠিক যেন সেই মা।'

আমি বলিলাম, 'মা! সে ঘটনাটি কি ভাবে ঘটেছিল, আমায় খুলে বলুন।

মা বলিতে আরম্ভ করিলেন;—তোমার দেড় বৎসর বয়সের সেই মারাত্মক রোগের সময় যখন ডাক্তার বদ্যি হার মানলে, সবাই তোমার আশা ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল, তখন আমি ত চক্ষে অন্ধকার দেখলুম। সেই এক দুঃখের দিনে ৺মা মঙ্গলচণ্ডীর সামনে তোমায় রেখে আমি একটু চোখ বুজেছি এমন

সময় স্বপ্নে দেখি,—আমি আমাদের পূবের পুকুরে জল আনতে গেছি ; আর তেঁতুল গাছের নীচে একটি মেয়ে হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে ; কাছে গিয়ে মুখখানি দেখে আমার মনে হল, এ আর কেউ নয়—৺মা কালী ; তখন আমি ভক্তি করে নমস্কার করলুম। ৺মা বললেন,—'তোর অন্নদা ভাল হয়ে যাবে ; যদি আমার পুজো মানৎ করিস্।' আমি বললুম, 'নিশ্চয় আপনার পুজো দেব ; আমার অন্নদাকে আমায় ফিরিয়ে দিন। বলতে বলতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল ; আমি তখনই ৺মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে এই বলে মানৎ করলুম, 'মা! আমার অন্নদাকে ভাল করে দাও ; সে বেঁচে থাক, তার স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে জাঁকজমক করে তোমার পুজো করবে।'

মার কথা শুনিয়া আমি একটু হাসিলাম। মা বলিলেন, 'কেন ? তোমাকে ত অনেক দিন আগে একথা বলেছি। তোমার কি মনে নেই ? তোমার প্লেগ হয়েছে বলে ৺কাশী থেকে দিদি যখন আমায় যেতে লিখলেন, তখন আমি উত্তরে লিখেছিলাম,—দিদি ! তোমার কি মনে নেই যে অন্নদা আমার ৺মায়ের দান ? যতদিন না অন্নদার মাতৃপুজো মানৎ পূর্ণ হবার সময় হয়, ততদিন অন্নদার মৃত্যু নেই।'

আমি বলিলাম, 'হাঁ মা ! সে কথা আমার মনে আছে।'

মা বলিলেন, 'তবে হাসলে যে ?'

'হাসলুম আপনার মানৎ করার বহর দেখে ; ছেলের অসুখ হয়েছে ; মানৎ করুন, অসুখ ভাল হলে পুজো দেবেন।—তা নয়, ছেলে ভাল হোক ; বেঁচে থাক ;—বড় হয়ে বিয়ে হোক ; তারপর—স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে তোমার পুজো করবে।'

'কি জানিবাপু ? আমার যেন সে সময় ঐ রকম বুদ্ধিই ৺মা যুগিয়েছিলেন। এই মানৎ শুনে সে সময় আমার শ্বশুর ও আর সকলে হেসেছিলেন ; তা সে যাই হোক ; ৺মা ত ফেলেন নি ?—সবই ত হয়েছে ? এখন তুমিও বিবাহিত। আর যা দেখছি তাতে ত মনে হয় তুমি নিত্যই ৺মায়ের পুজো করবে।'

আমি বলিলাম, 'মা ! আপনার মানৎ কি কখনও বিফল হয় ?

তারপর মা বলিলেন, 'সেই যে মাতৃমূর্ত্তি দেখেছিলাম, সেই মূর্ত্তি তোমার স্বপ্নাদেশে পাওয়া মূর্ত্তি—দুই এক রকম।'

আমি বলিলাম, 'তা ত হবার কথাই।'

এই সকল কথা হওয়ার দিন দুই পরে আমার জন্ম সম্বন্ধে একটী স্বপ্ন বিবরণ মার কাছে শুনিয়াছিলাম। সেদিন মাকে বলিলাম, 'মা ! আমার যে রকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তাতে আমার মনে হয় যে বেশী দিন আর আমাকে লোক সমাজে থাকতে হবে না ; কেন না আমার যেন কিছুই ভাল লাগছে না। এই কদিন দেশে এসেছি ; এরই মধ্যে প্রাণ পালাই পালাই করছে। কিন্তু কোথায়

যে পালাব—কোথায় গিয়ে যে প্রাণের জ্বালা জুড়াব—কোথায় যে প্রকৃত শান্তি তৃপ্তি আনন্দ পাব—তা জানি না ;—তবে এক জায়গায় যেন বেশী দিন থাক্‌তে পার্‌ছি না।

আমার কথা শুনিয়া মার চোখে জল আসিল। মা বলিলেন, 'বাবা! তোমার জন্মের আগে থেকেই আমি জানি—তুমি আমার কাছে বরাবর থাক্‌তে পার্‌বে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি তা কেমন করে জান্‌লেন ?'

মা বলিলেন, 'আমার একটু বেশী বয়সেই তোমার দাদার জন্ম হয়। তখন আমার ২১ বৎসর বয়স ; তারপর চার বৎসর আমার আর সন্তান না হওয়ায় সকলে মনে করেছিলেন আমার আর ছেলে পিলে হবে না। তাতে কেউ কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন ; তাঁদের মধ্যে দিদির পরামর্শমত আমি একটী পুত্র কামনা করে ৺মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করেছিলুম। রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লুম ৪টী ফল হাতে ৺মা আমার কাছে উপস্থিত। ফল চারটী এক বোঁটাতেই ঝুলছে। ৺মা বলিলেন, 'তুমি একটী ফল বেছে নাও।' আমি ফলগুলি ভাল করে দেখ্‌লুম। একটী ফল বেশ পাকা দেখে সেইটী নিতে যেমন হাত বাড়িয়েছি, অমনি ফলটী ঝরে পড়্‌ল। মা বল্‌লেন, 'ঐ ফলটী তুমি নিতে চেয়েছিলে ?' আমি বল্‌লুম, 'হাঁ ;' মা তখন বল্‌লেন, তা নাও ; কিন্তু মনে রেখো যে ঐ ফলটী একা তোমার নয় ; তুমি ওকে সব সময় কাছে রাখ্‌তে পার্‌বে না।' তাতে আমি বল্‌লাম, 'তা হোক ; আমি ঐটী নেব ; ওটী বেশ পাকা।' এই বলে ফলটী হাতে কর্‌তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কি এক পবিত্র স্বর্গীয় ভাবে তখন আমার প্রাণ ভরে এল। কিন্তু মনে রইল, এবার যদি আমার সন্তান হয়, তাকে হয় ত বরাবর বুকে রাখ্‌তে পার্‌ব না। তাতে কিন্তু আমার মনে কোন দুঃখ ভাবনা হয় নি। আর সে স্বপ্ন যে সত্য, তা এখন তোমার কথায় প্রমাণ হচ্ছে। তা বাবা! তোমার যেখানে গিয়ে শান্তি হয়, তুমি সেখানেই যেও আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে একটী কথা ;—বৌমার সুখ দুঃখের ভার এখন তোমার উপর ; সে যাতে সুখী হয় তা করাও কি তোমার ধর্ম্মের মধ্যে নয় ?'

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া মা পুনরায় বলিলেন, 'বাবা! তুমি আমাদের জন্যে ভেবো না ; ৺মায়ের কৃপায় আমরা এক রকম চালিয়ে নেব। তুমি তোমার ভাবনা ভাব ; ৺মা তোমার দ্বারা যা করাবেন—তুমি যেন নির্ভাবনায় তাই কর্‌তে পার ; ভগবানের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।'

৫০

আমার ধর্ম্মপালনে মার উৎসাহ উদারতা ও ত্যাগের ভাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তাঁহার বিশ্বাসকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলাম। এবং আমার

প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ দেখিয়া জীবনধারণ সার্থক মনে হইল। রাত্রে স্ত্রীর সহিতও এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ স্ত্রীও মার মত উদারতার পরিচয় প্রদান করিল। সে বলিল, 'তুমি শান্তির জন্য যেখানে ইচ্ছা যাও; তাতে আমার কোন আপত্তি নেই; তবে মধ্যে মধ্যে খবর দিয়ে নিশ্চিন্ত করো।'

বিবাহ হইতে এ পর্য্যন্ত যখনই স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনই ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কথা কখনও হয় নাই। কি করিলে ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপে ডাকিলে তিনি সহজে শুনিতে পান, কিসে তিনি সন্তুষ্ট হন, এই সকল কথা প্রায়ই হইত। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, তাহাও কি কখনও সম্ভব! যুবতী স্ত্রীর সহিত যুবক স্বামী কখনও এইরূপ আলাপে সন্তুষ্ট হইতে পারে?

কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু নিজের কথা না বলিলেও স্ত্রী যে ঐরূপ আলাপে আনন্দ পাইত না—তাহা কেমন করিয়া বলিব? কারণ, দেখিয়াছি—কৃষ্ণলীলার কথা হইলেই চোখের জলে তাহার বুক ভাসিত; এবং আমার চোখে কখনও জল দেখিলে ব্যাকুল হইয়া আমার ভাবে নিজেকে ডুবাইয়া সে আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিত। সেদিনও ৺মায়ের দর্শন সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। কথা হইতে হইতে আমার যে কি হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কিছুক্ষণ পড়িয়াছিলাম। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখি,—আমি স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি। স্ত্রী স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে আমায় বাতাস করিতেছে; তাঁহার মুক্ত কেশ-গুলি আমার বক্ষে ও বাহুতে পড়িয়াছে। আমি তাহার সেই ভয় ও ব্যথা বিজড়িত স্থির দৃষ্টি দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হয়েছে?' সে কোন উত্তর না করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি ক্রমশঃ সব বুঝিতে পারিলাম; এবং অনেক সান্ত্বনার পর তাহাকে কতকটা আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, 'তুমি অত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?—আমার ঐরকম মাথার রোগ কি তুমি আর দেখ নি? আরও ত অনেকবার দেখেছ; এই সেদিনও ত বলছিলে আমি কি রকম হয়ে গেছলাম। তুমি ভয় পেয়ো না; ওতে কারও মৃত্যু হয় না।'

স্ত্রী উত্তর করিল, 'তা নাও হতে পারে; কিন্তু আজ তুমি যে রকম অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে, এমন ত আর কখনও দেখি নি, তাই আমার ভয় হয়েছিল। আমি আর কোন উপায় না দেখে কাঁদতে কাঁদতে তোমায় ডাকছিলুম; এমন সময় ঠিক বুঝতে পারলুম না কে—একখানি পাখা দরজার উপর দিয়ে বিছানায় ফেলে দিলেন। আমি তাই দিয়ে তোমায় বাতাস করতে লাগলুম; অনেকক্ষণ পরে তবে জ্ঞান হল।'

তাহার পর আমার এরূপ হইবার দুএকটী কারণ তাহাকে বলিয়া দিয়া সেদিনকার মত বিশ্রামলাভ করিলাম। স্বামী স্ত্রীর মিলনে আমাদের এইরূপ

আলাপ ব্যবহারই হইত।

সে যাহা হউক; এবারও বেশী দিন বাড়ী থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কয়েকদিন পরে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। এবারকার বিদায় দৃশ্য আরও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। সকলে যেন আমায় চির বিদায় দিতেছেন; আমি যেন আর সংসারে ফিরিব না; বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস অবলম্বনের জন্যই যেন গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়াছি। সে বিদায়ে এমনই করুণ ভাবের অবতারণা হইয়াছিল। আমার স্নেহময়ী জননীর সেদিনের আশীর্ব্বাদের কথা এখনও আমার কানে বাজিতেছে। সে কথা মনে হইলে এখনও আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠে; আমি আত্মহারা হই। কিন্তু আমি এমনই অযোগ্য যে তাহা প্রকাশ করিতেও আমি সঙ্কুচিত হই; লজ্জায় আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। আজ লেখনীর সাহায্যে সে কথা প্রকাশ করিতেছি। সকলে আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

বিদায়ের সময় মাকে প্রণাম করিলে মা আমায় স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'বাবা! আমি আর তোমায় কি আশীর্ব্বাদ করব? ভগবানের কাছে এই আমার একমাত্র প্রার্থনা যে তুমি—পরমহংস হও।' আমি লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিলাম। তিনি পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, 'নিশ্চয় তুমি পরমহংস হবে; ৺মা তোমায় পরমহংস করুন;—এই আমার আশীর্ব্বাদ।'

জানি না, পরমহংস কাহাকে বলে মা তখন জানিতেন কিনা; কারণ আগেই বলিয়াছি মা আমার একেবারে সেকেলে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। বোধ হয় তাঁহার অক্ষর পরিচয়ও ছিল না। তথাপি তিনি সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, মুক্ত-কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'তুমি পরমহংস হও!'

ধন্যা জননী! তোমার জঠরে স্থান পাইয়া আমিও ধন্য হইয়াছি। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য ফলে জীব এমন জননীর সন্তান হয়। আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত সাধনা দিয়াও যদি আমি পরমহংস-পদরজের অধিকারী, তাঁহার দাসানু-দাসও হইতে পারি, পরমহংস ভাবের এক কণাও যদি আমি পাই, তাহা হইলে বুঝিব কেবল আমার সতী সাধ্বী জননীর আশীর্ব্বাদেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। এমন মায়ের সন্তান হওয়ার গৌরবেই আমার জীবন ধন্য হইয়াছে।

৫১

যথাসময়ে কলিকাতা আসিয়া দেখিলাম শচীন এক সংকীর্ত্তনের দল গড়িয়াছে। আমি এক সময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম শচীনের বাড়ীতে আমরা কীর্ত্তন করিতেছি; আর কীর্ত্তনের মাঝে পরমহংসদেব বসিয়া আছেন। শচীনকে সে কথা বলিয়াও ছিলাম; আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। শচীন, নির্ম্মল, যতীন, হরিচরণ, সত্য, হরিভূষণ প্রভৃতি

এই কীর্ত্তনে প্রধান উদ্যোগী ছিল। প্রথমতঃ সপ্তাহে একদিন এবং পরে প্রায় প্রত্যহই কীর্ত্তন হইত। মাতৃকীর্ত্তন, হরিসংকীর্ত্তন এবং রামকৃষ্ণ গুণানুকীর্ত্তন হইয়া শেষে নাম হইত। কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া শুধু যে আমিই বাহ্যজ্ঞান হারাইতাম তাহা নহে; পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত নব্যদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে থাকিতেন; নির্ম্মল ভায়াকে ত মধ্যে মধ্যে চৈতন্য হারাইতেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়।

আমাদের কীর্ত্তনের শ্রোতা হইতেন মায়ের দল। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের নিদর্শন যে কত পাইয়াছি তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। কীর্ত্তনে তাঁহাদের প্রেমাশ্রু ভক্তপ্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করিত; সে ভাব বর্ণনার অতীত। এই সকল পবিত্র ভাবের মধ্যে বেশ এক রকম দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার উপর আমি এক নূতন কাজ পাইলাম। শচীনের মা আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পূজার ঘরে বসিয়া যাহা লিখিতেন, তাহা পড়িয়া আমায় সংশোধন করিয়া দিতে হইত।

ইহার মধ্যে একদিন স্বপ্ন দেখিলাম আমি বিমলমার লেখা একটী কবিতা প্রকাশ করিবার জন্য এক পত্রিকায় দিতেছি। কথাটা যতীন বাবুকে জানাইলে যতীন বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'এবার আর আপনার স্বপ্ন সফল হবে না; এ স্বপ্ন সত্য হতে পারে না। একখানা চিঠি লিখতে যে এক লাইনে পাঁচটা ভুল করে, ২।৩ খানি বাংলা বইয়ের শেষ পর্য্যন্তই যার বিদ্যে, সে আবার কবিতা লিখবে, আর আপনি আবার তা ছাপাবেন।' আমি বলিলাম, 'আপনি গিয়ে বিমলমাকে বলুন দেখি; তারপর তিনি কি বলেন শুনে তারপর অন্য কথা হবে।'

যতীনবাবু হাসিতে হাসিতে ঘরে গেলেন। ক্ষণেক পরে একখানি হাতে লেখা খাতা আমার নিকট লইয়া আসিয়া বলিলেন, 'আপনার স্বপ্ন অনেকটা গা ঘেঁসে গেছে; বিমল এক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছে; এই দেখুন পড়ে; কি লিখেছে।

আমি ব্যস্তভাবে খাতাখানি লইয়া বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিলাম। লেখা সামান্যই ছিল; ৫।৭ পৃষ্ঠার অধিক নয়। পড়া শেষ করিয়া আমি বলিলাম, 'যতীনবাবু! এ বড় সুন্দর বিষয় ধরা হয়েছে। যদিও আমি উপন্যাস লেখার পক্ষপাতী নই, তবু বিমলমাকে বলবেন, আমি তাঁকে উৎসাহ দিয়েই বলছি, তিনি যেন তাঁর ভাব মধ্যে মধ্যে কবিতায়ও প্রকাশ করেন।'

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই ঘটনার ৩।৪ দিন পরেই যতীনবাবু বিমলমার লেখা একটী কবিতা আনিয়া আমায় দেখাইলেন। কবিতাটী পড়িয়া আমি বড়ই আনন্দ পাইলাম। ক্রমে আরও ৪।৫টী কবিতা লেখা হইল। আমি নিজে গিয়াই বিমলমার লেখা কবিতা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় দিয়া আসিলাম এবং

ক্রমান্বয়ে তিন সংখ্যায় তিনটী কবিতা প্রকাশিত হইল। আমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল।

আমি এই সকল লইয়া বেশ আনন্দেই আছি। একদিন শচীন আমায় বলিল, 'ভাই! তোমার জন্য বড়ই ভাবনায় পড়েছি; এ রকম করে আর কদিন কাটবে? পিতামাতার সেবার জন্য ৺কাশীধামে ৺মায়ের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত হল না।—এখন তাঁদের জন্য যাহোক একটা কিছু করতে হবে ত?'

আমি বলিলাম, 'কি কর্‌ব বল?—যোগেনদার বোর্ডিং ত উঠেই গেল; নাহলে আবার না হয় সেখানে গিয়েই ভর্ত্তি হতুম। তার পর মটর ড্রাইভারি শিখ্‌ব মনে করেছিলুম; তাও তো হল না। একজন বল্‌লে দোকান করে খবরের কাগজ বিক্রী কর্‌তে; তুমি কি বল? তোমার যদি মত হয় আমি তাই কর্‌ব।'

'না ভাই! আমি তা কর্‌তে তোমায় কিছুতেই বল্‌তে পারি না;' বলিয়া শচীন ভাবিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'তোমার অমতে আমি কিছু কর্‌তেও চাই না;' কেননা, তুমি শ্রীমার শিষ্য; আবার ঠাকুর আমায় অভয় দিয়ে বলেছেন, তোমায় যখন শচীনের কাছে এনে দিয়েছি, তখন আর তোমায় ভাব্‌তে হবে না।'

শচীন লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আমি ভাই অতি সামান্য; সবই ঠাকুরের দয়া।'

আমি তাহাতে বলিলাম, 'তুমি সামান্য; তাই বা কি করে বলি? তোমারই চেষ্টায় আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি। তুমিই ত সবাইকে ধরে চেষ্টা চরিত্র করে আমার ছোট বোনটির বিয়ের জন্য এতগুলি টাকা তুলে দিলে। তা ছাড়া সেই দেনার—

শচীন বাধা দিয়া বলিল, 'ভাই! ওসব কথা বলে আমায় লজ্জা দিও না; তা ছাড়া আমারও ত অহঙ্কার আস্‌তে পারে? ওসব ঠাকুরের দয়া; সবই ভাই ঠাকুরের দয়া; আমি কিছু নই।' কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলিল, 'দেখ ভাই! আমি ত এবার থার্ড ইয়ারের এক্‌জামিন দিচ্ছি; আর আমার তিন বছর আছে; তারপর ত যাহোক একটা কিছু হব? তাই বল্‌ছিলাম কি—এর মধ্যে তুমি দুচারখানা ইংরেজী বই পড়ে কম্পাউণ্ডারিটা পাশ করে নিলে হয় না? কম্পাউণ্ডারিতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না; তাতে জাল জুয়াচুরী কিছু নেই। আর, চাকরী কর্‌লেও জোর বছরখানেক; তারপর আমার ডিস্‌পেন্‌-সারীতেই থাক্‌বে। আমিও তোমার কাছে কিছু কিছু কবিরাজী শিখে নিয়ে তোমার সেই পেটেণ্ট ঔষধগুলো আবার চালাতে চেষ্টা কর্‌ব। তাতে তোমারও যথেষ্ট আয় হবার সম্ভাবনা আছে। পিতামাতার সেবাই যখন আপাততঃ তোমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন অন্ততঃ কিছু কিছু টাকা দেশে

পাঠান ত তোমার কর্ত্তব্য ? নাহলে আর কি উপায় আছে ? কিসে পিতামাতাকে সুখী কর্‌তে পার বল ?'

শচীনের কথা ৺ঠাকুরের ইঙ্গিত মনে করিয়া আমি বলিলাম, 'ভাই ! তোমার যা ইচ্ছা, আমি তাতেই রাজি ; বল কি কর্‌তে হবে।'

ইহার পর সহজে ইংরাজী শিখিবার একখানি বই কেনা হইল এবং নির্ম্মল মাষ্টারের কাছে আমার পড়িবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। ঐ সকল ব্যবস্থায় আমাকে সম্মতি দিতে হইলেও কিন্তু অন্তরে আমার ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সন্দেহের ঘন অন্ধকারে আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। দুশ্চিন্তায় আমি দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছিলাম। সত্যসত্যই কি আমি কম্পাউণ্ডারি করিয়া জীবন কাটাইব ? না ৺ঠাকুর আমায় অন্য পথে লইবেন ? এইরূপ চিন্তায় আহার নিদ্রা একরূপ ত্যাগ হইল। রাত্রে কিছু আহার করিয়া আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে বাহির হইয়া পড়ি ; এবং চিন্তা করিতে করিতে সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে মেছুয়াবাজার পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকি। এইরূপে কিছুদিন যায়।

৫২

সেদিন রাত্রি প্রায় নয়টা। আমি চিন্তিতভাবে আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের বাটীর নিকট পদচারণা করিতেছি ; এমন সময় একজন সাধু আমার গায়ে রীতিমত ধাক্কা দিয়া আগে চলিয়াছে। সাধুটী দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল। তাহার গায়ে একখানা কাল কম্বল ; হাতে চিম্‌টে। সাধুর ধাক্কায় আমার ভাব ভঙ্গ হওয়াতে আমার রাগ হইল। আমি বলিয়া ফেলিলাম, 'এমন হতভাগ্য সাধু ত দেখি নি। বেটা সাধু না শয়তান ! এত বড় রাস্তা পড়ে থাক্‌তে চোখে দেখ্‌তে পেলে না ?—বেটা আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে গেল ?' আমার স্তুতিবাদ বোধ হয় সাধুর কানে পৌঁছিয়াছিল। কেননা, দেখিলাম ৫।৭ পা অগ্রসর হইয়াই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল ; তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়া আমিও তাহার সম্মুখীন হইলাম ; সাধু স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তখন হঠাৎ মনে হইল,—তাই ত ! এই না সেই ? দুইবার যাঁহাকে পাইয়াও হারাইয়াছিলাম ; সেই 'গাঁজার পয়সা চাওয়া' সাধুই ত এই ! চিনিতে পারিয়া অবিলম্বে তাঁহার পায়ে পড়িয়া করজোড়ে ক্ষমা চাহিলাম। আমার গালাগালিতে ক্রুদ্ধ হইবার সাধু ত এ নয়। মৃদু হাসিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং আলিঙ্গনের ভাবে আমায় আপ্যায়িত করিলেন। আমি বলিলাম, 'বাবা ! আপনি ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবই বল্‌তে পারেন ; আমার অনেক কথা আছে ; একটু দাঁড়ান ; আমি বাসায় বলে আসি। দেখ্‌বেন, যেন পালাবেন না ; এই দুঃসময়ে যদি দেখা দিলেন—দয়া করে একটু দাঁড়ান ;

আমি এখনই আস্‌ছি।' এই বলিয়া আমি বাসার দিকে ছুটিলাম ; গলিতে শচীনদের চাকর বিদেশীকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া দিলাম, 'মাকে বলিস্ আমি আজ আর রাত্রে বাসায় আস্‌ব না ; বুঝ্‌লি ?' বলিয়াই আবার ত্বরিৎপদে সাধুর কাছে আসিয়া পেঁাছিলাম। আজ সাধু লক্ষ্মী ছেলেটীর মত ঠিক দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া আনন্দিতভাবে বলিলাম, 'চলুন, আপনি কোথায় থাকেন ; আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

সাধু নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলেন। আমিও নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। হ্যারিসন রোডে পড়িয়া সাধু পশ্চিম দিকে চলিলেন। ক্রমে বড়বাজার আসিল। সিন্দুরিয়াপটী পার হইয়া খোংরাপটী অভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সাধু একটী গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পর এ গলি ও গলি করিয়া আঁকা বাঁকা রাস্তায় কিছুদূর গমনান্তর একটী নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া একখানি নামাবলী দ্বারা আমার চোখ বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, 'ভয় পেয়ো না ; আমি তোমায় ঠিক আমারই বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। এই কথাগুলি সাধু বাংলায় বলিলেন ; এবং ইহার পরও সকল কথা বাংলায় হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সাধুর মুখে হিন্দি ভিন্ন শুনি নাই। এবং তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। সাধু ভালরূপে আমার চোখ বাঁধিয়া অন্ধের মত আমার হাত ধরিয়া প্রায় ১৫।২০ মিনিট চলিয়া গিয়া বাঁধন খুলিতে খুলিতে বলিলেন, 'দেখ, আমি যে বাসায় থাকি, সে বাসায় আমায় সকলে পাগল বলেই জানে,—পাগ্‌লা পাগ্‌লা বলেই ডাকে। তুমি কারও কথায় কোন উত্তর না করে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুক্‌বে।'

আজ আমি সাধুর হাতে যেন খেলার পুতুল। তিনি চলিলেন ; আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দু একখানি বাড়ীর পরেই একখানি প্রকাণ্ড বাড়ীর দরজায় দুইজনে ঢুকিলাম। অমনিই উপর হইতে এক বালক 'পাগ্‌লা আয়া, পাগ্‌লা আয়া ; উস্‌কা সাথ আউর ভি এক দুসরা পাগ্‌লা আয়া ;' ইত্যাদি বলিতে লাগিল ; সাধুকে অনুসরণ করিয়া আমি বাড়ীর দ্বিতীয় মহলের একটী ছোট ঘরে প্রবেশ করিলে সাধু দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ঘরখানি সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্প ও ধূপের সৌরভে ভরা ; সাধু একটী ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন। দেখিলাম দৈর্ঘ্য প্রস্থে ঘরখানি ৬ হাত ৪ হাত পরিমিত হইবে। পূর্ব্বদিকে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে ; তাহারই সম্মুখে দেড় ফুট দু ফুট আন্দাজ একখানি সাধুর ছবি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন আমি কোন স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছি। আমার যেন আর কোন চিন্তা ভাবনা নাই। আসন দেখাইয়া দিয়া সাধু আমায় বলিলেন 'বস ;' আমি বসিতে ইতস্ততঃ করায় সাধু বলিলেন, 'বস,

বস ; তোমার জন্যই ও আসন পাতা হয়েছে ; বস।'

আমি বসিয়া ছবির দিকে দেখিতে দেখিতে সন্দেহ হইল এই মূর্ত্তি কাহার ? এই সাধুরই পূর্ব্ব মূর্ত্তি নয় ত ? জটা ও দাড়ির আড়ম্বরে ঠিক অনুমান হইল না। সাধু বলিলেন, স্থির হয়ে বস ; উনি আমার গুরুদেব। গুরুদেবের দিকে চেয়ে মন স্থির কর। ঐ মূর্ত্তির মধ্যে তোমার অতীত জীবনের অনেক ঘটনা দেখ্‌তে পাবে। তারপর তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের ২।৪টী কথা আজ তোমায় বলে দেব। আগে আমার ওপর তোমার বিশ্বাস হোক ; স্থির হয়ে বস।'

৫৩

আমি বসিলাম। সাধুর আসনের এমনই গুণ, যে বসিতে না বসিতে আমার চিত্ত স্থির হইয়া আসিল ; জ্ঞান রহিয়াছে ; কিন্তু নড়িবার ক্ষমতা নাই। দেহমন স্থির হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টিও স্থির। এমন সময় ঘরখানি যেন গাঢ় চন্দ্রালোকে পূর্ণ হইয়া গেল ; আর সম্মুখস্থ চিত্রের সাধুমূর্ত্তিও সেই আলোয় মিলাইয়া গেল ; এবং তৎপরিবর্ত্তে সেখানে ছায়াচিত্রের মত একটী গৃহস্থের পর্ণকুটির দৃশ্য প্রতিফলিত হইল। দেখিলাম সেই পর্ণকুটীরের একটি ঘরে এক রুগ্নশয্যাশায়ী শিশু সন্তানের পার্শ্বে এক ব্যক্তি চিন্তিত মনে বসিয়া রহিয়াছে। দৃশ্যটী দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর ! চিন্‌তে পারছ শিশুটী কে ?' আমি স্থিরভাবে উত্তর করিলাম, 'না।'

'ঐ শিশুটী তুমি। তোমার যে দেড় বছর বয়সের সময় কঠিন রোগ হয়েছিল, সেই রোগে তুমি ঐ রকম শয্যাশায়ী হয়েছিলে।'

সাধুটী এইরূপ বলিতেছেন এমন সময় দৃশ্যপটের শয্যাপার্শ্বস্থ সেই লোকটি উঠিয়া গেল। আর সাধু বলিলেন, 'ঐ দেখ, এবার তোমার মা আস্‌ছেন।'

বলিতে বলিতে মাথায় অল্প ঘোমটা দেওয়া সত্যই আমার মা আসিয়া সেই রোগশয্যাপাশে বসিলেন এবং স্থির দৃষ্টিতে শিশুর পানে চাহিয়া রহিলেন। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন যুগলের স্নেহমাখা কাতর দৃষ্টি মনে হইলে এখনও আমি অভিভূত হইয়া পড়ি। মা আসিয়া বসিলে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন ? চিন্‌তে পারছ ত ?' বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আমি শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, 'হ্যাঁ।'

তাহার পর সে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের দেশের স্কুলগৃহে পরিণত হইল। দেখিলাম প্রসন্নময়ী আমায় কোলে করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেছে। আমার বয়স তখন ৫।৬ বৎসর ; হাতে একখানি 'বর্ণবোধ'।

পরের দৃশ্যে দেখিলাম আমাদের বাড়ীর উঠানে আমি পুস্তক হস্তে যেন কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। আমার তখন বয়স ১১।১২ বৎসর। দেখিতে

বেশ সুন্দর সুগঠিত এবং সাধারণ বালক অপেক্ষা ঈষৎ স্থূল ও শান্ত শিষ্ট ছিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার অগ্রজ এবং পাড়ার অন্যান্য বালক বালিকারা আসিয়া জুটিল। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন 'চিনতে পারছ?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ।'

মনে হইল সাধু ত অতীতের সবই দেখাইতেছেন, যদি আর একটী ঘটনা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। এই কথা ভাবিতে না ভাবিতে অন্তর্যামী সাধু বলিলেন, 'সেই সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে চাও? আচ্ছা দেখ।'

সম্মুখে দেখিলাম সেই সমুদ্রের দৃশ্য।—সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; সূর্যদেব ধীরে ধীরে সমুদ্রের মধ্যে নামিয়া যাইতেছেন। এমন সময় একখানি সামপান অতি কষ্টে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমি ও আমার খুড়া ৺পণ্ডিত ষষ্ঠীচরণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সেই সামপানে উঠিলাম। সামপানের মাঝি কিছুতেই পার করিতে চাহে না। কাকাও কিছুতেই ছাড়িবেন না। অবশেষে কাকার তিরস্কারে সে পাড়ি দিতে বাধ্য হইল। আদিনাথ হইতে তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া সামপান অপর পারে চলিল। প্রায় তিন ভাগ অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় চট্টগ্রাম হইতে কক্সবাজারে যে ষ্টীমারখানি যায় তাহা সামপানের পিছন দিয়া চলিয়া গেল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বাড়িল; এদিকে অল্প অল্প ঝড়ও উঠিয়াছে। সামপান অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুফানও বাড়িতে লাগিল। তরঙ্গের আঘাতে সামপানের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। দেখিলাম ভয়ে তখন কাকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর তিনি পরিত্রাহি ডাকিতেছেন—

'আদিনাথ চন্দ্রনাথ শম্ভুনাথ সদাশিব।
পরিত্রাহি পরিত্রাহি পরিত্রাহি চ শংকটে॥'

আমার বয়স তখন ১৩।১৪ বৎসর। আমিও কাকার সংগে সংগে 'আদিনাথ চন্দ্রনাথ—' করিতেছি। এদিকে তরংগে পড়িয়া সামপান একবার ২০ হাত উপরে উঠিতেছে আবার নামিতেছে। অথচ তীরে পেঁাছিতে আর বিলম্ব নাই; একরূপ আসিয়া পড়িয়াছি। গতিক ভাল নয় দেখিয়া প্রাণপণে একলাফ দিয়া চড়ায় পড়িয়া চাচা আপন বাঁচাইলেন। আর সংগে সংগে সামপান উলটাইয়া ঘটিবাটির মতই আমি ডুবিয়া গেলাম।

তরংগের আঘাতে পরে আমাকেও চড়ায় লইয়া ফেলিল। কাপড় খুলিয়া কোথায় গিয়াছে তার ঠিক নাই; জামাটী গায়ে আটকাইয়া আছে। কাকা তাড়াতাড়ি আমার জামা ধরিয়া টানিয়া আরও কিছু উপরে তুলিলেন। কিন্তু একি! কাকা দেখিলেন, এক বিপদ হইতে আর এক বিপদ; সামপানের ধার আমার হাঁটুর নীচে লাগিয়া ভীষণভাবে কাটিয়া গিয়াছে। একেবারে মাংস উলটাইয়া রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়াই কাকা চামড়ার মুখ সোজা

করিয়া বসাইয়া দিয়া তাঁহার গামছা দিয়া ভালরূপে বাঁধিয়া দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

ঘটনা সত্যই এইরূপ ঘটিয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি অবাক হইয়া রহিলাম। সাধু বলিলেন, 'কেমন? এখন বিশ্বাস হবে ত?' আমি বলিলাম, 'হবে।'

তখন অবার সেই আলো ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। আসনের সম্মুখে সেই সাধুর চিত্র যেমন প্রথমে দেখিয়াছিলাম, আবার তেমনই দেখিলাম; আর আমিও ঘাড় ফিরাইয়া বাঁচিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম ঘরে কোনরূপ বৈদ্যুতিক বা অন্যপ্রকার আলো আছে কি না; কিন্তু ঘরে কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

সাধু বলিলেন, 'দেখ ঠাকুর! তোমাকে শিগ্‌গিরই বনে যেতে হবে। সেখানে যে আদেশ পাবে তাতেই তোমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে!'

আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'বনে যাবার সাধ আমার নেই। আর বাসনা নিয়ে বনেই বা যাব কেন?'

সাধু বলিলেন, 'তোমাকে যেতেই হবে।'

আমি তাঁহার কথার প্রতিবাদ না করিয়া কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি আমাকে দু'বছর বিবাহ করতে বারণ করেছিলেন কেন? আমি ত এক বছর পরেই বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছি।'

'তা বেশ হয়েছে। তবে বিবাহটা যদি ৺মাকে পাওয়ার আগে না হত, তাহলে আর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হত না। এখন হয় ত ভাল বুঝতে পারছ না। পরে বুঝবে যে, বিবাহ বন্ধন জ্বালা কি ভয়ানক! বিবাহের কি ভীষণ দায়িত্ব। আর দাম্পত্যজীবনের প্রেম পবিত্রতা রক্ষা করা কি কঠোর আত্মশাসন ব্রত!'

'তা এখন থেকেই অল্প অল্প বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমার এই স্ত্রী কি পূর্বজন্মের স্ত্রী নয়?'

'তোমার পাঁচ জন্মের পূর্বের স্ত্রী? গত চার জন্মের স্ত্রীকে আর সংসারে আসতে হবে না।'

'এই পাঁচ জন্মের আগে আর কয় জন্ম এ রকম ব্রত নিয়ে সংসারে এসেছিলুম?'

'আরও আট জন্ম।'

'সে সব স্ত্রী কোথায়?'

'তারা এ জন্মে তোমার সাক্ষাৎ পাবে; তোমার কাজে আত্মসমর্পণ করে কঠোর সাধনায় জীবনব্রত উদ্‌যাপন করবে।'

'আচ্ছা; আমার এই ১৩ জন্মের মা কি পৃথক পৃথক? না বর্ত্তমান

গর্ভধারিণীই ১৩ বার আমায় গর্ভে ধরে আসছেন ?'

'না ; তোমার বর্তমান গর্ভধারিণী তোমার এই জন্মেরই মা। এর আগের ২ জনকে আর আস্‌তে হবে না ; তার আগের ১০ জন মার সঙ্গে তোমায় এ জীবনে দেখা হবে। তাঁরাও সকলে তোমার এই কাজে আত্মসমর্পণ করে যাতায়াত হতে চিরমুক্তি লাভ কর্‌বেন।'

'আপনি বল্‌তে পারেন, আমায় আর কবার এ পৃথিবীতে আসতে হবে ?'

'আর একবার যে আস্‌তে হবে, তা বল্‌তে পারি ; তারপর কি হবে না হবে জানি না।'

'আচ্ছা, আমার বড় ইচ্ছা যে পিতামাতাকে কাশীধামে বা গঙ্গাতীরে রাখি ; আমার সে বাসনা পূর্ণ হবে কি ?'

তুমি ত এখন কাশীতে থাক না, যে তাঁদের কাশীবাসী কর্‌বে ?' তবে গঙ্গা-তীরে রাখা একান্ত ইচ্ছা থাক্‌লে হতে পারে ; কেন হবে না ?'

এ কথায় আমি বড়ই আনন্দ পাইলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, এদেশে যে একটা রব উঠেছে শিগ্‌গির একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে—একথা কি সত্য ?'

প্রশ্ন শুনিয়া সাধু ঈষৎ হাসিলেন ; তারপর বলিলেন, 'যা রটেছে, তার একটুও মিথ্যা নয় ; তবে সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব এই বাংলাতেই হবে ; অন্য কোথাও নয়।'

'যিনি আস্‌বেন, তিনি কে ?'

'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পুনরায় আসিতেছেন শুনিয়া আমার আনন্দের অবধি রহিল না ; আমি পুলকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা তিনি যদি নিজেই আস্‌বেন, তাহলে এ হতভাগার উপর এসব স্বপ্নাদেশ কর্‌বার দরকার কি ছিল ? তিনি নিজে এসে ৺মাকে তুলে আনলেই ত হত ?'

'সে ৺মা জানেন, আর ৺ঠাকুর জানেন ; আমি কি বল্‌ব ? তবে তুমি ৺ঠাকুর সম্বন্ধে শিগ্‌গির সবিশেষ জান্‌তে পার্‌বে। এটা মনে মনে খুব বিশ্বাস রেখো। বলিতে বলিতে সাধু উঠিলেন এবং বলিলেন, 'অনেক রাত হয়েছে ; এখন চল তোমায় রেখে আসি।'

আমার আরও দু-একটি কথা ছিল ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম না। সাধু আমাকে বাহিরে আনিয়াই আমার চোখ বাঁধিলেন এবং যথাপূর্ব অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যখন আমাকে হ্যারিসন রোডে উপস্থিত করিলেন তখন ১২টা বাজিতেছিল। সাধু আমার চোখ খুলিয়া দিলেন। দেখিলাম রাস্তায় লোক চলাচল একেবারে কমিয়া গিয়াছে ; দোকান বাজার প্রায় সব বন্ধ হইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া মনে হইল, আমি সিন্দুরিয়াপটির কিছু

পূর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছি। সাধুকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার কবে দেখা হবে?' তিনি বলিলেন, 'সময় হলে।' তার পর অনেক দিন অনেক চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান পাই নাই।

৫৪

সাধু বিদায় হইলে আমি বাসা অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। প্রায় নেশাখোরের মতই স্খলিত পদে অতি কষ্টে চিৎপুর পার হইয়া কিছুদূর আসিয়াছি, এমন সময় এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটিল একটি অল্পবয়স্কা যুবতী রক্তাক্তকলেবরে ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, 'বাবু! আমায় রক্ষা কর; বদমায়েস্‌দের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর; আমায় বাঁচাও।—আমার ধর্ম্ম যায়;—আমার ইজ্জত যায়;—আমায় আশ্রয় দাও।'

আমি সেই বিপন্না নারীর ভীতিবিহ্বল অবস্থা দেখিয়া ও তাহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। কিরূপে এই রমণী রক্ষা পায় ভাবিতে ভাবিতে তাহার আততায়ী শত্রুদিগের আগমন আশঙ্কায় আমি ভয়-চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলাম। রমণী ক্ষিপ্রহস্তে আমার গায়ের চাদরখানা টানিয়া লইয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিল; এবং ভালরূপে ঘোমটা টানিয়া দিয়া গলির দিকে দেখাইয়া বলিল, 'বাবু! ওই গলি থেকে গুণ্ডাগুলো আমার সন্ধানে আস্‌ছে।- দোহাই ধর্ম্মের! আপনি আমায় আপনার করে নিন;' বলিতে বলিতে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে চলুন; ওরা যদি এসে জিজ্ঞাসা করে—একটী মেয়ে এদিকে এসেছে কি না,—বল্‌বেন, 'ঐ দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।' বলিয়া সে পিছন দিকে দেখাইয়া দিল। আমি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যন্ত্রচালিতের মত রমণীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় একটী পাহারাওয়ালাকেও সেখানে দেখিতে পাইলাম না।

দেখিতে দেখিতে তিন জন মুসলমান গুণ্ডা ছুটিয়া আসিয়া আমার গতি-রোধ করিল। তাহাদের হাতে বাঁশের লাঠি; চক্ষু রক্তবর্ণ; দৃষ্টি হৃতশিকার শার্দ্দুলের মত ক্ষুধিত ও কামোন্মত্ত। উহাদের দেখিয়াই ত আমার হৃৎকম্প উপস্থিত। ভয়ে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে; তথাপি বলিলাম, 'পথ ছাড়, যেতে দাও।'

গুণ্ডার দল ২।১ মিনিট আমাদের ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। একজন বলিল, 'যাবে কোথায়?—একটী মেয়েমানুষকে এদিকে ছুটে পালাতে দেখেছ?'

কথার উপর আর একজন জোর গলায় বলিল, 'সত্য কথা বল; না হলে খুন কর্‌ব।'

হৃদয়ের সমস্ত সাহস এক করিয়া আমি বলিলাম, 'হাঁ দেখেছি ; মাথায় রক্ত মুছতে মুছতে ঐ দিকে ছুটে গেল ; বোধ হয় এতক্ষণ চিৎপুরে গিয়ে পড়েছে।

আমার কথা শুনিয়াই তিন জন রুদ্ধশ্বাসে চিৎপুর অভিমুখে ছুটিল। তখন আমার ভরসা হইল। মনে মনে কিঞ্চিৎ বলও পাইলাম এবং আন্দাজে ঘটনাটী কতক বুঝিতে পারিলাম। ভগবান আমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই অসহায়া বিপন্নাকে রক্ষা করিলেন ভাবিয়া চক্ষে একবিন্দু জলও আসিল। পা এখন দ্রুত চলিয়াছে ; বিপন্না রমণীও অনেকটা সাহস পাইয়া আমার মুখের দিকে এক একবার তাকাইতেছে ;—যেন কত কি দুঃখের কথা আমায় বলিতে চায়, আবার কি ভাবিয়া বাধা পায়।

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বলিলাম, 'মা ! যদি বাধা না থাকে সকল ঘটনা আমায় খুলে বল ;' বলিতে বলিতে মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি,—তাই ত ! এখনও যে কপালের রক্ত বন্ধ হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওকি মা ! কপাল যে একেবারে ছেঁদা হয়ে ! কি করে এমন হল ?'

রমণী বলিল, 'পাথরে মাথা খুঁড়ে অমন হয়েছে ; আপনি ভয় পাবেন না ; আমি সব বল্‌ছি।'

ততক্ষণে আমরা 'নবীন ফার্ম্মাসী' পার হইয়া আসিয়াছি। রাস্তায় একখানি কয়লা পড়িয়াছিল। কয়লাখানি ভগবানের ইচ্ছায় কাঁচাই ছিল। তাড়াতাড়ি একটু কয়লা গুঁড়া করিয়া লইয়া রমণীর ক্ষতস্থানে দিলাম। একটু খড়ি পাইলে আরও ভাল হইত ; কিন্তু তখন পাই কোথায় ? যাহা হউক, তাহাতেই রক্ত বন্ধ হইয়া আসিল।

রমণী তখন বলিতে লাগিল, 'বাবু ! আজ আপনি আমার বাবার কাজ করলেন। রাস্তায় আপনার আশ্রয় না পেলে আজ আমার সতীত্ব ত যেতই ; প্রাণ পর্য্যন্ত হারাতে হত। আমার দিকে দেখ্‌ছেন কি ?—আমি ভদ্রলোকের মেয়ে নই ; আমরা জাতে চাষা। আমার স্বামী এখানে পটলডাঙ্গায় থাকেন ; শিয়ালদা থেকে দুধ এনে বাবুদের বাড়ী বাড়ী দেন ; আর দুধের মাখন তুলে ঘি বিক্রী করেন ; তাতে মাসে প্রায় এক শ টাকা উপায় হয়। কিন্তু এতেও তাঁর আশ মেটে না ; যতদূর অধর্ম্ম কর্‌তে হয়, করেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি অধর্ম্ম করেন ?'

সে বলিল, 'অধর্ম্মের কথা আর কি বল্‌ব ?—আজ সকাল বেলা দুধ এনে দেদার জল ঢাল্‌ছিলেন ; আমি আর চুপ করে থাকতে পার্‌লুম না ; বাবুদের কাছ থেকে খাঁটি দুধের দর নিয়ে দুধ দিচ্ছেন ; আর বাড়ীতে দেদার জল মেশাচ্ছেন ; এ সব কি অধর্ম্ম নয় ? তা ছাড়া খাঁটি ঘিয়ের যে দুর্দ্দশা হয়, সে কথা ত মুখে আন্‌তে সাহস হয় না ! এই সব দেখে শুনে আমি আজ দুচার

কথা জোর করে বলেছিলুম। তাইতে চটে গিয়ে আমায় এমন প্রহার করেছিলেন যে আমি এক রকম অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। সন্ধ্যার ঢের পরে এই কাণ্ড হয়। তারপর আমায় বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। অনেক কান্নাকাটি করেও যখন দরজা খোলা পেলুম না, তখন আমার প্রাণে ধিক্কার এল; মনে হল বাপের বাড়ী চলে যাই। তাই ঠিক করে হাওড়ার ইষ্টিশানের দিকে একলা যাচ্ছিলুম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার বাপের বাড়ী কোথায়?'

উত্তরে সে বলিল, 'কালনা থেকে দুকোশ যেতে হয়;—যা হোক, বাপের বাড়ী যাব বলে নিশ্চিন্ত হয়ে চলেছি; মনে ভেবেছি যদি গাড়ী না পাই, ইষ্টিশানেই শুয়ে থাকব; পরে সকালের গাড়ীতে চলে যাব। এই ভেবে যেতে যেতে বড় রাস্তা পার হয়ে যেমন একটু গেছি অমনই দুইজন মোছলমান পেছনে পেছনে চলতে লাগল, আর মাঝে মাঝে আমি কোথায় যাব, কোথা থেকে আসছি, এইসব জিজ্ঞেস করতে লাগলে;—যেন তারা কতই ভদ্দরলোক। তারপর আমি যখন বললুম, 'ইষ্টিশানে যাব' তখন তারা একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে বললে,—'আমরাও ইষ্টিশানে যাব, তুমি যাও ত ওঠ;—আমি বললুম,—'আমি তোমাদের গাড়ীতে উঠব না।' তখন তারা দুজনে, কেউ ছাতে, কেউ গাড়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে যাবে বলে এক রকম জোর করেই আমায় গাড়ীতে তুললে; আমি ভাবলুম বোধ হয় ভাল লোক। আমায় একলা নিরাশ্রয়া দেখে দয়া করে পেঁছে দিচ্ছে। তারপর গাড়ী গিয়ে একটা গলির ভিতর ঢুকল। তারা দরজা খুলে আমার হাত ধরে গাড়ী থেকে নামালে; দেখতে দেখতে আর একজন এসে জুটল। সকলে মিলে তখন আমাকে সামনের বাড়ীর নীচের একখানা ঘরে বন্ধ করে রাখলে। আমি কত কান্নাকাটি করলুম; কিছুতেই শুনলে না। তারপর তারা পরামর্শ করে কজনে কোথায় চলে গেল। আমি নিরুপায় হয়ে কেঁদে কেটে মাথা খুড়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম দেখে, বাড়ীর একটী মেয়েমানুষ বকাবকি করতে করতে এসে দরজা খুলে দিয়ে আমায় বললে—শিগগির পালা; নাহলে তোর সব্বনাশ হবে। তাই আমি প্রাণপণে ছুটেছিলাম; তারপর ত আপনার সঙ্গেই দেখা।' বলিতে বলিতে সে চক্ষু মুছিতে লাগিল; আর কথা কহিতে পারিল না।

আমি তখন তাহার দোষ কোথায় দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, 'স্বামীর উপর রাগ করে যে স্ত্রী স্বাধীনভাবে চলতে চায় তারই এই রকম বিপদ হতে দেখা যায়; তোমার খুব সয়ে সয়ে স্বামীকে সৎপথে আনতে চেষ্টা করাই উচিত ছিল। ঝগড়াঝাঁটি করে লোককে তার দোষ বুঝিয়ে দিতে পারে কে? তুমি তার স্ত্রী; তোমায় কৌশলে এমন কাজ করতে হবে যে দুদিক বজায় থাকে।

এখন এত রাত্রে তুমি বাসায় গিয়ে তোমার স্বামীকে কি বল্‌বে বল দেখি ?'

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে মহেন্দ্র দত্তের ছাতার দোকানের পাশের গলির সম্মুখে আসিতেই স্ত্রীলোকটী বলিল, 'এই গলিতে আমার এক জ্ঞাতি কাকা থাকেন ; আমি সেখানেই যাই। সেখানে এসব কথা না বলে, স্বামীর সঙ্গে যে ঝগড়া হয়েছে, তাই বল্‌বে ; আর মাথার ঘায়ের কথা জিজ্ঞেস কর্‌লে বল্‌ব,— দুঃখে মাথা খুঁড়েছি।

আমিও সে কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম ; এবং নিজে গোলদীঘিতে গিয়া রাত্রি কাটাইলাম।

৫৫

সাধুর সঙ্গে দেখা এবং কথাবার্ত্তা হওয়া সত্ত্বেও আমি বিশেষ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া শচীনভায়ার পরামর্শ মত কম্পাউণ্ডারি পরীক্ষার জন্যই প্রস্তুত হইতেছিলাম, এমন সময় একদিন ৺ঠাকুর স্বপ্নে আসিয়া আমায় বলিলেন, 'অন্নদা! তুমি ওসব পাগলামি ছেড়ে দাও। তোমায় শিগ্‌গিরই লছমনঝোলায় যেতে হবে!'

আমি ত শুনিয়াই অবাক। স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই ঠাকুর আজ আমায় তাহাই শুনাইলেন! আমি কখনও লছমনঝোলার গল্প পর্য্যন্ত শুনি নাই ; আর আমায় লছমনঝোলায় যাইতে হইবে। এও কি সম্ভব ? ঠাকুর বলিলেন, 'তুমি শিগ্‌গিরই লছমনঝোলায় যাবার সঙ্গী পাবে ; তার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুন্‌তে পাবে।'

সত্য সত্য তাহাই হইল। ঠাকুরের কথা কখনই বা মিথ্যা হয় ? শচীনের সেজদা আম্বালার সাব-ওভারসিয়ার ধীরেন্দ্র বসু আজ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। তাহার মুখে লছমনঝোলার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। লছমনঝোলায় যাইবার আদেশের কথা কিন্তু এ পর্য্যন্ত শচীন ভিন্ন কাহাকেও জানাই নাই ; কারণ কিছুই স্থির ছিল না। সেখানে গিয়া কি করিতে হইবে তাহাও তখন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। ধীরেন ভায়ার নিকট লছমনঝোলার বৃত্তান্ত শুনিবার পর আর একদিন ঠাকুর স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'অন্নদা! তুমি ঝুলন পূর্ণিমার আগে কল্‌কাতা থেকে রওনা হয়ে ঝুলন পূর্ণিমার দিন লছমনঝোলায় উপস্থিত থাক্‌বে। সেদিন তোমার উপর যে আদেশ হবে, সেই আদেশ অনুযায়ী কাজ কর্‌বে ; তাহলেই তোমার জীবন সার্থক হবে।'

তারপর ঠাকুর বলিলেন, 'তুমি বোধ হয় জান, এবৎসর তোমার জীবনে ভীষণ সংগ্রাম ; আর এই বৎসরই তুমি তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে উপনীত

হবে।'

আমি সবজান্তার মতই মাথা নাড়িয়া সায় দিলাম ; যেন আমি সবই জানি। ঠাকুর আবার বলিলেন, 'তোমাকে লছমনঝোলায় যেতে হলে তার আগে একটী কাজ কর্‌তে হবে।' বলিয়া তিনি তিন জন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি আমায় দেখাইলেন ; তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে আমি চিনিলাম। তিনি আর কেহ নন ; হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি অধুনা পরলোকগত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিন জনকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিলেন, 'তুমি এই তিন জনের সঙ্গে দেখা করে তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁদের শুনিয়ে তারপর লছমণঝোলায় যাবে। কিন্তু যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন ততদিন এ সম্পর্কে তাঁদের নাম প্রকাশ করো না।'

আমি বলিলাম, 'আপনি আমাকে যাঁদের দেখালেন, তাঁদের দুজনকে ত আমি কখনও দেখি নি ; তাঁদের নাম ধাম কিছুই জানি না। এ অবস্থায় এতবড় কল্‌কাতা সহরে আমি তাঁদের কোথায় খুঁজে পাব ?'

উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, 'তুমি যে দুজনকে জান না তাঁদের এক জনের বাড়ী কল্‌কাতার দক্ষিণপ্রান্তে বড় রাস্তার উপর ; আর এক জন থাকেন উত্তর প্রান্তে এক বড় রাস্তার উপর।'

আমি মাথা নাড়িয়া সায় দিলাম ; যেন সবই বুঝিয়াছি। ঠাকুর আর দু একটী গোপনীয় কথা আমায় শুনাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমি জাগ্রত হইয়া মহা সমস্যায় পড়িলাম। শচীনকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া কৌশলে ৺গুরুদাসবাবুর বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলাম।

এদিকে ধীরেন ভায়ার আম্বালা ফিরিবার সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। আমিও তাহার সহিত রওয়ানা হইব স্থির করিয়াছি। কিন্তু প্রাণে এক নূতন সংকল্প জাগিয়াছে যে লছমনঝোলা যাইবার পথে মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়া যাইব। মনে হইল, কি জানি এ দেহে আর ফিরিব কি না কিছুই ত ঠিক নাই ; প্রাণে যে বাসনা বহুদিন হইতে জাগিতেছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া যাওয়াই শ্রেয়।

স্থির হইয়াছে ধীরেন দিল্লী একপ্রেসে আম্বালা যাইবে। আমিও সেই সঙ্গে হাতরাস পর্য্যন্ত গিয়া মথুরার গাড়ী ধরিব। যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত নারিকেলডাঙ্গায় গুরুদাসবাবুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

যথাসময়ে গুরুদাসবাবুর বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জনৈক ভৃত্যের নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম তিনি বাটীতে আছেন। ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দক্ষিণের একটী ছোট পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাড়ে গুরুদাসবাবুর জনৈক পুত্র ২।১টী বন্ধুর সহিত আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা কিঞ্চিৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কাকে খুঁজ্‌ছেন ?'

আমার বেশভূষা তখন অতি হীন ; জামা জুতা পর্য্যন্ত ছিল না। গায়ে কেবল একখানা চাদর ছিল। এমন অবস্থায় আমি যে স্যার গুরুদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, তাহা তাঁহারা কিরূপে বুঝিবেন ? যাহা হউক তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, 'আমি গুরুদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ; তিনি বাড়ী আছেন কি ?'

গুরুদাসবাবুর পুত্রকে দেখাইয়া ভদ্রলোক বলিলেন, 'ইনি গুরুদাস বাবুর ছেলে ; আপনার কি বক্তব্য এঁকে বলতে পারেন।'

তাঁহাদের কথার ভাবে বোধ হইল তাঁহারা আমার চাল চলনে আমাকে কোন কিছুর প্রার্থী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, 'আমার কাজ কর্ত্তার সঙ্গে, তাঁর ছেলের সঙ্গে নয় ; তিনি বাড়ী আছেন কিনা বলতে পারেন ?'

তখন তাঁহারা আমায় বাড়ীতে যাইতে আদেশ করিলেন। আমি দরজায় গিয়া দাঁড়াইলাম। একটী ভৃত্য ভিতর হইতে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কি চাই ?'

আমি বলিলাম, 'কর্ত্তাবাবু বাড়ী আছেন ? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

লোকটি ত্বরিৎপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। আমি অবাক হইয়া গুরুদাসবাবুর বাড়ীর বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেছিলাম। দেখিলাম ভিতরে চারিদিকে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও লীলাচিত্র সুশোভিত ; উত্তর দিকে মনোহর ঠাকুর-দালান। দেখিতে দেখিতে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি ব্রাহ্মণ ?'

আমি উত্তর করিলাম, 'হাঁ ; আমি ব্রাহ্মণ সন্তান।'

ভৃত্য পুনরায় উপরে ছুটীল ; আমি ভাবিলাম,—কি মুস্কিল ! গুরুদাস-বাবু যদি ব্রাহ্মণের ছেলে কিছু চায় মনে করে দুচার আনা পয়সা পাঠিয়ে দিয়ে কাজ শেষ করেন ? তাহলেই সেরেছে ? তাহলে ত আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে না। ঠাকুরের যত সব বিদকুটে কাণ্ড। জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমায় পাঠান কেন বাপু ? আর যদি পাঠালেই ত তাঁকেও স্বপ্নে জানিয়ে দিলে না কেন ? তাহা হইলেই ত গোল চুকে যেত।

আমি এই সকল ভাবিতেছি এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সসম্মানে আমায় উপরে যাইতে আহ্বান করিল। আমি সংযতভাবে উপরে উঠিতে লাগিলাম। উপরে উঠিতেই কোষের বসন পরিহিত গুরুদাসবাবু আমায় সাদর আহ্বান করিলেন ; এবং ভৃত্যকে আসন আনিয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার পরিধানে কোষেয় বসন ও হস্তে কুশাঙ্গুরী শোভা পাইতেছিল দেখিয়া আমি মনে করিলাম বোধহয় পিতৃতর্পণ করিয়া পূজায় বসিবেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বারান্দার এক মর্ম্মর বেদীর উপর বসিয়া পড়িলাম এবং পৃথক আসনের প্রয়োজন

নাই বলিয়া তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিলাম। ভৃত্য আসন লইয়া আসিল; আমি আসনে না বসিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনিও বসিলেন না; আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাকভাবে আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি দেখ্‌ছেন?'

তিনি উত্তর করিলেন, 'কাল স্বপ্নে যাঁকে দেখেছি আপনি ঠিক সেই ব্যক্তি কি না দেখ্‌ছি।'

এ কথা শুনিয়া আমার মস্তক নত হইয়া আসিল। ভাবিলাম, তবে কি ঠাকুর আমার জন্য এখানেও আসিয়া ইঁহাকে জানাইয়া গিয়াছেন। ধন্য ঠাকুর! এই জন্যই তোমায় সকলে ভক্তবৎসল বলিয়া ডাকে। গুরুদাস বাবু বলিলেন, আপনার কি বক্তব্য বলুন; আমি কাল রাত্রে আপনাকে আমার ইষ্টদেবের সঙ্গে দেখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ বালকটী যা বল্‌বে, মনোযোগ দিয়ে শুনো;' আর দু'একটী কথার পর আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমি খুব ভোরেই উঠি। আপনি আর একটু পরে এলে বিশেষ অসুবিধায় পড়্‌তেন। কেননা, আমায় স্বহস্তে শালগ্রাম শিলার পূজো কর্‌তে হয়; কাজেই পূজোয় বস্‌লে আমার একটু বিলম্ব হয়।'

আমি বলিলাম, 'আপনি বসুন; আমার বল্‌তে একটু সময় লাগ্‌বে।'

'বসবার দরকার হবে না; আপনি বলে যান। যদিও আমার শরীর এখন ভাল নয়, তবু ২।১ ঘণ্টা অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি।'

আমি অতি সংক্ষেপে আদ্যামূর্ত্তি প্রাপ্তির কথা তাহাকে শুনাইলাম। তিনি নিবিষ্ট মনে শুনিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মুগ্ধ বিস্ময়ে 'নারায়ণ! নারায়ণ!' বলিতে লাগিলেন। আমার বক্তব্য শেষ হইলে তিনি বলিলেন, 'ঠাকুরের কৃপা যখন আপনি পেয়েছেন, তখন আর ভাবনা কি? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গুপ্ত অবতার। তিনি অনেকের সাক্ষাতে বলে গেছেন—আবার আস্‌বেন; আর সম্ভবতঃ সত্বরই আস্‌বেন। আচ্ছা, আপনার আদ্যামূর্ত্তির একখানি ফটো আমি কি করে পাই বলুন দেখি?'

আমি বলিলাম, 'এখন ফটো ছাপান নেই; পঞ্চানন ঘোষ লেনের ফটোগ্রাফার বলাই মিত্রকে বল্‌লেই ছাপিয়ে দেবে।'

তাহার পরে তিনি আমার মুখে লছমণঝোলা যাত্রার কথা শুনিয়া চমকিতভাবে বলিলেন, 'আপনাকে আবার সেখানে যেতে আদেশ হয়েছে? এবার নিশ্চয়ই মা আপনাকে বিশেষভাবে কৃপা কর্‌বেন।'

'আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যাত্রা যেন শুভ হয়; আপনার কাছে সেই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতেই এসেছি।'

'নারায়ণ নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল কর্‌বেন; বলিয়া তিনি একবার পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং অবিলম্বে একমুষ্টি টাকা লইয়া আসিয়া বলিলেন,

'লছমণঝোলা যেতে অনেক খরচ পড়্বে। এই নিন; পাথেয় স্বরূপ কিছু রাখুন।'

আমি একটু লজ্জিতভাবে বলিলাম, 'বাবা! ক্ষমা করবেন; ঠাকুরের বিনা আদেশে আমি আপনার কাছে পাথেয় নিতে পারি না। কেননা আমার এক বন্ধুর মা সমস্ত খরচ দেবেন স্বীকার করেছেন। কাজেই পাথেয় বলে আর কি করে গ্রহণ করি?'

ধার্ম্মিকপ্রবর আমার কথা শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'বেশ বেশ তাই হোক; সেই পুণ্যবতীর অর্থেই আপনি সৎপথে যাত্রা করুন।'

তাহার পর—আদ্যাশক্তির পূজা প্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই হইবে—বলিয়া, তিনি শক্তিপূজার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমায় অনেক কথা শুনাইলেন। আমি আর অধিকক্ষণ তাঁহাকে কষ্ট না দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। আসিবার সময় তিনি বলিলেন, 'আপনি একবার ডাক্তার গিরিন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে দেখা করবেন; তিনি বাদুড়বাগানে থাকেন; স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করছেন।' কিন্তু দুঃখের বিষয় উপরের কোন নির্দ্দেশ না পাওয়ায় আমি এ পর্য্যন্ত সেই স্বপ্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে পারি নাই।

৫৬

যাহা হউক অতি কষ্টে অনেক রাস্তা ঘুরিয়া সেই স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট অপর দুই ব্যক্তির সহিতও দেখা করিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনাইলাম। লছমণঝোলা যাত্রা করিবার দুইদিন পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিলাম ঠাকুর আমায় গৈরিক বসনে ভূষিত করিতেছেন। আমি বলিলাম, 'ঠাকুর! এ বসন আপনি কোথায় পেলেন?'

ঠকুর বলিলেন, 'কেন? তোমার মা যে তোমার জন্য ছুপিয়ে রেখেছেন।'

ঠিক পরদিন দেখি মা কাহাকেও কিছু না বলিয়া গিরিমাটী আনিয়া নূতন কাপড় ছুপাইয়া দিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! এ কাপড় কি আমার জন্য রং করছেন?'

মা উত্তর দিলেন, 'হাঁ, ঠাকুর? পাহাড়ে পর্ব্বতে যাবে; গেরুয়া রংএর কাপড় হলে শিগ্গির ময়লা হবে না।'

কথাটা আমার তেমন ভাল লাগিল না। কেন না এই গৈরিক বসনের আমি ঘোর বিরোধী ছিলাম; আমার বিশ্বাস ছিল এই গৈরিক আচ্ছাদনে বেশ্যা হইতে খুনি পর্যন্ত নিজ নিজ দুষ্কৃতি গোপন করিয়া গা ঢাকা দিয়া বেড়াইতেছে। তা ছাড়া চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার, চা, চুরুট, অখাদ্য কুখাদ্য প্রভৃতি কত অনাচার ত এই গৈরিক বসনের সহিত প্রকাশ্যেই চলিয়াছে। আমাদের সেই পবিত্র

ভগবান বস্ত্র এখন ভোগীর বিলাসের উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণে যে পাপের ভারে নতশির হইয়া পড়ে, এই গৈরিক সহায়তায় সেই পাপ অবাধে চলিয়াছে।

মাকে আর কিছু বলিলাম না। সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে ঠাকুর আবার আসিয়া বলিলেন, 'অন্নদা! বসন গৈরিক না হলে মুস্কিল হবে।'

আমি বলিলাম, 'ঐ বসনের উপর আমি বড় চটা।'

ঠাকুর তখন গৈরিক বসনের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া শুধু বলিলেন, 'তুমি এর উপকারিতা সময় সময় যথেষ্ট অনুভব করবে। আমার কথা শোন; গৈরিক বসন পর।' আমি তখন অগত্যা গৈরিক বসন পরিতে স্বীকৃত হইলাম।

আজ আমার লছমণঝোলা যাত্রার দিন। আমার নূতন পুরাতন বন্ধু বান্ধব সকলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল এবং হর্ষ বিষাদের অভিনয়ান্তে একে একে সকলে বিদায় লইল। আসিল না কেবল পাশের বাটীর নিৰ্ম্মলকৃষ্ণ সেন। নিৰ্ম্মল ভায়া তখন এম. এস-সি পড়ে; আমি মনে করিলাম ভায়ার একজামিনের পড়া; তাই আসিতেছে না।

সেদিন সিদ্ধেশ্বরভবনে জাঁকজমকে ৺আদ্যামায়ের পূজা হইল। আমি নূতন সাজে সাজিয়া ৺মায়ের পূজার আসনে বসিয়াছিলাম। আমার হাবভাব বেশভূষা দেখিয়া আজ কেহই আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। মা ও বিমলার দিকে যখনই দেখিতেছি তখনই তাঁহারা চক্ষু মুছিতেছেন। মার মুখে তবু হাসি আছে; বিমলমা একেবারে বিষাদের মূৰ্ত্তি। সকলেরই ধারণা এই ঠাকুরের শেষ যাত্রা; আর ঠাকুর ফিরবে না। পূজা অন্তে আমি সকলকে আশীৰ্ব্বাদী ফুল ও চরণামৃত দিয়া একটী নিৰ্ম্মাল্য হস্তে আমি নিৰ্ম্মলের সহিত দেখা করিতে গেলাম।

নিৰ্ম্মল বাহিরের একটী ছোট ঘরে বই খুলিয়া হেঁট মুখে বসিয়া আছে। আমি জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, 'নিৰ্ম্মল!' নিৰ্ম্মল মুখ তুলিয়া আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; কোন কথা কহিল না। আমি আবার ডাকিলাম, 'নিৰ্ম্মল! আমি ৺মায়ের নিৰ্ম্মাল্য এনেছি; দরজা খোল।'

এবার নিৰ্ম্মল সাশ্রুনয়নে আমার দিকে তাকাইয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে শুধু বলিল, 'অন্নদা! তুমি একি বেশ ধরেছ? সত্য সত্যই তুমি আমাদের ছেড়ে চল্লে?'

আমি বাড়ীর দরজার ভিতর গিয়া যখন দরজা খুলিলাম, নিৰ্ম্মল ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া বিছানায় ঢলিয়া পড়িল। আমি ব্যস্ত হইয়া তাহার মস্তকে নিৰ্ম্মাল্য স্থাপন-পূর্ব্বক মুখে চোখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য

সঞ্চার হইলে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং—আমার সহিত এই শেষ দেখা। এ জীবনে আর দেখা হইবে না—প্রভৃতি বলিয়া আমার অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিল। অনেক চেষ্টায় তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বাড়ীতে আসিব এমন সময় ডাকপিওন আমার হাতে একখনি পত্র দিল। পত্রখানি বাবারই হাতের লেখা; মার জবানী দেওয়া। পত্রে তাঁহারা অকপটে আমাকে আমার কর্ত্তব্য সাধনের জন্য স্বপ্ননির্দিষ্ট স্থানে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন। আমার প্রাণে দ্বিগুণ ভরসা হইল। পত্র দেখিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিল, ধন্য তুমি! আর ধন্য তোমার পিতামাতা!'

যথা সময়ে আমি ধীরেনের সহিত দিল্লী এক্সপেসে মথুরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বহু দিনের বহু সঙ্গীকে আজ বিদায় দিয়া সাধের কলিকাতা নগরী ছাড়িয়া কোন সুদূর প্রবাসে চলিয়াছি সে চিন্তা একবারও মনে স্থান পাইল না। সমস্ত দয়া মায়া তীব্র বৈরাগ্যের কঠোর শাসনে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাঁহারা আমায় ট্রেণে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সজল চক্ষু দেখিয়াও আমার ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। আমি স্থির ধীর অচল অটল; যেন এক সিদ্ধ যোগী পুরুষ। সংসারের কোন ভাব অভাবই আজ আমার প্রাণে স্থান পাইতেছে না; কোন মায়া অভিনয়ের দৃশ্যই আমার মন আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। আমার প্রাণে আজ বিমল আনন্দ; অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতেছে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ভার্য্যা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণের কথা স্মরণেও উঠিতেছে না; কেহ স্মরণ করাইয়া দিলেও হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি।

আহা সে কি পবিত্র দিন! সে কি মহান বৈরাগ্য! তত্ত্বজ্ঞানে তখন হৃদয় পরিপূর্ণ। হৃদয়ের কোন প্রদেশে বা চিন্তার কোন ধারায়, সংসারের কোন ভাব কোন ভাষা বা কোন অভিনয়ই, স্থান পাইতেছে না। সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যাদেশ ও ৺মায়ের মোহিনী মূর্ত্তি বিরাজিত; আর থাকিয়া থাকিয়া সেই নবজলধর বৃন্দাবনবিহারী যুগলমূর্ত্তিতে নয়নে প্রতিভাত হইতেছেন। মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনভাবে শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে; হৃদয় নাচিয়া উঠিতেছে; প্রাণে এক তুমুল আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইতেছে। কবে মথুরায় পেঁাছিব, কবে শ্যাম সুন্দরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব, কেবল এই চিন্তা। সেই শুভদিন, সেই শুভসংযোগ, এ জীবনে আর ঘটিবে কিনা জানি না; জন্মজন্মান্তরের কত পুণ্যবলে, মাতাপিতার কত আশীর্ব্বাদের ফলে, যে এমন দিন আসিয়াছিল কেমন করিয়া বলিব? এমনই পবিত্র দিনের পুণ্য প্রভাবে যুবরাজ শাক্যসিংহ ধন জন রাজ্য ঐশ্বর্য্য চিরতরে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন; সাক্ষাৎ শিবতুল্য শঙ্কর মাতৃস্নেহপাশ কৌশলে ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণান্তর অসাড়প্রায়-ভারতে জ্ঞানের আলো দেখাইয়াছিলেন; নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাধের

নবদ্বীপ, সাধ্বী স্ত্রী ও স্নেহময়ী জননীর স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রেমরাজ্যের অভিষেক লইতে পুরুষোত্তমের পথে ছুটিয়াছিলেন। জীবের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধদেব বিশুদ্ধ কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন; আচার্য্য শঙ্কর তাহাতে জ্ঞানবীজ বপন করিয়া গেলেন; মহাপ্রভু ভক্তিবারি সিঞ্চনে সেই বীজ অঙ্কুরিত করিয়া সুবিশাল কল্পবৃক্ষে পরিণত করিলেন। জীব প্রেমফল আস্বাদন করিল। এমন বস্তু সেই বৈরাগ্যধন কিন্তু আমার অধিক দিন স্থায়ী হইল না; যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছিল, সেই কার্য্য শেষ করিয়া কোন অজানা রাজ্যে উহা মিলাইয়া গেল; আর আমি যে সংসারী সেই সংসারী—যথাপূর্ব্ব সেই বদ্ধ জীবই সাজিয়া রহিলাম।

৫৭

যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া মোগলসরাই পেঁছিল। ক্রমশঃ ৺কাশীধামের দৃশ্য নয়ন পথে পড়িল। স্নেহময়ী পিসিমা ছোটমার কথা ও স্নেহের ভ্রাতাভগিনীদিগের কথা মনে পড়ায় তাহাদিগকে একবার দেখিবার বাসনা হইল। কেননা তখন মনে করিয়াছিলাম চিরদিনের মতই বুঝি চলিলাম; হয় ত এ জীবনে আর ফিরিব না। কাশীবাসী মাতুল শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্নেহ এবং সরল পবিত্র ভালবাসার স্মৃতিতে হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করিল। আর মনে পড়িতে লাগিল, আমার কৈশোরের একমাত্র বন্ধু বিনোদ দাদাকে। বিনোদ দাদা আমার জীবন নাটকে এক নূতন অঙ্কপাত করিয়াছিলেন। সময় হইলে সে কথাও আপনাদের শুনাইব। অবশেষে মনে পড়িল আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর স্মৃতিভূষণ ও কাশীধামের স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়দিগের কথা। এই সকল বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনগণের স্মৃতি ও তাঁহাদিগকে দেখিবার বাসনা কিন্তু তখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বৈরাগ্য অনলে দগ্ধ হইয়া গেল। আমি মনকে প্রবোধ দিয়া সুস্থ হইলাম; গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

বেলা প্রায় চার ঘটিকার সময় গাড়ী এলাহাবাদে আসিয়া পেঁছিলে ধীরেন ভায়া কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কারণ ধীরেন ভায়ার দিদি ও দিদির দেবর পরেশ বাবুর ষ্টেশনে আসিবার কথা ছিল। ধীরেন গাড়ী হইতে নামিয়া অনুসন্ধান করিতেই দিদি ও পরেশ বাবুর দেখা পাইল। কিন্তু একি! পরেশ বাবুকে একেবারে চিনিবার উপায় নাই! কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! বিষম শ্বাস-রোগে ভুগিয়া পরেশ বাবু একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যাঁহার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাঁহার এই দুরবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। দিদিও এই সকল দুশ্চিন্তায় রুগ্ন হইয়া পড়িয়া-

ছেন। সাশ্রুনয়নে তিনি আমাকে পরেশ বাবুর রোগের কথা জানাইয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! ৺মাকে বলবেন, যেন এঁর কোন উপায় হয়; ইনি যেন সেরে উঠেন।' পরেশবাবুও ছলছল চোখে বলিলেন, 'ঠাকুর! ৺মাকে জানাবেন, হয় আমায় এই ভীষণ রোগের হাত থেকে মুক্তি দিন; আর না হয় তাঁর চরণে স্থান দিন।'

আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। আমি পরেশ বাবুর রোগ মুক্তির জন্য প্রাণে প্রাণে প্রার্থনা করিলাম। ৺মাকে বলিলাম, 'মা! পরেশ বাবুকে রোগের হাত থেকে মুক্তি দাও; যদি কোন দুষ্কর্ম্মের ফলে তার এ ভোগ হয়ে থাকে, তা হলে তা আমায় দিয়ে তাকে শাস্তি দাও।'

এ প্রার্থনা তখনকার সেই বৈরাগ্যের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। কেহ মনে করিবেন না যে আমি প্রত্যেক আর্ত্তের জন্যই এরূপ কাতর প্রার্থনা করিয়া থাকি। এ একটা সাময়িক ভাব মাত্র।

রাত্রে যখন ধীরেনের নিকট বিদায় লইয়া তন্দ্রায় নিদ্রা যাইতেছিলাম তখন স্নেহময়ী ৺মা আমার, ষোড়শী মূর্ত্তিতে আমার কাছে উপস্থিত হইয়া হাসি-মুখে বলিয়া গেলেন, 'অন্নদা! তোমার প্রার্থনা আমার প্রাণে লেগেছে; আমি তিন মাসের মধ্যে পরেশের আরোগ্যের উপায় করবো।'

৺মায়ের কি অপূর্ব্ব দয়া! ৺মায়ের স্বপ্নাদ্য ঔষধেই পরেশ বাবু আজ পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়া পরম আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে হাতরাস জংসন হইতে যখন মথুরার গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম তখন হইতে আমার আরও অধিক পরিবর্ত্তন হইল। আমি যেন কেমন এক রকম হইয়া গেলাম। আমার আধ্যাত্মিক হাবভাব দেখিয়া অনেকেই আমাতে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আমি কিন্তু উদাসীন, মথুরা বৃন্দাবনের ভাবেই আমি মুগ্ধ। জানি না এত অশ্রু কোথায় ছিল;—অনর্গল অশ্রুধারায় আমি ভাসিতে লাগিলাম। আর মধ্যে মধ্যে 'রাধানাথ! মথুরানাথ! আমায় কৃপা কর;' ইত্যাদি প্রার্থনা আমার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। আমার সম্মুখে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পার্শ্বে দুই তিন জন ব্রজবাসী ভক্ত বসিয়াছিলেন। আমার ভাব দেখিয়া তাঁহারা আমায় নূতন নূতন লীলা শুনাইতে লাগিলেন। মেয়েদের দেখিয়া আমার উচ্চ শ্রেণীর গণিকা বলিয়া বোধ হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে এক প্রৌঢ়ার প্রেমসাগরে ভাবতরঙ্গ খেলিতে লাগিল। তিনি বাংলায় একটী কীর্ত্তন ধরিলেন। আহা! মরি। মরি! কি মধুর! কি চমৎকার সুর! গানটী এই—

আমার কানুর পিরীতি বুঝিল যেই;
(আহা) কানুর সনে পিরীতি করিয়া কানুরে কিনিল সেই।
সেই মহাজন, কানুর জীবন, কানুও জীবন ধন,

( ও তার ) কানুও জীবন ধন।
চরণে সঁপিয়া জীবন যৌবন জপে কানু কানু মন ;
আর, কানুতে তাহাতে পৃথক না রহে বলিহারি প্রেম এই।
আমার, কানুর পিরীতি বুঝিল যেই।
কানুর সনে পিরীতি করিয়া কানুরে কিনিল সেই॥

স্ত্রীলোকটী নানা ভঙ্গীতে গানটী গাহিতে লাগিল ; গানের মোহন আবেশে আমায় আরও বিহ্বল করিয়া তুলিল ; আমি একরূপ অচেতন হইয়া পড়িলাম। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন দেখি মথুরা ষ্টেশনের অনতিদূরে একটী সাধুর আশ্রমে আমি একটী সাধুর কোলের উপর শুইয়া আছি। তিন চারিটী মেয়ে সাশ্রু-নয়নে আমার পাশে বসিয়া আমায় বাতাস করিতেছে। আমি চোখ চাহিলে সকলে আমায় কিছু খাইতে অনুরোধ করিল। আমি তখন বেশ সুস্থ ; চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া লজ্জিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে উঠিয়া কূপ হইতে জল তুলিলাম এবং প্রাণ ভরিয়া জল পান করিয়া সাধুটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি কি মথুরা আসিয়াছি ? এখান থেকে মথুরা কতদূর ?'

মায়েদের মধ্যে একজন অল্প বয়স্কা এবং অতি সরলা ছিলেন। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, 'ঠাকুর ! আপনি যে আমাদের সঙ্গে কথা কইবেন, আপনার যে আবার চৈতন্য হবে, তা আমরা ভাবি নি ; আপনি মথুরাতেই এসেছেন। আমরা অতিকষ্টে আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় গাড়ী থেকে নামিয়েছি ; আর এই সাধুটী অনেক কষ্ট করে আপনাকে এই পর্যন্ত এনেছেন।'

কথা শুনিয়া আমি বেশ লজ্জিত হইলাম ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলাম এস্থানে অধিক বিলম্ব করা উচিত হইবে না। সুতরাং আসন হইতে উঠিয়া মায়েদের নিকট হইতে আমার ঘটী ও পুঁটুলীটি চাহিয়া লইলাম এবং ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। আমায় গমনোদ্যত দেখিয়া মায়েরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত না করিয়া যখন আশ্রম হইতে রাস্তায় আসিয়া নামিয়াছি, তখন সাধুটী উঠিয়া আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমি তখন কোথায় যাইব এবং সেখানে আমার কেহ পরিচিত আছে কি না। উত্তরে আমি জানাইলাম আমি যমুনাতীরে যাইব এবং স্বয়ং মথুরানাথ ভিন্ন অন্য সুহৃদ আমার নাই।

এইরূপে দ্রুত মথুরার পথে চলিতে চলিতে যখন আমি রেলের পুলের নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তখন ফিরিয়া দেখি মায়েরা ত্বরিৎপদে আমার অনুসরণ করিতেছেন ; এবং আমায় ফিরিতে দেখিয়া অপেক্ষা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। আমি কিন্তু চলিলাম ; ইতিমধ্যে সেই যুবতী দৌড়িয়া আমার

কাছে আসিয়া পৌঁছিল। আমি তখন করজোড়ে তাহাকে বলিলাম, 'মা! কেন আপনারা আবার আমায় মায়ার বাঁধনে বাধ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন বলুন দেখি? যা হবার হয়ে গেছে; এখন আমায় ছেড়ে দিন; আমি আমার পথে যাই।'

যুবতী নির্ব্বাক কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সে বিহ্বল নির্ণিমেষ দৃষ্টি এখনও আমার নয়নে ভাসিতেছে। আহা! সে চাহনীতে কি পবিত্রতাই না নিহিত ছিল! দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু দুটী সজল হইয়া আসিল; ঠোঁট দুখানি কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল তাহার প্রাণে যেন কত ভাব—কত ভাষাই তোলপাড় করিতেছে। এমন সময় অন্যান্য মেয়েরাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার ভাব দেখিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা! এ কাঁদ্‌ছে কেন? তুমি কি একে কিছু বলেছ?'

আমি মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিলাম। মায়েদের এক জন মেয়েটীর হাত ধরিয়া বলিল, 'খেপী! তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। ও যে সাধু ছেলে; সন্ন্যাসী। ওকে তুই কাছে কাছে কি করে রাখ্‌বি? ওদের কি মায়া দয়া আছে? না আপন পর আছে?' এই বলিয়া আমায় সম্বোধন করিয়া মা বলিল, 'চল না বাবা! আমরা এক সঙ্গে যাই; আমরা এখানে ধর্ম্মশালায় আছি; প্রায় মাসেকের ওপর হবে এখানে এসেছি; আর ঝুলনের এখনও দেরী আছে দেখে একবার দিল্লী আগ্রাও ঘুরে এলুম। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? চল না?'

আমি অসম্মতি জানাইয়া উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। সে অল্প বয়স্কা যুবতী কিন্তু নাছোড়বান্দা আদুরে মেয়েটীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল। জোড় হস্তে 'মা! ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর; বলিয়া হাত ছাড়াইয়া আমি দ্রুত প্রস্থান করিলাম। কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া দেখি মেয়েটী একই স্থানে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি আর দাঁড়াইলাম না; আর ফিরিয়া দেখিলাম না; আর ভাবিলাম না; একেবারে যমুনাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

## ৫৮

যমুনার দৃশ্য আমার বড়ই সুন্দর লাগিল। নির্ম্মল নীল যমুনাসলিলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি যেন প্রিয়জনের সন্ধান পাইয়া তন্ময়ভাবে একের গায়ে অপরে গিয়া ধাক্কা মারিতেছে; যেন বলিতেছে চল, চল, ঐ যে বাঁশী বাজ্‌ছে;

ঐ যে বাঁশী বাজিয়ে আমাদের ডাকছে; ঐ যে মোহন বাঁশী করে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনোমোহন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আহা! কি মধুর সে দৃশ্য! কি প্রাণস্পর্শী সে ভাব! যমুনার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি বিশ্রামঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ঘাট কংসঘাট নামেও অভিহিত। ঘাটে অত্যধিক লোকসমাগম দেখিয়া পার্শ্ববর্তী ঘাটে গিয়া আশ্রয় লইলাম। ঘাটের সিঁড়ির দক্ষিণ ধারে বেশ একটী সুড়ঙ্গের মত আছে; স্থানটী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ও নিরাপদ মনে করিয়া আমি সেখানে আসন করিয়া বসিলাম।

আনন্দিত মনে বসিয়া যমুনার দৃশ্য দেখিতেছি। ওপারের দৃশ্য যেন আরও চমৎকার, আরও মনোমুগ্ধকর বোধ হইতেছে। শুভ্র গাভীগুলি দেখিয়া মনে যেন কত নূতন ভাবের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সেই গোপাল,—সেই রাখাল,—সেই যমুনাতট, দেখিয়া আমার উদ্দীপনা হইতেছে; ভালরূপে দেখিতেছি আমার প্রাণের প্রাণ সেই প্রেমিক রতন ঐ রাখাল বালকদিগের মধ্যে আছেন কি না? সেই বৃন্দাবনধন বংশীবদন গোষ্ঠে আসিয়া বংশী করে খেলিতেছেন কিনা—ঐ না?—ঐ ত;—ঐ যে; হাঁ, হাঁ; —তাই ত! কিরূপে যাই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কতবার যে আসন ছাড়িয়া ঘাটের শেষ সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়াছি তাহার আর সংখ্যা নাই। হায়! সে ভাবের কথা মনে হইলেও আনন্দে আত্মহারা হইতে হয়। আজ কোথায় কোন অজানা রাজ্যে যে সেই ভাব মিশিয়াছে তাহার সন্ধান কে করিবে? হায় ঠাকুর! জীবের সে ভাব কেন চিরস্থায়ী হয় না বলিয়া দিবে কি? কোন পুণ্যে সে ভাব আসে, আর কোন পাপের প্রভাবেই বা সে ভাব লুকায়, বলিয়া দিতে পার কি? বল ঠাকুর! বল যেন চিরদিন সে ভাবের ভাবুক হইয়া থাকিতে পারি।

এক বেলা বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল; ক্ষুধা তৃষ্ণার কথাও মনে আসিল না। বেলা যখন দুই প্রহর অতীত হইতে চলিয়াছে তখন দেখি ৩।৪ জন ভিখারী সেই ঘাটের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। তাহাদের দেহ ক্ষীণ, মুখ মলিন ও ভাব অতি বিষণ্ণ। তাহারা পরস্পর যে সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিল তাহাতে বুঝিলাম আজ দুই দিন তাহারা মথুরানাথের প্রসাদ পাইতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছে। কয় জনই দুদিনের উপবাসী; মথুরানাথের উদ্দেশ্যে তাহারা বলিতে লাগিল,—হে মথুরাপতি! তুমি না মিলাইলে আমরা কোথায় পাইব? কে আমাদের মুখে তাকাইয়া খাইতে দিবে? তাহাদের কথা শুনিয়া আমার দয়ার উদ্রেক হইল। আমার সঙ্গে যে খুচরা পয়সা ছিল তাহা হইতে দু আনা করিয়া চারি জনকে দিয়া বলিলাম, 'যাও, মথুরানাথকে ধন্যবাদ দিয়ে কিছু কিনে খাও গে।'

আমার দয়া দেখিয়া তাহারা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। তাহার পর

আমাকেই শত সহস্র ধন্যবাদ ও নমস্কার জানাইতে জানাইতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমি তাহাদিগকে পয়সা দেওয়ার সময় এক রামায়েৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উহার হস্তে একখানি কাঠের করতাল; উহাতে ছোট ছোট প্রায় ২০ খানি করতাল লাগান; যন্ত্রটী দেখিতে অতি সুন্দর এবং শব্দও বড় মধুর। রামায়েতের ললাটে দীর্ঘ তিলক; বাহুতে এবং বক্ষেও তিলক চিহ্ন রহিয়াছে। তাহার পরিধানে আমার মত গৈরিক না থাকিলেও বেশভূষা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাধুর মতই ছিল। ভিখারীরা চলিয়া গেলে রামায়েৎ হাসিয়া আমায় বলিল, 'বাবা! দু'আনা করে দান করলেন কেন? দু' পয়সা করে দিলে যে ওরা খুব সন্তুষ্ট হয়ে যেত; এই সব জায়গায় সিকি পয়সা দান পেলেও লোকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে। এ এমন দরিদ্র স্থান। আপনি বোধ হয় নতুন বৈরাগী; তাই পয়সা কড়ির উপর মমতা নেই।'

আমি তাহার কথায় উত্তর না দিয়া তাহাকেও ভিখারী বৈষ্ণব মনে করিয়া আমার নিকট যে সিকিটি ছিল, তাহা তাহাকে দিতে চাহিলে সে বলিল, 'বাবা! আমিও দরিদ্র বটে; কিন্তু আমার খাবার সংস্থান আছে; আমায় ভিক্ষা করে খেতে হয় না। আপনার বৈরাগ্য দেখে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। আপনাকে আমার রামগুণগান শোনাতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি কিছু প্রসাদ পেয়েছেন কি?'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'প্রসাদ এই যমুনাবারি; আবার অন্য কি প্রসাদ?'

রামায়েৎ বলিল, 'না, না; সেকি! এখানে এসে মথুরানাথের প্রসাদ পেতে হয়। আপনি আমার সঙ্গে চলুন; আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দিচ্ছি।'

আমি বলিলাম, 'মাথায় থাক আমার মথুরানাথের প্রসাদ! বরং আমি যে প্রসাদটা পাব, সেটা কোন দরিদ্র দুঃখী পেলে কাজ হবে; আমার কাছে পয়সা আছে; আমি ত বাজার থেকেও কিনে খেতে পারি।'

রামায়েৎ আশ্চর্য্য ভাব দেখাইয়া বলিল, 'বাবা! পয়সা অমন করে খরচ করতে নেই; অসময়ে কোথায় পাবে? তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমায় মথুরানাথের প্রসাদ এনে দিচ্ছি; দেখবে কেমন মধুর প্রসাদ।'

এই কথা বলিয়া রামায়েৎ চলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম হায়! হায়! ইহারা কি পয়সাই চিনিয়াছে! ধন্য অর্থ! পরমার্থের পথেও তোমার কি মহান প্রভাব! এই অর্থকেই ত মহাত্মারা কেহ 'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং' কেহবা 'শুনীবিষ্ঠাবদর্থং' কেহ বা আরও জঘন্য ভাষায় গালি দিয়া গিয়াছেন। সেই কদর্থ আজ সাধু জীবনের উপরেও কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে! আমি এই সকল ভাবিতেছি এমন সময় সেই রামায়েৎ দুইখানি বৃহদাকার রুটী হস্তে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাসিয়া বলিল, 'বাবা! তুমি সহজ মানুষ নও, এবং সহজ সাধক নও; প্রসাদ আনতে গিয়েই তোমার মাহাত্ম্য আমি বুঝতে পেরেছি। বাবা! কৃপা করে এ দাসকে চরণে রাখতে হবে।' বলিতে

বলিতে যথাস্থানে রুটি রাখিয়া রামায়েৎ পায়ে ধরিতে উদ্যত হইল। আমি ত দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! যথাসাধ্য বাধা দিয়া বলিলাম, 'বাবা! আমি তোমার ছেলের বয়সী। কেন আমায় অমন করে লজ্জা দিচ্ছ? আমা হতে তুমি বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ সাধকশ্রেষ্ঠ ভক্ত। আমায় ক্ষমা কর।'

রামায়েৎ কিছুতেই আমার পা ছাড়িতে চাহে না। আমি বহু অনুনয় বিনয় করার পর বলিল, 'তবে স্বীকার কর আমায় ভৃত্য করে রাখ্‌বে? তুমি যেখানে যাবে আমি তোমায় মাথায় করে ঘুরে বেড়াব; আমি তোমায় গোকুলে নিয়ে যাব; শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন করাব। তোমায় মাথায় করে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করব। বল, বল বাবা! আমায় চরণে রাখ্‌বে; ছেড়ে যাবে না?'

আমি অগত্যা স্বীকার করিয়া লইলাম। কি করি? ভক্তের বোঝা ভগবান বয়; আমি ত কীটাণুকীট। যাহা হউক, এই অভিনয়ের পর আসিল ভোজনের পালা। সে রুটির আকৃতি দেখিয়াই ত আমি অবাক্! এত বড় রুটি জীবনে দেখি নাই; রুটিতে এত অধিক ঘৃত দেওয়া যে, যেখানে রুটি রাখা হইয়াছিল, সেখান দিয়া ঘৃত গড়াইয়া পড়িতেছে; তাহার উপর এগার রকমের তরকারী ও নানাবিধ মিষ্টান্ন। রামায়েৎ বলিল, 'খেয়ে নিন।'

আমি বলিলাম, 'বাবা! আমার সাধ্য নয় যে এত প্রসাদ উদরসাৎ করি।'

রামায়েৎ বলিল, 'এ মথুরানাথের আসলি ভোগ; যা পার খাও; আর যা থাকবে, রাত্তিরে হবে।'

আমি বলিলাম, 'এক বেলা খেয়ে আর এক বেলার জন্য সঞ্চয় করে রাখা আমাদের ধর্ম্ম নয়। তুমি অর্দ্ধেক নাও; আমায় অর্দ্ধেক দাও।'

অবশেষে তাহাই হইল। দুইজনে প্রসাদ ভাগ করিয়া লইলাম। কিন্তু অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক খাইতেই আমার উদর পূর্ণ হইয়া আসিল। অবশিষ্টাংশ কুর্ম্ম ও বানরদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করিলাম। রামায়েৎ আমার এই অল্পাহার দেখিয়া আমাতে অধিকতর আকৃষ্ট হইল। আমি যেন স্বয়ং ভগবান; আজ তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছি; এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল। আহারাদির পর সে ভক্তিগদগদ চিত্তে প্রায় ২।৩ ঘণ্টা নৃত্য গীতের মধ্য দিয়া আমায় রামলীলা শুনাইল। বেলা প্রায় ৫টা বাজিয়া যাইবার পর রামায়েতের নৃত্যগীত শেষ হইল। সে সেই দিনই আমায় অন্যত্র লইয়া যাইতে চাহিল। আমি বলিলাম,' আমি এখানেই ত্রিরাত্রি বাস করব; পরে বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানে সমস্ত লীলা দর্শন করে, তার পর যেখানে যেতে হয় যাব।'

৫৯

কেন যে লছমণঝোলা যাওয়ার প্রসঙ্গ রামায়েতের নিকট সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছিলাম জানি না। গত্যন্তর নাই দেখিয়া রামায়েৎ সেদিনের মত আমার নিকট বিদায় লইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল পর দিবস দ্বিপ্রহরে সে প্রসাদ লইয়া আসিবে। সত্যই সে পর দিন যথাসময়ে প্রসাদ আনিয়া আমায় ভোজন করাইয়া গেল। সেদিন শুক্লা সপ্তমী; পরদিন মথুরানাথের শৃঙ্গার; আমি ভাবিলাম অষ্টমীর বেশ দেখিয়া পরদিন বৃন্দাবন যাত্রা করিব। দৈবযোগে সেদিন বেলা শেষে জনৈক বৈষ্ণব আসিয়া আমার সহিত মিশিলেন। বৈষ্ণবের ভাব এক অদ্ভুত রকমের; তাঁহার বাড়ী বাংলায়; বেশীর ভাগ নবদ্বীপেই থাকেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি ঝুলনে বৃন্দাবন যাবার সংকল্প করেই বুঝি নবদ্বীপ থেকে আসছেন?'

বৈষ্ণব বলিলেন, 'বাবা! আর বৃন্দাবনের কথা বলো না; আমি নবদ্বীপ ছেড়ে যে কি আহাম্মুকি করেছি, তা আমিই বুঝতে পারছি। কেন যে লোক বৃন্দাবনে আসে—তা কে জানে? আমি আজ তিন দিন বৃন্দাবনে এসে একবারও গৌরাঙ্গ নাম শুনতে পেলুম না। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার প্রাণগৌর হতে যার প্রকাশ; সেখানে আমার গৌরের নাম গন্ধ নেই! এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি আছে?—যাক্, আমি নবদ্বীপেই চলেছি; আমার গুপ্ত বৃন্দাবন নবদ্বীপধামই আমার সব। বৃন্দা দূতীর বনে আর থাক্‌ব না।

বৈষ্ণব ঠাকুরের ভাবে আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। কি বলিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তর্কশক্তি যথেষ্ট ছিল; কিন্তু বৈরাগ্যের স্পর্শে সব যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তথাপি বলিলাম, 'সে কি বৈষ্ণব ঠাকুর! বৃন্দাবন আপনার ভাল লাগ্‌ল না? বৃন্দাবনে আপনি গৌরের নাম শুনতে পেলেন না? এসব কথা শুনলে যে হাসি পায়; আর দুঃখেও বুক ফেটে যায়। আপনি কি সত্য বলছেন যে বৃন্দাবন আপনার ভাল লাগ্‌ল না?'

'হাঁ বাবা! আমি সত্যই বলছি বৃন্দাবন আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ল না।'

'যে বৃন্দাবন ছেড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক পা যেতে চান নি; যে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবন নিধুবনে এখনও তাঁর মাহাত্ম্য প্রকট; সেখানে তাঁর লীলার সমস্ত ভাব এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়; সাধক ভক্তগণ সহস্রমুখে যাঁর গুণগান করে আসছেন; যে বৃন্দাবনধামে মিবারলক্ষ্মী মীরাবাঈ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাত বৎসর গোপাল বালকরূপে বক্ষে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন; শত শত বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যেখানে এখনও পরমানন্দে বসবাস করছে—কৃষ্ণসাধনায় তন্ময় হয়ে আছে সে বৃন্দাবন আপনার ভাল লাগ্‌ল না! সে বৃন্দাবনে আপনি গৌর নাম শুনতে

পেলেন না ! আর সেই জন্য আপনাকে ফিরে যেতে হচ্ছে ! কি দুঃখের কথা !'

'কি কর্‌ব বাবা ? আমার ভাল লাগ্‌ছে না ; তাই আমি চলে যাচ্ছি।' বলিয়া বৈষ্ণব ঠাকুর চক্ষু মুছিলেন।

আমি বলিলাম, 'আমার অনুরোধ, আপনি আবার ফিরুন ; বৃন্দাবনে চলুন ; সেখানে ঝুলন উৎসব পর্য্যন্ত থাকুন ; দেখ্‌তে পাবেন এমন মনোরম স্থান পৃথিবীতে আর নাই।'

বৈষ্ণব বলিল, 'না বাবা ! ক্ষমা করুন ; আমি শপথ করে এসেছি, আর যদি বৃন্দাবনমুখী হই ত আমি জারজ।'

আমি লজ্জায় মাথা নত করিলাম ; আর তাঁহাকে কোন অনুরোধ করিলাম না। ইহার পূর্ব্ব দিবস একাকী রাত্রি যাপন করিতে বড় কষ্ট হইয়াছিল। আজ আর তাহা হইল না। বৈষ্ণবঠাকুর প্রায় সারারাত্রি আমায় গৌরকীর্ত্তন করিয়া শুনাইলেন। তাঁহার অতি সুললিত কণ্ঠ। পরম আনন্দে রাত্রি কাটিল।

প্রত্যুষে মথুরাবাসিনী মায়েরা যমুনায় স্নান করিতে আসিলেন। একজন মথুরাবাসী মায়েদের এই প্রাতঃস্নান প্রসঙ্গে আমায় বলিয়াছিল মথুরার চোবেদের মধ্যে এখনও মেয়েদের 'অভিসার প্রথা' বর্ত্তমান। অভিসার প্রথা অনুযায়ী মেয়েদের শ্রীমতীর মত লুকাইয়া স্বামীর গৃহে যাওয়ার রীতি এখনও ওদেশে চলিয়া আসিতেছে। বিবাহিতা কন্যাগণ সন্তান বড় না হওয়া পর্য্যন্ত পিত্রালয়েই অবস্থান করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে আহার ও বেশভূষা করিয়া কেহ একা- কেহ দাসী বা সখি সমভিব্যাহারে স্বামীর গৃহে গমন করেন এবং প্রভাতে প্রত্যাগমন করিয়া যমুনায় স্নানান্তে পিতৃভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন। মেয়েদের সম্বন্ধে চোবেদের আবার উত্তরাধিকার আইনও পৃথক। পিতৃসম্পত্তি পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে ; কোনরূপ তারতম্য করা হয় না। নব্য শিক্ষিতদিগের মতে এই অভিসার প্রথা হয় ত বড়ই দোষের ; আমার কিন্তু ইহা বেশ ভাল লাগিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার এমনই প্রভাব যে তাহার সংস্পর্শে আসিলে প্রায়ই তদ্ভাবাপন্ন করিয়া ফেলে। যাহা কিছু পাশ্চাত্য মতের বিরোধী তাহাই নিন্দনীয় বলিয়া মনে হয়। মথুরায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহার পর যখন আমি দ্বিতীয় বার মথুরা যাই, তখন একটী সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আহূত হইয়াছিলাম। সভার উদ্দেশ্য ছিল উক্ত 'প্রাচীন অসভ্য অভিসার প্রথার সংস্কার।' আমি কিন্তু সে সভায় যোগদান করি নাই। পরে সভার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে আমার ধারণা সত্য বলিয়াই বোধ হইল। বুঝিলাম সমাজের মঙ্গলচেষ্টা অপেক্ষা পরানুকরণ প্রবৃত্তিই এই আন্দোলনে অধিকতর পরিস্ফুট।

অষ্টমী তিথিতে আমি মথুরানাথের শৃঙ্গার দর্শন করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। সেই গৌরভক্ত বৈষ্ণব ঠাকুরও আমার সঙ্গেই ছিলেন। বেলা প্রায়

তৃতীয় প্রহরের সময় ভক্ত রামায়েৎজী আসিয়া বলিলেন, 'সাধু বাবা! আজ আপনাকে এক নতুন জায়গায় নিয়ে যাব। বড় সুন্দর স্থান; এমন সুন্দর আশ্রম কোন তীর্থের নিকটে আর নেই।'

আমি আশ্রমের নাম জিজ্ঞাসা করিলে রামায়েৎ বলিল, 'আশ্রমের নাম—দুর্ব্বাসা আশ্রম।' এই বলিয়া রামায়েৎ দুর্ব্বাসা মুনির গুণগান করিতে লাগিল। তাহার বর্ণিত যাবতীয় গুণগানের মধ্যে 'দুর্ব্বাসা পারণের' ঘটনাটী আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। সংক্ষেপে উহা বলিব।

একদিন শ্রীমতী রাধারাণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দর্শন করিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ধ্যানান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রাণবল্লভ! আজ আমাকে একটি সত্য কথা বল্‌তে হবে। বল—আমি যা জিজ্ঞেস কর্‌ব তার যথার্থ উত্তর দেবে?'

রসরাজ হাসিয়া বলিলেন, 'সে কি? তোমার কথার যথার্থ উত্তর দেব না? বল প্রিয়ে! তোমার কি কথা আছে।'

তখন শ্রীমতী বলিলেন, 'তুমি আজ ধ্যানস্থ অবস্থায় কি চিন্তা কর্‌ছিলে আমায় বল্‌তে হবে; ঐ কথা জান্‌বার জন্যে আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে।'

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'রাধে? আমি শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে তোমাকে ছাড়া আর যে কিছুই চিন্তা করি না, তা কি তুমি জান না? আমার নয়নের মণি, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, তুমি ছাড়া আর কি আছে প্রিয়ে?'

শ্রীমতী কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন; 'ওহে শঠশিরোমণি! আমি তা শুন্‌তেচাই নি। তোমার যেআমিই সব,তা আরআমার জান্‌তে বাকী নেই। তা যদি না হবে ত দিবানিশি এমন করে তোমার জ্বালায় জ্বল্‌ব কেন? আর তা না হলে, তুমিই বা আজ এর দ্বারে, কাল ওর কুঞ্জে—কখনও বৃন্দার আসরে, কখনও কুব্জার বাসরে আসা যাওয়া কর্‌বে কেন? তোমায় কি আর আমার চিন্‌তে বাকী আছে প্রভু?—তুমি ভাব এক, কর আর; দেখাও যেন চমৎকার! তোমার গুণের অন্ত আছে?—এখন ওসব কপটাচরণ ছেড়ে সত্য কথা বল দেখি—ধ্যান মনে কি ভাব্‌ছিলে?'

শ্রীরাধার ভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'প্রিয়ে! আজ আমি ভক্ত দুর্ব্বাসার কথা ভাব্‌ছিলাম। দুর্ব্বাসা আজ একাদশীর উপবাস করে কঠোর তপস্যায় মগ্ন; তাই আমি ধ্যানে তাকে দেখ্‌ছিলাম। তুমি ত জান ভক্তের জন্য আমি কি না করি।'

কথা শুনিয়া শ্রীমতী একটু হাসিয়া বলিলেন, 'তা হতে পারে; তুমি যে তোমার ভক্তের জন্য নিজেকেও বিকিয়ে দিতে পার, তা আমি একশবার স্বীকার কর্‌ব। আচ্ছা তাই যদি হয়, ভক্তকে যদি তুমি এতই ভালবাস, ত দুর্ব্বাসার এ দুঃখ দেখে তোমার দয়া হচ্ছে না কেন। দুর্ব্বাঘাসের দুখানা রুটি মাত্র যার

আহার, তার যে একাদশী কোন দিন নয়, তা ত আর আমি ভেবে পাই না। বেচারা না খেয়ে খেয়ে কি রুক্ষ প্রকৃতির যে হয়ে পড়েছে, তা ত তার যাবতীয় আচরণেই প্রকাশ পায়। তুমি এদিকে এত দয়াল, এত প্রেমিক, এত ভক্তবৎসল ; আবার এবন কঠোর, কপট, ক্রুর যে তোমায় চেনা দায়! তোমায় বোঝে কার সাধ্য? দুর্ব্বাসা যদি আমার ভক্ত হত, ত দেখ্‌তে আমি তাকে কেমন দুধ ক্ষীর ছানা ননী—চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কত কি খাইয়ে তার মাথা ঠাণ্ডা রাখ্‌তুম ; অমন বদমেজাজী হতে দিতুম না। সত্যই ওরকম অস্থিচর্ম্মসার যোগী দেখে আমার দুঃখ হয়—ভয়ও হয়।'

কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'রাধে! তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে এসব কি বল্‌ছ? যোগীরা কি ভোগী হয়?—না ভোগ্য বস্তুর অভাবে তাদের কোন গুণের লাঘব হয়; যে যে প্রকৃতির যোগী সে সেই প্রকৃতি নিয়েই—থাক্‌বে; হাজার ছানা ননী খাওয়ালেও তার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হবে না। দুর্ব্বাসা যে প্রকৃতির সাধক, তুমি সে রকম আর একটি খুঁজে পাবে না।'

তখন শ্রীমতী বলিলেন, সত্যই দুর্ব্বাসার দুঃখ দেখে আমার বুক ফেটে যায়। এত কঠোরতা না করে কি সাধনা হয় না? ও রকম কঠোর যোগীদের কি তুমি বেশী ভালবাস?'

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি কঠোরতা মোটেই ভালবাসি না; উপবাস করে যারা কঠোর ব্রত অবলম্বন করে, তারা প্রকৃত পক্ষে আমাকেই দুঃখ দেয়। তবে সে দুঃখ পেয়ে আমি তাদের উপর কুপিত হই না;—কেন জান? আমার জন্যই ত তাদের দুঃখ; এত কঠোরতা; এত ত্যাগস্বীকার। তারা যদি জান্‌ত যে তাদের এ দুঃখে আমি দুঃখ পাই; তাহলে কি তারা ব্রত গ্রহণ কর্‌ত?—কখনই নয়; তাই কষ্ট পেয়েও আমি তাদের সিদ্ধি দান করি। কিন্তু যারা ভক্ত তাদের জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে; তারাই আমার সবচেয়ে প্রিয়।'

শ্রীমতী বলিলেন, 'এই ত একটু আগে তুমি বল্‌লে,—দুর্ব্বাসা তোমার ভক্ত; তুমি দুর্ব্বাসার জন্য ভাব্‌ছ;—আবার বল্‌ছ সে ভক্ত নয়; এ কেমন কথা?'

'হাঁ প্রিয়ে! যোগীও ভক্ত, জ্ঞানীও ভক্ত, আবার ভক্তও ভক্ত; ভক্ত সবাইকেই বলে। তবে কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক। যারা শুধু আমার ধ্যান, আমার পূজা ও আমার গুণগান নিয়ে থাকে – যখন যা করে সমস্ত আমাকে সমর্পণ করেই সন্তুষ্ট থাকে—তাদেরই ভগবৎভক্ত বলে; তারাই আমার প্রধান সাত্ত্বিক ভক্ত। আর যারা যোগাদি ব্রত পালন করে অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিলাভের আশায় সাধন পথে অগ্রসর হয়, তারা মধ্যম শ্রেণীর বা রাজসিক ভক্ত। আর যারা বেদাদি অধ্যয়ন করে, মৌনাবলম্বন করে পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা বহু শিষ্য সেবক গ্রহণ মানসে সাধুবেশ ধারণ করে, তারা অধম বা তামসিক ভক্ত।

প্রকৃত জ্ঞানী ভক্ত পৃথিবীতে অতি বিরল। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁরা মৌন থাকেন; কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। তাঁদের কর্ম্ম থাকে না; সকল কর্ম্মই ক্ষয় হয়। ভক্তির চরম অবস্থায় সেই জ্ঞান লাভ হয়। কেহ কেহ বলেন, ভক্তির চরম অবস্থাকেই জ্ঞান বলে। জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় জীব সেই জ্ঞানের অধিকারী হয়।

এই কথায় শ্রীমতী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি জগৎস্বামী হয়ে তোমাতে এত ভেদ বুদ্ধি কেন? ছোট বড়, উত্তম মধ্যম, এসব বিচার কেন?—তুমি ত সবার হৃদয় জান? সবাই যে তোমাকে চায়, তা কি বুঝতে পার না? যে, যে পথেই থাক, তুমি ছাড়া অন্য লক্ষ্য ত নেই। তুমিই ত আনন্দময়।'

'হাঁ প্রিয়ে! সত্য কথা; তবে কি জান? পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের মধ্যে যেমন উত্তম মধ্যম অধম ভাবে শ্রেণী বিভাগ আছে, সেই রকম এই ভব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যেও গুণভেদ শ্রেণীভেদ আছে। তা না থাকলে পরীক্ষার মর্য্যাদা থাকে না। আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর। তাহলেই বিষয়বিরাগীর অবস্থা বেশ বুঝতে পারবে। কাল দ্বাদশী; তুমি ভোরে গিয়ে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করে দুর্ব্বাসাকে বেশ করে আহার করিয়ে এস। ভাল আহার্য্যের প্রতি দুর্ব্বাসার কেমন আগ্রহ তাহলেই বুঝতে পারবে।'

প্রথমতঃ শ্রীমতী দুর্ব্বাসার নিকট যাইতে ঘোরতর অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ অনেক বুঝাইলে এবং অভয়দান করিলে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে নানাবিধ আহার্য্য লইয়া শ্রীমতী যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এ কি! যমুনার কি ভীষণ উগ্র মূর্ত্তি! স্রোতের বেগ যেন সেদিন দ্বিগুণ; তাহাতে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ; এতদবস্থায় খেয়ার মাঝি কাহাকেও পার করিতে প্রস্তুত নয়। ব্যাপার দেখিয়া শ্রীমতী মনে মনে দুঃখিতা হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় উপায়নির্দ্ধারণকল্পে পুনরায় কৃষ্ণসকাশে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে ভগ্নোৎসাহ হইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'প্রিয়ে! তুমি যাও; গিয়ে যমুনাকে বল—আমার শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করে থাকেন, তাহলে আমায় পথ দাও।'

এই কথায় শ্রীমতী সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া যখন বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ চাতুরী করিতেছেন না; তখন ধীরপদক্ষেপে পুনরায় যমুনাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যমুনাকে শুনাইয়া দেখিলেন, অবিলম্বে যমুনা শান্তভাব ধারণ করিয়া পথ দিলেন। শ্রীমতী বিস্মিত কৌতুহলে যমুনা পার হইয়া দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

মুনিবরের তখনও পারণ হয় নাই। শ্রীমতী করজোড়ে তাঁহাকে পারণ করাইবার বাসনা জানাইলেন। দুর্ব্বাসা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার বাসনা পূর্ণ হবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, এই রূপ নিয়ে আপনি আর কোন মুনি

ঋষির আশ্রমে যাবেন না। যে রূপমদিরায় স্বয়ং মদনমোহন উন্মাদ, সেই মুনিমনোহারী রূপ নিয়ে যদি আপনি এই রকম যোগী ঋষির আশ্রমে যাতায়াত করেন, তা হলে নিশ্চয়ই তাদের সাধনায় বিঘ্ন ঘট্‌বে।'

দুর্বাসার কথায় শ্রীমতী লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আমার অদৃষ্ট আজ বড়ই সুপ্রসন্ন যে ঋষিবর আজ ক্রুদ্ধ না হইয়া স্বাভাবিকভাবে আমার সহিত কথা কহিতেছেন। যাহা হউক তিনি বলিলেন, 'প্রভো! আদেশ করুন; পারণার আয়োজন করি।'

দুর্বাসা মৃদু হাসিয়া বলিলেন; 'দেবী! আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন; আজ আমি আপনার হাতে পারণ করে ধন্য হব।'

শ্রীমতী বলিলেন, 'দেব! আমি সমস্ত উদ্যোগ করে দিই; আপনি গ্রহণ করুন।'

মুনিবর বলিলেন, 'আপনার ও সব খাদ্য সামগ্রী আমি স্পর্শ কর্‌ব না। যদি আপনি আমার মুখে তুলে দেন তা হলে গ্রহণ কর্‌তে পারি; না হলে নয়।'

শ্রীমতী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিই বা করেন? অগত্যা স্বহস্তে পারণা করাইবেন স্বীকার করিলে মুনিবর হৃষ্টচিত্তে তাঁহার হস্তে খাইতে লাগিলেন। শ্রীমতী এক এক করিয়া মুনিবরকে সমস্ত খাওয়াইলেন। সমস্ত খাদ্যদ্রব্যগুলি নিঃশেষ হইলে দুর্বাসা বলিলেন, 'কেমন? সন্তুষ্ট হলেন ত?'

শ্রীমতী বলিলেন, 'আপনার আনন্দেই আমার আনন্দ; আপনি সন্তুষ্ট হলেই আমিও সন্তুষ্ট।'

ঋষি বলিলেন, 'আমার সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট আমি বুঝতে পারি না; ভগবান যখন যে ভাবে রাখেন আমি সেই ভাবেই থাকি; এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।'

তখন শ্রীমতী আর কোন কথা না বলিয়া বলিলেন, 'প্রভো! এখন অনুমতি হলে আমি গৃহে যাই।'

ঋষিবর বলিলেন, 'আমার আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই; এখন আপনার অভিরুচি।'

শ্রীমতী গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে মনে হইল আসিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের কথায় যমুনা রাস্তা দিয়াছিল; কিন্তু যাইব কিরূপে? সুতরাং পুনরায় আসিয়া দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঋষিবর'! আমি যমুনা পার হব কেমন করে? আসবার সময় ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পার হয়েছি।

একথার উত্তরে মুনিবর বলিলেন, যাবার সময় যদি পথ না পান তাহলে যমুনাকে বল্‌বেন—'দুর্বাসা মুনি যদি আজ দুখানি ঘাসের রুটি ছাড়া আর কিছু না খেয়ে থাকেন তবে আমায় পথ দাও।' একথা বল্‌লে যমুনা অবশ্য আপনাকে পথ দেবে।

তখন শ্রীমতী বিস্মিত দৃষ্টিতে দুর্বাসার পানে চাহিলে, দুর্বাসা বলিলেন ; 'ধনি ! বিস্ময়ের কি আছে ? সত্যই আমি দুখানি দুর্বাঘাসের রুটি ছাড়া আর কিছু খাই নি।'

শ্রীমতী বলিলেন, 'সেকি ! আমি স্বহস্তে আপনাকে দুধ, ক্ষীর, ছানা, ননী, আরও কত কি খাওয়ালুম । আর আপনি একি বল্‌ছেন ?'

তখন দুর্বাসা বলিলেন, 'হাঁ দেবি ! তুমি নানাবিধ খাওয়াতে পার ; কিন্তু আমার কাছে সে সব দুর্বাঘাসের রুটির চেয়ে বেশী মনে হয় নি। প্রত্যহ রুটি খেয়ে যে আনন্দ পাই, ওসব খেয়ে তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাই নি ; সত্য মিথ্যা যমুনায় গিয়ে পরীক্ষা কর।'

তখন শ্রীমতী ক্ষিপ্রপদে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং খরস্রোতা যমুনাকে সম্বোধন করিয়া দুর্বাসার কথা বলিবামাত্র যমুনা শান্তভাব ধারণ করিয়া পথ দিলেন। শ্রীমতীও বিস্মিত কৌতুহলে ত্বরিৎপদে কৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, 'দেখ্‌লে প্রিয়ে ? মুনি ঋষিরা কেমন অনাসক্ত ! তাদের কোন কিছুতে আসক্তি নেই। অনাসক্ত অবস্থায় যাই খাওয়া হয়, তা কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির উপকরণ হয়ে থাকে ; ভাল মন্দের বিচার তাতে আসে না। তাই শাস্ত্রে বলে, সাধুর চন্দন বিষ্ঠায় সমজ্ঞান। সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, জয়ে পরাজয়ে তাদের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না ; এ অবস্থায় অনাসক্ত হয়ে যাই খাওনা কেন তাতে ভোজন অপরাধ হয় না ; অর্থাৎ সে ভোগ মিথ্যা হয়।'

এই কথা শুনিয়া শ্রীমতীর আর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ যে জাগতিক সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত এবং সকল বস্তুতে অনাসক্ত তাহা বুঝিয়া শ্রীমতী বলিলেন, 'তবে তোমার যা কিছু ব্যাকুলতা সবই মিথ্যা ?'

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, 'কি রকম ?'

শ্রীরাধা বলিলেন, 'তুমি যে অহরহঃ 'রাধা' 'রাধা' বলে বাঁশী বাজাও, রাধাকে দেখ্‌বার জন্য ছুটে আস ; নানা বেশে, নানা ভাবে রাধাকে দর্শন দিয়ে থাক ; এসব কি মিথ্যা ?'

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'না না মিথ্যা নয় ; তবে আমার এ ব্যাকুলতা আমার জন্য নয় রাধে ! তোমার জন্য ; তোমাকে সুখী কর্‌বার জন্যই তোমার কাছে ছুটে আসি ; যেমন দুর্বাসা তোমায় তৃপ্ত কর্‌বার জন্য তোমার হাতে নানাবিধ খাদ্য গ্রহণ কর্‌লেন।'

কথা শুনিয়া লজ্জায় শ্রীমতী মাথা নত করিলেন এবং বলিলেন, 'প্রিয়তম ! তুমি কি দাসীকে এতই ভালবাস যে দাসীর সুখের জন্য দিবানিশি উন্মাদ হয়ে কত অসাধ্য সাধন কর্‌ছ ? ধন্য আমি ! ধন্য আমার নারী জন্ম !'

৬০

রামায়েৎ দুর্বাসা সম্বন্ধে আমায় নানা গুণগান শুনাইলে আমি 'দুর্বাসা আশ্রম' দর্শন করিতে সংকল্প করিলাম ; এবং স্থির হইল বেলা ৪ ঘটিকার সময় রামায়েৎ আসিয়া আশ্রম দর্শনার্থে আমায় লইয়া যাইবেন। তখন সেই গৌরভক্ত বৈষ্ণব ঠাকুর বলিলেন, 'বাবা! আপনি ত এখন যাচ্ছেন? আমিও আজ এখান থেকে রওনা হব।—তবে আমার একটী প্রার্থনা ছিল ; যদি আপনি রাখেন, আমার বড় উপকার হয়—এই বলিয়া আমার রামচন্দ্রপুরী বড় ঘটীটি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'প্রার্থনা আর কিছুই নয় বাবা! ঐ ঘটীটি যদি আমায় দেন ; —আমি ভিক্ষা করে খাই—ঐ ঘটীটি পেলে আমার বড় সুবিধা হয় ; সময়ে অসময়ে রান্না পর্যন্ত চলে। আপনার জল রাখ্‌বার জন্য আমি আপনাকে এই কমণ্ডলুটি দিচ্ছি।'

এই বলিয়া বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহার নারিকেল মালার কমণ্ডলুটী রাখিলেন। আমি বৈষ্ণব ঠাকুরের কথায় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঘটীটি দান করিলাম। রামায়েৎ তাহাতে বড় সন্তুষ্ট হইল না। সে ইঙ্গিতে আমায় বলিয়া গেল বৈষ্ণবটী লোক ভাল নয় ; আমি যেন তাহাকে আর কিছু না দিই।

বৈষ্ণব ঠাকুর চলে গেলে সেই নারিকেলের কমণ্ডলু ভরিয়া আমি এক কমণ্ডলু জল আনিয়া রাখিলাম। ক্ষণেক পরে দেখি কমণ্ডলুতে কিছুই নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম কমণ্ডলুটী শতছিদ্র ; ভাবিলাম ইহাও বোধ হয় মথুরানাথের কোন সংকেত। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য! কমণ্ডলুটী সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতেছি ; এমন সময় রামায়েৎ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ কি আশ্রম দর্শনে যাওয়া হবে?'

রামায়েৎ বলিল, 'হাঁ হবে ; কেন? ভয় কি? জোৎস্না রাত্রি ; আমি আছি ; তোমায় মাথায় করে নিয়ে যাব। শিগ্‌গির সব গুছিয়ে নাও।'

আমার আর গুছাইবার তেমন কিছুই ছিল না। কেবল এক কৌপীন ও বহির্বাস ; আর একখানি গীতা। ইহা ছাড়া মথুরা গিয়া যে যুগলমূর্ত্তিখানি ক্রয় করিয়াছিলাম তাহা কম্বলে জড়াইয়া গামছা বাঁধিয়া স্কন্ধে লইলাম এবং কমণ্ডলুটী হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রাময়েৎ আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বাঃ—বেশ মানিয়েছে ; টাকাকড়ি কোথায় রাখ্‌লে?'

আমি কোমরে হাত দিয়া বলিলাম, 'এই ট্যাঁকে।'

দেখিতে দেখিতে নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল। আমরা নৌকায় উঠিলাম। আহা! যমুনার সে দিন কি সুন্দর দৃশ্য! সজ্জিত বড় বড় নৌকায় রাসলীলা আরম্ভ হইয়াছে। অসংখ্য দর্শক নৌকার পর নৌকায় চলিয়াছে। রাসলীলায়

যাহাদিগকে রাধাকৃষ্ণ সাজান হইয়াছে তাহাদিগকে এমন সুন্দর দেখাইয়াছে যেন মনে হয় সাক্ষাৎ ভগবান সত্য সত্যই যমুনায় নৌকাবিহার করিতেছেন। যিনি মথুরায় এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনি শুধু বুঝিবেন; অন্যে এ লীলার মর্ম্ম কি বুঝিবে? আমি নৌকায় উঠিয়া নির্নিমেষ নয়নে সেই দৃশ্য দেখিতেছি আর রামায়েৎ রাসলীলার ব্যাখ্যা করিয়া আমায় শুনাইতেছে। রাসলীলার এই অভিনয় দর্শন শ্রবণে আমার নয়ন মন এমন তন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কখন যে নৌকা হইতে তীরে উঠিয়াছি কিছুই মনে নাই। ক্ষণকাল পরে দেখি রামায়েৎ আমার হাত ধরিয়া এক মাঠের উপর দিয়া লইয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে ক্রমশঃ দুজনেই লোকালয়ের বাহিরে গিয়া পড়িলাম। আমার বোধ হইল দুই ক্রোশের উপর আসিয়াছি; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর কতদূর যেতে হবে? তুমি বল্লে এক ক্রোশ; এ যে দু ক্রোশের উপর এসেছি বলে বোধ হচ্ছে?'

রামায়েৎ হাসিয়া বলিল, 'না বাবা! তোমার জ্ঞান ছিল না কিনা? তাই তোমার এরকম মনে হচ্ছে।'

আমি বলিলাম, 'তুমি এদিক দিয়ে চলেছ কেন? এদিকে রাস্তা আছে বলে ত মনে হয় না; এ যে একেবারে জঙ্গল—সামনে আরও নিবিড় বন আছে বলেই ত মনে হচ্ছে।'

বাস্তবিক তখন আমরা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছি সেখানে সত্যই নিবিড় জঙ্গল; জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। জ্যোৎস্নারাত্রি বলিয়া যাহা কিছু দেখা যাইতেছে; অন্ধকার রাত্রে সেস্থান সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া বোধ হইল। বাদানুবাদ করিতে করিতে আরও ১০।১৫ মিনিট তাহার সহিত চলিয়া আমি বলিলাম, 'বাবাজী! তুমি নিশ্চয় ভুল পথে এসেছ; দেখ—এখনও ভাল করে দেখ, চিনতে পারছ কিনা।'

রামায়েৎ আমার কথায় থমকিয়া দাঁড়াইল এবং চতুর্দ্দিকে দেখিয়া শুনিয়া উৎকর্ণভাবে ক্ষণকাল থাকিয়া বলিল, বাবা! তুমি একটু দাঁড়াও, আমি একবার দেখে আসি কারও দেখা পাই কিনা।'

এই কথা বলিয়া রামায়েৎ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। আমি সেই নিবিড় বনে একাকী ভুতের মত দাঁড়াইয়া একবার এদিক একবার ওদিকে তাকাইতেছি; আর মধ্যে মধ্যে 'জয় মথুরানাথ' 'জয় মথুরানাথ' 'বলিয়া সাহস লইতেছি। তখন হৃদয়ে বৈরাগ্য থাকায় সাহসও যথেষ্ট ছিল; তাই কোনরূপে খাড়া ছিলাম। নতুবা সেই নিবিড় বনের নিশীথ নীরবতা ও ঘন অন্ধকারের ভীষণ গভীরতা সাধারণ অবস্থায় সহ্য করা অতি দুরূহ। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর যেন মনে হইল কে বা কাহারা আসিতেছে; যেন মানুষের পদশব্দ শুনিতে লাগিলাম। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে শুনিতে এবং সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিতে

চাহিতে দেখিলাম অদূরে—মাথায় পাগড়ি বাঁধা লাঠি হাতে ভীমকায় দুই ব্যক্তি, যে পথে রামায়েৎ চলিয়া গিয়াছিল, সেই পথ দিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ দেখিয়া প্রথমে ভরসা হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই উহাদের যমদূতের মত আকৃতি ও দস্যুজনসুলভ চঞ্চলতায় আমাকে কিয়ৎপরিমাণে চঞ্চল করিয়া তুলিল। এক জন দস্যু জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি ?

আমি উত্তর না দিতেই আর একজন, 'সাধু! এমন সময় এখানে কেন?' বলিয়াই আমার হাত ধরিল। আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কি চাও?'

একজন বলিল, 'যা আছে শিগ্‌গির দাও; নয় ত প্রাণে মারা যাবে।'

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার নিকট যে সাত টাকা বার আনা বা চৌদ্দ আনা ছিল তাহা সমস্ত তাহাদের হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রামায়েৎ কোথায়? সে যে আমাকে—আশ্রমে নিয়ে যাবে বলে নিয়ে এল।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, 'কোন শালা রামায়েৎ? কোথায় এখানে আশ্রম!'

প্রথম ব্যক্তি বলিল, 'সে বেটা ডাকাত; শিগ্‌গির আর কি আছে দিয়ে দাও, নয় ত সে এসে পড়লে প্রাণে মারা যাবে।

আমি বলিলাম, 'সে বেটা ত ডাকাত; আর তোমরা সাধু। তা তোমরা যাই হও, আমার কাছে এক কাণা কড়িও আর নেই; এখন কোন দিকে গেলে আমি রাস্তা পাব বলে দাও দেখি।'

আমার কথায় অট্টহাস্য করিয়া তাহারা বলিল, 'চালাকি করলে চলবে না; আমরা জানি তোমার কাছে অনেক টাকা আছে; তুমি বড়লোকের ছেলে; শিগ্‌গির টাকা বের কর।'

আমি যত বলি 'কিছু নাই' তাহারা ততই টাকার জন্য জিদ করে। শেষে আমি রাগিয়া 'যা বেটা তোরা মানুষ নোস; তোরা পশু।' বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই একজন লাঠি দিয়া পথ রোধ করিয়া বলিল, 'তোমার ঐ তল্পীর ভেতর কি আছে আগে খুলে দেখাও; তবে যেতে দেব।'

দেখিতে দেখিত একজন আমার পুঁটুলী চাপিয়া ধরিল। আমিও যথাশক্তি পুঁটুলীটি বগলে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'এ আমি তোমাদের কিছুতেই দেব না।'

আমি যে বাস্তবিক কম্বলের মমতায় পুঁটুলীটি চাপিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা নহে। কম্বলখানি ছিল আমার মায়ের গায়ের। বাড়ী হইতে আসিবার সময় মা আমার এই কম্বলখানি দিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই কম্বল সঙ্গে থাকলে তোর কোন বিপদ হবে না।' তাই আমি কম্বলখানি ছাড়িয়া দিতে নারাজ হইতেছিলাম। মায়ের আশীর্বাদী কম্বলখানি রক্ষা করিতে মথুরানাথ এমন

শক্তি দিয়াছিলেন যে সেই ভীমাকায় দস্যুদ্বয় কিছুতেই পুঁটুলী কাড়িয়া লইতে পারিল না। জপীটি অবশ্য গামছায় বাঁধা অবস্থায় আমার বগলের নীচে গাট দেওয়া ছিল। কোনরূপে আমার নিকট হইতে উহা লইতে না পারিয়া এক জন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'শালাকে বেঁধে ফেল।' অমনি আর একজন এক ধাক্কায় আমাকে একটী গাছের নিকট লইয়া গিয়া আমারই বহির্বাস দ্বারা আমাকে গাছের সহিত বাঁধিতে লাগিল। আমি তখন মথুরানাথকে ভুলিয়া কেবল মাকেই স্মরণ করিতেছি। 'মা রক্ষা কর! মা রক্ষা কর! তোমার কথা যেন ব্যর্থ না হয়; সতীবাক্য যেন বিফল না হয়।' এইরূপে কেবল মাকেই ডাকিতেছি, এমন সময়—কি আশ্চর্য! অদূরে দ্রুত পদধ্বনি ও 'পাক্‌ড়াও—পাক্‌ড়াও শব্দ শ্রুত হইল।

'পাক্‌ড়াও' 'পাক্‌ড়াও' শব্দে দস্যুদ্বয় চমকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দৌড়িয়া পলাইল। তখন আরও নিকটে চীৎকার শুনিলাম —'পাক্‌ড়াও পাক্‌ড়াও' এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম একটী ধোপার গাধা সম্ভবতঃ দাঁড় ছিঁড়িয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। রাসভনন্দন আমাকে সম্মুখে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে একটী যুবতী স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিতেই গর্দ্দভ পুনরায় দৌড়িল; স্ত্রীলোকটী আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিল, তাহার পশ্চাৎ একজন পুরুষ, দেখিলে রজক বলিয়া বোধ হয়, আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ধোপানী আমাকে দেখিয়া পুরুষটীকে কি বলিল সে ধীরপদে আমার কাছে আসিয়া আমায় ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'বাবা! তোমায় কি ডাকুতে ধরেছিল?'

আমি উত্তর করিলাম, হ্যাঁ।

'তুমি কেমন বোকা সাধু? বলিয়া রজক বন্ধন খুলিতে লাগিল; আমি অতি সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জানাইলে সে বলিল 'তুমি এখানে নতুন এসেছে; কিছু জান না। এ সব এমন সাংঘাতিক জায়গা যে সিকি পয়সার জন্য মাথায় লাঠি মারে; ভাগ্যে তোমায় কিছু বলে নি।'

আমি তখন অবাক হইয়া দুইজনকে দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম কে ইহারা? এই নিবিড় বনে গর্দ্দভ তাড়াইবার ভাণ করিয়া আমায় উদ্ধার করিতে আসিল; কে ইহারা? আমায় চিন্তিত দেখিয়া রজকিনী বলিল, 'বাবা! মথুরানাথ তোমায় রক্ষা করেছেন।'

'যা হোক, তুমি খুব বেঁচে গেছ; এখন এস। বলিয়া রজক এক দিকে কয়েক মিনিট যাইতেই যমুনার জল দেখা গেল। রজক তখন চরের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া বলিল, 'বাবা! ঐ যে বাবুটী দুই জন লাঠিয়াল সঙ্গে বেড়াচ্ছেন, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বল; আর আজ রাত্তিরটা তাঁর বাড়ীতে গিয়েই থাক। বাবু এক জন জমিদার। আমি ওঁর কাপড় কাচি;

আমি জানি উনি খুব ভাল লোক। তুমি ও'র কাছে যাও।'

নিঃশব্দে উভয়কে উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিয়া আমি সেই জমিদারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

৬১

দুপাশে দুইজন লাঠিয়াল লইয়া একজন সুপুরুষ বাঙালী ধীরে ধীরে যমুনাতীরে পদচারণ করিতেছেন। আমি নিকটে যাইতেই তিনি 'এই যে;' বলিয়া ভালরূপে আমায় নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার হাত ধরিলেন। আমি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, 'না, চিনি না বটে; তবে তুমিও যে তোমার হতভাগ্য বাপ মাকে কাঁদিয়ে এই বেশ ধরেছ—তা বেশ বুঝতে পারছি।'

অতঃপর তিনি একে একে আমার সমস্ত পরিচয় লইলেন। আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলাম, 'আমি এখন কলকাতা থেকে আসছি; আর বাপ বাপ মার অনুমতি নিয়েই বেরিয়েছি।'

জমিদার মহাশয় দৃঢ়মুষ্টিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'তা আর বুঝতে পারছি না? এই বয়েস—তার ওপর আবার বিবাহিত; এমন অবস্থায় বাপ মার ত অনুমতি দেবার কথাই। আচ্ছা; এখন কোথা থেকে আসছ—সত্য করে বল দেখি?'

আমি তখন সেই রামায়েতের সহিত আমার 'দুর্বাসা আশ্রম' দর্শনাভিলাষের পরিণাম সম্বন্ধে সকল কথা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, 'বেশ হয়েছে;—তোমার বাপ মার অদৃষ্ট ভাল; তাই বিপদে পড়ে তুমি আমার শরণাপন্ন হয়েছ। কিন্তু বাবা! তুমি যে বললে—যে ধোপা আমার কাপড় কাচে সেই তোমাকে আমায় চিনিয়ে দিয়েছে,—এ কথার অর্থ কি; তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যা বলছ সব সত্য; কিন্তু আমার ত কোন ধোপাই নেই;—আমি ত এখানে কোন ধোপাকে দিয়ে কাপড় কাচাই না।'

আমি বিস্মিত ভাবে ভদ্রলোকটির মুখের পানে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তবে কি ধোপা ঠিক বুঝিতে পারে নাই? সে কি অন্য জমিদারের কথা ভুল করিয়া এই ভদ্রলোককে দেখাইয়া বলিয়াছে? জমিদার মহাশয় আমাকে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আর অত ভাবতে হবে না; যা হবার হয়েছে।— এখন আমার সঙ্গে এস।'

রাত্রি প্রায় দশটার সময় জমিদার মহাশয়ের সহিত এক বাসাবাটীতে গিয়া উঠিলাম। উপরে উঠিয়া আমাকে বরাবর তেতালায় লইয়া যাইবার জন্য তিনি

দ্বারবান দুইজনকে বলিলেন; 'এই সাধুটীকে তেতালার ঘরে নিয়ে যাও ; আমি যাচ্ছি।' বলিয়া জমিদার মহাশয় দোতালার ঘরে ঢুকিলেন আর দ্বারবানদ্বয় আমাকে তেতালায় একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুমার্জ্জিত ঘরে লইয়া গিয়া বসিতে আসন দিল। ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে মশারি খাটান একখানি মূল্যবান খাটিয়া বিরাজ করিতেছে দেখিয়া আমি একজন দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ ঘরে কে শোয়?'

দ্বারবান উত্তর দিবার পূর্ব্বেই জমিদার মহাশয় ঘরে আসিয়া বলিলেন, 'এ খুব পবিত্র ঘর ; এ ঘরে আমার এক ব্রহ্মচারিণী বিধবা মেয়ে রাত্রে থাকে। সে আজ দোতালায় থাকবে ; তুমি এখানে থাক।' বলিয়া দ্বারবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দেখ্ লছমণ! এই সাধুটীকে সাবধানে পাহারা দিয়ে রাখ্বি! যেন না পালায়। পালালে তোদের ছমাসের মাইনে কাট্ব।'

দ্বারবান অবাক হইয়া রহিল। আমি ভাবিলাম, আমায় আবার পাহারা দিতে হইবে কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি বল্ছেন? আমায় সাবধানে পাহারা দিতে হবে কেন? আমি কোথাও যাব না ত?'

জমিদার মহাশয় বলিলেন, 'না, না. তা নয় ; আমিই তোমায় কোথাও যেতে দেব না ; একেবারে কল্কাতায় নিয়ে গিয়ে তোমার বাপ মার হাতে তুলে দেব ; দেখি যদি সেই পুণ্যে আমার হারানিধি ফিরে পাই।' এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি পুনরায় বলিলেন, 'বাবা! তুমি বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে সাধু হতে যাচ্ছ ; বাপ মার যে কি হচ্ছে, তা কি তুমি বুঝতে পারছ? আমি ভুক্তভোগী ; আমি বুঝতে পারছি। আজ ছ'বছর হ'ল আমার একমাত্র ছেলে, বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে পালিয়েছে ; আমি সস্ত্রীক পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই ছ বছর এমন তীর্থ নেই যে না ঘুরলুম ; প্রত্যেক বছর ঝুলনের সময় বৃন্দাবনে আসি—যদি একবার তাকে দেখতে পাই ; কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও একবার তাকে দেখ্লুম না। আমার প্রাণে যে কি হচ্ছে, একমাত্র ভগবান জানেন ; তবু আমার ছেলে অবিবাহিত।—আর তুমি আবার বিবাহিত ; আর এক জ্বালা বাপ মার বুকের কাছে রেখে এসেছ। আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না ; যতদিন আমরা এখানে থাকি, ততদিন তোমাকে এই ঘরেই আটকে রাখ্ব ; তারপর সঙ্গে করে কল্কাতায় নিয়ে যাব।'

আমি প্রথমে জমিদার মহাশয়ের করুণ কাহিনী শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে ধীরে ধীরে আশ্বস্ত হইয়া 'ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' এই ভগবৎ বাক্যের আশ্রয় লইয়া বলিলাম, 'বাবা! আপনি ব্যথিত ; আপনার ব্যথায় আমিও ব্যথিত। কিন্তু কি করে বোঝাব বলুন, যে—আপনার ছেলের মত আমি সংসার থেকে পালাই নি।

যদিও সংসারের কণ্টক-পথে চল্‌তে আমি বহু সংকটে পড়েছি; সংসারের রাঙ্গা ফলে নিজেকে মজাতে বসেছি; দুর্লভ মনুষ্যজীবন সামান্য ইন্ধনের মত কামানলে আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছি; তবু ৺মায়ের দয়ায় আর বাপ মার আশীর্ব্বাদে কোন রকমে এ পর্যন্ত স্থির ধীর অচল অটল হয়ে কাটাতে পেরেছি। আমি একদিন এক ধার্ম্মিক গৃহস্থের বিশ্রাম কক্ষে দেখেছিলাম লেখা রয়েছে—

'খাটিবারে আসিয়াছি খেটে যাব নাথ।
ফলাফল যাহা কিছু সব তব হাত॥'

সেই দিন থেকে আমিও স্থির করলুম, বিবেকের বাধ্য হয়ে চল্‌ব; যা হবার হবে; কিছুতেই বিচলিত হব না। আপনি যদি আমায় আট্‌কে রেখে দেন, আমার সংকল্প আমায় পূর্ণ কর্‌তে না দেন, তাহলে মনে কর্‌ব—তাও মথুরানাথের ইচ্ছা। তা যদি না হয়,—কে আমায় দস্যুর কবল থেকে উদ্ধার কর্‌লে? কেই বা সেই নিবিড় বন থেকে পথহারা আমাকে পথ দেখিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করালে। আর আপনিই বা কেন এমন যত্ন করে আমায় এই নিরাপদ স্থানে রাখ্‌লেন? জান্‌বেন সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।'

এমন সময় পাচক এক থালা গরম লুচি, তরকারি, মিষ্টি ও এক বাটী ঘন দুধ আনিয়া আমার কাছে রাখিল। জমিদার মহাশয় ইঙ্গিতে আমায় পা ধুইতে বলিলে, আমি গাত্রোত্থান করিলাম। ভৃত্য জল আনিয়া দিল; দ্বারবান সযত্নে আমার পা ধোয়াইয়া দিল। জমিদার মহাশয় বারংবার দ্বারবানদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া দোতলায় নামিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ সুরসুন্দরীর মত জমিদারপত্নী উপরে আসিলেন। আমি ভক্তিগদগদ ভাবে তাঁহাকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। তিনি মহা অপরাধিনীর মত সসম্ভ্রমে নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'বাবা! আমি শূদ্রাণী; ব্রাহ্মণের দাসী। আমায় অমন কর্‌লে আমার অপরাধ হবে বাবা!—বাবা!—' বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ধরিয়া আসিল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া তিনি বলিলেন, 'বাবা! না জানি জন্ম জন্মান্তরে কত অপরাধ করেছি; কত মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জাল জোচ্চুরী করে এসেছি; হয় ত কত পরধন হরণ করে পরের প্রাণে আঘাত দিয়ে এসেছি; পরের দুঃখে আনন্দ করে এসেছি; বোধ হয় তাই আজ আমার এই কর্ম্মভোগ। তাই আজ আমার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র নিরুদ্দেশ। একমাত্র প্রাণের পুতুলী কন্যা আমার অবীরা বিধবা। বাবা বলব কি, ভাব্‌তে বুক ফেটে যায়—দরিদ্রের মেয়ে আমি; বাপ মার পুণ্যফলে বড় ঘরে বে হয়েছিল; বাপ মার পুণ্যে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কদিন ছিলুম। দেবতুল্য স্বামী,—হাজার হাজার টাকার অলংকার,—অকলংক চাঁদের মত ছেলে,—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী মেয়ে,—তিন চার লাখ টাকার জমিদারী;—এর বেশী আর মানুষ কি পায়? কি চায়? আমার কি ছিল না বাবা!

ভগবান আমায় কি দেন নি ? আর আজ আমার ভাঙ্গা কপাল ! পিতামাতা স্বর্গগত ; স্নেহের কন্যা চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা ; প্রাণাধিক পুত্র বি, এ, পাশ দিয়ে নিরুদ্দেশ। শুধু তাই নয়, স্ত্রীলোকের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল, ইহ পরকালের সাথী, স্বামী দেবতাও আজ অর্ধ উন্মাদ, মদ্যপায়ী, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। হায়! ভগবান আর কেন যে আমায় রেখেছেন ? কেন যে আমায় এ যন্ত্রণা দিচ্ছেন জানি না ; আর আমার এ দুঃখ সহ্য হয় না।' বলিতে বলিতে জমিদারগৃহিণী অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া আমারও চোখে জল আসিল ; আমিও চোখ মুছিলাম ! ইহা দেখিয়া জমিদারগৃহিণী আমায় তাঁহার আরও অনেক দুঃখের কথা শুনাইয়া অবশেষে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন এবং আরও বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন যেন আমি তাঁহাদিগকে কোনরূপ অভিসম্পাত না করি ! আমি হাসিয়া বলিলাম, মা ! আপনারা ত আমায় কোন কষ্ট দেন নি ; আমি কেন আপনাদের অভিসম্পাত দেব ?' বলিয়া জমিদারগৃহিণীর বারংবার অনুরোধে আমি ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। জমিদারগৃহিণীও দোতলায় নামিয়া গেলেন।

## ৬২

প্রত্যুষে হাত মুখ ধুইয়া আমি স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতেছি এমন সময় জমিদারবাবু আসিয়া দ্বারবানকে ডাকিয়া আমাকে যমুনায় স্নান করাইয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি দ্বারবানদিগের সহিত যমুনায় চলিলাম। দ্বারবানদ্বয় আমার কাপড় ও কমণ্ডলু লইয়া অগ্র পশ্চাৎ চলিয়াছে ; আর রাস্তার লোক দুধারে দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ লোচনে নবীন যোগীকে দেখিতেছে ও আমার যমুনাতীরে থাকা, আমি বড় লোকের ছেলে প্রভৃতি কথা লইয়া পরস্পর কানা-কানি করিতেছে। আমি তাহাদের ভাব দেখিয়া কখনও লজ্জিত হইতেছি ; কখনও বা আমোদ অনুভব করিতেছি ; আবার ঝুলনপূর্ণিমার দিন লছমণঝোলা পেঁছিতে পারিব না মনে হইলে দুঃখেও মর্ম্মাহত হইতেছি।

যাহা হউক আমি ত আড়ম্বরের সহিত যমুনায় স্নান সারিয়া মথুরানাথকে দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসায় ফিরিয়া দেখি আমার ঘরে জমিদারের বালবিধবা কন্যা একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র হস্তে বসিয়া রহিয়াছেন। ইতি-পূর্ব্বে জমিদার কন্যাকে আমি দেখি নাই ; সুতরাং ঈষৎ সঙ্কুচিত অবস্থায় ঘরে ঢুকিলাম। জমিদার কন্যা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার শান্তোজ্জ্বল নয়নযুগলের পবিত্র দৃষ্টি আমার প্রাণে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের ভাব আনিয়াছিল। অভাগিনী এত রূপ গুণ লইয়া আসিয়াও কি দুঃখেই না পড়িয়াছে—এই ভাবিয়া দুঃখ, আর সেই নয়নযুগলের পবিত্র দৃষ্টি-

সৌন্দর্য্যে আনন্দ অনুভব করিলাম ; কারণ বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে অপরিচিতের প্রতি এমন অচঞ্চল পবিত্র প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি আমি যেন এই নূতন দেখিলাম। আমার মাথা নত হইয়া আসিল ; আমি মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। এমন সময় জমিদারপত্নী আসিয়া হাস্যমণ্ডিত বদনে আমায় সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা ! স্নান সেরে এসেছ ত? এখন একটু চা খাবে ?'

আমি উত্তর করিলাম, 'না, মা ! আমার চা খাওয়া অভ্যেস নেই।'

জমিদারকন্যা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অভ্যেস করেন নি কেন? —চায়ে মাদকতা আছে বলে ?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ ; চায়ে মাদকতা আছে বলেও বটে ; আবার চা রোগের ওষুধ বলেও বটে।'

জমিদার কন্যা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ; বলিলেন, 'সে কি ! চা আবার কি রোগের ওষুধ ?'

জমিদার গৃহিণী বলিলেন, 'কেন—ওষুধ নয় ত কি ?—সর্দ্দি হলে লোকে চা খায় না ?'

মায়ের কথায় মেয়ে হাসিয়া বলিলেন, 'ও—তাই ? তা যদি হয় ত গরম জিলিপি খাওয়াও ত সর্দ্দির ওষুধ ? তা বলে কি লোকে গরম জিলিপি খাওয়াও ছেড়ে দেবে ?' বলিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি গরম জিলিপি খান না ?'

আমি হাসিয়া বলিলাম. 'হাঁ, তা পেলে খাই বটে ; কিন্তু চা খাই না।'

'কেন খান না ?' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষায় জমিদারকন্যা আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিলে, আমি বলিলাম, 'চা যে শুধু সর্দ্দির ওষুধ—তা নয় ; চায়ের গুণ অল্প, দোষ বিস্তর। চা-ই আমাদের বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে এত অম্ল অজীর্ণের প্রাদুর্ভাব কেন জানেন ? এর একমাত্র কারণ এই চা। চা খেলেই ক্ষুধা নষ্ট হয় ; ক্ষুধার হ্রাস থেকেই অম্ল অজীর্ণের উৎপত্তি ; আর অজীর্ণ থেকেই যত রোগের উৎপত্তি ; এমন কি অম্ল অজীর্ণের প্রাবল্যে ক্ষয় রাজযক্ষ্মা পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। চায়ের অপকারিতার কথা যে শুধু আমরা বলছি, তা নয়। চা না খেলে যাদের চলে না, মদ যারা সাধারণ পানীয়ের মত ব্যবহার করে, তারাও বলছে 'চা ছাড়।' ইউরোপ আমেরিকাতে পর্য্যন্ত চায়ের বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে।'

চায়ের কথা আর অধিক দূর গড়াইল না। এবার উঠিল আমার জন্মভূমির কথা। আমি সে কথা প্রথম হইতেই চাপা দিয়া আসিয়াছি। এবং এখনও চাপা দিলাম বুঝিতে পারিয়া জমিদারকন্যা বলিলেন 'আচ্ছা, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটী কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি।'

আমি বলিলাম, 'আমি পণ্ডিতও নই, যোগী সন্ন্যাসীও নই ; গেরুয়া পরেছি বলে যে একজন তত্ত্ববিৎ হয়ে পড়েছি, তাও মনে করবেন না। আমি শুধু গুরুকৃপায় স্বপ্নাদেশের উপর নির্ভর করে চলছি ; এ ছাড়া আর কিছুই নই।'

স্বপ্নাদেশের কথা শুনিবামাত্র জমিদারকন্যা যেন কি এক পুরাতন কথা মনে করিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া মাকে সংকেতে বলিলেন, 'মা! সেই নয় ত ?' বুঝিবা আমার সব কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে ভাবিয়া আমিও কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলাম। জমিদারকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কলকাতায় কোন্ ষ্ট্রীটে থাকেন ?'

আমি বলিলাম 'আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে।'

'আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ? কত নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ?'

এখন আর সে বাড়ীর ঠিকানা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নয় ; এখন সে বাড়ী ২০নং বলাই সিংহের লেন হয়েছে।'

'১00 নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কি আপনার বাড়ীর কাছে ?'

'আমাদের বাড়ীই আগে ১00 নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ছিল।'

'তবে ত বোধ হয় আপনিই সেই লোক ;—মা! আমার বিশ্বাস ইনিই সেই ব্রাহ্মণসন্তান, যিনি স্বপ্নে ৺আদ্যামাকে পেয়েছিলেন।'

জমিদারপত্নী আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'হাঁ বাবা! তুমি কি সেই ? আমরা খবরের কাগজে দেখেছিলুম ; আমার মেয়ে বেঙ্গলী কাগজে পড়েছিল ; কাগজে মায়ের মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ছেপেছিল। তুমিই কি সেই মূর্ত্তি পেয়েছিলে বাবা ?'

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিদুষী কন্যা মায়ের গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'হাঁ মা, ইনিই সেই ; তাতে আর সন্দেহ নেই। ওমা! কি সর্ব্বনাশ!—বাবা কাকে ধরে এনে আটকে রেখেছেন ? বলিতে বলিতে মেয়েটী উঠিয়া নিকটে আসিয়া আমার পদধূলি লইতে উদ্যত হইলে আমি যথাসাধ্য বাধা দিয়া বলিলাম, 'মা হয়ে কি সন্তানের পদধূলি নিতে আছে মা ?'

জমিদারগৃহিণী বিস্মিতভাবে গলবস্ত্র হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া আমায় প্রণাম করিলেন। আমি প্রতি নমস্কার জানাইলে তাঁহারা লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইলেন এবং জমিদারগৃহিণী আমায় বলিলেন, 'বাবা! তোমার সেই মূর্ত্তি আমরা যত্ন করে রেখেছি। আমার মেয়েটী আবার বড় মায়ের ভক্ত ; মায়ের কাছে রোজ ধূপধুনো দেয়। কিন্তু বাবা! আমাদের এ অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত তা ত জানি না ?'

জমিদারকন্যা বলিলেন, 'মা! এখনই, এই মুহূর্ত্তেই, বাবা বাড়ী না এসে পেঁছুতেই এঁকে বিদায় করুন। ঠাকুরকে বলুন, শিগ্গির এঁর কিছু খাবার

যোগাড় করে দিক্। এ*কে এই রকম করে আট্‌কে রাখ্‌লে শ্‌ধ্‌ যে এ*র অনিষ্ট হবে তা নয়, সমস্ত দেশের অনিষ্ট হবে। এ*র দ্বারা দেশের ঢের মঙ্গল হবে ; এ*কে ছেড়ে দিন।'

মেয়ের কথা শ্‌নিয়া মা যাইতে উদ্যত হইলে, আমি বলিলাম, 'মা ! বাবা না আস্‌তে যদি আমায় যেতে দেন, তাহলে তিনি এসে আপনাদের বা দ্বারওয়ানদের কিছ্‌ বল্‌বেন না ত ?'

মা যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, 'না বাবা ! আমরা যাহোক একটা ব্‌দ্ধি খাটিয়ে সব সাম্‌লে নেব ; তার জন্য তোমায় ভাব্‌তে হবে না।'

জমিদারকন্যা বলিলেন, 'আপনি আমাদের জন্য ভাব্‌বেন না। আমরা না হয় বাবা এলে বল্‌ব,—সাধ্‌কে দরজা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছিল ; দরজা খ্‌লে দেখি কেউ কোথাও নেই।'

আমি বলিলাম, 'আমার জন্য আপনারা এমন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বেন ?'

জমিদারকন্যা দ্‌ঢ়তার সহিত বলিলেন, 'মিথ্যা ? মিথ্যা কাকে বলে ? সত্য রক্ষার জন্য যে মিথ্যার প্রয়োজন হয়, সে মিথ্যা সত্যের চেয়ে ম্‌ল্যবান, পবিত্র ও সত্য।'

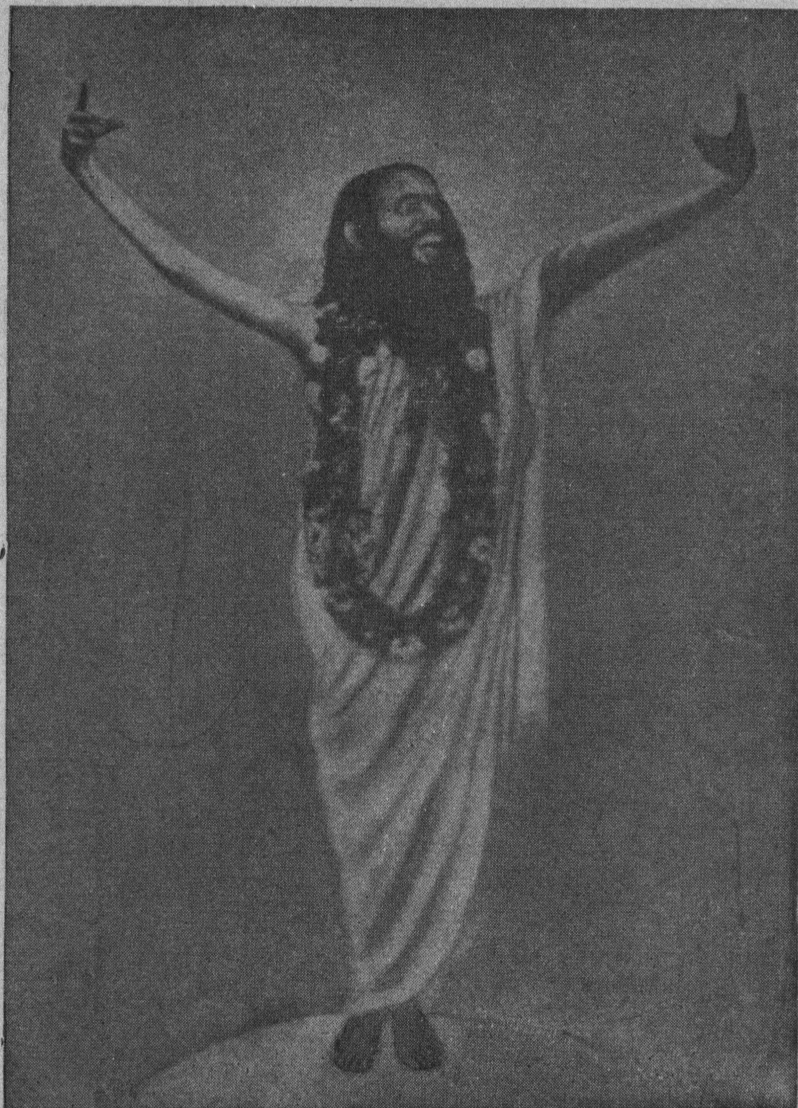
এইর্‌প কথা হইতেছে এমন সময় পাচক একখানি থালায় করিয়া কয়েকখানি ল্‌চি, মিষ্টান্ন ও দ্‌ধ আনিয়া আমার সম্ম্‌খে রাখিল। আমি জমিদারকন্যার ইঙ্গিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ত্বরিৎগ্রাসে খাবারগ্‌লি প্রায় সমস্তই উদরসাৎ করিয়া ম্‌খ ধ্‌ইতে গেলাম। আসিয়া দেখি, জমিদারকন্যা ভক্তিনম্রশিরে আমার ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিতেছে। আমি একটু আশ্চর্য হইলাম ; কারণ শিক্ষিত সমাজে এর্‌প প্রসাদ গ্রহণের রীতি আজকাল প্রায় দেখা যায় না। মনে মনে ভাবিলাম, বোধ হয় মেয়েটী স্কুল কলেজে শিক্ষা পায় নাই। কৌতূহল মিটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সত্যই মেয়েটী স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করে নাই ; বাড়ীতে পড়াশ্‌না করিয়াই উচ্চশিক্ষার অধিকারিণী হইয়াছে। আরও জানিতে পারিলাম, যিনি এই কন্যার শিক্ষক তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিষয়াসক্তিহীন নিরামিষাশী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ।

আমি জমিদারপত্নীর আদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। জমিদারকন্যা থালাখানি তুলিয়া লইয়া আমার উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়া ঘরের বাইরে গেলেন।

'জয় মথ্‌রানাথ !' বলিয়া সানন্দচিত্তে আমি দোতালায় নামিলে, জমিদার-গ্‌হিণী ভক্তিনম্রশিরে কৃতাঞ্জলিপ্‌টে আমায় প্রণিপাত করিয়া অশ্র্‌সিক্ত নয়নে বলিলেন, 'বাবা ! আশীর্বাদ কর, আর ৺মাকে জানিও, ৺মা যেন আমাদের হারানিধি মিলিয়ে দেন। এমন করে আরও তিনবার খ্‌জ্‌তে বেরিয়েছি। কিন্তু ৺মায়ের দয়া হয় নি। এইবার আমার খ্‌ব আশা হচ্ছে ; কেন না ৺মায়ের বড়



মথুরা হইতে সংগৃহীত এই যুগলমূৰ্ত্তিখানি শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর সর্ব্বদা [illegible] রাখিতেন।



ভাবাবেশে শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর

ছেলের পদধূলি আমার বাসায় পড়েছে। এবার নিশ্চয়ই আমার হারাধন ফিরে পাব।'

আমি বলিলাম, 'মা! যার যেমন প্রাক্তন, তার তেমন ভোগ হবেই। যদি সত্যই আপনাদের প্রাক্তনে থাকে, নিশ্চয়ই পুত্র ফিরে পাবেন ; তার জন্য কারও দয়া বা আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন হবে না। অবশ্য মানুষমাত্রের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ; কারণ শাস্ত্রে আছে, 'তথাপি যত্নঃ কর্ত্তব্যো নরৈঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।' দৈবের কৃপা পেতে হলেও যত্ন চেষ্টা করতে হয়। তাছাড়া চেষ্টা করেও যদি সুফল না পাওয়া যায়, তাতেও দুঃখের অনেকটা লাঘব হয়।'

'হাঁ বাবা! তা সত্যি।' বলিয়া জমিদারগৃহিণী আমায় বিদায় দিলে আমি যখন নীচে নামিলাম তখন বাড়ীর ঝি দূর হইতে জানু পাতিয়া আমায় নমস্কার করিল। সঙ্গে সঙ্গে জমিদারকন্যা আসিয়া আমার অপহৃত সাত টাকা কয় আনা আমার পায়ের নিকট রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া আমায় নমস্কার করিল।

আবার সেই অর্থ! আমি ত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। ঘৃণাভরে বলিয়া ফেলিলাম, 'ওকি! আবার টাকা। না, না, আর আমায় টাকা দেবেন না ; আমি আর টাকা ছোঁব না। ঐ টাকাই আমায় মরণের পথে টেনে নিয়ে গেছল। ঐ টাকা কাছে থাকার জন্যই আমি ডাকাতের হাতে নিপীড়িত হয়ে ক্রোধের শরণাপন্ন হয়েছিলুম। আমার বিবেক বুদ্ধি লুপ্ত হতে বসেছিল। আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর টাকা কাছে রাখ্‌বে না।'

আমার কথা শুনিয়া জমিদারকন্যা বিস্মিতভাবে করজোড়ে বলিলেন, 'কি বলছেন ঠাকুর? এ যে আপনার চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।' বলিয়া জমিদারকন্যা ভূমি হইতে টাকা কয়টী উঠাইয়া আমার হাতে তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'টাকা নিন ; এ টাকা আপনারই ; এতে কোন সঙ্কোচ করবেন না।'

উপর হইতে জমিদারগৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা! টাকা নাও ; যিনি নিয়েছেন তিনিই দিচ্ছেন। এ সবই মথুরানাথের ইচ্ছা! না হলে এক পয়সা দান করতে যাদেব হাত কাঁপে তারা কি কখনও সাত আট টাকা এক সঙ্গে দান করতে পারে। তা ছাড়া টাকা না নিলে ত পূর্ণিমের মধ্যে তোমার লছমণ-ঝোলা যাওয়া ঘটে উঠবে না ; কে তোমার গাড়ীভাড়া দেবে? কার কাছেই বা চাইতে যাবে? তুমি টাকা নাও ; আর এইবেলা বেরিয়ে পড় ; নটা বাজে ; বাবু আসবার সময় হয়েছে। আর দেখ বাবা! তুমি ষ্টেশনের রাস্তায় যেয়ো না। বাবু সম্ভবতঃ ষ্টেশনের দিকেই গেছেন। তুমি হাঁটাপথেই বৃন্দাবনের দিকে যাও। বৃন্দাবন এখান থেকে বেশী দূর নয় ; ৬৷৭ মাইল হবে ; যদি হাঁটতে না পার, একায় যেও ; শেয়ারে ২৷৩ আনা দিলে পৌঁছে দেবে।'

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া টাকা কয়টী লইয়া জমিদার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

৬৩

রাজপথে বাহির হইয়া একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম জমিদার মহাশয় আসিতেছেন কি না ; পরিচিত কাহাকেও পথে না দেখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ভাবিতেছি বৃন্দাবনের পথ কোন দিকে কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করি, এমন সময় একখানি এক্কা আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্কাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, সাধুবাবা কি বৃন্দাবনে যাবেন ? এক্কায় যান ত আসুন।' আমি বলিলাম, 'না।'

এক্কা বৃন্দাবনে যাইবে শুনিয়া, আমিও সেই রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। পথে বহু যাত্রী, অনেকেই বৃন্দাবনে চলিয়াছে ; অনেকের মুখেই বৃন্দাবন লীলা শুনা যাইতেছে। আমি আনন্দিত মনে মথুরানাথকে উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিয়া চলিতে চলিতে এক গোয়ালার দোকানের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে রাস্তায় ধূলিকণাগুলি সূর্য্যের উত্তাপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত পায়ে লাগিতেছে। রৌদ্রের তাপে আমি একেবারে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া গিয়াছে। বিবেকের তীব্র কষাঘাতে সমস্ত কষ্টই অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছি ; কিন্তু বৃদ্ধিমান গোয়ালা ও তাহার সহধর্ম্মিণী আমাকে ঘর্ম্মাক্তকলেবর দেখিয়াই হউক, অথবা বাৎসল্য প্রবৃত্তিই হউক, তাহাদের দোকানে আমাকে বসিতে আহ্বান করিল। আমি গোয়ালা ও তাহার স্ত্রীর আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া দোকানে গিয়া উঠিলাম। পিপাসায় তখন আমার কণ্ঠ শুষ্ক ; কোথায় জল পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আমার জলের পরিবর্ত্তে প্রায় আধসের গরম দুধ চিনি দিয়া আনিয়া দিল। আমি দুধ পান করিতে করিতে বৃন্দাবন এখান হইতে কতদূর, রাস্তা কেমন, সঙ্গী মিলিবে কি না, প্রভৃতি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। তাহারাও উত্তরে আমায় জানাইল বৃন্দাবন সেখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, রাস্তা ভালই ; পথে সৎসঙ্গীরও অভাব নাই। এই সকল কথায় আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমি দুধ শেষ করিয়া দুধের দাম দিতে চাহিলাম ; তাহারা দুধের দাম লইল না ; অধিকন্তু আমাকে তখন যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল, 'এখন ঐ খাটিয়ায় বিশ্রাম করুন ; বেলা গেলে, রোদ পড়ুলে, আরও কিছু দুধ খেয়ে চলুতে থাকুবেন।'

বিশ্রাম করিয়া পরে যাওয়ার কথা যুক্তিযুক্ত মনে হওয়ায় আমি উহাদের কথায় সম্মত হইলাম। অতঃপর উহাদের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমি খাটিয়ায় বিশ্রাম করিতে গেলাম। গোয়ালিনী আমার সঙ্গে আসিয়া খাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। আমিআসন বিছাইয়া নিরুদ্বেগে শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়া ঘটনাক্রমে গোয়ালিনীর দিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে আর আমার অলক্ষ্যে সে তাহা মুছিতে যত্ন পাইতেছে। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ; ভাবিতে লাগিলাম গোয়ালিনী কাঁদে কেন ? আপন মনে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় গোয়ালিনীর দিকে দৃষ্টি

ফিরাইলাম। কি আশ্চর্য্য! গোয়ালিনী এখনও সেই একই স্থানে একই ভাবে দাঁড়াইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত ব্যথিত করুণ দৃষ্টিতে আমারই দিকে নির্ণিমেষলোচনে চাহিয়া আছে। গোয়ালা কোথায়, দেখিবার জন্য মুখ তুলিয়া দেখি গোয়ালা আপন মনে দুধ জ্বাল দিতেছে। তাহারও যেন মলিন ও চিন্তিত ভাব; অশ্রুসিক্ত লক্ষ্যহীন দৃষ্টি যেন কোন অজানা রাজ্যে কাহার সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে। আমি ত এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; অগত্যা গোয়ালিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, 'মায়ি!' তোমার চোখে জল কেন? তুমি আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ?'

গোয়ালিনী এতক্ষণে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল এবং একটু যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া আমায় বলিল, 'বাবা! আমার বড়ই মন্দভাগ্য; আমাদের মত দুঃখী বোধ হয় এ রাজ্যে আর কেউ নেই।'

আমি বলিলাম, 'কেন মায়ি? তোমরা ত বেশ লোক; তোমাদের ত ধর্ম্মবুদ্ধি আছে; দয়া আছে; দান আছে; তোমরা মন্দভাগ্য কেন হবে মায়ি?'

গোয়ালিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না; আমার মুখে মাতৃসম্বোধন শুনিয়া একেবারে অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল! গোয়ালা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল; কিন্তু দেখিলাম তাহারও চোখের জলে বুক ভাসিতেছে। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। আমার আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে অভাগিনী পুত্রহারা। জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহাই শুনিলাম। তাহারা বলিল, তাহার প্রায় দুই মাস আগে ঠিক আমারই মত মুখ তাহাদের এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ছেলেটি বড় সুন্দর ছিল; তাহার নাম মন্নু। মন্নু এই অল্প বয়সেই এক মিঠাইয়ের দোকানে দশ টাকা বেতনে চাকুরী করিত। সে তাহাদের একমাত্র পুত্রসন্তান ছিল। এখন আছে কেবলমাত্র একটি কন্যা; নাম তার মনিয়া। বয়সে মন্নু অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট! মেয়েটী তখন সেখানে ছিল না; রন্ধনাদি কার্য্যে ভিতর বাড়ীতে ছিল।

আমি তখন তাহাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম, 'মা! এ সংসারে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না। কেউ আজ, কেউ কাল, কেউ বা দুদিন পরে কালের কবলে পড়বেই; সর্ব্বগ্রাসী কাল কাউকে ছাড়বে না। যে যত দিনের কর্ম্ম নিয়ে এসেছে, সে ততদিন বেঁচে থাকবে; যোগী ঋষি কেউ তার পরমায়ু বাড়িয়ে দিতে পারে না। মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার নেই জেনে জ্ঞানীরা তার জন্য প্রস্তুত হয়; স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে; ভয় করে না। মা! তোমরা আজ মন্নুর জন্য কাঁদছ; আবার একদিন তোমাদের জন্য লোক কাঁদবে। এই ত সংসারের রীতি; এ রীতি কে খণ্ডন করবে বল? বৃথা শোক করো

না মা ! শোক না করে যদি তোমরা তার আত্মার শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর তাহলেই যথার্থ বাপ মার কাজ করা হয়। কেননা, বাপ, মা চিরদিনই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন।'

এইরূপ বহু উপদেশের পর তাহাদিগকে শান্ত করিলে, তাহাদের আদরের কন্যা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনিয়া রূপে গুণে অদ্বিতীয়া। আহা ! তাহার কি শান্ত সরল দৃষ্টি, পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত মনিয়ার অনিন্দ্য রূপরাশি দেখিয়া আমার দ্বাপরের কথা মনে জাগিল। মনিয়া যেন সেই দ্বাপর যুগের শ্রীরাধা ! ভাবিলাম বুঝি ইহারাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এদেশে আনিয়াছিল। এমন না হইলে আর কৃষ্ণসঙ্গিনী হইবে কে ? মনিয়া অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া মাতাকে সম্বোধন করিয়া করুণ-স্বরে বলিল, 'মা ! এই সাধুটী যেন আমার মন্নু ভাই ; না ? মুখ চোখ ঠিক এই রকম ছিল না ?'

মনিয়ার কথা শুনিয়া আমার মন যেন বলিয়া উঠিল,—'ওগো না না, না ; আমার চেয়ে সে ঢের সুন্দর ছিল। তোমাকে দেখেই তা বুঝতে পাচ্ছি। মনিয়ার মা কাঁদিতে কাঁদিতে মেয়েকে বুকে করিয়া আমার কাছে আনিয়া আমায় বলিল, 'সাধুবাবা ! একে আশীর্ব্বাদ কর ; যেন বেঁচে থাকে।'

মনিয়া বড়ই সুশীলা। আমার কাছে আসিয়া সে আমায় নমস্কার করিল ; আমি প্রতিনমস্কার করিলে লজ্জায় সে মার মুখপানে তাকাইল। আমি মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম, 'তুমি স্বামী সোহাগিনী হও ; তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক।' এমন সময় একদল পশ্চিমা যাত্রী গোয়ালার দোকানে দুধ লইতে আসিলে স্বামী স্ত্রী উভয়ে চলিয়া গেল। মনিয়া আমার খাটিয়ার কাছে বসিয়া আমার সহিত কথা কহিতে লাগিল। তাহার দুএকটী কথা যেন এখনও আমার কানে লাগিয়া আছে। মনিয়ার মত কোমল প্রকৃতির মেয়ে আমি এ পর্য্যন্ত আর দেখি নাই। অপরাহ্ণে আমি যখন উহাদের নিকট হইতে বিদায় লই, তখন মনিয়া যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, আমাকে কোথাও যাইতে বিদায় দিবার সময় আমার সহোদরা ভগ্নীও কখন সেরূপ কাতর আর্ত্তনাদ করে নাই।

যাইবার সময় আমাকে দুগ্ধ পান করাইতে না পারিয়া গোয়ালা ও তাহার পত্নী বড়ই লজ্জিত হইল ; কারণ সেদিন তাঁহার পূর্ব্বেই দোকানের সমস্ত দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। গোয়ালা কিন্তু আমায় ছাড়িল না। এক মিঠাইয়ের দোকান হইতে এক পোয়া বরফি আনাইয়া আমায় খাইতে দিয়া বলিল, 'বাবা ! খাও ; আজ আমার অনেক লাভ হয়েছে ; রাত্রি নটা পর্য্যন্ত বিক্রি করেও যে দুধ শেষ করতে পারি না, পরদিনের জন্য দই পেতে রাখি ; সে দুধ আজ দুতিন ঘণ্টার মধ্যে সব বিক্রি হয়ে গেল। এ রকম হলে ত আমি রাজা হয়ে যাব।'

আমি বলিলাম, 'এখন ত বিক্রি হবেই। ঝুলন যতদিন না শেষ হয় ততদিন যাত্রীও হবে; এ রকম বিক্রিও হবে।' এই বলিয়া আমি সেই গোয়ালা পরিবারের মায়া কাটাইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। আমি চলিতে থাকিলে যত-দূর দেখা যায় মনিয়া ও তাহার পিতা মাতা আমার পানে তাকাইয়া রহিল। আসিবার সময় উহারা আমায় বলিয়া দিয়াছিল, আমি যদি আবার কখনও আসি, যেন উহাদের দোকানে অতিথি হই। কিন্তু ইহার পরের বারে যখন মথুরা আসি, তখন আর সে দোকান খুঁজিয়া পাই নাই।

৬৪

বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছি। এক ক্রোশ পথ চলিতে না চলিতে পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল! রাস্তায় কোথাও এক বিন্দু জল পাইলাম না। বিপরীত দিক হইতে কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী মথুরায় আসিতেছিল; তাহাদের প্রত্যেকের কমণ্ডলুতে কিছু কিছু জল ছিল; কিন্তু আমার অতীব কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও তাহারা কেহ আমায় একটু জল দিল না; বলিল, এখনও আমাদের এক ক্রোশ পথ যেতে হবে। তোমায় জল দিয়ে কি শেষে নিজেরা মারা যাব? তুমি কমণ্ডলু করে জল আন নি কেন?'

আমি বলিলাম, 'আমার কমণ্ডলু শতছিদ্র।'

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'একটু এগিয়ে যাও; আগে ফাঁড়ি আছে; ফাঁড়িতে খাবার জল থাকে।'

অগত্যা আমি পিপাসাপীড়িত দেহে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। প্রখর রৌদ্রতাপে তপ্ত ধূলারাশি বালুকণার মত আমার পদদ্বয় দগ্ধ করিতে লাগিল। ওঃ! কী ভীষণ সে যন্ত্রণা! জীবনে আমি এমন কাতরতা ইতিপূর্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। কিছু দূর গিয়া রাস্তার পশ্চিমে ফাঁড়ি দেখিতে পাইলাম। ফাঁড়ি দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। আমি আশ্বস্ত হইয়া ফাঁড়ির চৌকিদারদিগের নিকট গিয়া জল চাহিলাম। দুই তিন জন চৌকিদার উপস্থিত ছিল; আমার প্রার্থনায় তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাহি করিতে লাগিল; কেহ কিছু উত্তর দিল না। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া আমি যেন দৃঢ় কণ্ঠেই বলিলাম, 'তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যায়; শিগ্‌গির জল দাও; আমায় জল দিতেই হবে; না হলে প্রাণে মারা যাব।'

চৌকিদারদিগের মধ্যে জনৈক পাষাণহৃদয় মূর্খ উত্তর করিল, 'তুমি মারা গেলে আমাদের কি? এখানে জল পাবে না; যাও!'

কথা শুনিয়া আমি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম। ভাবিলাম হায়! ইহারা কি জনপদের শান্তিরক্ষক? না—ইহারাই গুণ্ডা, ডাকাত; সকল সর্ব-

নাশের মূল। ইহাদের ব্যবহারে সেদিনকার দস্যুদিগের কথা মনে হইল। আমি উষ্ণ হইয়া পুনরায় বলিলাম, 'ওই ত ঘড়ায় জল রয়েছে; তোমরা আমায় জল দিচ্ছ না কেন?' আরও কত কি তাহাদিগকে বলিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের মন গলিল না। সাধুদের মত তাহারাও বলিল, 'তোমাকে জল দিয়ে কি শেষে আমরা তেষ্টায় মারা যাব? আমাদের তখন কে জল দেবে? যাও এখানে জল পাবে না।'

আমি অগত্যা সেস্থান হইতে চলিলাম। পিপাসাদগ্ধ হৃদয়ের কাতরতায় চোখে জল আসিল। আবার ক্রোধদীপ্ত মস্তিষ্কের উত্তাপে সে বারিবিন্দু শুকাইয়া গেল। আমি স্খলিতপদে অগ্রসর হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, একি অস্থিরতা। এর কারণ কি? কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে পথ চলিতে লাগিলাম। এক গুণ পথ অতিক্রম করিতে চার গুণ সময় লাগিতেছে; আর মনে হইতেছে, হায়! এ কি বিষ্ণুমায়া!—বৃন্দাবন-চন্দ্রের এ কি লীলা! একবার মনে হইল, আমি এখনও মলিনতা দূর করিতে পারি নাই; এখনও বৈরাগ্যের প্রখর আলোকে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হই নাই। বৃন্দাবন অভিমুখে আমি চলিয়াছি; পবিত্র ধাম বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আমি ধন্য হইব; সামান্য পাপ, সামান্য মলিনতা, সামান্য সন্দেহ থাকিলে ত সেখানে পৌঁছাইতে পারিব না। তাই বুঝি প্রেমময় আমার পাপরাশি দগ্ধ করিবার জন্যই আমার প্রাণে দারুণ তৃষানল জ্বালিয়া দিয়াছেন? তাই বুঝি এই পথ, এই সামান্য ব্যবধান, ফুরাইয়াও ফুরাইতেছে না? প্রাণাধিক প্রাণেশ আমার! একবার ফিরিয়া চাও; আর দুঃখ দিও না। এ দারুণ পিপাসার নিবৃত্তি কর প্রভু! হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধু! আমায় কৃপা কর; দীনবন্ধু! এই দীনের পানে ফিরে চাও।

মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম জনৈক ব্রজবাসী রাস্তার ধারে একটী কূয়ার পার্শ্বে বসিয়া হাত ধুইতেছেন। তাহাকে দেখিয়া আমার আশার সঞ্চার হইল। আমি 'জয় রামকৃষ্ণ! জয় বৃন্দাবনবিহারী!' বলিয়া ব্রজবাসীর দিকে অগ্রসর হইলাম। ব্রজবাসী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চাই?'

আমি বলিলাম, 'জল; তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায়; আমায় একটু জল দিন।'

তখন সন্ধ্যা হয় হয়; সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতেছেন। মৃদু মন্দ সান্ধ্য বায়ু বৃক্ষপল্লব স্পন্দিত করিতেছে। আমার কথা শুনিয়া ব্রজবাসী বলিলেন, 'ইয়ে ক্ষরা পানি; পিনে নেহি সকোগে।'

এবার আমি সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলাম। অতি কাতরভাবে ব্রজবাসীকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম, 'বাপু হে! তেষ্টায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত;

আমায় রক্ষা কর ; জল দাও ; নোনা হোক—বোদা হোক—ক্ষরা হোক—আমায় জল দাও ; পিপাসায় আমার প্রাণ যায়। এখন যে কোন জল পেলেই আমি প্রাণে বাঁচি। দাও,—দাও ;—আমায় জল দাও।'

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ব্রজবাসীর একি হৃদয়হীন আচরণ! আমার সকল অনুরোধ সে উপেক্ষা করিল কিছুতেই আমায় জল দিল না। আমি কাতর নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম ; আর সে 'ক্ষরা পানি পিনে নেহি সকোগে ;' বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া তৃষাপীড়িত দেহে কুয়ার ধারে বসিয়া পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে ব্রজবাসী দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। আমি আর কোন উপায় না দেখিয়া জলের অভাবে জলের শীতলতার আশায় প্রায় বুক পর্য্যন্ত কুয়ার মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়া পড়িয়া রহিলাম ; কিয়ৎক্ষণ ঐরূপে থাকিবার পর যেন দুইটী বালক বালিকার মধুর কথোপকথন শব্দ শুনিতে পাইলাম।

সচকিতভাবে মাথা তুলিয়া দেখিলাম একটি বালক ও একটি বালিকা নানা বেশভুষায় ভূষিত হইয়া পরস্পর নানাবিধ কৌতুক করিতে করিতে কুয়ার দিকে আসিতেছে। সেই আনন্দময় পুরুষ-প্রকৃতির বদনকমলে প্রেমানন্দ যেন উছলিয়া উঠিতেছে। হাসিতে হাসিতে তাহারা একজন আর একজনের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহাদের ভাব ভাষা, তাহাদের অঙ্গভঙ্গী, যেন এক অভিনব ভাবে আমায় মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। অনিমেষ লোচনে দেখিতে দেখিতে যেন আমি উঠিয়া বসিলাম। নিৰ্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবেই তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছি। ক্রমশঃ দেখিলাম তাহাদের মধ্যে এক জনের হাতে একটি ঘটী ও একগাছি দড়ি রহিয়াছে। তাহারা জল তুলিতেই কুয়ার ধারে আসিয়াছে।

হাস্য পরিহাস করিতে করিতেই তাহারা জল তুলিয়া এক জন আর এক জনের গায়ে জল ছিটাইয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহাদের হাস্য কলরবে স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠিল। আহা! কি মনোরম সে দৃশ্য! লেখনীর সাধ্য নাই সে দৃশ্য বর্ণনা করে। তাহার উপর কি সুন্দর তাহাদের বেশভুষা! সেই মথুরায় যমুনাবক্ষে বালক বালিকারা রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া রাসলীলার যে অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেছিল, ঠিক সেইরূপ। আমি এই বালক বালিকা দুইটীকেও ঐ শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী মনে করিলাম ; এবং ভাবিলাম, তাহা হইলে বৃন্দাবন আর অধিক দূরে নয়। প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল ; হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইল। তখন তাহাদের মধ্যে একজন আমায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চাই?'

আমি বলিলাম, 'জল ; আমার বড় পিপাসা, আমায় জল দাও।' বলিবামাত্র সে কুয়া হইতে জল তুলিয়া সযত্নে আমার হাতে ঢালিয়া দিতে লাগিল। আমি আমি জল পান করিতে লাগিলাম। আহা! কি মধুর! কি সুমিষ্ট জল! এই জলকে কি না ক্ষরা পানি বলিয়া হৃদয়হীন ব্রজবাসী আমায় পান করিতে

দিল না। ছাতিফাটা তৃষ্ণায় প্রায় দুটী ঘটী জল নিঃশেষে পান করিয়া বলিলাম, 'আর না।' এই 'আর না' শব্দ দিয়া আমার তৃপ্তির অপূর্ব আভাষ পাইয়া তাহারা একবার করুণ নয়নে এই দীনহীনের পানে চাহিল। মরি! মরি! কি সে চাহনি! সেই সুধামাখা দৃষ্টিতে কি অপার শান্তি, কি অপরিমিত তৃপ্তিই যে নিহিত ছিল তাহা কেমন করিয়া বলিব?

জীবনে সুন্দর কত কি দেখিয়াছি। শারদীয়া জ্যোৎস্নায় কুমুদিনীর কোমল হাসি দেখিয়াছি; তরুণ তপনের কোমল কিরণস্নাত কমলিনীর স্ফুটনোন্মুখ সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি; বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আরক্তিম সৌন্দর্য্যমহিমা দেখিয়াছি; আরও কত কি সুন্দর এ জীবনে দেখিয়াছি; কিন্তু এমন সুন্দর দৃষ্টিমাধুর্য্য ত আর কখনও দেখি নাই! আহা! চোখের চাহনিতে যে এমন ভাব, এমন করুণা, এত আকর্ষণ থাকিতে পারে, তাহা ত জানিতাম না। আমি আত্মহারা হইলাম। মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নাই; শুধু চাহিয়া আছি। হায়! আমার এ কি হইল! দুটী ভাল কথা বলিয়াও একবার তাহাদের আদর করিলাম না? যখন তাহারা দৃষ্টি ফিরাইয়া সত্যই স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, তখন শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'ভাই! তুমলোক কাঁহাকে রহনেওয়ালা হায়?'

উত্তরে শুনিলাম, 'হামলোক কি আস্তানা রঙ্গনাথজী কি মন্দির!'

আমি মনে করিলাম যেমন মথুরায় দেখিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় এখানেও তেমনই উহারা রঙ্গনাথজীর মন্দিরে লীলা অভিনয় করিতেছে। যাক্‌ আমিও রঙ্গনাথের মন্দিরে গিয়া পুনরায় উহাদের দেখিব এবং উহাদের মুখে লীলা-কীর্ত্তন শুনিয়া ধন্য হইব। কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া আরও কিছু বিশ্রামের পর আমি আবার পথ চলিতে লাগিলাম।

৬৫

আর আমার কোন অবসাদ নাই। পায়ে আবার জোর পাইয়াছি; প্রফুল্ল মনে দ্বিগুণ উৎসাহে বৃন্দাবন অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি। এমন সময় জনৈক ভক্ত বৈষ্ণবের সহিত আমার দেখা হইল। ভক্ত বৈষ্ণব আপন মনে গান করিতে করিতে আসিতেছিল। চন্দ্রালোকে উভয়ে সহজেই উভয়কে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিয়া লইলাম। আমি সম্মুখে পড়িবামাত্র তিনি গান থামাইয়া আমায় ভাল-রূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি গাহিতেছিলেন—

'জয় রাধে রাধে গোবিন্দ বল'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি গান বন্ধ করলেন যে?'

তিনি উত্তরে বলিলেন, 'যিনি গাওয়াচ্ছিলেন তিনিই বন্ধ করে দিলেন, আমি কি করব বাবা?'

আমি বলিলাম, 'সে কি। যিনি বলান, তিনি কি আবার বন্ধ করে দেন? একথা ত আমার বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় কি জানেন? তিনি যখন বলান জীব তখন জীবভাবে থাকে না; চৈতন্যে ডুবে যায়; সমাধির আগে আর সে বলা বন্ধ হয় না; আর মানুষ যখন নিজে বলে তখন সামান্য কারণে বন্ধ করতে বাধ্য হয়; ইষ্ট নাম ভুলে যায়।

আমার কথা শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণবঠাকুরের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল; আর তিনি 'রাধে! কৃপা কর'; বলিয়া আমায় দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। আমি তখন অস্থির না হইয়া গম্ভীরভাবে পুনরায় বলিতে লাগিলাম, 'দেখুন; যতদিন না কায়-মনোবাক্যে তাঁর উপর নির্ভরতা আসছে, তাঁকে প্রাণনাথ প্রভু বলে জেনে তাঁকে ভাল মন্দ সমস্ত অর্পণ করতে না পারা যাচ্ছে, 'আমি তোমারই' বলে যতক্ষণ না তাঁর ভাবে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি, অহংবুদ্ধি ভুলে গিয়ে যতক্ষণ না আমার জীবভাবকে তাঁর ভাবে ডুবিয়ে দিতে পারছি, ততক্ষণ তিনিই সব করাচ্ছেন এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করা ঠিক নয়। এতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের সম্ভাবনা বেশী; এতে এক ভীষণ অহং সৃষ্টি হয়ে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে দেবে; সমস্ত সাধনা নষ্ট করে সাধ্য বস্তু থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। সিদ্ধিলাভ তখন মুখের কথাই থাকবে; কখনও কার্য্যে পরিণত হবে না।'

বৈষ্ণবঠাকুর একদৃষ্টিতে আমার মুখেরপানে তাকাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন আর মধ্যে মধ্যে 'রাধে কৃপা কর।' 'রাধে কৃপা কর;' বলিয়া ক্রমশঃ আমায় দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভাবে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। বুঝিলাম ভাব ক্রমশঃ জমাট হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় পথ দেখাই মঙ্গল, ভাবিয়া আমি বলিলাম, 'প্রভু! বৃন্দাবন আর কতদূর?—আমায় ছেড়ে দিন; —আমায় সেখানে যেতে হবে।'

প্রভু আমায় পাইয়া বসিলেন; কিছুতেই আর ছাড়িতে চাহেন না; বলেন, 'বাবা! তোমায় যখন তিনি মিলিয়েছেন, তখন আর ছাড়ছি না। বল, বল বাবা! তোমার কথা আমার বড় ভাল লাগছে।'

আমি বলিলাম, 'ও কি বলছেন প্রভু! আবার আপনি বলছেন তিনিই মিলিয়েছেন? এ ত—পথে যেতে যেতে পথিকের সাথে ক্ষণিকের পরিচয়। প্রভু! উচ্ছ্বাস রাখবেন না; সাধকের প্রথম জীবন উচ্ছ্বাসময়। সে উচ্ছ্বাস চেপে চলতে না পারলে সাধকের বড়ই ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। এই উচ্ছ্বাস থেকেই জনতা, ঐশ্বর্য্য প্রশংসা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়ে থাকে; তাতে ক্রমেই সাধককে অহঙ্কারের গণ্ডির ভেতর টেনে নিয়ে যায়; আর সাধক সিদ্ধাই লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। ক্রমে সে সুবিধাও হয়ে যায়। তখন সাধক ইষ্ট ভুলে একেবারে সোহহং সেজে সর্ব্বনাশের পথে ধাবিত হয়; আর ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হয়।'

তখন বৈষ্ণবঠাকুর ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। আমিও তাঁহার বাহুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তন করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম,—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রভুও নাম করিতে করিতে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি তখন নাম বন্ধ করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ করিবার অভিপ্রায়ে বার বার তাঁহাকে 'বৃন্দাবন আর কতদূর?' জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তিনিও প্রকৃতিস্থ হইয়া,—'বৃন্দাবন আর বেশী দূর নয়;—আপনার সঙ্গে গোবিন্দজীর মন্দিরে আবার দেখা হবে;—আমায় কৃপা করবেন।' ইত্যাদি বৈষ্ণবসুলভ বিনম্রবচনে আমায় মুগ্ধ করিয়া আমার পাদস্পর্শ করিতে চাহিলে আমি সাধ্যমত বাধা প্রদানপূর্ব্বক সেই রাত্রির মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

উভয়ে নিজ নিজ পথে চলিলাম। প্রভু কিছু দূর গিয়া আবার গান ধরিলেন—

'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন—মোহনমুরলীধারী।' ইত্যাদি।

গানের সুর ক্রমেই অস্পষ্ট হইতে লাগিল। অস্পষ্ট হইতে হইতে আকাশের গুণ ক্রমে আকাশেই মিলাইয়া গেল। আর যখন কিছুই শুনিতে পাইলাম না তখন আমার সেই উৎকর্ণ ভাব সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বৃন্দাবন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বৃন্দাবন নিকট হইতেছে জানিয়া প্রাণে আনন্দ হইতে লাগিল। আনন্দের আতিশয্যে মধ্যে মধ্যে আমার গতিরোধ হইয়া যায়; আবার বিচারদ্বারা উচ্ছ্বাস চাপিয়া পথ চলিতে থাকি।

এইরূপে আশা ও আনন্দের পূর্ণ আবেগে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন ঝুলনের মেলা বসিয়াছে। চারিদিক হইতে খোল করতালের, মধুর ঝঙ্কার আসিয়া আমায় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। গতি পুনরায় সংযত হইয়া আসিল। দৃষ্টি লক্ষ্যহীন হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমি তখন আত্মহারা নবীন বৈরাগী। একদল বৈষ্ণব খোল করতাল বাজাইয়া আমার সম্মুখ দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যমুনা অভিমুখে যাইতেছিলেন। তাঁহারা গাহিতেছিলেন,—

'কে নিবি কিশোরীপ্রেম—নিতাই ডাকে আয়।
নিতাই ডাকে আয়রে তোরা—গৌর ডাকে আয়।' ইত্যাদি।

বৈষ্ণবের দল চলিয়া গেলেন; কিন্তু আমার আর চলিবার শক্তি নাই। হাত পা একেবারে অচল; আমি যেন কেমন এক ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।

ক্ষণেক পরে ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখি আমি ধূলিধূসরিত অঙ্গে পড়িয়া আছি; হাতের কমণ্ডলু ও সাধের আসন দূরে বিক্ষিপ্ত। আমার যেন কি হইয়াছে, যেন আমাতে আর আমি নাই।

ক্রমে সংযত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ধীরে ধীরে কমণ্ডলু ও আসন কুড়াইয়া লইয়া চাঁদের আলোয় দেখিলাম সম্মুখে এক সুবৃহৎ মন্দির; ভাবিলাম বুঝি এই রঙ্গনাথের মন্দির। অনুসন্ধানে উহা সত্যই রঙ্গনাথের মন্দির জানিয়া প্রফুল্ল মনে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই সুবর্ণ স্তম্ভোপরি বোধ হয় দীপশিখা শোভা পাইতেছিল। স্তম্ভনিম্নে ঝুলন উপলক্ষে লীলাকীর্ত্তন চলিতেছে। লোক সমাগম অধিক না হইলেও সেখানে কোলাহলের অভাব ছিল না। ধৈর্য্য সহকারে দুই একটী গান শুনিলাম। কিন্তু—কই? রাধাকৃষ্ণবেশে সেই বালক বালিকা দুটী ত এখানে নাই? এখানে যাহারা রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া অভিনয় করিতেছে তাহারা বয়সে বড় আর দেখিতেও তেমন সুন্দর নয়। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরদর্শন অভিলাষে নাটমন্দিরে গিয়া উঠিলাম। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দীপালোকে রঙ্গনাথজীর মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই পবিত্র পুণ্য দর্শন বড়ই মনোরম বোধ হইল। আমার নয়নযুগল তৃপ্তিলাভ করিল বটে; কিন্তু সেই তৃষাহারী ব্রজবাসী বালক বালিকা দুটীকে না দেখিতে পাইয়া যেন কি এক অভাব মধ্যে মধ্যে আমার চিত্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি পুনরায় কীর্ত্তন স্থানে আসিয়া, সেদিন আর কেহ রাধাকৃষ্ণ সাজিয়াছে কি না বা সাজিবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলাম, 'না; আজ এই দলই এখানে কীর্ত্তন করছে; আর কেউ করেও নি; করবেও না।'

আমার সেই তৃষাহারী গোপালকে না দেখিতে পাইয়া মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল; এবং তাহারা কোথায় আছে খুঁজিয়া বাহির করিবার অভিপ্রায়ে আমি মন্দির হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিলাম। রাস্তায় এক বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে আর কোথায় লীলাকীর্ত্তন হচ্ছে?'

বৈষ্ণবঠাকুর উত্তর করিলেন, 'এখানে এখন প্রতি কুঞ্জে ও প্রত্যেক দেবালয়ে লীলা অভিনয় হচ্ছে। তবে এক কাজ করুন ঐ সামনের গলি দিয়ে যান; বড় রাস্তায় গিয়ে একটি মন্দির দেখতে পাবেন, সেটী লালাবাবার মন্দির। সেখানে লীলাকীর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে; সেখানে অভিনয় খুব ভালই হয়।'

আমি বৈষ্ণবঠাকুরকে নমস্কার করিয়া রুদ্ধশ্বাসে লালাবাবার মন্দির অভিমুখে ছুটিলাম। কিন্তু—কই? যাহাদের জন্য ছুটিলাম, লালাবাবার মন্দিরেও ত তাহাদের দেখিলাম না। যাহা হউক এই ভাবে আরও দু একটি স্থানে ঘুরিয়া আমি সেদিনকার মত তাহাদের সন্ধানে বিরত হইলাম।

৬৬

বহুক্ষণ ঘুরাঘুরি করিয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। দেখিলাম বড় বড় খাবারের দোকানে নানাবিধ উপাদেয় খাবার প্রস্তুত হইতেছে। বড় বড় কচুরী ভাজিতেছে; যেমন তেমন কচুরী নয়;—তখনকার দিনে চার পয়সায় একখানি কচুরী; এখন আন্দাজ করিয়া দেখুন সে কি জিনিষ। কচুরীর আকর্ষণে অজ্ঞাতসারে দোকানের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে মনে হইল, আগে যমুনায় গিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসি; তারপর যাহা হয় কিছু কিনিয়া জলযোগ করিব। এই ভাবিয়া আমি যমুনা অভিমুখে চলিলাম। যমুনায় যাইতে লালবাবার মন্দির হইতে বেশ খানিকটা যাইতে হয়। তারপর বেলাভূমি অতিক্রম করিতেও খানিকক্ষণ লাগে। আমি সেই বিস্তীর্ণ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এমন শ্রান্ত বোধ করিলাম যে পুনরায় ফিরিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে আর ইচ্ছা হইল না। কোনরূপে যমুনায় হাত মুখ ধুইয়া খানিকটা যমুনার জল পান করিয়া সেই নদীতরে বালুরাশির উপরেই শুইয়া পড়িবার জন্য আসন পাতিলাম।

আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ শ্রান্তি অপনোদন করিয়া লক্ষ্য করিলাম আমার উভয় পার্শ্বে বহু নাগা সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া আছে। কেহ ধ্যানে মগ্ন, কেহ বা স্তব স্তুতি করিতেছে; আবার কেহ বা ধুনির পার্শ্বে শুইয়া আছে। সাধুদিগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার মন এক অজানা রাজ্যে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। আমিও কিছুক্ষণের জন্য সকল ভুলিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ যেন কাহার সুললিত সঙ্গীতের মোহন সুরে আমায় জাগাইয়া দিল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম আমারই আসনের অনতিদূরে এক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী আসন করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালী। উভয়েই মুণ্ডিত মস্তক। শিখা, তিলক প্রভৃতি বৈষ্ণববেশের কোন অঙ্গ বাদ যায় নাই। বৈষ্ণবের বয়স ১৮।২০ বৎসরের অধিক নহে; বৈষ্ণবী মার বয়স আরও ৬।৭ বৎসর অধিক বলিয়া বোধ হইল। বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে এ জাতীয় বৈষ্ণবের বহু নিন্দাবাদ শুনিয়াছিলাম। তাই ইহাদিগকে দেখিয়া প্রথমে মনে নানারূপ প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল। এমন সময় যুবতী বৈষ্ণবী নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া গান ধরিল—

'কালা!' তুমি ছল করে অবলা মজাও;
বাঁশীর স্বরে ডেকে এনে এখন কেন যেতে কও?' ইত্যাদি।

গানটার ভাব অতি মনোহর হইলেও ইহাদের অভিনয় আমার যেন তেমন ভাল লাগিল না। কিন্তু সুরের কি মোহিনী শক্তি! গানের সুরে মোহিত হইয়া আমি একেবারে চিত্রার্পিতবৎ উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া

রহিলাম। ঝুলন পূর্ণিমার আর অধিক দিন নাই। শুক্লপক্ষের সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত যমুনাতট সাধুসন্ন্যাসী সমাগমে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; আর সেই সাধু-সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে বৈষ্ণববৈষ্ণবী ক্রমেই আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণব থামিলে বৈষ্ণবী গান ধরিল—

'কেন মরতে এলে কুলের নারী কালার প্রেমে পড়ে?
যেন আঁধার রাতে দীপেব আলোয় পতঙ্গ পুড়ে মরে।
প্রেমের জ্বালায় ঝালাপালা, আজও বলি পালা পালা,
পালিয়ে যারে কুলের বালা! পড়িস্ নি রে প্রেমের ফেরে।'

এইরূপে উভয়ে একটীর পর একটী করিয়া বিভোরভাবে গাহিয়া যাইতেছে। গভীর নিশায় নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে এই পুরুষপ্রকৃতির লীলা ক্রমে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া আমার নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছিল। গান বন্ধ হইলে উভয়ে আর এক লীলা আরম্ভ করিল। উভয়ের সেই বাকবিতণ্ডা; সেও এক মজার দৃশ্য। সেখানে সমাজ-শাসনের বিধি নিষেধ নাই। সভ্য শোভন বিচার বিবেচনার স্থান নাই; আছে শুধু পুরুষ প্রকৃতির ভাববিনিময়। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর মধুর ভাবের অভিনয়; আছে শুধু রস-সাধনের অকৃত্রিম নিদর্শন। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পরে বৈষ্ণবী মা বাবাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'ওরে মুখপোড়া! তোর সঙ্গে আমি কথায় পারব না। এখন যা দেখি আগে কিছু খাবার নিয়ে আয়।'

বৈষ্ণব বলিল, 'কত আনব লো মুখপুড়ি? তাই আগে বল্।'

'কত আবার আনবি? যেমন গিলতে পারবি তেমনই আনবি; যা শিগ্গির নিয়ে আয়।'

'তাই বল্না', বলিয়া বাবাজী তীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। আমিও চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাবাজী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। চাদরের ফাঁক দিয়া নিবিষ্টচিত্তে আমি তাহাদিগকে দেখিতেছিলাম; তখন যেন তাহাদিগকে দেখিতে আমার কেমন ভাল লাগিতেছিল। কেহ হয় ত মনে করিবেন, একে ব্রাহ্মণের ছেলে—তার ক্ষুধার জ্বালা; খাবার হাতে কাহাকেও দেখিলে ত ভাল লাগিবারই কথা। সে কথা সত্য বটে; কিন্তু শুধু তাই নয়। উহাদের ভাবের অভিনয়টাও আমার তখন ভালই লাগিতেছিল। যাহা হউক, খাবারের আয়োজন দেখিয়া বৈষ্ণবীমা বাবাজীকে বলিয়া উঠিল, 'ওরে ও হাভাতে! এত খাবার কি হবে রে? এত সব কেন এনেছিস?'

'সাধুদের খাওয়াতে হবে।' বলিয়া বাবাজী খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া প্রত্যেক নাগা সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া একবার মনে হইল,—'তাই ত! ওদের মত তৈলংগস্বামী সেজে বসে পড়ব নাকি?

তাহলে হয় ত বাবাজী আমাকেও সাধ্তে পারে।' আবার কি ভাবিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসীরা সকলেই বাবাজীকে উপেক্ষা করিল। তাহারা কেহই তখনও অভুক্ত নাই; এবং দ্বিতীয়বার খাইবার লোভও কেহ করিল না। বৈষ্ণবী মা বলিল, 'তোর হাতের খাবার কে খাবে রে হতভাগা? এত বড় হলি এখনও একটু বুদ্ধি হল না? দিন দিন ত খুব কথা শিখ্ছিস্, এ বিবেচনা তোর নেই?'

বাবাজী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করিয়া বলিল, 'ওলো! ও ঢেমনি! দেখ্ দেখি ঐ কে ওখানে শুয়ে আছে? বোধ হয় রাধানাথ আজ ওর জন্যেই এত খাবার আনিয়াছেন।'

যেমন কথা অমনই কাজ। তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবী মা আমার কাছে আসিয়া আমায় ডাকিয়া বলিল, 'কে বাবা শুয়ে আছ?—কিছু খাবে কি?'

আমি ত হাতে স্বর্গ পাইলাম। তথাপি যেন কিছুই জানি না এই ভাবে ধীরে ধীরে মস্তক অনাবৃত করিয়া চমকিতভাবে উঠিয়া বসিলাম এবং 'কে আপনি?—কি বল্ছেন?' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলাম। আমার মুখে বাংলা কথা শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে বাবাজীর উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবী মা বলিয়া উঠিল, 'ওরে ও মিন্সে! আয় আয় দেখে যা; কেমন নবীন সন্ন্যাসীর দর্শন পেয়েছি।'

বাবাজী তাড়াতাড়ি খাবারের ঠোঙ্গা হাতে করিয়া আমার কাছে আসিল এবং কিছুক্ষণ আমার পানে তাকাইয়া বৈষ্ণবী মাকে বলিল, 'তবে আর কি! এই নে তোর ছেলেকে খেতে দে।'

বাবাজীর হাত হইতে খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া বৈষ্ণবী মা, 'বাবা! কিছু খাবে ত?' বলিয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। মায়ের সেই স্নেহকোমল পবিত্র দৃষ্টি ক্রমে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে মুক্তার মত দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া খাবারের ঠোঙ্গায় পড়িতেই মা আমার হাসিমুখে জিভ কাটিলেন; আর আমার মনে হইল, যেন আমি মা আদ্যাশক্তির হাস্যময়ী জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতেছি। সে যাহা হউক, আমি আর বিলম্ব না করিয়া অকপটে বলিয়া ফেলিলাম, 'দাও মা! খেতে দাও; আমি সত্যই ক্ষুধার্ত্ত।'

মা আমায় খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রথমেই তরকারী সহযোগে সেই বড় বড় কচুরী খাওয়াইলেন; তারপর মিঠাই। আবার আমি খাইতে খাইতে বাবাজী ছুটিয়া গিয়া রাবড়ি লইয়া আসিলেন; এবং আমার পাত্রে প্রায় এক পোয়া আন্দাজ রাবড়ি ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'সাধু! সব খেতে হবে; কিছু ফেল্তে পারবে না।' আমিও ওজর আপত্তি না করিয়া সমস্ত খাবারগুলি নিঃশেষ করিয়া যমুনায় মুখ ধুইতে গেলাম। ইত্যবসরে তাঁহারা কিছু দূরে তাঁহাদের আসন

করিয়াছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তাঁহারা সেখানে রঙ্গরসে পানভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মনে হইল, আমি বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয় তাঁহারা লজ্জায় দূরে সরিয়া গেলেন। আমিও তৃপ্ত হৃদয়ে 'জয় গরু' বলিয়া শুইয়া পড়িলাম।'

অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। তেমন সুনিদ্রা বোধ হয় জীবনে আর হয় নাই। এমন সময়, এ আবার কোন ভাবের অভিব্যক্তি! আমি যেন দেখিতেছি—সেই কুয়ার ধারে যাঁহারা আমায় জলপান করাইয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন —তাঁহারাই আবার বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সাজিয়া আমায় আহার করাইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিবামাত্র আমি জাগ্রত হইলাম। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যেদিকে বসিয়াছিল সেইদিকে তাকাইলাম। কিন্তু কই? তাহারা কোথায় গেল! হায়! এ কি হইল! এ কি দেখিলাম! এ যে শূন্যময় দেখিতেছি। আসন শূন্য; স্থান শূন্য; আমার হৃদয় পর্যন্ত শূন্য করিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গেল? তখনও প্রায় একঘণ্টার উপর রাত্রি আছে। আমি ক্ষিপ্রহস্তে আসন উঠাইয়া সেই স্থানে গিয়া দেখি—সেখানে কেবলমাত্র একখানি পাতলা গৈরিক রঞ্জিত চাদর বিছান রহিয়াছে। আর কোথাও কোন চিহ্ন নাই। এমন কি সেই চাদরের উপর কেহ বসিয়াছে বা শুইয়াছে এমন কোন নিদর্শনও সেখানে পাইলাম না।

মনটা খারাপ হইয়া গেল। ব্যাপার কি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সংকল্প করিয়া আমি যমুনাতট পরিত্যাগ পূর্বক বৃন্দাবন বাজার হইতে একগাছি দড়ি সংগ্রহ করিরা সেই কুয়া অভিমুখে চলিলাম। যথাসময়ে কুয়ার ধারে উপস্থিত হইয়া আমার সেই শতছিদ্র কমন্ডলুতে দড়ি বাঁধিয়া জল তুলিলাম। জল তুলিয়া এক অঞ্জলি মুখে দিতেই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। একি সেই জল! এ যে লবণাক্ত পচা দুর্গন্ধ জল! কার সাধ্য এ জল গলাধঃকরণ করে? হায়! অভাগা অজ্ঞান জীব! বার বার দুই বারেও তোর চৈতন্য হইল না! হাতে পাইয়াও ধরিতে পারিলি না!

দুঃখে হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পাইতে লাগিল; ক্রমে আমি অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকভাঙ্গা আকুল ক্রন্দনের হাহাকারে সে স্থান যেন মরুশ্মশানে পরিণত হইল। চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে শুধু বলিতে লাগিলাম, 'প্রাণবল্লভ! যদি দেখাই দিলে, তবে এমন করে ফাঁকি দিলে কেন?' বহুক্ষণ এইরূপ কান্নাকাটির পর কখন যে আমি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছি কিছুই জানি না। অকস্মাৎ দেখি, আবার যেন তাঁহারা আসিয়াছেন। আবার প্রাণবল্লভ প্রাণসখা প্রাণের প্রাণ ভুবনমোহন রূপে আমার কাছে আসিয়াছেন। আহা! সে কি আনন্দময় মূর্তি! কি স্নিগ্ধ

মধুর ভাব। আমায় আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'অন্নদা! কেন কাঁদ্‌ছিস? আমাদের স্বরূপ যদি তুই বুঝ্‌তে পার্‌তিস্‌—তাহলে যে তোর শরীর থাক্‌তে না; তোর শরীর দিয়ে যে আমার অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে। তাই তোকে কিছু জান্‌তে দিই নি; তুই কোন দুঃখ করিস্‌ নি।'

আহা! সে কি অমৃতময়ীবাণী! সে কি আশা—কি আশ্বাসের বাণী! নিমিষের মধ্যে যেন আমার সমস্ত বেদনা দূর হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেই ভুবনমোহন রূপ আকাশের গায়ে মিলাইয়া গেল। আমি যেন যাদুমন্ত্রের গুণে আনন্দময় হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলাম। জাগিয়া দেখি আর আমার চিত্তে কোন ক্ষোভ নাই—চাঞ্চল্য নাই—দুঃখ বা অবসাদ নাই; আমি আবার সেই পুরাতন ভাব ফিরিয়া পাইয়াছি। সেই স্বপ্নাদেশের কথা আবার স্মরণ হইল। ঝুলন পূর্ণিমায় আমাকে লছমণঝোলায় উপস্থিত হইতে হইবে। এই সংকল্প আমায় আবার সতেজ করিয়া তুলিল। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সমস্ত ঘটনা যত্নে রাখিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অতঃপর আরও দুই রাত্রি বৃন্দাবনে পরম আনন্দে কাটাইয়া হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যমুনার কোল হইতে গঙ্গার কোলে গিয়া উঠিলাম।

৬৭

ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পার হইতে হরিদ্বারে গঙ্গার দৃশ্য আমার বড়ই মনোরম বোধ হইল। আমি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সারিয়া এক মাড়োয়াড়ী ভক্তের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম। পর্য্যাপ্ত আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরে কয়েকটী দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া আমি ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে ট্রেনে হৃষীকেশরোড ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে হৃষীকেশ আট মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ আট মাইল রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে আমি অগ্রসর হইলাম। কিছু দূর গিয়া পথের বামভাগে শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণজীর মন্দির। ঝরণানিঃসৃত জলপ্রবাহ পরিখার মত মন্দির ঘেরিয়া চলিয়াছে; সম্মুখে মন্দিরে৺সত্যনারাণয়জীর বিগ্রহ। বামভাগে অন্যান্য বিগ্রহও রহিয়াছে; স্থানটী বড়ই মনোরম ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইল। দর্শনান্তে সে স্থানে অধিক বিলম্ব না করিয়া আমি পুনরায় অগ্রসর হইলাম। কিছু দূরে গিয়া রাস্তার দক্ষিণে একটী শিবমন্দির দেখিতে পাইলাম। বিশ্রাম করিবার মানসে সেই শিবমন্দিরের চত্বরে গিয়া বসিবার অল্পক্ষণ পরে সন্নিহিত এক সন্ন্যাসীর আস্তানা হইতে জনৈক ব্রহ্মচারী আমায় জানাইল—সন্ন্যাসীঠাকুর আমায় ডাকিতেছেন।

একরূপ অনিচ্ছাসত্ত্বেই আমি সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিলাম। গিয়া দেখি

চার পাঁচটী চেলাপরিবেষ্ঠিত হইয়া সন্ন্যাসীঠাকুর গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন। দেখিয়াই আমার ভক্তি লোপ পাইল। নেশাখোর সাধক আমার চক্ষুশূল ; আমার ধারণা মাদকদ্রব্যের নেশাই উহাদের যাহা কিছু সাধন ভজন তন্ময়তার মূল ; কারণ বিষয়সঙ্গবর্জ্জিত এবং উদাসীন হইয়াও উহারা এতদূর নেশার বশ হইয়াছে যে চিত্তবিক্ষেপকারিণী শক্তিতে মোহিত হইয়াই তাহারা সাধনপথে পরিচালিত হয় ; আমি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উহাদের ধূমপান অভিনয় দেখিতেছি এমন সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পীওগে ?'

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'হাম নেহি পীতা।'

আমি গাঁজা খাই না শুনিয়া সাধু একটু উচ্চ গলায় বলিলেন, 'যাও, তুম কুছ্ কামকা নেহি হায়।—আচ্ছা, এহি লেও ;' বলিয়া একটি বিড়ি আমায় দিতে চাহিলে আমি ইঙ্গিতে জানাইলাম, আমি বিড়িও খাই না। তাহাতে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তামাকু পীওগে ?'

'ভাং ?—হামরা পাস ওভি হায়।'

'হাম কুছ নিসা নেহি পীতা।'

সাধু তখন গাঁজার কল্কেটী অপরের হাতে দিতে দিতে বিদ্রূপ ছলে বলিলেন, 'সমঝ্ গিয়া তুম্ বাঙ্গালী সাধু হায় ; দাল ভাত হোনেসে তুমহারা সবকুছ হো যায়েগা।' বলিয়া নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে চাটুকার দলেও হাসির রোল উঠিল। তারপর হাসিতে হাসিতে কাশি। কাশিতে কাশিতে বমির উপক্রম ; আর আমি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছি।

এইরূপে প্রায় দশ মিনিট পরে অবস্থা কিঞ্চিৎ সাম্যভাব ধারণ করিলে আমি বলিলাম, 'মহারাজ! হামকো সাধন ভজন পর কুছ্ উপদেশ বাতায় দে সক্‌তা ?'

সাধু উত্তর করিলেন, 'সাধন ভজন তুমসে কুছ্ নেহি হোগা যব্ তক ভাং, নেহি পীওগে, তব্ তক চিত্ত স্থির হি নেহি হো সক্‌তা।'

আমি তখন হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'শাস্ত্র মে লিখা হায়—যোগোহি চিত্তবৃত্তিণিরোধঃ—উস্‌মে যোগকা অর্থ কেয়া ভাংযোগ ?—বা গাঁজাযোগ ?'

ওঃ—যেই না এ কথা বলা সাধু ত একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! একে গঞ্জিকার গুণে সাধুর চক্ষু রক্তবর্ণ। তাহার উপর এই গঞ্জনায় সেই রক্তচক্ষুর অগ্নিস্রাবী দৃষ্টি যেন আমায় ভস্মীভূত করিবার জন্যই আমার উপর পতিত হইল। আমি কিন্তু স্থির আছি। কারণ মনে জানি সাধুর ক্ষমতা বড় জোর তাঁর চিমটার একটী আঘাত পর্য্যন্ত। অতএব দেখিই না, শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়। ব্যাপার কিন্তু কিঞ্চিৎ ঘনাইয়া উঠিল ; আমার কথায় সাধুর অনুচরদিগের মধ্যে মুখ চাওয়াচাহি ও ইঙ্গিত চলিতে লাগিল। তখন ভাবিলাম ঐ চেলাচামুণ্ডাগুলি যদি ক্ষেপিয়া ওঠে ; তাহা হইলেই ত দফা শেষ! একে ত গাঁজার নেশা, তাহার

উপর দলপতির অপমান ; বেটারা আমায় প্রহার দিয়াই না শেষ করে। সাধু গর্জিয়া উঠিলেন, 'এৎনা তুমহারা দিমাগ !—তুম বালযোগী হো ; নেহি ত আজ তুমকো দেখ লেতে।'

অনুচরগুলি ঐরূপ শাসনসূচক বুলি ছাড়িতে লাগিল। আমি হাত জোড় করিয়া সাধুকে বলিলাম, 'মহারাজ ! মুঝে মাফ কি জিয়ে ; ম্যয় মাফি মাংতা হুঁ ; লেকিন সাধুকো এয়সা ক্রোধ নেহি হোনা চাহিয়ে।' সঙ্গে সঙ্গে চাটুকার দলকে একটু ধমক দিয়ে বলিলাম, 'তুমলোগ কেঁও এৎনা চিল্লাতে হো ? চুপ রহো ; যো সাধু হোগা উস্‌কা ক্রোধ নেহি রহ না চাহিয়ে ; জানতা ?—

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥'

কি আশ্চর্য্য ! সংস্কৃত শ্লোকটী মন্ত্রের মত কার্য্য করিল। আমার ধমক খাইয়াও সকলে শান্তভাব ধারণ করিল এবং কেহ কেহ যেন কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'নেহি, নেহি বাবাজি ! আপ্ বইঠিয়ে ; আপ্ কা বাথ, পর হামলোক নারাজ নেহি হায়।'

আমি বলিলাম, 'হামারা বৈঠনেকো সময় নেহি ; হাম্‌কো বহুত দূর যানে হোগা।'

সন্ন্যাসীঠাকুর তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে নিজের কাছে বসাইলেন এবং আমার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, 'বালযোগী ! তুম যোগ পর কুছ কহো ; হামলোক শুনেঙ্গে।'

আমি তখন মহা সমস্যায় পড়িলাম। কি করা যায় ? ভাল হিন্দিও জানি না যে দু এক কথা যাহা জানি বুঝাইয়া বলি। তাহা ছাড়া যোগ সম্বন্ধে ত আমার জ্ঞান স্বপ্নযোগ পর্য্যন্ত। যাহা হউক, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সকলের একান্ত অনুরোধে বলিলাম, 'দেখিয়ে ! পহিলে ত যোগ তিন প্রকার ;—কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞানযোগ ঔর ভক্তিযোগ। লেকিন উয়ো তিনহি এক হায়, ঔর একহি তিন হায় ; এয়সা হি সমঝনা চাহিয়ে। কেঁও কি প্রত্যেক যোগী এক সন্ন্যাস পর খাড়া হয় ; সন্ন্যাস কা মতলব বাসনাত্যাগ, ইয়ে কর্ম্মফলত্যাগ ; কর্ম্মযোগী হো, ইয়ে জ্ঞানযোগী হো, ইয়ে ভক্তিযোগী হো, যব্‌তক উস্‌কো বিষয় বাসনা মন্‌সে দূর ন হোতা, তব্‌তক উও যোগী হি নেহি বন্ সক্‌তা। জিস্‌কে মনমে কর্ম্মফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস আ গিয়া—ওহি কোই রোজ সাচ্চা যোগী বন্ সক্‌তা।'

এইরূপ ভাবের দুএকটী কথা বলিতেই সন্ন্যাসীঠাকুর আমাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে এবং 'জীতা রহো বাচ্চা ? তুম্‌হারা জ্ঞান বহুত ঠিক হায়' ইত্যাদি স্নেহসূচক বাক্যে আমায় আপ্যায়িত করিলেন। আমিও সন্ধ্যার

পূর্ব্বে হৃষীকেশ পৌঁছিতে হইবে বলিয়া সন্ন্যাসীঠাকুরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিদায় লইয়া দ্রুত পথ চলিতে লাগিলাম।

৬৮

শুভকার্য্যে শতেক বাধা। কিছু দূর যাইতে না যাইতে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি একখানি টম্‌টম্‌ আসিতেছে। গাড়ী যাইতে দিবার জন্য আমি পথ ছাড়িয়া এক ধারে দাঁড়াইলাম। কিন্তু টম্‌টম্‌ আমার কাছে আসিতেই আরোহীদিগের মধ্যে একজন বলিল, 'রোখো।'

গাড়ী থামিল। দেখিলাম টম্‌টমে তিনজন আরোহী ; দুইজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। রমণী বিলাসিনী যুবতী এবং পুরুষ দুটীও মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত যুবক। যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন টম্‌টম্‌ হইতে নামিয়া আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'আপ্‌ বাঙালী হায় ?'

আমি উত্তর করিলাম, 'হাঁ, আমি বাঙ্গালী।'

যুবক তখন বাংলাতেই জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোথায় যাবেন ?'

'হৃষীকেশ।'

'আপনি কি ব্রহ্মচারী ?'

'হাঁ, কিন্তু বিবাহিত।'

কি একটু চিন্তা করিয়া যুবক পুনরায় বলিল, 'বেশ, বেশ, আপনি কি সংসার ত্যাগ করেছেন ?—না তীর্থ পর্য্যটনে বেরিয়েছেন ?'

'দুটোর কোনটাই আমি নই।'

এ কথা শুনিয়া যুবক হাসিয়া বলিল ; 'ও—বুঝেছি ; সম্প্রতি বৈরাগ্য আশ্রয় করেছেন ; কেমন ?'

'তাই বা কি করে বলি ?'

আচ্ছা ; আপনি যাই হন আমি জানতে চাই না। আমরাও হৃষীকেশ যাব ; আসুন—গাড়ীতে উঠুন।'

'গাড়ীতে জায়গা কোথায় ?'

খুব হবে, 'আসুন আসুন ;' বলিয়া যুবক আমাকে তাহার স্থানে বসাইয়া নিজে চালকের পাশে গিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল ; প্রায় আধ মাইল পথ যাইতে না যাইতে যুবক বলিল, 'গাড়ী ঘুমাও।'

গাড়ী ফিরিল। আমি বলিলাম, 'গাড়ী ফেরালেন যে ; তবে আমি নেমে পড়ি ?'

'না, না ; নামবেন না—চলুন ; আমরা আবার আপনাকে পেঁশছে দিয়ে আসব। এখন আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই চলুন।'

'সে কি মশাই! আমাকে যে সন্ধ্যার আগে হৃষীকেশ পৌঁছুতে হবে; কারণ ঝুলন পূর্ণিমার দিন আমায় স্বর্গাশ্রমে থাকতেই হবে।'

'তা হবে; তার জন্যে ভাবনা কি? এখনও ঝুলন পূর্ণিমার দুদিন বাকী আছে। আর হৃষীকেশ থেকে স্বর্গাশ্রম ত এক ঘণ্টার পথ; অত ভাবছেন কেন?' বলিয়া যুবক টমটমওয়ালাকে চালাইতে আদেশ করিলে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমায় লইয়া গাড়ী চলিল।

গাড়ী ফিরিল দেখিয়া যুবতী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। অপর যুবকটিও সে হাসিতে যোগ দিল এবং আমার আলাপী যুবকটি তাহাদের সহিত হাসিতে হাসিতে পাঞ্জাবী ভাষায় কি সব বলাবলি করিল আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যুবতীর হাসির ধুম দেখিয়া আমি নীরবে একটী বার ভালরূপে তাহার মুখখানি দেখিয়া লইলাম; এবং বেশ বুঝিতে পারিলাম, সে বাজারের বেশ্যা না হইলেও, তাহার চরিত্রগত যথেষ্ট দোষ আছে। একে স্ত্রী চরিত্র, তায় ভিন্নদেশীয়া এবং সম্পূর্ণ অপরিচিতা; আমি মহা ধাঁধায় পড়িলাম। তাই ত! ইহারা আমায় কোথায় লইয়া চলিল? গাড়ী বেগে ছুটিয়াছে; লাফ দিয়া যে নামিয়া পড়িব তাহারও উপায় নাই। অগত্যা ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে গাড়ী ধরিয়া স্থিরভাবে বসিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু কাহার সাধ্য স্থির থাকে? পার্শ্বে যুবতী; তাহার উপর তাহার হাস্য পরিহাস; তাহাও যদি বা সহ্য হয়, তাহার চঞ্চল হস্তের অত্যাচার অসহ্য। সে অত্যাচার মধ্যে মধ্যে আমাকে চঞ্চল করিতে লাগিল; আমি ভাবিলাম ইহাও ঠাকুরের পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দেখিতে দেখিতে অন্যের অলক্ষ্যে যুবতীর চঞ্চল হস্ত আমার বাম হস্তের উপর আসিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে আমার অঙ্গুলি পীড়ন করিতে লাগিল। আমি কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে হাতখানি টানিয়া লইতেছি আর মনে মনে মাতৃনাম জপ করিতেছি। ওঃ—সে কী ভীষণ অবস্থা! আমি যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিবেক বুদ্ধি হারাইয়া অস্থির চিত্তে অবস্থান করিতেছি, এমন সময় বেগবান গাড়ীর ধাক্কা সামলাইতে না পারার ছলে যুবতী আমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল; আবার সঙ্গে সঙ্গে জিভ কাটিয়া সোজা হইয়া বসিতে চেষ্টা করিল। অপর পার্শ্বস্থ যুবকও হাস্য পরিহাস করিতে করিতে পুনরায় ঠিক হইয়া বসিতে সাহায্য করিল। এইরূপ অবস্থায় চলিয়াছি। যিনি এ অবস্থায় পড়িয়াছেন কেবল তিনিই বুঝিবেন তখন আমার অন্তরে কি ভীষণ সংগ্রাম! শুধু যে রিপুর অত্যাচার তাহা নহে, আমি তখন দুই জন যুবক ও এক চরিত্রহীনা যুবতীর হস্তে কৌশলে বন্দী। যুবকদ্বয়ের চরিত্রহীনতার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে পর্য্যন্ত না পাইলেও তাহাদিগের ভাবে তাহাদিগকে ভাল বলিয়া বোধ হইতেছিল না। এদিকে গাড়ী ক্রমে শিবমন্দির, সত্যনারায়ণের মন্দির, এমন

কি হৃষীকেশ রোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া যখন তীরবেগে চলিতে থাকিল তখন সত্যই আমার ভয় হইল। যত বারই গাড়ী থামাইতে বলি, সেই যুবক হাত জোড় করিয়া বলিতে থাকে, 'আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে—কিছু ভাব্‌বেন না।'

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় গাড়ীখানি হরিদ্বারের পথে এক বাগানের ফটকের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। নিঃশব্দে সকলে নামিয়া পড়িলাম এবং ফটকের দ্বার খুলিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাগানের অপর দিকে বাসোপযোগী গৃহাদি ছিল কি না জানি না; কিন্তু আমাকে লইয়া যেদিকে তাহারা চলিল, সেদিক বেশ ফাঁকা; বড় বড় বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সেই বৃহৎ বাগানের নিস্তব্ধ নির্জ্জন অতি মনোরম এবং শান্তিজনক এক স্থানে আমায় লইয়া গিয়া আলাপী যুবকটী বলিল, আপনি বাঙ্গালী সাধু; নিশ্চয়ই জ্যোতিষ জানেন। আপনাকে এই যুবতীর হাত দেখে ভাল মন্দ সব বলে দিতে হবে। আমরা আজ এই উদ্দেশ্যেই হৃষীকেশ যাত্রা করেছিলুম; কারণ শুনেছি সেখানে দু একটী বাঙ্গালী সাধু আছেন;—তাঁরা হাত দেখ্‌তে পারেন। এখন আপনাকে পেয়ে আর আমাদের যেতে হল না। অনুগ্রহ করে এর হাত দেখে যা যা সত্য মনে হয় অকপটে বলুন।' এই বলিয়া যুবক একটী আলো জ্বালাইয়া যুবতীর হস্তের নিকট ধরিল।

আমি কায়মনোবাক্যে ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া যুবতীর হস্তের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। দীপের আলোয় হস্তরেখা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না; তাই যেন অতি নিবিষ্ট মনে হাত দেখিতেছি এই ভাব দেখাইয়া মনে মনে শুধু ৺মাকে ডাকিতেছি আর বলিতেছি,—'মা! এখন ক্ষমতা দাও যেন একটী কথাও ঠিক বলে দিতে পারি। এইরূপ প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেলে ৺মা যেন আমায় বলাইলেন, 'দেখ—এই স্ত্রীলোকটীকে তোমরা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ, সেখানকার কয়েকটী লোক তোমাদের খুবই বিরুদ্ধে দাঁড়াবে; আর এর একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ ব্যক্তি একে তোমাদের হাত থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য যত্ন কর্‌বে। কেমন? এ সব কথা ঠিক মিল্‌ছে ত?'

যুবক কিছুক্ষণ অবাক হইয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'আপনি কি অন্তর্য্যামী?'

আমি বলিলাম 'কেন?'

'তা নয় ত কি?—আপনি যে সব কথা বল্‌লেন, সে সব কি হাতের রেখা দেখে বলা যায়?'

'কথাগুলি মিলেছে কি?'

হাঁ; অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। এই স্ত্রীলোকটী বিধবা হওয়ার পর এর স্বামীর দুএকজন বন্ধু একে কুলত্যাগ করাতে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু এর

দেবরের সাবধানতায় তারা কৃতকার্য্য হতে পারে নি ; তারাই এখনো আমাদের বিরুদ্ধে লাগ্‌বার সম্ভাবনা। তা ছাড়া এর দেবরও যে একে আমাদের হাত থেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা কর্‌বে না, তাও নয় ; অবশ্যই সে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌বে।'

আমি মনে মনে ৺মাকে প্রণিপাত জানাইয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা কি এই স্ত্রীলোকটীকে এর বাপের বাড়ী থেকে এনেছেন ?'

'হাঁ ; ঐই যে বাবুটী দেখ্‌ছেন, ইঁনি আমারও বন্ধু, এর দেবরেরও বন্ধু। এর শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার কথা বার্ত্তা যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন ইঁনি যেন একে আন্‌তে যান ; এখন বুঝতে পার্‌ছেন ত, কি কৌশলে একে নিয়ে আসা হয়েছে ?'

'একে কুলত্যাগিনী করাই কি আপনার উদ্দেশ্য ? না অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে ?'

'আছে। এই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে এক সময় অমারই বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল ; আর এও আমায় যথেষ্ট ভালবাস্‌তে। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে সে বিয়ে ভেঙ্গে যায় ; আমি সেই থেকে অবিবাহিত আছি। এখন আমার উদ্দেশ্য আমি আর্য্যধর্ম্ম অবলম্বন করে এই বিধবাকে বিবাহ কর্‌ব। আপনি শুধু দেখুন এর হাতে আবার বিবাহ আছে কি না।'

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'অর্থাৎ উপপতির রেখা আছে কি না ; কেমন ?'

'হাঁ তাই দেখুন,' বলিয়া যুবক পুনরায় যুবতীর হাতের নিকট আলো ধরিল।

আমি তখন সবজান্তা। নির্ভীক হৃদয়ে বলিলাম, 'আছে ; বেশ স্পষ্টই আছে।' মনে মনে ভাবিলাম, উপপতি কি শুধু একজন ? দুই চার পাঁচ জনও হইতে পারে। স্ত্রীলোকটীর স্বভাব ও হস্তরেখায় যতদূর প্রমাণ পাইলাম, তাহাতে সে যে দুশ্চরিত্রা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। আমি যুবকটীকে বলিলাম, 'তবে এখন চলুন ; যাওয়া যাক।'

যুবক তখন অপর দুজনকে পাঞ্জাবী ভাষায় সমস্ত কথা জানাইলে তাহারা আমার গুণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইল। কিন্তু স্ত্রীলোকটীর মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তিত হইল ; যেন সে কোন অজানা ভবিষ্যতের ভাবনায় ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার ভাব কিঞ্চিৎ বুঝিয়া আমি বলিলাম, 'মায়ি ! কেয়া সোচ্‌তা ? ডরো মৎ ; হাম বাবুকো সাদি কর্‌নেকো বোল দিয়া।' আর মনে হইতে লাগিল—

'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্।
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।'

স্ত্রীলোকটী আমার কথা শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'আপ্‌কো ম্যয় আজ নেহি ছোড়েঙ্গে।' বলিয়া সঙ্গীদিগকে গ্রাম্য ভাষায় কত কি বলিল। তখন রাত্রি প্রায় দুই তিন দণ্ড হইয়াছে। আমি বলিলাম 'আমাকে আজ হৃষীকেশ যেতেই হবে।

'আচ্ছা, চলিয়ে' বলিয়া বাবুটী আমার হাত ধরিয়া বাগানের ফটক অভিমুখে চলিল। সংগে সংগে শুনিতে পাওয়া গেল টম্‌টম্‌ওয়ালা হাঁকিতেছে,—'বাবু! জল্‌দি আইয়ে।'

'হাঁ হাঁ—আতে হেঁ ;' বলিয়া বাবু ত্বরিৎপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। অপর দুই ব্যক্তিও পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। সম্মুখে না জানি আরও কি বিপদ আছে এই আশংকায় আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি মনে মনে শুধু মাতৃনাম জপ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে সকলে পূর্ব্ববৎ গাড়ীতে গিয়া বসিলে পুনরায় গাড়ী ছুটিল। বাবুটী চালকের কানে কানে কি বলিয়া দিলেন; চালক 'আচ্ছা—বাবু!' বলিয়া দ্রুত গাড়ী ছুটাইল। গাড়ী হৃষীকেশ অভিমুখে না গিয়া অন্য দিকে চলিয়াছে দেখিয়া আমি বলিলাম, 'একি! গাড়ী কি হৃষীকেশ যাবে না?'

বাবু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, 'না; কাল আপনাকে পেঁছে দিয়ে আস্‌ব; এখন অতদূর যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

গাড়ী যে কোন দিকে চলিয়াছে আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিবার পর গাড়ী একটী সরু রাস্তার মাথায় গিয়া দাঁড়াইল। সকলে গাড়ী হইতে নামিল। আমি অন্যমনস্কভাবে ভাবিতেছি—তাই ত! আজ আমি কোথায় চলিয়াছি! এমন সময় যুবক আমার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া বলিল, 'দেখুন! যতদিন না আমাদের আর্য্যধর্ম্ম মতে বিবাহ হচ্ছে ততদিন স্ত্রীলোকটীকে আমাদের লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে। আপনার কোন ভয় নেই; আসুন—বেশ পবিত্র স্থানেই আপনার থাক্‌নার বন্দোবস্ত করে দেব।' বলিয়া টম্‌টম্‌ চালককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'আধা ঘণ্টা সে জিয়াদা দের নেহি হোগা;' তারপর আমার হাত ধরিয়া সে লইয়া চলিল।

৬৯

আমি মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গবৎ যুবকের হস্তে বন্দী হইলাম; এবং মনে করিলাম বোধহয় ইহাদের কাছে টাকা পয়সা নাই; বাড়ী হইতে আনিয়া দিবে; তাই এইরূপ বলিতেছে। যাহা হউক, প্রায় পাঁচ সাত মিনিট পথ চলিয়া আমরা একটী কুটীরের সম্মুখীন হইলাম। কুটীরের সম্মুখে জনৈক দ্বারবান লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বাবুকে দেখিবামাত্র সসম্মানে অভিবাদন জানাইল।

'বাইরের ঘরে এই সাধু বাবার থাকবার বন্দোবস্ত করে দাও।' বলিয়া বাবু আমাদের লইয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জনশূন্য কারাগৃহের মত কুটীরখানি আমার ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। কুটীরখানির তিনটী মাত্র প্রকোষ্ঠ। ভাবিলাম, এখানে আবার ভিতর বাহির কোথায়? যাহা হউক, স্ত্রীলোকটীকে লইয়া যুবকদ্বয় পশ্চিমের ঘরে প্রবেশ করিলে দ্বারবান আমাকে পূর্ব্ব দিকের প্রকোষ্টে লইয়া চলিল। সেখানে আমায় বসাইয়া ঘরে বাতি জ্বালিয়া দিয়া সে আমায় প্রণাম করিল। চিন্তায় তখন আমার অন্তর আলোড়িত হইতেছিল। আমি হতাশ হৃদয়ে বসিয়া পড়িলাম।

এইরূপ অবস্থায় বসিয়া আমার ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া দ্বারবান নীরবে সে স্থান ত্যাগ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম যুবকদ্বয় দ্বারবানের কানে কানে কি বলিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমি মনে করিলাম উহারা আবার ফিরিবে। কিন্তু তাহা নয়; উহারা যুবতীকে দ্বারবানের পাহারায় রাখিয়া তখনকার মত সরিয়া পড়িল। দ্বারবানও প্রাচীর সংলগ্ন বহির্দ্বার সশব্দে বন্ধ করিয়া তালা লাগাইল। আমার মনে হইল,—হায়! এই পাপের অভিনয়ে আমিও আজ প্রহরী নিযুক্ত হইলাম।

প্রায় দুই ঘণ্টার পর বাম হস্তে একটী দীপ ও দক্ষিণ হস্তে একখানি রেকাবীতে পুরী মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রচুর আহার্য্য লইয়া যুবতী আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, 'হাম কুছ নেহি খায়েঙ্গে।'

'নেহি জী, জরুর কুছ খানে হোগা।' বলিয়া যুবতী আমার সম্মুখে রেকাবী রাখিল এবং সত্বর একগ্লাস জল আনিয়া খাবারের কাছে রাখিল; পরে দ্বারবানকে ডাকিয়া বলিল, 'থোড়ি পানি লায়কে জল্‌দি গোড় ধো দেনা।'

অবিলম্বে দ্বারবান এক ঘটি জল আনিয়া হাত পা ধুইবার জন্য আমায় আহ্বান করিল। দেখিলাম যুবতী আমায় সহজে ছাড়িবে না। মনে হইল, উহার সহিত অধিক বাদানুবাদ না করিয়া মানে মানে কিছু খাইলে যদি অব্যাহতি লাভ করা যায়, সে বরং ভাল। কাজেই আর বেশী ওজর আপত্তি না করিয়া হস্তপদাদি ধুইয়া লইলাম এবং দুই তিন খানা পুরী ও কিছু মিষ্টান্ন উদরসাৎ করিয়া বলিলাম, 'ঔর নেহি খায়েংগে, মায়ি!' পুনরায় অনুরোধ হইল, খাইতেই হইবে; আমি আরও কিছু খাইয়া উঠিলাম। তখন স্ত্রীলোকটী দ্বারবানের নিকট আমার খুব প্রশংসা করিতেছিল। সে দ্বারবানকে অনেক কথা বলিয়া শেষে বলিল, 'তুমি ঘরুমে যাকে আরাম করো; সাধুজীকে সাথ হামারে কুছ বাথ হায়।'

আমার উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়া দ্বারবান চলিয়া গেল; যুবতী কিছু গুজরাটী এলাচী আমার হাতে দিয়া বলিল, 'আপ্ মেহেরবানি করকে হামারে ঘরমে জেরা পধারেংগে?

আমি বলিলাম, 'নেহি।'

'কে'ও? চলিয়ে না; ইস্‌মে হর্‌জ কেয়া?'

'নেহি।'

আমি পুনরায় যাইতে অস্বীকার করায় যুবতী এক অপূর্ব্ব দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল; আর আমি মাথা নত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম; কি করা যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল, 'সাধুজী? আপ্‌ কেয়া মেরেকো অবিশোয়াস কর্‌তে হেঁ? ম্যায় আপ্‌কো পাস বহুৎ কুছ কসুর কিয়া হুঁ; মুঝকো ক্ষমা কিজিয়ে। শ্রিফ্‌ ম্যায়নে আপ্‌কে পরীক্ষা কর্‌নেকে লিয়ে গাড়ীপর ঐসা দিক কিয়া হুঁ।'

যুবতীর কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত। আঁধার গগনে আলোর রেখা পড়িয়াছে; তাহার মুখ ক্রমশঃ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। আমি সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলাম। তাহার সম্বন্ধে আমার ধারণা, তাহার হাত দেখা,—সব ভুল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নিজেকে নিজে মহা অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া কর-জোড়ে বলিলাম, 'মাফ কিজিয়ে মায়ি! হামারা কসুর হুয়া।'

'নেহি নেহি সাধুজী! আপ্‌ কুছ কসুর নেহি কিয়া;' বলিয়া যুবতী দুহাতে আমার পা জড়াইয়া ধরিল এবং ছল ছল নয়নে অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'ম্যায় জনানা হুঁ; মেরে অজ্ঞানতা মাফ্‌ কিজিয়ে; আপ পরমাত্মা—মেরে ভগবান হ্যায়।'

আমি আর কোন সন্দেহ না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম এবং 'চলিয়ে মায়ি!' বলিয়া যুবতীর অনুসরণ করিলাম। মুক্তদ্বার কক্ষান্তরে উভয়ে প্রবেশ করিলে সে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। আমার কিন্তু মনে আর কোন অবিশ্বাস আসিল না। হৃষ্ট চিত্তে তাহার দেওয়া আসনে নীরবে উপবেশন করিলাম। তখন অতি ব্যস্ততা সহকারে বিছানা পাতিয়া লইয়া আমার কাছেই সে তাহার বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। আমি ইতস্ততঃ গৃহের চারিদিকে কোথায় কি আছে দেখিতেছিলাম এমন সময় সে অকস্মাৎ পদস্পর্শ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃদু হাস্য পরিহাসের সহিত 'সাধুজী! আপ্‌ কাহে সংসার ছোড় দিয়া?—কাহে সাদি উদি নেহি কিয়া?—আপ্‌ত পরমাত্মা অন্তর্য্যামী—আপ্‌কা ঐসা মতলব হুয়া?' ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং আরও দুচারটী এমন বেখাপ্পা কথা বলিয়া ফেলিল যে আমি আবার জুজুর ভয় দেখিতে লাগিলাম।

ভাবিলাম—কি রহস্যময় চরিত্র! কি ঐন্দ্রজালিক বৈচিত্র্য! একি ভগবানের ভেল্কি? ভাবিতে ভাবিতে ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়াছি দেখিয়া চতুরা রমণী আমাকে আর অধিক ভাবিতে না দিয়া গম্ভীর ভাবে 'আপ আভি যাইয়ে—বহুৎ

রাত হয়েছে;' বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দরজাও খুলিয়া দিল। অবশেষে আমি গমনোদ্যত হইলে চরণে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক নমস্কার করিবার ছলে আবার চরণ চুম্বন করিয়া আমায় পুনরায় চঞ্চল করিয়া তুলিতেও ছাড়িল না।

আমি আর কোন দিক না তাকাইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহিরের ঘরে আমার আসনে বসিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর! কেন তুমি আমায় এমন বিপদে ফেলছ? তোমার আদেশের বোঝা বইতে গিয়ে আজ আমি পথের ভিখারী হয়েছি। আমার যা কিছু অধ্যবসায়, যা কিছু বিদ্যা বুদ্ধি কৃতিত্ব, সব হারিয়েছি; আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত ভুলেছি। তার ওপর একি কঠোর পরীক্ষা ঠাকুর! এই কি তোমার সুবিচার? আমি ত সাধক নই; সাধ্য বস্তু পাবার জন্য লালায়িত নই; সিদ্ধি সিদ্ধাই কিছুই ত চাই না? তবে এমন নিৰ্ম্মম শাসন কেন করছ ঠাকুর! কেন আমায় কামিনীর প্রলোভনে ফেলে আমার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করছ? যদি তাই হয়, তাহলে এই কঠোর জীবনসংগ্রামে—কে তোমার উপর নির্ভর করে নির্ভয় হবে প্রভু!'

এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে অন্তর্নিহিত রুদ্ধ বেদনা দ্রবীভূত হইল; আমার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও প্রাণাধিক পত্নীর সেই বিদায় দৃশ্য আমার মানস নয়নে দেখিতে লাগিলাম। তাহাদের আদর যত্ন স্নেহ ভালবাসার কথা স্মৃতি পটে জাগিয়া উঠিল। তারপর মনে পড়িল আমার সেই কলিকাতার ঔষধালয়ের বিরাট আয়োজন, অর্থোপার্জ্জনে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, বন্ধু বান্ধবদিগের সহানুভূতি জীবনের সাংসারিক আরও কত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। এই সকল কথা মনে হওয়ায় আমি যেন কেমন একরকম হইয়া গেলাম। ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মযাতনায় আসনের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম কিছুই মনে নাই।

ঘুমঘোরে দেখি সেই যুবতী ছুটিয়া আসিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ঘন ঘন আমার মুখ চুম্বন করিতেছে এবং বলপূর্ব্বক আমাকে তাহার ঘরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি মহা খাপ্পা হইয়া তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতেছি; এবং তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া তাহার বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি; আর মনে মনে 'মা! রক্ষা কর; মা! রক্ষা কর' বলিয়া আদ্যামায়ের পায়ে মাথা ঠুকিতেছি; এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

বুকের বোঝা যেন নামিয়া গেল। 'যাক—বাঁচা গেল; এ সত্য নয়—স্বপ্ন। ওঃ কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন! বলিয়া লাফ দিয়া শয্যাত্যাগ করিলাম এবং অবিলম্বে আসন কমণ্ডলু লইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলাম; বহির্দ্বার অর্গলমুক্ত করিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছি অমনই পিছন হইতে একখানা হাত নিঃশব্দে আমার হাত

চাপিয়া ধরিল। আমি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলাম। সংগে সংগে স্বপ্নকথা মনে পড়ায় রোষকষায়িত লোচনে ফিরিয়া চাহিলাম। সে তীব্র চাহনিতে বোধ হয় তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কারণ তাহারও মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল; এবং আমি ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার মুক্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহিরে গিয়া, 'যাইয়ে মায়ি! ভিতর যাইয়ে; হামারা কসুর মাপ কি জিয়েগা;' বলিয়াই রুদ্ধশ্বাসে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। কিছুদূরে গিয়া ফিরিয়া দেখি, স্ত্রীলোকটী একইভাবে দাঁড়াইয়া আছে; আমি আর কিছুই না ভাবিয়া একেবারে বড় বাস্তায় আসিয়া পেঁাছিলাম। তখনও রাত্রি প্রভাত হইতে বিলম্ব ছিল।

৭০

সন্ধ্যার সময় হৃষীকেশ পেঁাছিলাম। কিছুই চিনি না; কোথায় গিয়া উঠি এক জনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, 'এখানে কালিকমলি বাবার ছত্তর আছে; সেখানে গেলে খেতে পাওয়া যায়।' আমি সত্রেই গেলাম। সত্রের লোকজন আমায় কিছু ডাল ভাত রুটি খাইতে দিল। খাইতে খাইতে আমি 'সন্ত আশ্রমের' কথা শুনিলাম এবং জানিতে পারিলাম সেখানে গেলে থাকিবার স্থান পাইব। কাজেই সত্রে আহারাদি শেষ করিয়া সে রাত্রি 'সন্ত আশ্রমেই' অতিবাহিত করিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসনে বসিয়া ভাবিতেছি স্বর্গাশ্রমে যাইতে কাহাকে সংগে পাই, এমন সময় জনৈক বাংগালী সন্ন্যাসী আশ্রমের দ্বারদেশে ডাকিয়া বলিতেছে, স্বর্গাশ্রমের যাত্রী কে আছ হে?—যাবে ত এস।' সন্ন্যাসীর আহ্বান শুনিয়া আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। ঠাকুরকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে উঠিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন-পূর্বক আমি তাঁহার সহিত স্বর্গাশ্রমে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সন্ন্যাসী আমার পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি কি এখনই স্বর্গাশ্রমে যেতে চাও?—না বিকেলে যাবে?'

আমি বলিলাম, 'আমি আপনার সংগেই যাব; আপনার যখন সুবিধে হবে আমায় সংগে নিয়ে যাবেন।'

'আমি আজই যাব; কিন্তু তুমি কি স্বর্গাশ্রমে কিছুদিন থাকবে?'

'থাকব; কাল ঝুলনপূর্ণিমাতে ওখানে থাকবার ত আমার একান্ত ইচ্ছা।

'থাকবে ত,—কিন্তু ভাল কুঠিয়া একখানাও এখন সেখানে খালি নেই। আচ্ছা দেখি, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর; কোন চিন্তা নেই; আমি তোমায় সংগে নিয়ে যাব; অন্য কুঠিয়া না পাওয়া যায়, তুমি আমার কুঠিয়াতেই থাকবে।'

বহুদিন পরে একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী বন্ধু পাইলাম মনে করিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। মনে হইল,—'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা! লোকে বলে করি আমি। সেদিন প্রাতে আর যাওয়া হইল না। বৈকালে সেই সন্ন্যাসীর সহিত লছমণঝোলা পার হইয়া আমি স্বর্গাশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

তখনকার মত সেই সন্ন্যাসীর কুঠিয়াতেই স্থান করিয়া লওয়া হইল। রাত্রিতে সন্ন্যাসীঠাকুর কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। আমি তাঁহার ধ্যানযোগ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি শুইয়া পড়িলাম; প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখি সন্ন্যাসীঠাকুর সেই একভাবেই বসিয়া আছেন। স্থির ধীর অচঞ্চল সেই শান্ত মূর্ত্তির পায়ে মাথা নত হইয়া আসিল। ভাবিলাম, ভগবানকে পাইতে এত কঠোরতা করিতে হয়? যিনি দয়াময়,প্রেমময়, দীনবন্ধু, অনাথনাথ,—শাস্ত্র যাঁকে করুণাসিন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে জীবের এত কঠোরতা, এত জটা ভার বহন। এত অনিদ্রা অনশন ভোগ করিতে হয়! কলির জীবের জন্য কি আর কোন সহজ সরল পথ নাই?—কেন থাকিবে না? মহাপ্রভু ত বলিয়া গিয়াছেন—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'

এই গতি কি সালোক্য সাযুজ্য সারূপ্য সার্ষ্টির মধ্যে একটা নয়? সঙ্গে সঙ্গে একটি শ্লোকের কথা মনে পড়িল; জনৈক বৈষ্ণব কোন সময়ে বক্তৃতাচ্ছালে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

'দুরাচাররতো বাপি মন্নামভজনাৎ কপে।
সালোক্যমুক্তিমাপ্নোতি ন তু লোকান্তরাদিকম্॥'

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন, 'হে কপিবর! দুরাচার রত হইয়াও জীব যদি আমার নাম ভজনা করে, তাহা হইলেও তাহার সালোক্য মুক্তি প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ আমার সমান লোকে সে বসতি করে; তার আর অন্য গতি হয় না। ইহা মুক্তিকোপনিষদের কথা; এরূপ অবস্থায় কলিহত দুর্ব্বল জীব কঠোরতা অবলম্বন করিয়া কোন্ দুঃখে জীবন্মৃতবৎ অবস্থান করে? শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও কি জন্য তাহারা স্বেচ্ছায় দুঃখকে আলিঙ্গন করে? এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় সন্ন্যাসীঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'ঠাকুর; তুমি এখনও ছেলেমানুষ; তোমায় এখনও ঢের দেখ্‌তে হবে; অনেক কাঁটাবন পরিষ্কার করে চল্‌তে হবে। দাঁড়াও,—আগে কিছুদিন যাক; তারপর বুঝবে মানুষ ত্যাগের পথে ছোটে কেন; সন্ন্যাস নিতে চায় কেন! আর সেই কঠোর সাধনাতেই বা কোন্ সুখে ব্রতী হয়? তখন বুঝবে 'ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্'—এ কথা ধ্রুব সত্য।

আমি অবাক হইয়া সন্ন্যাসীঠাকুরের মুখের পানে তাকাইয়া তাঁহার কথা

শুনিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সন্ন্যাসীঠাকুরকে খবর দিল, দেখুন! সে যোগীরাজ আর কুঠিয়ায় থাক্‌তে পারলেন না; কাল সন্ধ্যায় নাকি আবার সে কুঠিয়ায় সাপের উৎপাত হয়েছিল; তাই আজ বেলা না হতেই তিনি জিনিষপত্র নিয়ে চলে গেলেন। পাশের এক ব্রহ্মচারীকে বলে গেছেন,—'আমি জঙ্গলের ভেতরে চলে যাচ্ছি। সাবধান! যে সে লোককে এই কুঠিয়ায় থাক্‌তে দিও না; মারা যাবে।'

সন্ন্যাসীঠাকুর আমার দিকে চাহিলে আমি তাঁহার ভাব বুঝিয়া বলিলাম, 'আমার তাতে কোন ভয়ের কারণ নাই! যদি আমায় ও কুঠিয়ায় থাক্‌তে দেন, আমি এখনই গিয়ে দখল করি। যেহেতু একখানি আলাদা কুঠিয়া হলেই আমার বড় ভাল হয়।'

এই কথায় সন্ন্যাসীঠাকুর সংবাদদাতাকে বিদায় দিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া উক্ত কুঠিয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুঠিয়াখানি দেখিয়া আমার বড়ই মনোরম বোধ হইল। সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন,'এই কুঠিয়াখানি এখানকার মধ্যে খুব ভাল; এমন ছত্তর ও গঙ্গা দুয়েরই কাছে, অথচ নির্জ্জন; আবার এমন ফাঁকা কুঠিয়া,—নেহাৎ তোমার ভাগ্যেই খালি হয়েছে। ভগবান সে যোগীকে ভয় দেখিয়ে সরিয়েছেন; তুমি এখানে নির্ভয়ে বাস কর। আমি আশ্রম থেকে চাটাই পত্র সব তোমায় যোগাড় করে দিয়ে যাব।'

ক্রমে সন্ন্যাসীঠাকুরের সহায়তায় আমার আবশ্যকীয় যাহা কিছু সমস্ত আসিয়া জুটিল। পার্শ্বস্থ কুঠিয়ার ব্রহ্মচারী ভায়া আমাকে একটি দিয়াশলাই, মাটির প্রদীপ ও কিঞ্চিৎ তৈল দিয়া গেল; এবং সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য বার বার বলিয়া গেল; কারণ সর্পের অত্যাচারে ঐ কুঠিয়ায় কোন সাধুই থাকিতে পারে না। আমি অবনত মস্তকে তাহার কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

কুঠিয়াখানি আমি মনের মত করিয়া সাজাইতে লাগিলাম। উত্তর দিকের দেওয়ালে আমার সেই যুগলমূর্ত্তিখানি ঝুলাইয়া দিলাম। দক্ষিণের খোপে প্রদীপটি রাখিয়া যুগলমূর্ত্তির নীচে আমার আসন করিলাম। আসনের পূর্ব্বদিকে আমার কমণ্ডলু ও আর একটী জলপাত্র রহিল। যুগলমূর্ত্তিখানি আমি মথুরা হইতে খরিদ করিয়াছিলাম। মূর্ত্তিখানি আমার চোখে বড়ই সুন্দর লাগিত; এখনও সে মূর্ত্তি নিত্য পূজা পাইতেছে। সে যাহা হউক, সেই ঝুলন পূর্ণিমার দিন প্রাণবল্লভকে এক ছড়া বনফুলের মালা পরাইতে বড় সাধ হইল। অমনই ছুটিয়া গিয়া কিছু ফুল ও তুলসী মঞ্জরী লইয়া আসিলাম। পাহাড়ের গায়েবনে লাল নীল প্রভৃতি নানা রংয়ের একজাতীয় ছোট ছোট ফুল পাওয়া যায়; ফুলগুলি দিয়া মালা গাঁথিলে বড়ই সুন্দর দেখায়। সেই ফুল কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া লছমণঝোলার পুল পার হইয়া

যখন স্বর্গাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলাম তখন মনে হইল কিছু ফল পাইলে বড়ই সুবিধা হইত।

তখনকার দিনে হৃষীকেশ হইতে লছমণঝোলা আসিবার পথে 'ভরত আশ্রম' 'কৈলাস আশ্রম' ও 'রাম আশ্রম' ব্যতীত এখনকার মত এত ঔষধালয়, পোষ্টাপিস, দোকানপত্র প্রভৃতি কিছুই ছিল না। কোন কিছু খরিদ করিতে হইলেই হৃষীকেশ যাইতে হইত। আমি ভাবিলাম—এখন পুনরায় হৃষীকেশে ফলমূল খরিদ করিতে যাইলে আসিতে হয়ত সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। আবার রাত্রিতে না জানি কি আদেশ হয়। সেই জন্য যাহাতে সুনিদ্রা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন অধিক হাঁটাহাঁটি করিয়া যদি রাত্রিতে নিদ্রা না হয় তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতেছি এমন সময় পিছনে চিমটের শব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দেখিলাম জনৈক সাধু একটী ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছেন এবং চিমটের শব্দ করিয়া দাঁড়াইবার জন্য আমায় ইঙ্গিত করিতেছেন। আমি গতি সংযত করিলাম। সাধু আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বালযোগী! কুছ খাওগে?'

আমি তখনও জলস্পর্শ করি নাই এবং সেদিন করিবও না ইচ্ছা ছিল। তাই বলিলাম, 'বাবাজী! হাম আজ কুছ নেহি খায়েঙ্গে!'

'কাহে নেহি খাওগে? জরুর তোমকো কুছ খানে হোগা;—লেও খা লেও।' বলিয়া সাধু চারিটী সুপক্ক পেয়ারা আমার হাতে দিলেন। সুপক্ক ফল পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভাবিলাম, আমার সংকল্প পূর্ণ হইবে; কিন্তু সাধু কিছুতেই ছাড়েন না। অগত্যা তাঁহার একান্ত অনুরোধে একটী ফল সেখানেই উদরসাৎ করিলাম। সাধু সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। আমিও পরমানন্দে 'জয়! রাধানাথজী কি জয়!' বলিতে বলিতে আপন কুঠিয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

৭১

বেলা তখন প্রায় শেষ হইয়াছে। কুঠিয়ার দ্বার খুলিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। অন্তর্যামী ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রাণবল্লভের মূর্ত্তিখানি বুকে করিয়া বার বার পদচুম্বন করিলাম এবং বলিতে লাগিলাম,—'হে কৃষ্ণ! করুণাময়! অধমকে তুমি এ কি দেখাচ্ছ প্রভু! এত দয়া!—এত করুণা তোমার! যখন যা ইচ্ছা হচ্ছে তখনই তুমি আমার তাই পূরণ করে দিচ্ছ?—কেন? কেন ভক্তবৎসল?—আমার কি সব শেষ হয়ে এসেছে? এবার কি তুমি আমায় অষ্টপাশ মুক্ত করে কোলে স্থান দেবে?—নেবে কি? এই দীনহীন অভাগাকে আপনার করে চরণে টেনে নেবে কি? নাও—

নাও প্রাণাধিক! আর এই ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হতে পারি না। বড় জ্বালা। বড় যন্ত্রণা প্রভু! এই ২৬।২৭ বৎসরের মধ্যে জীবনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল তাতে তোমারই কৃপায় এখনও কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছি নাথ! দীনবন্ধু! আর আমায় ভুলে থেকো না; আর আমায় দূরে ফেলে রেখো না; আমার পায়ে স্থান দাও; তোমার সেবার অধিকার দাও।' সঙ্গে সঙ্গে স্বরচিত একটি গান আমার মনে পড়িল। আপন মনে গান ধরিলাম—

ঐ, ডুবছে যেমন দিনমণি
তেমনি করে ধীরি ধীরি;
কবে, ডুবে যাব প্রেমপাথারে
হৃদে ধরে তোমায় হরি!
কবে, রাঙ্গা চরণ হৃদে ধরে,
মায়ার বাঁধন ফেলব ছিঁড়ে?
আমি, ভুলে যাব সবাকারে
শুধু, হেরব তোমা নয়ন ভরি।
এই, অসার সুখে রইব না আর
ভেঙ্গে যাবে মোহ আগার;
আমি, থাকব সুখে নিয়ে তোমার
পবিত্র প্রেম মনোহারী॥

আমি গাহিতে জানি না; কিন্তু হৃদয়ের আবেগে সেদিন যেন বেশ গাহিলাম। ভাবে হৃদয় ভরপুর হইয়া গেল; আনন্দে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বার বার চরণ চুম্বন করিয়া যুগলমূর্ত্তিখানি যথাস্থানে স্থাপিত করিলাম। এবং তাহার পর আমার কুঠিয়ায় এমন রাঙ্গা টুকটুকে এক ফালি তরমুজ কোথা হইতে আসিল তাহার সন্ধানে পার্শ্ববর্ত্তী ব্রহ্মচারীর নিকট গমন করিলাম। ব্রহ্মচারী বলিলেন,—একজন সাধু পেশোয়ার হইতে একটি তরমুজ আনাইয়াছিলেন; তিনি সাধুদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন তার পর যখন শুনিলাম তরমুজটী উৎসর্গীকৃত নহে; তখন আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া পেয়ারা ও তরমুজ কাটিয়া পাতায় করিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া দিলাম। বনফুলের মালা গাঁথিয়া মনের মত করিয়া প্রাণনাথকে সাজাইলাম। চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া গঙ্গাজল ও তুলসী দ্বারা নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া দিলাম। গঙ্গাজলে ডুবাইয়া একটি তুলসীও কালাচাঁদের পায়ে বসাইয়া দিলাম। পূজার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই ত জানি না; শুধু বলিলাম, 'প্রভু! এসব তোমারই দেওয়া; আবার তোমাকেই দিচ্ছি। তোমারই দান তুমি গ্রহণ করে এই দীন হীন অভাগাকে ধন্য কর; পবিত্র কর; পরিতৃপ্ত কর নাথ!'

হঠাৎ একটী গোবরে পোকা দীপের উপর পড়িয়া দীপটী নিভাইয়া দিল।

আমি স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণেক পরে পশ্চিমের জানালা দিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম একটি প্রকাণ্ড সাপ মাথা তুলিয়া ঘরের দিকে দেখিতেছে; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দিয়াশলাই জ্বালিতেই সাপটি পলাইল। আমি পুনরায় দীপ জ্বালিয়া জানালার উপরে রাখিলাম। ভাংগা জানালা ভাল বন্ধ হইল না; অল্পক্ষণ পরেই আবার একটি পোকা উড়িয়া দীপের উপর পড়িয়া দীপ নিভাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় দীপ জ্বালাইলাম। এইরূপে আরও দুইবার আলো নিভিয়া গেল, নিশ্চয় ইহার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে মনে করিয়া, আর আলো জ্বালিলাম না; প্রাণনাথের মূর্ত্তিখানি বুকে করিয়া শুইয়া পড়িলাম। তখনও ভাল তন্দ্রা আসে নাই; এমন সময় হঠাৎ যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পগন্ধে আমার ঘরখানি আমোদিত হইয়া উঠিল। আমি চমকিত হইলাম। একি! আমি যে বনফুলগুলি আনিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ত কোন ফুলের এমন গন্ধ নাই! সামান্য যে গন্ধ আছে তাহাতে ত এমন ঘর আমোদিত হইবে না! সংগে সংগে মনে হইল যেন একঝাঁক বড় বড় পাখী আমার কুঠিয়ার সম্মুখ দিয়া দক্ষিণদিকে উড়িয়া যাইতেছে; যেন স্পষ্টই আমি তাহাদের পাখসাট শুনিতে পাইলাম। তখন আর বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

## ৭২

আজ আমার জীবনের এক শুভদিন। আমার নরজীবন ধন্য করিতে আজ নরনারায়ণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই দীনহীনের কুঠিয়ার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের মুখ প্রফুল্ল; যেন ইসারায় বলিতেছেন 'অন্নদা! উঠে এস।' আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঠাকুরের সংগে চলিলাম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে যখনই ঠাকুর স্বপ্নে আমার কাছে আসেন, তখনই মনে হয় যেন তিনি আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু; কোন পূজনীয় গুরুজন বা আরাধ্য দেবতা নন। যখন আসেন তখন বন্ধুভাবে বেশ থাকি; ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, 'হায়! হায়!' করি; এক বার অভিবাদন পর্য্যন্ত করিলাম না—ভাবিয়া জ্বালা অনুভব করি; নিজ আচরণে সহস্র ধিক্কার দিই। যাহা হউক, আজ এই যে জাগ্রতের মত ঠাকুরের সংগে চলিয়াছি, তাঁহার নির্দ্দেশ মত নবনির্ম্মিত একটী কুয়ার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছি; ইহাতেও, আমার চৈতন্য হইল না। ঠাকুর তখন বলিলেন, 'এখানে বড় ঠাণ্ডা; একটু আগে জল হয়ে গেছে; তুমি এক কাজ কর; কুঠিয়া থেকে তোমার কম্বল আসনখানা নিয়ে এস।'

তৎক্ষণাৎ কুঠিয়ায় গিয়া কম্বল আসন লইয়া আসিলাম এবং তাঁহার আদেশে সেই কুয়ার ধারে পাতিয়া সেখানে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতে

লাগিলাম। ঠাকুর আমার সম্মুখে মাথার কাছে বসিয়া বলিলেন, 'অন্নদা! আজ তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত; তা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ কি? যদি তুমি আমার সংগে চলে যেতে ইচ্ছা কর—তাহ্‌লে বল; তোমার সমস্ত দুঃখের অবসান হবে।' তারপর আবার বলিলেন, 'তুমি বিশেষ করে ভেবে দেখ,—আমার সংগে চলে যাওয়া? না, সংসারে থাকা? কোনটা তোমার সুখের হবে? যদি তুমি সংসারে থাক্‌তে চাও, আমি তোমায় কিছু আরও দিতে যেতে পারি।'

মৃত্যুর কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিশেষ চিন্তার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে এই জ্বালাময় সংসারে বদ্ধ থাকা অপেক্ষা ঠাকুরের সঙ্গে যাওয়াই মঙ্গল। সংসারের জীব কি অসহ্য দুঃখই না ভোগ করিতেছে! রোগে শোকে, পাপে তাপে, জীবনটা কি হাহাকারময়ই না করিয়া তুলিতেছে! দিনান্তে একবার বিমল আনন্দে ভগবানকে স্মরণ করিতে পারে এমন স্বাধীনতা পর্য্যন্ত জীবের নাই। সংসারে কি আছে? আছে শুধু রোগীর আর্ত্ত চীৎকার, শোকের মর্ম্মভেদী হাহাকার, দুর্ভিক্ষের পৈশাচিক নৃত্য, তার উপর আবার আত্মীয়ের অসহ্য গঞ্জনা, প্রবলের অদম্য অত্যাচার, সমাজের নির্ম্মম পীড়ন;—আর সবার উপর আছে পরাধীনতার দুর্ব্বহ শৃঙ্খল-ভার। এই জ্বালাময় সংসারে কে থাকিতে চায়? এ সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়। এইরূপ সংকল্প করিয়া ঠাকুরকে বলিলাম, 'ঠাকুর! আমায় নিয়ে চল; আমি আর এই বন্ধনের ভেতর থাকতে চাই না।'

আমি যখন এইসকল চিন্তা করিতেছিলাম তখন যে ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমি ঠাকুরের সহিত যাওয়াই সংকল্প করিয়াছি শুনিয়া ঠাকুর যেন বিস্মিত হইয়াই বলিলেন, 'যাওয়াই ঠিক হল! তা বেশ;—আচ্ছা, আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ দেখি।'

ভাবিতে গিয়া দেখি আমার সম্মুখে কিছু দূরে সহস্র সহস্র লোক যেন করুণ কটাক্ষে আমার পানে তাকাইয়া আছে। উহাদের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্র উহারা মিনতিপূর্ণ বাক্যে অনুরোধ করিতে লাগিল, আমি যেন একাকী না চলিয়া যাই; উহাদের যেন সঙ্গে লইয়া যাই। উহাদের মধ্যে আমার সংসার সম্বন্ধে কোন আত্মীয়ই ছিলেন না; পরিচিতের মধ্যে দুই চারিজন বন্ধু বান্ধব ছিলেন মাত্র; আর সকলেই অপরিচিত। সকলকে দেখিয়াই বড় দুঃখী বলিয়া মনে হইল। এই কাতর দৃশ্য ক্রমশঃ আমার ক্ষুদ্র হৃদয় গ্রাস করিয়া ফেলিল; অজ্ঞাতসারে আমার ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল। আমি উহাদের কাতরতা ঠাকুরকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঠাকুর! ওদের সবাইকে সংগে নিয়ে যেতে পারি না?'

ঠাকুর বলিলেন, 'অসম্ভব; ওদের এখনও অনেক কর্ম্ম বাকী। ওরা কেমন

করে তোমার সংগে যাবে ?'

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম ; এবং উহাদের অনেক দুঃখের কথা ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলাম, 'কি উপায়ে এই অসম্ভব সম্ভব হয়, আমায় তাই বলে দাও ঠাকুর ! আমি জীবন পণ করে তাই করব।'

ঠাকুর অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, 'অসম্ভব—অসম্ভব ; সে সময় আসতে এখনও এক শ বৎসর দেরী আছে ; তুমি ও সংকল্প ছাড়।'

আমি বলিলাম, 'তা হবে না ঠাকুর ! ঐ এক শ বৎসরকে ঘুরিয়ে ওর শেষের দিকটা আগে নিয়ে আসতে হবে ; তার জন্যে কি করতে হবে বল। এ তোমাকে করতেই হবে। ঐ শোন ঠাকুর ! নিরন্নের কাতর ক্রন্দন ; আর্ত্তের মর্ম্মভেদী হাহাকার ; ঐ দেখ ত্রিতাপদগ্ধ জীব আকুল আহবানে ভগবানের আসন টলাতে বদ্ধপরিকর হয়েছে ; ভগবানের সন্ধানে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে ; তাঁর পূজার জন্য যথাসর্ব্বস্ব নিয়োগ করতে ব্যাকুল হয়েছে। আর নির্দ্দয় হয়ো না ঠাকুর ! আর ওদের মোহে ফেলে রেখো না। ওরা অনেক শাস্তি পেয়েছে ; কর্ম্মের ফলে অনেক দুঃখ কষ্ট সয়েছে ; অনেক জ্বালায় ওরা জ্বলছে ;—আর ওদের কষ্ট দিও না ঠাকুর ! ওদের পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। আর কেন ? পতিতপাবন ! এবার পতিতকে দয়া কর প্রভু ! বিপদবারণ ! বিপদ থেকে উদ্ধার কর। সব যে যায় ; ধর্ম্ম কর্ম্ম মনুষ্যত্ব সব যে যেতে বসেছে আর বিমুখ হয়ো না ঠাকুর ! এক বার ওদের দিকে ফিরে চাও ;—বল কি করলে ওদের বন্ধন ঘোচে,—কর্ম্ম শেষ হয়,—ওরা তোমার কাছে যেতে পারে।'

আমার অনুনয়ে ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, অন্নদা ! তুমি যা চাইছ তা করতে হলে, তোমাকে বিশ বৎসর সাধনা করতে হবে। দশ বৎসর সংসারে থেকে বাপ মার সেবা ; আর দশ বৎসর সস্ত্রীক গংগাতীরে থেকে * * * এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করতে হবে। কঠোর নিয়মের মধ্যে থেকে মন্ত্রশক্তিকে জাগাতে হবে ; পারবে ত ?'

আমি তখন নীরব। ঠাকুর আবার বলিলেন, 'যা বললুম তা যদি করতে পার ত—তোমার ওপর আর একটী শক্ত কাজের ভার পড়বে। বল ;—আমার কথার উত্তর দাও ; পারবে ?'

এবার আমি বলিলাম, ঠাকুর ! এত লোকের যদি সামান্য উপকারও হয়, আমি বিশ বৎসর সাধনা করতে প্রস্তুত আছি ; বলুন—বিশ বৎসর পরে আবার কি কঠিন কাজের ভার আমার ওপর পড়বে ?

ঠাকুর বলিলেন, 'সেই কঠিন কাজ হচ্ছে, একটী মন্দির স্থাপন ;—যে মন্দির স্থাপনের পর দেশে এক অপুর্ব্ব ভাবের অভিনয় হবে, সেই মন্দির স্থাপন ;—যে মন্দির প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে ভগবান আছেন—তাঁকে দেখা যায়, —যেমন করে তোমার সংগে কথা কইছি এমনি করে তাঁর সংগে কথা কওয়া যায় ; এইরূপ

বিশ্বাস সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অন্তরে জেগে দেশে এক নব জাগরণ নিয়ে আসবে ; সেই মন্দির স্থাপন ,—বল ; পারবে।'

আমি আনন্দের সহিত বলিলাম, 'নিশ্চয় পারব ; বলুন সে মন্দির কি রকম হবে।'

ঠাকুর তখন আমাকে পাহাড়ের গায়ে এক একটী করিয়া তিনটী মন্দির দেখাইলেন।—প্রথম মন্দিরটী একটী অতিকায় হংসপৃষ্ঠোপরি অবস্থিত ; মন্দিরের চূড়া স্বর্ণময় ; প্রাচীর বহুমূল্য রত্নরাজি খচিত মন্দির মধ্যে বেদীর উপর পরমহংসদেবেরই একটী সজীব প্রতিমূর্ত্তি।—প্রথম মন্দিরের পার্শ্বেই দ্বিতীয় মন্দির। মন্দিরটী শবরূপী শিবের বক্ষোপরি অবস্থিত ; যে আদ্যামূর্ত্তি কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে পাওয়া গিয়াছিল। সেই আদ্যামায়ের জীবন্ত মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে দাঁড়াইয়া যেন মৃদু হাসিতেছে।—তৃতীয় মন্দিরটী গরুড়ের পৃষ্ঠে অবস্থিত ; ঐশ্বর্য্যে ইহাও প্রথম দুইটির অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয় ; মন্দিরের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের জীবন্ত যুগলমূর্ত্তি প্রণবের মধ্যে শোভা পাইতেছে। তিনটী মন্দিরই পরস্পর সংলগ্ন।

স্তব্ধদৃষ্টিতে মন্দিরগুলি দেখিয়া আমি বলিলাম, 'ঠাকুর। পৃথিবীতে এমন মন্দির নির্ম্মাণ করা কি মানুষের সাধ্য ? এমন মন্দির কেবল ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোকেই শোভা পায়। আমার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর এ ভার দেওয়া কি যুক্তি সঙ্গত ? আমার পক্ষে কি এ কাজ কখনও সম্ভব ?'

তখন ঠাকুর আমায় আর একটী মন্দির দেখাইলেন। এই মন্দিরের তিনটী চূড়া ; একটীর পিছনে কিঞ্চিৎ উচ্চে আর একটী করিয়া নিৰ্ম্মিত ; দেখিলে মনে হয় যেন একটী বৃহৎ মন্দিরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন আর একটী মন্দির কতকটা প্রবেশ করিয়াছে ; তাহার মধ্যে আবার আর একটী অর্থাৎ সম্মুখের ছোট মন্দিরটী কতকটা প্রবেশ করিয়া যেন সংযোগ সম্বন্ধে ত্রিমন্দিরের এক অভিনব সমাবেশে মন্দির স্থাপত্যে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে। মন্দির মধ্যে তিনটি বিভাগ সোপান শ্রেণীর আকারে সজ্জিত। প্রথম বিভাগে বেদীর উপর পরমহংসদেবের মূর্ত্তি ; পদতলে বেদীগাত্রে লিখিত আছে 'গুরু'। মধ্যম বিভাগে পূর্ব্বকথিত ৺আদ্যামূর্ত্তি ; মূর্ত্তির নিম্নে বেদীগাত্রে লিখিত রহিয়াছে —'জ্ঞান ও কর্ম'। শেষ বিভাগে প্রণবের মধ্যে ৺রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ; মূর্ত্তির পাদমূলে বেদীগাত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে—'প্রেম' এই কথাটী লেখা রহিয়াছে। মূর্ত্তিত্রয় এমনভাবে স্থাপিত রহিয়াছে যে মন্দিরদ্বারের বাহির হইতে ত্রিমূর্ত্তি একত্র সুন্দরভাবে দর্শন করা যায়। মন্দিরটী বড়ই সুদর্শন ; দেখিয়া মনে হইল মর্ম্মর নিৰ্ম্মিত।

ইহার পর ঠাকুর একবার আমার মুখের পানে তাকাইয়া আর একটী মন্দির আমায় দেখাইলেন। এই মন্দিরটী সাধারণ শ্রেণীর ; ইহার পাশাপাশি তিনটী

বেদীর উপর পূর্ব্বোক্ত ত্রিমূর্ত্তি স্থাপিত ; উপরে পাশাপাশি তিনটী চূড়া।

এইরূপে তিন দফায় আমাকে তিন প্রকার মন্দির দেখাইয়া ঠাকুর বলিলেন, 'অন্নদা! দ্বিতীয়বারে তোমায় যে মন্দির দেখিয়েছি, তা তুমি নির্ম্মাণ করতে পারবে ; যদি তুমি এ ভার নিতে স্বীকার কর ত বল,—আমি তোমায় সমস্ত খুলে বলি।'

৭৩

ঠাকুর প্রফুল্ল বদনে যেন আমায় অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে বলিলেন, 'অন্নদা! তুমি যখন জগতের মঙ্গলের জন্য এরূপ কঠোর ভার বহন করতে প্রস্তুত, তখন বলি শোন ; তোমার কোন ভয় নেই। আমার দেহরক্ষার বত্রিশ বছর পরে আমি আবার বাংলায় যাচ্ছি। সেই দেহরক্ষার সত্তর বছর পরে আমি আবার যাব ; এইভাবে আমি আরও এগার বার অবতীর্ণ হব। যতদিন না বাংলার জনসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ততদিন আমায় এইভাবে যেতে হবে। তুমি কিছু ভেবো না ; আমার আটজন অন্তরঙ্গ ভক্ত তোমার মন্দিরের কাজে জীবনপাত করবে ; আর আমার গত বারের আঠার জন ভক্ত এক শ আঠাশটি শরীর চালনা করে তোমার কাজের সহায়তা করতে আবার বাংলায় যাচ্ছে। বিবেকানন্দ একটী ব্রাহ্মণ, একটী কায়স্থ ও একটী বৈদ্য এই তিন জনের ভিতর দিয়ে কাজ করবে ; রামদত্ত দুজনের ভিতর দিয়ে কাজ করবে ;—এই-ভাবে আঠার জন ভক্ত কাজ করবে। তোমার ভয় কি ?'

ইহার পর উক্ত মন্দির কোথায় স্থাপন করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, 'মন্দিরটী বাংলা দেশেই ৺কালীঘাটের ৺নকুলেশ্বর শিবের মন্দির থেকে আড়িয়াদহের ৺দক্ষিণেশ্বর শিবের মধ্যবর্ত্তী এই কালীস্থানে স্থাপিত হবে। এই মন্দির স্থাপনের পর দেশ এক মহা ধর্ম্মভাবের বন্যায় প্লাবিত হতে থাকবে। লোকের প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস হবে যে ভগবান যে আছেন, শুধু তাই নয় ; তাঁকে দেখা যায়। এমন কি প্রতি বৎসর অন্ততঃপক্ষে তিন জন ভাগ্যবান ভক্ত এই মন্দিরেই ভগবানের প্রকট দর্শন লাভ করে জগতের মঙ্গল কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করবে।

আমি আনন্দে আত্মহারা। সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মন্দিরের দৈনন্দিন কাজ কি ভাবে চলবে ?'

ঠাকুর বলিলেন, 'দৈনন্দিন মঙ্গল আরতির পর প্রাতে পূজা ও ভোগরাগাদি হলে পরে আরতি দিয়ে দুয়ার বন্ধ হবে। তারপর মধ্যাহ্নে পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা ; সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ; রাত্রে শীতল আরতির পর

দুয়ার বন্ধ।—আর দেখ এই মন্দিরে ঠাকুর দর্শনের একটা নিয়ম থাকবে। সাধারণতঃ প্রত্যহ শুধু আরতির সময় মাত্র সকলে দর্শন করতে পারবে। তাছাড়া বৎসরের মধ্যে শুক্লা নবমী, কৃষ্ণা একাদশী প্রভৃতি বাহান্ন তিথিতে সারাদিন সাধারণের দর্শনের জন্য মন্দির খোলা থাকবে।—আর দেখ, স্ত্রী ও পুরুষের দর্শনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকবে।

ঠাকুর আরও বলিলেন, মন্দিরের অধীনে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক দুটী আশ্রম স্থাপন করতে হবে। একটী পুরুষ সাধকদের জন্য; আর একটী সাধন পথ অবলম্বন করতে চান এমন স্ত্রীলোকদের জন্য। তাছাড়া মন্দিরের আয় থেকে আরও চারটী কাজ করতে হবে।—

১। বালকদিগের শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপন।

২। বালিকাদিগকে আর্য্যনারীর আদর্শে শিক্ষাদান।

৩। সংসারবিরাগী গৃহস্থের জন্য বাণপ্রস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠা।

৪। সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের চেষ্টা।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,'আচ্ছা, মন্দিরে ভোগের কিরূপ ব্যবস্থা করা হবে?'

ঠাকুর বলিলেন, 'ক্রমানুযায়ী তিন দেবতার সাড়ে বার সের, সাড়ে বাইশ সের, আর সাড়ে বত্রিশ সের চালের ভোগ দেওয়া হবে। পঞ্চব্যঞ্জনে সেই ভোগ উৎসর্গ করে আশ্রমের লোক জন ও দীন দুঃখীকে প্রসাদ দেওয়া হবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পরমান্নভোগও থাকবে কি?'

'থাকবে বই কি; যথাক্রমে পাঁচপো, আড়াই সের আর সাড়ে তিন সের দুধের পরমান্নভোগ নিত্য হবে। তাছাড়া শয়ন আরতির পূর্ব্বে একটী ভোগ দিতে হবে; সে কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি। অন্ততঃ পাঁচ পো ঘি, আড়াই পো কিসমিস, পাঁচ ছটাক বাদাম পেস্তা দারচিনি তেজপাতা লবঙ্গ, আর সাত পো চিনি দিয়ে আড়াই সের উৎকৃষ্ট সুগন্ধ চালের ভোগ প্রস্তুত করে জাফরাণ দিয়ে রং করে নিতে হবে। এইভাবে অমৃত ভোগ প্রস্তুত করে প্রত্যহ তিন দেবতাকে উৎসর্গ করে দিতে হবে।'

'আচ্ছা প্রত্যেক দিন যে এত ভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে—সে সব কোথায় সাজিয়ে দেওয়া হবে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'অমৃতভোগ ও পরমান্নভোগ মন্দিরেই দেওয়া হবে। তাছাড়া দুপুরের অন্নভোগের জন্য পৃথক ভোগালয় করতে হবে। সেই ভোগালয় থেকে যেন মূর্ত্তি দর্শন হয়। সেই ভোগালয়েই ভোগ সাজিয়ে দেওয়া হবে।'

'এ সব বৃহৎ ব্যাপার; ঠিক ঠিক হবে কি?'

'নিশ্চয় হবে; আমার কথা কখনও মিথ্যা হবার নয়। তুমি নিশ্চয় জেনো যে সৃষ্টির পর এরকম ব্যাপার পৃথিবীতে এই প্রথম। এমন সুযোগ—জীবহিতে

এমন কৃপা, আর কখনও হয় নি। এখন এমন কোন স্থান নেই যেখানে ভগবানের প্রকট আবির্ভাব সম্ভব। যে দু একটী স্থান নাম মাত্র আছে তাও ক্রমে কালের গর্ভে লীন হয়ে যাবে; থাক্‌বে শুধু বাংলায় ঐ পীঠস্থান। কলির দুর্ব্বল জীবকে আবার সবল ও ধর্ম্মপরায়ণ করে ভগবানের সেবায় লাগাবার জন্যই আজ এই কাজের সূচনা করা হল। তুমি কখনও মনে স্থান দিও না যে—এই কাজ জীবভাবপ্রসূত। দেবতার ইচ্ছায় এই কাজ সম্পন্ন হবে; জীব নিমিত্ত মাত্র। বাংলাকে অবিশ্বাস করো না। বাংলা এখনও আধ্যাত্মিকতা হারায় নি;—এখনও ভগবানকে বাদ দিয়ে নিজে ভগবান সাজবার দুর্ব্বুদ্ধি বাংলার হয় নি;—এখনও বাংলার আকাশে বাতাসে ভক্তির বীজ ছড়ান রয়েছে;—এই বাংলাই এখন এমন পবিত্র কাজে সাড়া দেবার মত একমাত্র দেশ;—বাংলায় এখনও দাতা ভক্তের অভাব হয় নি; তবে তুমি নিমিত্ত কারণ বলে তোমাকেও নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে। তোমার উপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে যাবে; তোমায় তাতে স্থির ধীর অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে। শুধু দেখ্‌বে প্রকৃতির নিয়মে কত লোক আস্‌বে, কত লোক যাবে; যার কাছে যা সাহায্য পাও, তাই যথেষ্ট মনে করে তার উপর সন্তুষ্ট থাক্‌বে। তুমি ছাড়া আর যে ছাব্বিশ জন সহ-কর্ম্মীর কথা তোমায় আগে বলেছি—মন্দিরের কাজে তাদেরও চোখের জল পড়্‌বে; সহকর্ম্মীরা সম্ভবমত দেশ কাল পাত্র অনুসারে তোমাকে এই কাজে সাহায্য কর্‌বে। তোমার সাধনার পর বার বৎসরের মধ্যেই মন্দিরের কাজ আরম্ভ হবে। যদি সেই বার বৎসরের মধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হয়, তাহলে দর্শক সাধারণকে মন্দির স্পর্শ কর্‌বার অধিকার দিও; নাহলে মন্দিরের চারিদিকে এমন কঠিন বেষ্টনী রাখ্‌বে যে, সেবায়েৎ পূজারী ভিন্ন সাধারণ লোক যেন মন্দির স্পর্শ কর্‌তে না পায়।'

'সে কি ঠাকুর! সাধুরাও নয়?'

'তুমি সাধু কাকে বল্‌ছ? জটা রেখে যারা গেরুয়া পরে বেড়ায় আর চিম্‌টে ভস্মের সদ্ব্যবহার করে, তাদেরই সাধু বল্‌ছ ত? দেখ, সে জাতের সাধুদের মধ্যে প্রকৃত সাধু খুব কম পাবে; প্রকৃত সাধু বরং গার্হস্থ্য আশ্রমেই আছে। এ যে ঘোর কলিকাল; একথা ভুলো না। কাজেই সাধুবেশীকেও মন্দির স্পর্শ কর্‌বার অধিকার দেওয়া হবে না। আর যদি বার বৎসরের মধ্যে মন্দির হয়ে যায় ত মনে কর্‌বে দেশে একটা মহা সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। যে মন্দিরে ভগবানের প্রকট আবির্ভাব, দেশবাসী আজ সেই মন্দির স্পর্শ কর্‌বার উপযুক্ত হয়েছে; দেশ ধন্য হয়েছে।'

'বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার দিন যে মন্দিরে পূজারী ভিন্ন অন্যান্য লোকজন না হলে চল্‌বে না; তখন কি করা যাবে?'

'প্রতিষ্ঠার দিন কোন নিয়ম থাক্‌বে না।'

'যারা উপস্থিত থাক্‌বে সকলেই স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে ?'

'হাঁ ; পার্‌বে।'

'আচ্ছা, তিন দেবতার কি তিন জনই পূজারী থাক্‌বে ?—আর কেবল তাদেরই মন্দিরের ভেতর যাবার অধিকার থাক্‌বে ?'

'তার কোন মানে নেই ; পূজারী যত জন দরকার হয়, থাক্‌তে পারে ; তার কোন সংখ্যা নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো যে এই মন্দিরের মোহন্ত বলে কেউ থাক্‌বে না। মন্দিরের কাজ যাতে সুশৃঙ্খলায় যথারীতি চলে শুধু তাই দেখ্‌বার জন্য দুই বৎসরের মত মন্দিরের অধীন আশ্রম থেকে এক এক জন সাধুর উপর ভার দেওয়া হবে ; উপযুক্তভাবে কাজ চালালে একই জনের উপর একাধিক বার ভার দেওয়া যেতে পার্‌বে ; তাতে কোন দোষ হবে না।'

'আচ্ছা, আপনি সাধারণের দর্শনের জন্য যে বাহান্ন দিনের কথা বলেছেন,—সে কোন কোন দিন ?'

'হাঁ ; ভাল কথা মনে করেছ। শোন ;—শুক্লপক্ষের নবমী ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশী বৎসরে ২৪ দিন ; ঝুলনপূর্ণিমা, রাসপূর্ণিমা, দোলপূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপূর্ণিমা ৪ দিন, মহালয়া ও দীপান্বিতা অমাবস্যা ২ দিন ; জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী ২ দিন ; শ্রীপঞ্চমী ও নাগপঞ্চমী ২ দিন ; সংক্রান্তি ১২ দিন, শারদীয়া দুর্গাপূজো ও বাসন্তীপূজার সপ্তমী অষ্টমী ও দশমী এই তিন দিন করে ৬ দিন,—মোট ৫২ দিন।'

'যদি এই সমস্ত পর্ব তিথি এক দিনে দুটি পড়ে, তাহালে ত বাহান্ন দিনের কম হবে ;—তখন কি করা হবে ?'

'সে রকম হলে তার পরের শুক্লা একাদশীতেও মন্দির খোলা থাক্‌বে।'

'মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি কত বড় হবে ? আর কি কি উপাদানেই বা প্রস্তুত হবে ?'

'গুরুমূর্ত্তি—উপবিষ্ট প্রমাণ মানুষের মূর্ত্তির মতই হবে ; কাঠের পাথরের, ধাতুর বা মাটির মূর্ত্তি হলেও চল্‌বে। আদ্যামূর্ত্তি—আট বৎসরের কুমারীর মত অষ্টধাতুর মূর্ত্তি কর্‌তে হবে। আর প্রণব মধ্যস্থ যুগলমূর্ত্তি—বার বৎসরের ছেলে মেয়ের মত হবে, এবং গুরুমূর্ত্তির মত যে কোন উপাদানে প্রস্তুত কর্‌লেই চল্‌বে।'

'আচ্ছা, আপনি বল্‌লেন—গত বারের দেহরক্ষার বত্রিশ বৎসর পরে আপনি আবার আস্‌ছেন। তার কোন প্রমাণ আমরা পাব কি ?'

'হাঁ, তার একটা ছোট খাট প্রমাণ আমি তোমায় বলে দিচ্ছি ; শোন—দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে বাঁধান সিদ্ধাসনের উপর দিয়ে যে একটী বড় ডাল পড়ে আছে, বাংলায় আমার পুনরাবির্ভাব হওয়ার পর ; সেই ডালটি মূল থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার আসন মুক্ত করে দেবে।'

এই সকল কথাবার্ত্তার পর আরও দুই চারিটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলে আমি অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

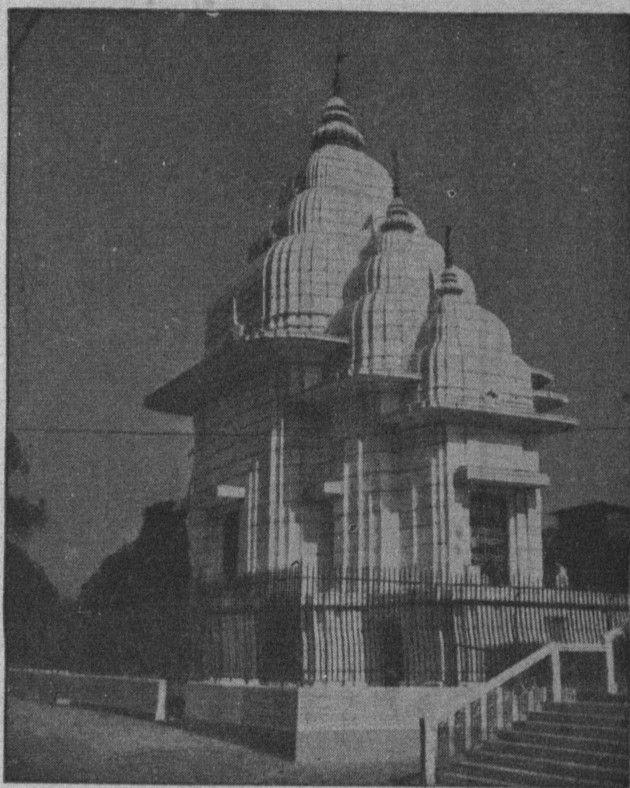
৭৪

প্রত্যুষে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া আমায় ডাকাডাকি করিয়া উঠাইল। ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল। প্রত্যেক কথাটী যেন আমার মস্তিষ্কের অনুপরমাণুতে জাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল। সন্ন্যাসীঠাকুর আমার অসাবধানতার জন্য আমায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন; বলিলেন, 'তোমার কি একটুও হুঁস নেই? এই বর্ষার দিনে এরকম খোলা জায়গায় সমস্ত রাত কাটালে? তোমার কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে?' এইরূপ দুই চারি কথা বলিতে বলিতে তিনি আরও বলিলেন, 'কাল রাত্রে যে বৃষ্টি হয়ে গেল তাতে বোধ হয় পড়ে পড়ে ভিজেছ? আসনও বোধ হয় ভিজে গেছে? —দেখি?' বলিয়া সাধু আমার কম্বলে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমি নীরবে হাতজোড় করিয়া আসন লইয়া কুঠিয়ায় উপস্থিত হইলাম।

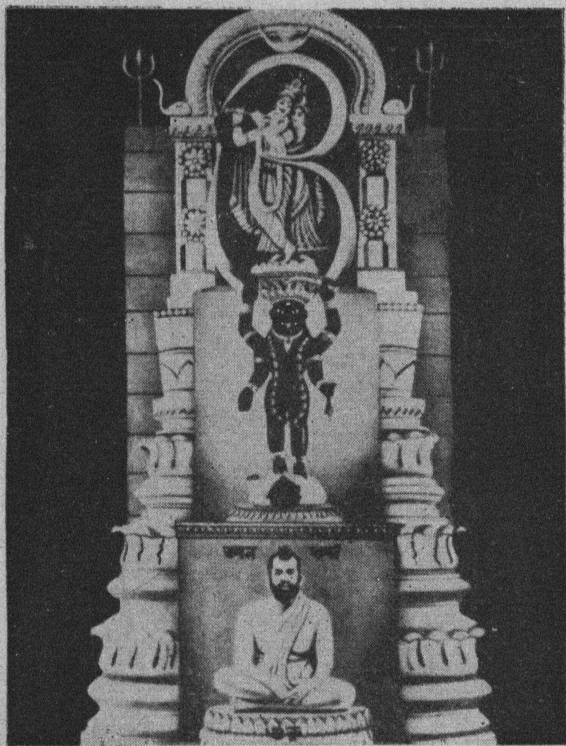
কুঠিয়ায় গিয়া দেখি যুগলমূর্ত্তিখানি সাজান নৈবেদ্যের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। কিছুক্ষণ চিন্তার পর বুঝিলাম উহা আমার বিছানার উপরই ছিল; রাত্রে আসন লইয়া বাহিরে যাইবার সময় নৈবেদ্যের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাড়াতাড়ি যুগলমূর্ত্তিখানি তুলিয়া কাপড়ে মুছিয়া বক্ষে ও মাথায় ঠেকাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া স্নান করিবার অভিপ্রায়ে আশ্রমের বাঁধা ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঘাটে দুই তিন জন সাধু বসিয়া পূর্ব্ব রাত্রের সেই পুষ্পগন্ধ ও বিচিত্র পক্ষসঞ্চালনশব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। একজন বলিতেছেন, —'কাল ঝুলন পূর্ণিমায় বৃন্দাবনে ঝুলন উৎসব ছিল। ঐ উৎসবে গন্ধর্ব্বগণ গিয়ে থাকেন; তাই ঝুলন উৎসবকে 'গান্ধর্ব্বোৎসব'ও বলে। কাল এই স্বর্গাশ্রমের উপর দিয়ে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ বৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন; সেইজন্য আমরা ঐরকম শব্দ ও গন্ধ পেয়েছিলুম।'

অপর দুই জন সাধুও তাঁহার কথায় সায় দিলেন এবং তাঁহারাও শব্দ এবং গন্ধ পাইয়াছিলেন বলিয়া জানাইলেন। আর একজন বিজ্ঞ সাধু বলিলেন, 'প্রতি বৎসর এরকম হয় না। আমি ঠিক এর বার বৎসর আগে এই আশ্রমে এরকম শব্দ ও গন্ধ পেয়েছিলুম। আর সেও ঠিক এই পূর্ণিমের দিনে।'

ইহা শুনিয়া অপর একজন কহিলেন, 'তা ত হবারই কথা; আমাদের বার বৎসরেই যে তাদের এক বৎসর।'



আদিষ্ট মন্দির



আদিষ্ট মন্দির অন্তরভাগ

গুরু, জ্ঞান ও কর্ম, প্রেম।

এইরূপ মীমাংসার পর বেশ একটা আনন্দের রোল উঠিল। কেহ কেহ পুলকে অশ্রুবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। আমি নীরবে এই দৃশ্য দেখিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলাম। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে মানব কি সরল বিশ্বাসের অধিকারী হয়, দেখিয়া আমি কৃতার্থ বোধ করিলাম। এই সরল বিশ্বাস ভিন্ন ভক্তি লাভ হয় না ; এবং ভক্তিবিশ্বাসহীন ধর্ম্ম কতকগুলি প্রাণহীন আচারেই পর্য্যবসিত হয়। অধুনা আমাদের দেশে অবিশ্বাসের প্রবল প্রভাব। তাই আজ জাতির এই শোচনীয় অধঃপতন। পাশ্চাত্যের প্রভাবে বিশ্বাস আজ আমাদের অন্তর হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত। আমাদের এমন স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে নিজ বিদ্যা বুদ্ধি বিজ্ঞান সাহায্যে যাহা বুঝিতে পারিব না তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিব না ; এই দুর্গতি আমাদের পূর্ব্বে ছিল না। স্বাধীনতা হারাইয়া হিন্দু যেদিন পাঠানের পদানত হইল, আর্য্যাবর্ত্তে যেদিন হইতে নিরাকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সময় হইতে আমাদের এই অধঃপতন শুরু হইয়াছে। না দেখিলে আমরা কিছুই বিশ্বাস করি না। আমার মনে আছে বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত একটি বন্ধুর সহিত মেঘের অন্তরাল হইতে মেঘনাদের যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। তাঁহার এবং তাঁহার মত বহু উচ্চশিক্ষিতেরই ধারণা ছিল পুষ্পকরথ প্রভৃতি কবির কল্পনা মাত্র। আমি বন্ধুবরকে তখন কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারি নাই ; পরে যখন বিগত মহাযুদ্ধে কত শত পুষ্পক রথের ব্যবহার সকলে প্রত্যক্ষ করিল তখন আবার সুর ফিরিল।

তাই বলি, হে অবিশ্বাসী! তোমাদের বুদ্ধির অগম্য ঐরূপ সত্য তোমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের অতীত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যাইতে পারে। তিনি সত্যই আসেন, তাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহাকে চাহিলে, স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী প্রকট হইয়া তিনি জিজ্ঞাসু সাধকের সন্দেহ ভঞ্জন করেন। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ঐতিহাসিক যুগের মধ্যেই খৃষ্টপূর্ব্ব তিন শতাব্দী পূর্ব্বের মহাবীর সেকেন্দারের জীবনী পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময় অনার্য্য জাতির মধ্যেও কিরূপ ঈশ্বর সাধনার পদ্ধতি ছিল। খৃষ্টের জীবনী পাঠ করিলেও পাওয়া যায়, যীশুর পিতা যদি স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে যীশুকে বাঁচাইতে পারিতেন না। ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের জীবনী আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, মহম্মদ ঈশ্বরের আদেশবাণী স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে কোরাণের উপদেশ বাণী শুনাইতে আসিয়াছিলেন। বিশ্বাস সহজে না হইলেও এ সকল কথা অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিবার আর উপায় নাই।

সন্ন্যাসীরা চলিয়া গেলে আমিও স্নানান্তে কুঠিয়ায় ফিরিলাম। দেখিতে

দেখিতে কিন্তু আমার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বিশ বৎসরের সাধনার কথা ভাবিয়া আতঙ্কে আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল, সংসারের মলিনতার মধ্যে এক বৎসর থাকিলে মনের কি শোচনীয় অবস্থাই হয়! আর সেই সংসারে দশ বৎসর! তারপর আবার দশ বৎসর সস্ত্রীক সাধনা! তাহা কখনও হইতে পারে না। ঠাকুর নিশ্চয়ই আমাকে সম্মোহিত করিয়া বিশ বৎসরের সাধনায় প্রতিজ্ঞাবন্ধ করিয়াছেন। আমি কিছুতেই ও কথা শুনিব না; উহা আমার পক্ষে অসম্ভব। যাহা হউক, ঠাকুরের কথামত যখন কালই আমার শেষ দিন গিয়াছে, তখন আর কি? আজই আমি নিজ জীবন শেষ করিব। ওঃ—কি ভীষণ চাতুরী! কি সম্মোহন শক্তি! কি ভয়ানক আদেশ! ভোগের উপাদান লইয়া বিশ বৎসর থাকিলে আমি ভোগে ডুবিয়া যাইব! আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে লোপ পাইবে।

তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম কিরূপে এই জীবন শেষ করিয়া আমি এই দেহ ত্যাগ করিতে পারি। এই দেহ ত্যাগ করিয়া তারপর দেখিব ঠাকুর! তোমার চাতুরী কোথায় থাকে? দেখিব তুমি কেমন আমায় জীব-হিতায় সাধনশক্তি সম্পন্ন করিয়া পুনরায় না প্রেরণ কর? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার সেই সহস্র সহস্র জীবের কাতর দৃষ্টি আমার নয়নপথে পতিত হইল। তাহাদের সেই কাতরোক্তি মনে পড়িয়া আমায় বিচলিত করিয়া তুলিল। আমি তখন এক উন্মাদের মত দুই হাত তুলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম,—দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমি আবার ফিরে আসছি; একটু অপেক্ষা কর।—এই দেহে আমায় সাধনা করতে হলে আরও বত্রিশ বৎসর পরে তবে তোমাদের কোন উপায় হবে;—তাও যদি সাধনসিদ্ধ হই, তবেই; না হলে নয়।—তোমরা একটু অপেক্ষা কর; আমি এই দেহ বদলে আসি—তোমাদের উদ্ধারের সঙ্কল্প করেই আমি বলি হব। আবার ফিরে এসে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যই এ দেহ ত্যাগ করব। তোমরা চঞ্চল হয়ে উঠো না; স্থির হও।'

এইরূপ বলিতে বলিতে দেহত্যাগের জন্য ঝোলার উপর হইতে গঙ্গায় আত্ম-বিসর্জ্জনের কথা মনে হইল অমনই অগ্রসর হইলাম; হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদের মত অগ্রসর হইলাম। সঙ্গের সাথী করিয়া লইলাম সেই বৃন্দাবন-বিহারী, গোপীমনোমোহন যুগলজীবন রাধাকৃষ্ণের পটখানি! কখনও উহা বক্ষে রাখিতেছি, কখনও মাথায় ঠেকাইতেছি, আবার কখনও বা উহার চরণ চুম্বন করিতেছে; এইরূপ নানা ভাবের অভিনয় করিতে করিতে ঝোলার উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। ঝোলার নিম্নে কলনাদিনী গঙ্গা ভীষণ কোলাহল করিতে করিতে তীব্র বেগে ছুটিয়াছে—দেখিয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল। এই খরস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা পট-

খানি উত্তমরূপে বক্ষে বাঁধিয়া লইলাম এবং ঝোলার তারের উপর এক পা দিয়া যেমন ঝাঁপ দিব অমনি এক নির্ব্বোধের কার্য্য আমায় চকিত ও সংযত করিল।

দেখিলাম এক পাহাড়িয়া একটি গোবৎসকে এমন নির্ব্বোধের মত অপর দিক হইতে তাড়া দিয়াছে যে বাছুরটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়াছে। দেখিয়াই আমার মনে পড়িল ঝোলার অপরপ্রান্ত অনাচ্ছাদিত; এখনই বাছুরটা গঙ্গার খরস্রোতে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে। এই কথা মনে হওয়া-মাত্র উহাকে রক্ষা করিবার জন্য যেখানে উহার পড়িবার সম্ভাবনা ছুটিয়া গিয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইলাম; বাছুরটা রক্ষা পাইল। তখন আমি নিজের দিকে তাকাইয়া দেখি, আমি ঐরূপেযেস্থানেছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহার এক পা সরিলেই, একেবারে খরস্রোত গঙ্গাগর্ভে পতন ও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। কি আশ্চর্য্য! যে স্থান হইতে অগ্রসর হওয়ামাত্র মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ঠিক সেই স্থান হইতে আর এক পা অগ্রসর হইতে না দিয়া কে আমায় রক্ষা করিল, এই ভাবিয়া আমি আবার কি এক রকম হইয়া গেলাম।

মনে হইতে লাগিল, কেনই বা আমি আত্মহত্যা করিতে আসিয়াছি? ঠাকুরকেই আমার শেষ প্রার্থনা একবার কাতর ভাবে জানাই না কেন? 'আমি বিশ বৎসর সাধনায় অপারগ; আমায় কমিয়ে দাও'—এই বলিয়া তাঁহাকে একবার জানাইয়া দেখিলেও ত হইত? তাই ত! এই আকুল আবেদন কোথায় বসিয়াই বা জানাইব? লোকালয়ে ত হইবে না; তেমন নির্জ্জন স্থান এখানে কোথায়? কে যেন বলিয়া দিল,—কেন? এমন গভীর অরণ্য তোমার সম্মুখে থাকিতে নির্জন স্থানের অভাব কি? অগ্রসর হও; তাহার নাম লইয়া অগ্রসর হও; নিজে মরিতে যাইবে কেন? তাঁহার নাম লইয়া অগ্রসর হও; হয় তিনি আবার দেখা দিবেন, না হয় হিংস্র জন্তুর কবলে ফেলিয়া তোমায় ধ্বংস করিবেন। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' বলিয়া অগ্রসর হও।

৭৫

সংকল্প স্থির হইয়া গেল। 'ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' বলিয়া আমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে গভীর বনে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সন্ধ্যা হইবামাত্র আমার প্রাণে যেন কি অজ্ঞাত ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল; মনে হইতে লাগিল যেন বনের প্রত্যেক বৃক্ষটি প্রেতের মত বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমায় গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া রহিলাম। অবশেষে সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে একেবারে বনের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। সেদিন আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না; পরদিন পুনরায় ঐ সংকল্প লইয়া

বনে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সেদিনও সেই গহন বনে অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পারিলাম না। সেই অহেতুক ভয় আমায় আবার অভিভূত করিয়া ফেলিল। শিশু যেমন ভয়ে জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয় আমারও অবস্থা সেইরূপ হইয়া উঠিল। কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতে লাগিল। 'ঠাকুর! কৃপা কর' বলিতে গিয়া 'ঠা—ঠা—ঠা—কুর।—কৃ—কৃ—ইপা—ওরে বাবা রে!—কি ভুত—রে!—কি ভুত—রে!—' বলিয়াই দৌড়—একেবারে সাংঘাতিক দৌড়; দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে একেবারে কুঠিয়ায় আসিয়া সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় আছাড়িয়া পড়িলাম! ক্রমে জ্ঞান হইলে প্রাণে ধিক্কার আসিল। জর্জরিত দেহে ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত ক্ষীণ কণ্ঠে একবার ডাকিলাম, 'ঠাকুর!—কৃপা কর।' অনাহারে অনিদ্রায় আত্মগ্লানিতে দেহ মন নিস্তেজ হইয়া আসিল। আজ তিন চার দিন পেটে অন্ন নাই, চোখে নিদ্রা নাই, তাহার উপর এইরূপ বিভীষিকা। হায়! কেন যে এমন দুর্ম্মতি হইল? কেন যে ঠাকুরের সঙ্গে চলিয়া গেলাম না? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘুমঘোরে অচেতন হইলাম। সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল; নির্দ্দয় ঠাকুর একবার দেখা দিতেও আসিলেন না। মনে মনে স্থির করিলাম আজ প্রত্যুষেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দিন বনের গভীরতম প্রদেশের দিকেই চলিতে থাকিব, যেন নিশাগমে ভয় পাইলেও আর পলাইয়া আসিতে না পারি।

সংকল্প মনে জাগিবামাত্র আমায় কার্য্যে নিয়োজিত করিল। আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথহীন দুর্গম বনে প্রবেশ করিলাম। নির্জ্জন অরণ্যের নীরবতায় সেদিন যেন কেমন এক প্রকার আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল; আনন্দে পথ চলিতে চলিতে ক্রমেই আমি নিবিড় বনে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। জনহীন দুর্গম সেই পার্ব্বত্য অরণ্যে, কখনও, উচ্চে কখনও নিম্নে, কোন দিকে যে চলিয়াছি কিছু স্থিরতা ছিল না; কেবল বনের গভীরতা যে দিকেই বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোথাও আমাকে বিশ্রাম করিতে হয় নাই। বরাবর চলিতে চলিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিশাগমের পূর্ব্বসূচনাস্বরূপ বনস্থলী ক্রমেই ঘন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, এমন সময় লক্ষ্য করিলাম, যোগাসনে উপবিষ্ট এক ক্ষীণকায় সন্ন্যাসীর পশ্চাৎভাগে আমি উপনীত হইতেছি। ক্রমে নিকটে আসিয়া দেখিলাম সন্ন্যাসীর শিরে জটাভার নাই; প্রায় হস্তপরিমিত দীর্ঘ রুক্ষ কেশগুলি অসংযত ভাবে স্কন্ধে ও পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে;—মুখ স্ত্রীলোকের মত রোমশূন্য; দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইলেও ঠোঁট দুখানি বড় সরস সুন্দর এবং হাসিমাখা। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। সন্ন্যাসী একখানি জীর্ণ কম্বল আসনে সমাসীন; দেহে কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না। তাহার দক্ষিণ দিকে কেবল তিন চার হাত উচ্চ একখানি প্রস্তর ছিল।

কেবল মাত্র সেই প্রস্তর খণ্ডের অস্তিত্বে সন্ন্যাসীর আসনভূমি গুহা বা গহ্বর নামে অভিহিত হইতে পারে না। জনপ্রাণহীন সেই নিবিড় বনে তিনি কিরূপে একা দিন অতিবাহিত করিতেছেন,—বিস্মিতভাবে আমি সন্ন্যাসীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতেছি,—এমন সময়ে অন্তর্যামীর মত তিনি বলিলেন, 'আগাড়ী চলো।'

সন্ন্যাসীর সম্মুখে একটী ধুনি মৃদুমন্দ জ্বলিতেছিল। দক্ষিণে সেই প্রস্তর-খণ্ড, বামে ধুনির নিমিত্ত সংগৃহীত কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ; এবং পশ্চাতে আমি দণ্ডায়মান। আমার উভয় পার্শ্বে কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় বন; সম্মুখে সংকীর্ণ পথটুকু রোধ করিয়া তিনি উপবিষ্ট। কাজেই আমাকে আগে চলিতে বলিলে আমি বলিলাম, 'আপ্‌কা লক্‌ড়ী হটাইয়ে।'

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সাধু পুনরায় বলিলেন, 'আগাড়ী চলো—আগাড়ী চলো।'

অগত্যা আমি স্বহস্তে কাঠগুলি সরাইয়া সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মুখ তুলিয়া সাধু ইঙ্গিতে বলিলেন,—আগে যাও; মিলিবে। আমি আর কিছু না বলিয়া অগ্রসর হইলে 'আও—আও;' বলিয়া তিনি আমায় পুনরায় আহ্বান করিলেন। আমি নিকটে আসিলাম; সন্ন্যাসী তখন হাসিমুখে এক খণ্ড কন্দমূল আমার হাতে দিলেন। কাঙ্গালের মত আগ্রহের সহিত সেই কন্দমূলখানি লইয়া আমি মুখে ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর তিনি একটী বাঁশের চোঙ্গা হইতে চরণামৃতের মত কয়েক বিন্দু গঙ্গাজল আমার হাতে দিলেন। আমিও পিপাসিত ভক্তের মত মস্তকে ও বক্ষে স্পর্শ করাইয়া উহা দ্বারা কণ্ঠনালী ভিজাইয়া লইলাম। আমার জঠর এই পানাহারের সন্ধান পাইয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু উহা তখনকার মত মন্ত্রশক্তিবৎ আমায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিল না। তৃপ্ত হৃদয়ে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মিলেগা বাবা?'

'হাঁ;—জরুর মিলেগা;' বলিয়া তিনি যথাপূর্ব্ব আসনে স্থির হইলেন। আমিও অগ্রসর হইলাম।

৭৬

সাধুর কথামত আমি আগে চলিয়াছি। গভীর হইতে গভীরতর বনে অগ্রসর হইতে হইতে দেখি অদূরে কতকগুলি সংগৃহীত শুষ্ক কাষ্ঠ পার্শ্বে রাখিয়া এক রমণীমূর্ত্তি একটী শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া রহিয়াছে। মেয়েটী যুবতী; দেখিলে মনে হয় বয়স আঠার বিশের অধিক হইবে না; মুখের ভাব অতি কমনীয়; দৃষ্টি সহজ সরল। এই নিবিড় বনে একাকিনী রমণীকে দেখিয়া

আমি বিস্মিত হইলাম। আবার মনে হইল, বনে যাহাদের বসবাস, তাহারা ত বন্য জীবের মতই নির্ভয় হইবার কথা। যুবতী আমাকে দেখিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল। আমি তাহার হাসির কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হিঁয়া তুমারা ঘর হায় ?'

নীরবে মাথা নাড়িয়া সে উত্তর করিল—না।

'তুমু কাঁহা যাওগে ?'

প্রশ্নের উত্তরে রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অস্পষ্টস্বরে কি যে বলিল, আমি বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝিলাম না। যুবতীর সম্মুখ দিয়া আমার অগ্রসর হইবার রাস্তা ; সেই জন্য আরও অগ্রসর হইয়া তাহার সম্মুখে গিয়াই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কাঁহেকো হিঁয়া একেলা বৈঠা হায়—তুমারা কোই সাথী হায় ?'

রমণী তখন ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক সংকেতে জানাইল—তাহার সাথী ভগবান ছাড়া আর কেহ নাই। আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যা আগত প্রায় ; এমন সময় এই গভীর অরণ্যে একাকিনী কে এই রমণী ?' সামান্য কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক এমন বিপদসংকুল স্থানে কেনই বা সে বসিয়া রহিয়াছে ?—আবার বলিতেছে, ভগবান ভিন্ন তাহার অন্য বন্ধু নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমি তাহার পানে তাকাইয়া আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম—অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি দিয়া কয়েকটী বন্য ঘোটক হ্রেষারব করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া যুবতী চমকিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, 'ডরো মৎ ; উয়ো শের নেহি ; ঘোড়া হায়।'

যুবতী দণ্ডায়মান হইয়া, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বহুদূর দেখিয়া, যখন বুঝিল ঘোড়াগুলি চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল ; সে তখন আমাকে বলিল, 'ভাগ গিয়া ;—দুষ্মণ আদ্মি দেখনেসে কাট লেতা।'

এই কথা বলিয়া সে আবার বসিল। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই। ভাবিলাম,—একি মায়াজাল ? আমি কেন এখানে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি ?—অগ্রসর হইতে চাই ; পা চলে না। ইন্দ্রিয়জন্য মন চলিবার ইচ্ছাকে আমল দেয় না ; বুদ্ধিও মনের সহিত যোগ দিয়া বলে—আহা ! এই নির্জ্জনে একা অসহায়া মেয়েটীকে ফেলিয়া যাওয়া কি ঠিক ? উহার যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া উচিত নয় কি ?

আমি মহা সমস্যায় পড়িলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, বিবেক যেন রোষকষায়িত লোচনে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমার তখন 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' এইরূপ অবস্থা। স্থির করিলাম শ্যামই রাখিব ; আমার কুল যায় যাক। যদি ইহাতে আমার মনুষ্যত্বের মূলেও আঘাত লাগে—লাগুক ; আমি

আর মুহূর্ত্তের জন্যও এ স্থানে দাঁড়াইব না। আমার বিবেক বলিয়া দিতেছে —এই দয়ার মূলে মলিনতা লুক্কায়িত আছে। নির্জ্জন বনে একাকিনী যুবতী নারীর প্রতি এই যে স্নেহ, এই যে করুণার উদয় হইতেছে, ইহা স্বচ্ছ সরল ও পবিত্র নহে; ইহার মধ্যে রিপুর চাতুরী এবং মানসিক দুর্ব্বলতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহা প্রবৃত্তির প্রশ্রয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রবৃত্তির দাসত্বের যে সুখ তাহা আপাতমধুর। অতএব এই করুণা হইতে বিরত হও।

একবার মনে হইল, সত্যই কি তাই? না—পাছে আমার মনে কোন রূপ বিকার আসে, সেই ভয়েই আমার এই চাঞ্চল্য উপস্থিত? যাহাই হউক, কিছুই যখন বুঝিতে পারিলাম না, তখন চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু ভগবানের কি পরীক্ষা! যেই এক পা অগ্রসর হইয়াছি, অমনিই যুবতী হাসিয়া আমার পিছনের কাপড় টানিয়া ধরিল। আমি যেন মরমে মরিয়া গেলাম। আমার ইন্দ্রিয়নিচয় আমার পশ্চাৎ আকর্ষণ করিতে লাগিল। নির্জ্জনে একাকী দস্যুদলের হাতে পড়িয়া ধনীর যে দুর্দ্দশা হইয়া থাকে, আমারও অবিকল সেই দুর্দ্দশা হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম আমার অন্তরে বাহিরে শত্রু। তখন আমার দুর্ব্বলতার মূল কারণ সেই সহানুভূতির ভাবকে দূরীভূত করলাম এবং উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সকোপ তীব্র দৃষ্টিতে একবার রমণীর দিকে তাকাইলাম। অকস্মাৎ আমার ভাবের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া যুবতী মস্তক নত করিল; চোখে চোখে আর আমার দিকে চাইতে পারিল না। আমিও আর কিছু বিচার না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেয়া মায়ি? কহো।'

মা আমার নীরব। আমি পুনরায় কহিলাম, 'থোড়ি দূর এক সাধু হায়! হুঁয়াপর যাওগে? যানে কা হো ত চলো।'

মাথা নাড়িয়া সে জানাইল—যাইব না।

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তব কেয়া মাংতা?'

রমণী সংগৃহীত কাষ্ঠগুলি আমায় দেখাইয়া দিল। আমি বলিলার, 'হিঁয়া পর ধুনি জ্বালায়কে বৈঠোগে?'

এবার সরল দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'হাঁ।'

আমি বলিলাম, 'হামারা পাস ত সালাই নেহি হায়।'

যুবতী তখন কতকগুলি শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তরের উপর স্থাপন পূর্ব্বক আর এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা আঘাতের পর আঘাত দিতেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এত সহজে কিরূপে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ভাবিয়া বিস্মিত উৎসাহে শুষ্ক ডাল পালা কুড়াইয়া আমি অগ্নিতে ইন্ধন দিতে লাগিলাম। রমণী ভালরূপে আগুন জ্বালিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল; এবং আমাকেও সঙ্কেতে তাহার নিকট বসিতে বলিল। আমি সে সঙ্কেত অগ্রাহ্য করিয়া বলিলাম, 'মায়ি! হামকো বহুৎদূর যানে হোগা।' এই

কথা বলিয়া এক মুহুর্ত্তের জন্যও আর দাঁড়াইলাম না ; দৃঢ় পদে অগ্রসর হইলাম। রমণীর কথা আর মোটেই মনে স্থান দিব না, এইরূপ সংকল্প করিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারে নির্জ্জন বনভূমির মধ্য দিয়া একা চলিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া একবার ফিরিয়া দেখিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! আগুনের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর দেখিতে পাইলাম না। ভালরূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য কয়েক পদ ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু কই ? কিছুই ত দেখিতে পাইলাম না ? মনে হইল—এ আবার এক নূতন স্বপ্ন !

৭৭

দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দুর্গম বনপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমেই আমি অগ্রসর হইতেছি। মন বুদ্ধি অহংকার সমস্ত আজ তৎপদে সমর্পণ করিয়াছি ; শ্বাসে প্রশ্বাসে শুধু তাঁহারই নাম হইতেছে। আজ আমি নির্ভয় ; প্রাণে আমার প্রভুত বল ; মনে মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি। তদ্ভাবে যেন আজ আমায় বিভোর করিয়া তুলিয়াছে। ভাবোন্মত্তের মত প্রকৃতির সেই বিশাল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আত্মহারা আমি আনন্দের উচ্ছ্বাসে গান ধরিলাম।—

ওগো ! আমি পথ ভুলেছি বলে ;—  
নেবে নাকি হাত ধরে নাথ ! যাব কি ধূলার তলে ?  
জগৎ তোমার যুক্তি করে,  
আমার পানে চায় না ফিরে,  
তাই, একা আমি ঘুরে ঘুরে চলছি আমায় ফেলে।  
খেটে খেটে সারা দিবস,  
ভঙ্গ দেহ হল অবশ ;  
আর চলতে যে পারি না সখা ! যাচ্ছে চরণ টলে।  
ভবের বোঝা মাথায় নিয়ে,  
উদাস প্রাণে চলছি ধেয়ে,  
আমার, অশ্রুধারা গণ্ড বেয়ে পড়ছে বক্ষঃস্থলে।  
জানি তুমি প্রেমের পাথার,  
জুড়ে আছ বিশ্ব সংসার,  
যেখানেই ডুবি না নাথ ! রইব তোমার কোলে।  
তলিয়ে যাব তোমার তলে তোমার নামের বলে॥

সৌভাগ্য ক্রমে জনমানবশূন্য বনপ্রদেশেই আমি এই গান ধরিয়াছিলাম ; নতুবা অপরের কর্ণে উহা ভীমসেনের সঙ্গীতের মতই শ্রুতিমধুর হইত ; কারণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সঙ্গীতে আমি সরস্বতীর বরপুত্র। তথাপি আপন ভাবের আনন্দে সেই সঙ্গীতেই আমি ডুবিয়া গেলাম। বনভূমির ভয়াবহ গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া আমার গানের ঝঙ্কার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বন্য পশুপক্ষীরাও সাড়া দিয়া যেন আমার গানের প্রশংসা করিতে লাগিল। সঙ্গীত-শেষে মনে হইতে লাগিল যেন আমি বেশ সুস্থ সবল সহজ অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছি। এই ভাবে সেই গভীর বনে আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম একটী বিল্ববৃক্ষের নিম্নে আসনোপযোগী একখানি প্রস্তর রহিয়াছে। স্থানটী অতি মনোরম এবং অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুদূর প্রবাসে আশাতীতভাবে আত্মীয় সন্দর্শনের মত স্থানটী দেখিয়া আমি আনন্দে অধীর হইলাম। ছুটিয়া গিয়া সেই বিল্ববৃক্ষটীকে আলিঙ্গন করিলাম এবং প্রণামের ভাবে উহার পাদদেশে মস্তক স্পর্শ করাইয়া যেন মায়ের কোলের মত উহার আশ্রয়ে বসিয়া পড়িলাম। আর আমার কোনরূপ উদ্বেগ নাই; পূর্ব্ব দিবসের মত এদিন আর ভূত প্রেতের বিভীষিকা দেখিতেছি না; যাহা দেখিতেছি যাহা শুনিতেছি, সবই যেন পরিচিত সবই যেন প্রিয়। এরূপ নির্ভয় নিরুদ্বেগ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্ব দিবসের কথা স্মরণ করিয়া আমার বহির্ব্বাসের দ্বারা আমি নিজ শরীর সেই বিল্ববৃক্ষের সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া পুনরায় মনের আনন্দে গান ধরিলাম—

তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি অবনীতে;
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক হে! এই আশা সদা চিতে।
তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হতেছে পরমানন্দ স্বামী!
তোমারই বাসনা মন্দিরে বসে সদা যেন হেরি আমি।
আর কোন সাধ জাগে না এ চিতে,
আর কোন আশা আসে না ছলিতে।
শুধু, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রার্থনা দিবাযামী।
তোমারই আদেশে দেশ বিদেশে
তব বোঝা নিয়ে চলিগো হরষে,
না যেচে মজুরী তোমারই কাছে সেধে নিছি ভার মাথে।
সাধ বড় প্রাণে জীবনে মরণে ঘুরি তব সাথে সাথে।
সখা! ঘুরি কর্ম্ম নিয়ে মাথে॥

মনের আবেগে বনভূমি কাঁপাইয়া মুক্তকণ্ঠে গান গাহিতেছি, কৃষ্ণপক্ষের তমোরাশি ভেদ করিয়া তৃতীয়ার চাঁদ সবেমাত্র দেখা দিয়াছে, এমন সময়ে প্রকৃতির এক অভিনব লীলা আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বনস্থলীর ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্যমান নক্ষত্রপুঞ্জ অদৃশ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠিল; এবং মুহুর্মুহুঃ মেঘগর্জ্জন শ্রুত

হইতে লাগিল। সে কি ভীষণ ঝড়! আবার যেমন ঝড় তেমন মুষলধারে বৃষ্টি; তাহার উপর ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিয়া সেই বিজন বনের গাঢ় অন্ধকার গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছিল। কি ভীষণ সে দুর্যোগ। প্রকৃতির কি প্রলয়ংকরী লীলা! হায়! এমন চাঁদের আলোর পরিবর্তে ধরণীর বুকে এই গাঢ় অন্ধকার ঢালিয়া দিয়া কে এই অশান্তির সৃষ্টি করিল? কোথা হইতে এত ঝড় ঝঞ্ঝা আসিল? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একটী কথা মনে হইতেই এমন বিপদের মাঝেও আমার হাসি আসিল। মনে হইল, বোধ হয় আমি মেঘমল্লারে গান ধরিয়াছিলাম; তাহারই ফলে এই মেঘমালার আবির্ভাব। যাহা হইক নিজেরই হাসিতে নিজের ভাব ভংগ করিয়া আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। তাহা না হইলেও, আর ত আমি ভয়ে বিহ্বল হইব না; এবার যে আমি অচল অটল; আমার মন প্রাণ যে ভগবানে উৎসর্গীকৃত।

ঝড় ঝঞ্ঝা বর্ষণ গর্জ্জনেই সারারাত্রি কাটিল। প্রভাতে আকাশ নির্ম্মল হইলে সূর্য্যোদয়ে চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। আহা! প্রকৃতির নিস্তব্ধতা কি মনোরম! কি হৃদয়োন্মাদক! নির্জ্জন বনভূমিতে একা আমি নিস্তব্ধ প্রকৃতির সংগে নীরবে কত কি আলাপ করিতে লাগিলাম। সে যে কত স্নেহ, কত অনুরাগ সুখ দুঃখ জড়িত কত প্রেমালাপ, লেখনীর সাহায্যে তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব? জীবনে যদি কাহারও সে সুযোগ উপস্থিত হয়, বৈরাগ্যের প্রবল আকর্ষণে যদি কেহ কখনও সেরূপ স্থানে উপনীত হন, আর তখন এ অধমের কথাগুলি যদি মনে থাকে—এ স্বপ্নজীবনের বনপর্ব্ব যদি স্মরণে জাগে, তাহা হইলে অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া লইবেন; এই মাত্র বলিতে পারি।

ক্রমেই যত বেলা হইতে লাগিল, ততই ক্ষুৎপিপাসার তাড়না অনুভব করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল; ক্ষুধার জ্বালায় জঠরে একরূপ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। কখনও মনে হইতেছি বুঝি পেট কামড়াইতেছে; আবার কখনও মনে হয়—না; বমি হইবে। কিন্তু কি করিব? আমি নিরুপায়। কারণ ইতিপূর্ব্বে বৃক্ষকাণ্ডের সহিত যখন এই দেহ নিজ বহির্ব্বাসের সাহায্যে বাঁধিতেছিলাম তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, হয় ঠাকুর দয়া করিয়া আমার বিশ বৎসর সাধনা হইতে অব্যাহতি দিয়া যাইবেন; না হয় এ দেহ বৃক্ষমূলেই থাকিবে। এখন ত আমি সে প্রতিজ্ঞা ভংগ করিতে পারি না। হিংস্র জন্তু দেখিয়া প্রাণভয়ে পাছে অস্থির হইয়া পড়ি বলিয়া নিজেকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। আর এখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া সেই বন্ধন খুলিব? কখনই নহে। মনে মনে এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছি এমন সময়ে দৃষ্টি পড়িল বৃক্ষনিম্নে পতিত ছোট ছোট দুইটী শ্রীফলের উপর। আনন্দে বুক ভরিয়া গেল; হাত বাড়াইয়া ফল দুইটী কুড়াইয়া লইলাম। মনে হইল দয়াল ঠাকুর দয়া করিয়া দুটী ফল আমায় খাইতে দিয়াছেন। ফল

দুইটীতে প্রায় আধ পোয়া হইবে ; ইহাতে অবশ্যই ক্ষুধা মিটিবে। পূর্ব্ব দিনে সন্ন্যাসীর দেওয়া সামান্য কন্দমূলে তিন দিনের ক্ষুধা দূর হইয়াছিল। আর ইহাতে আজ চলিবে না ? এইরূপ ভাবিয়া হৃষ্ট মনে সেই অপক্ক শ্রীফল দুইটী ভক্ষণ করিলাম। বিস্বাদে মুখ ভরিয়া গেল ; বুক জ্বলিতে লাগিল ; ক্ষুধাও অন্তর্হিত হইল। পরে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বনভূমি মথিত করিয়া আবার গান ধরিলাম—

সখা ! দেখা দাও আমায়।
(নইলে যে এ জীবন যায়)
ত্রিতাপ তাপিত তৃষিত এ চিত,
তোমারই ভাবনায় বিমুগ্ধ সতত
কবে কাছে এসে দেখা দেবে হেসে,
হেরিব মধুর অধর হায় !
(সখা ! হেরিব মধুর অধর হায়)
হেরিব জানি না কবে সে বদন,
ভেবে, হতেছে দহন ঝরে দুনয়ন,
ওহে ! নীরদ বরণ শুন নিবেদন,
বারেক নয়ন দেখিতে চায়।
(তোমায়, বারেক নয়ন দেখিতে চায়)
নহিলে অকালে এ কাল সলিলে,
ডুবে যাব সখা ! নয়নের জলে,
বাসনা রহিবে, হিয়া জ্বলে যাবে ;
সখা ! তুমি দুখ পাবে তায়।
(ওহে তুমি দুখ পাবে তায়)
অধর কোমল সুবিমল হাসি,
সুধা বিমণ্ডিত যেন পূর্ণ শশী,
তাহে দুখরাশি যদি পশে আসি,
এ পাতকী হবে দায়ী তায়।
(সখা ! এ পাতকী হবে দায়ী তায়)
দায়ী শুধু নয় দহনের ভয়,
জ্বালার উপর জ্বালা আর কত সয়,
হও হে ! সদয়, ওহে সদাশয় !
নইলে যে হে আমি নিরুপায়।
(সুখময় ! আমি নিরুপায়)

এইরূপ হাসি কান্না, কথা ও গান লইয়া সেই বিজন বনে দুই দিন অতিবাহিত হইল। কিছুতেই আর আমায় বিচলিত করিতে পারিল না। আমার মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্তধ্বনিতহইতে লাগিল—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।' তৃতীয় দিবস একরূপ হতচেতন অবস্থাতেই আমি কাটাইতে লাগিলাম। আমার আর মাথা সোজা করিয়া বসিবার ক্ষমতা রহিল না। বৃক্ষকাণ্ডে মাথা রাখিয়া মুদ্রিত নয়নে সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলাম। সন্ধ্যা হইতে না হইতে বনভূমি আবার সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। নিজ দেহ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না। আবার চক্ষু মুদিলাম। নির্জীব দেহে বিন্দুমাত্র শক্তি নাই ; কিরূপেই বা থাকিবে ? প্রায় ছয় দিন একরূপ অনাহারী। তাহার উপর বর্ষার সেই মুহুর্মুহুঃ বর্ষণে বস্ত্রাদি ভিজিয়া শীতে দেহ থরথর কাঁপিতেছে। আমি যেন ক্রমেই অবশ অসাড় হইয়া পড়িতেছি। তথাপি মনে কেবল আনন্দ ; কারণ মৃত্যু হইলেই যে সকল দুঃখ সকল জ্বালা দূরে যাইবে। সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইব ; ঠাকুরের কোলেই স্থান পাইব।

সেই তীব্র বৈরাগ্য, স্বকার্য্য সাধনের সেই দৃঢ় সংকল্প বস্তুলাভের জন্য সেই মরণপণ চেষ্টা ; মানবজীবনে এক অতি পবিত্র শুভ সংযোগ। এই শুভ যোগের সৌভাগ্য জীবনে অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। সে বিবেক বৈরাগ্য এখন আর আমার নাই ; এখন সেদিনের কথা মনে হইলে আনন্দে আমার বুক ভরিয়া যায়। সে যাহা হউক, সেই নিস্পন্দ নির্জীব অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। আমি তন্দ্রাজড়িত অবস্থায় পড়িয়া আছি, এমন সময় বোধ হইল, পিছন হইতে কে যেন আসিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইল। তন্দ্রাঘোর কাটিয়া গেল ; কিন্তু চোখ চাহিবার শক্তি নাই। আমি শুধু উৎকর্ণ হইয়া আগন্তুকের পদশব্দ শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় চুপ করিয়া পড়িয়া আছি, এমন সময় শুনিলাম, 'অন্নদা ! আর তোমায় বিশ বৎসর সাধনা করতে হবে না ; দু বৎসরেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হবে। তুমি যাও, এক বৎসর গৃহে পিতৃমাতৃ সেবা,—আর এক বৎসর সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে সেই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করগে। তাতেই তোমার বিশ বৎসরের সাধনা সিদ্ধ হবে ;—তারপর বার বৎসরের মধ্যে তোমার মন্দিরের কাজ আরম্ভ হবে।'

একি শুনিলাম ! এ যে পরিচিত কণ্ঠস্বর ! এ যে আমার চির নূতন, চিরপ্রিয়, চিরপরিচিত, আপন জনের কণ্ঠস্বর। কথাগুলি শুনিয়া চমকিত ভাবে চোখ চাহিয়া দেখিলাম। কিন্তু কই ? কাহাকেও ত কোথাও দেখিতে পাইলাম না ? এ কি স্বপ্ন ! এ কি প্রহেলিকা ! না এ দৈবাদেশ ? হায় ! এ আদেশ যে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় একেবারে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চারিত ! কি হতভাগ্য মূর্খ আমি ! বার বার এমন হাতে পাইয়াও হারাইতেছি ! এই ভাবিয়া প্রাণে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। নিজ নির্বুদ্ধিতায় সহস্র সহস্র ধিক্কার

দিলাম। কিন্তু আর এক দিক দিয়া প্রভূত আনন্দস্রোত আসিয়া আমার সেই জ্বালা যন্ত্রণা মুছিয়া দিল। আনন্দে হৃদয় প্লাবিত করিয়া মনে হইতে লাগিল —আর কি? এখন আমি বিশ বৎসরের সাধনা দুই বৎসরে শেষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবানের মন্দির স্থাপন করিতে পারিব। সেই মন্দিরে প্রতি বৎসর অন্ততঃ তিন জন ভক্ত ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া ভগবানের কার্যে, দেশের ও দশের কার্যে আত্মোৎসর্গ করিবে; জীব দেখিবে ভগবান সত্য সত্যই আছেন; ভাগ্যবান জীবকে তিনি দয়া করিয়া দর্শন দিয়া থাকেন। দেশে আবার সাকার ঈশ্বরের যথাবিধি পূজার প্রচলন হইবে। দুর্বল চিত্ত মানবের প্রাণে আবার তিনি প্রতিভাত হইবেন।

৭৮

প্রাণভরা আশার অবশ্যম্ভাবী সফলতার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বৃক্ষকাণ্ড হইতে বহির্বাস উন্মোচন করিয়া বন্ধনমুক্ত হইলাম। শৃঙ্খলমুক্ত শার্দূলের মত স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে প্রভূত শান্তি ও প্রচুর বল অনুভব হইতে লাগিল। জীবন্মৃত আমি তখন সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়াছি। আর কি আমায় ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়ে কাতর করিতে পারে? আমি বার বার প্রণাম করিয়া অশ্রুজলে সেই প্রস্তরাসন সিক্ত করিলাম এবং প্রিয়জনের নিকট বিদায় লওয়ার মত করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হই, আর এক একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সেই আসনের দিকে ফিরিয়া দেখি; অতি বড় আত্মীয়ের মত যেন তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে আর আমার পা সরে না; এমন সময় দেখিলাম বনের অন্তরালে গগনের কোলে চাঁদ উঠিতেছে। চন্দ্রোদয়ে আমি অধিকতর আনন্দ অনুভব করিলাম এবং একবার দাঁড়াইয়া বিল্ববৃক্ষমূলে প্রস্তরাসনখানি ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লইলাম। তারপর সে স্থান হইতে বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

চাঁদের আলোয় বনভূমি হাসিতে লাগিল। সেই হাসিতে হাসি মিলাইতে গিয়া আমি চোখের জলে বুক ভাসাইলাম; ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইতে ভাবনা হইতে লাগিল আমি কোথায় যাইতেছি? কোন দিকে গেলে আমি স্বর্গাশ্রমে পেঁছিব? একবার ফিরিয়া দেখিলাম। এবার আর বিল্ববৃক্ষ পর্যন্ত দৃষ্টি গেল না। আমি তখন 'জয় গুরু' 'জয় মা' বলিতে বলিতে সেই রজনীতেই নির্জন বনভূমি অতিক্রম করিতে লাগলাম। বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি কি গভীরতর বনে, চলিয়াছি তাহা তখন এক মাত্র ভগবানই জানেন। এই ভাবে দুই তিন ঘণ্টা চলার পর লক্ষ্য করিলাম একস্থানে ধুনির মত অগ্নি জ্বলিতেছে। দূর হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি লক্ষ্য করিয়া এক মনোরম স্থানে আসিয়া

উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে পেঁাছিয়া দেখিলাম চার জন ঋষিতুল্য সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন ধ্যানস্থ অবস্থায় রহিয়াছেন; আর একজন আমাকে লক্ষ্য করিয়া আহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিল গিয়া বাবা?—মিল গিয়া?'

কি মিলিয়াছে বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি ক্রমে তাঁহার আরও নিকটে আসিলাম। তিনি পুনরায় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিলা কি নেহি?—যো মাংনে আয়া, ওহি মিলা তো?'

সাধুর মুখে হিন্দী শুনিয়াও আমার কেমন মনে হইল ইনি হিন্দুস্থানী নহেন—বাঙ্গালী; তাই বাংলাতেই বলিলাম, 'বাবা! আপনি কেমন করে জানলেন যে আমি কিছু পাবার সংকল্প করে এখানে এসেছিলুম?'

সাধু তখন বাংলায় বলিলেন, 'হাঁ, আমি জানি, তুমি পেয়ে গেছ ত?'

'হাঁ; পেয়েছি।'

'বেশ বেশ, তুমি না পেলে কে পাবে?—এখন বাংলায় যাও; কাজ করগে।,

আমি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি কি পেয়েছি তা কি আপনি জানেন? না অমনি আন্দাজে আমায় বাংলায় যেতে বলছেন?'

সাধু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সরলভাবে হাসিয়া বলিলেন, 'বাবা! তোমায় যিনি পাঠিয়েছেন, বা তোমার প্রাপ্য যিনি তোমায় বুঝিয়ে দিলেন, তাঁকে আমরা বেশ জানি; তিনি বাংলার অধ্যাত্ম যজ্ঞের প্রধান হোতা—জগৎগুরু রামকৃষ্ণদেব। কেমন? ঠিক ত?'

তখন আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলাম না। একেবারে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিলাম, 'বাবা! আপনারা কে? আমায় বলুন; আমি যে এমন অন্তর্যামী সাধু আর কখনও দেখি নি।'

তিনি আমায় আশ্বস্ত করিয়া অপর তিন জনকে দেখাইয়া বলিলেন, এঁদের ধ্যান-ভঙ্গ হবে; তুমি অত অধীর হয়ো না। শোন বলি; তুমি আর বাংলা ছেড়ে এসো না। আমরা বিশেষভাবে জেনেছি এবারকার প্রেমের নিশান বাংলাতেই উড়বে;—বাংলাই বিশ্বজগৎকে অধ্যাত্মভাবের ভাবুক করে তুলবে;—ভগবানের প্রকট আবির্ভাব বাংলাতেই হবে। তুমি ত সবই জেনেছ; সবই পেয়েছ;—আর ভাবনা কি? এখন শত বিপদ, সহস্র বাধা, অসংখ্য শত্রুও যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—তুমি অচল অটল হিমাদ্রির মত স্থির থাকবে। নবীন উদ্যমে অদম্য উৎসাহে নির্ভীক-ভাবে শুধু তাঁর কথা তুমি জীব জগৎকে শুনিয়ে যাবে;—তিনি যা যা বলে দিয়েছেন আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে অসংকোচে বারবার শোনাবে। তোমার ভাবনা কি বৎস? তোমার ভয় কি? তুমি আজ যে রত্নের অধিকারী হয়েছে, তাতে তুমি যখনই ডোব না কেন, যেখানেই ডোব না কেন, তুমি অমৃতময় হয়ে যাবে। আত্মোৎসর্গের নিবিড়তম অনুভূতি যখনই তোমার মনে জাগবে, তখনই তুমি

সদানন্দসাগরে অবগাহন কর্‌তে পার্‌বে; অন্তরে বাইরে প্রেমময়ের মোহনমূর্ত্তি দর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হতে পার্‌বে। তখন ত্রৈলোক্যের আধিপত্যও তোমার কাছে তুচ্ছ হবে। আজ প্রেমলীলা রঙ্গের অঙ্গ হয়ে, তুমি যে প্রেম প্রবাহের অগ্রদূত রূপে বাংলায় যাচ্ছ, কালে দেখ্‌তে পাবে সহস্র সহস্র নরনারী সেই মহাপ্রেমস্রোতে ভেসে গন্তব্য পথে ছুটে চলেছে। তাই আবার বলি—তোমার কোন ভয় নেই; সমস্ত বাধা বিপত্তি পদদলিত করে, সকল কলংক বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে, তুমি অকুতোভয়ে অগ্রসর হও।'

যতিবরের উৎসাহের আবেগে আমি যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার আর বিশেষ কিছু জানিবার ইচ্ছা রহিল না; শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা! আপনি কেন বাংলায় যান না?'

তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবা! আমরা এখান থেকেই বাংলার মঙ্গলের জন্য সাধনা কর্‌ছি; আমাদের আর অন্য কোন সাধনা নেই।'

'আপনি কি ঠাকুরকে দেখেছেন?'

'না বাবা! দেখি নি; কি করে দেখ্‌বে? আমি যখন বাংলা ছেড়ে আসি, তখন তোমার ঠাকুর কোথায় ছিলেন কে বল্‌বে?'

'আপনার বয়স এখন কত?'

'বয়স কত ঠিক বলতে হলে আবার আমায় সাধনা কর্‌তে হবে?'

'তবু আন্দাজ কত হবে?'

'আন্দাজ ধরে নাও দুশো ওপর।'

আমি অবাক হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, 'আপনি ত সবই জানেন; আচ্ছা এই যে আমাদের দেশে স্বরাজের কথা উঠেছে, কত কাল পরে এই স্বরাজ হবে?'

তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'স্বরাজ কথাটা উচ্চ ধরণের; ধরে নাও আজ থেকে বিশ বৎসরের পর এই বাংলাতেই প্রথম স্বারাজের আলো দেখ্‌তে পাবে; তারপর ক্রমে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌বে।'

'এর মধ্যে তার কোন আভাস পাওয়া যাবে না?'

'তোমার দুবৎসরের কাজের শেষদিনে একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। সেটা কিছুদিন স্থায়ী হয়ে আবার নিভে যাবে। তারপর আবার আর এক ভাবে বাংলায় আর একটা ঝড় উঠ্‌বে; তাতেই স্বরাজের স্বার্থকতা উপলব্ধি হবে; তারপর প্রকৃত স্বরাজ। ভারতের স্বরাজ!—ভারতের স্বরাজ!—' বলিতে বলিতে সাধুজী স্থির হইয়া আসিলেন। তাঁহার দৃষ্টিও স্থির হইয়া গেল; নীরব নিস্পন্দ ভাবে দশ পনর মিনিট অবস্থানের পর তিনি অট্টহাস্য করিয়া যেন ভাবের ঘোরে আবার বলিতে লাগিলেন,—'আস্‌ছে; সবাই আস্‌ছে।—তোদের আর ভয় কি? ভাবনা কি?—তোরা সব বুক বেঁধে

আগ্রহ কেন? ইহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ আমার শরীর বড়ই দুর্ব্বল; স্বর্গাশ্রম ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছিল না। দ্বিতীয়তঃ আমি তখন নিঃস্ব। সাধু সাজিয়া রেল কোম্পানিকে রম্ভা প্রদর্শন করিতে মোটেই রাজী ছিলাম না। তাহা ছাড়া তখন আমার সাধ্য কি যে আমি স্বর্গাশ্রম ছাড়িয়া আসি? আমাকে লইয়া যে সেখানে আরও অনেক অভিনয়ের আয়োজন ঠাকুর করিয়াছিলেন। আমার যে সেখানে দেখিবার শিখিবার আরও অনেক বাকী ছিল। কাজেই নূতন করিয়া একটা আদেশ পাইবার মতিগতি আমার হইবারই কথা। আপনারা অভিনিবেশ সহকারে ঘটনাগুলি অনুধাবন করুন। দেখিতে পাইবেন, মানুষের জীবনে কত ঘটে; মানুষের সঙ্গে ভগবান কত ভাবে কত লীলা করেন।

কয়দিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। আজ দ্বাদশী; কাল একাদশীর অল্পাহারের পর আজ ডাল রুটি মিষ্টান্ন প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত আহার্য্য লইয়া গঙ্গাতীরে একটী শিলাখণ্ডের উপর আসিয়া বসিয়াছি। সত্র হইতে আহার্য্য লইয়া আমি প্রায়ই এই স্থানে বসিয়া আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক কুঠিয়ায় ফিরিতাম। যথারীতি খাদ্যদ্রব্যগুলি সম্মুখে লইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইব, এমন সময় দেখি দুটী পাহাড়িয়া বালক বালিকা একটী নূতন মাটীর কলস লইয়া কিছু দূরে গঙ্গায় জল লইতে আসিয়াছে। আমি চক্ষু মুদিয়া ৺আদ্যামাকে 'মা, খাও' বলিয়া আহার্য্য নিবেদন করিতে করিতে ধ্যানে সেই পাহাড়িয়া বালিকাকেই দেখিতে পাইলাম। মনে বড়ই ধিক্কার আসিল। বালিকাটীর বয়স প্রায় চৌদ্দ পনর। দেখিতে তেমন সুশ্রী না হইলেও হাবভাব বড় মধুর; ভাবিলাম, আজ আবার মা কোন মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছেন! যাহাই হউক, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' এই মহাবাক্য মনে মনে উচ্চারণ করিয়া সেই মূর্ত্তিকেই আহার্য্য নিবেদন করিয়া দিলাম। তাহার পর রুটি লইয়া একটীবার মাত্র মুখে দিয়াছি, আর মৃদু হাস্যময়ী সেই পাহাড়িয়া মা আমার নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে বলিল, 'হামকো ভি বহুত ভুখ লাগা; কুছ খানে দিজিয়ে।'

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাই ত! মেয়েটী কে? উহাকে দেখিয়া আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বনপ্রবেশের পথে সেই যে এক পাহাড়িয়া যুবতীর অস্বাভাবিক আকর্ষণে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলাম, এ মেয়েটী যেন ঠিক তাহারই মত; তবে তাহাকে যেন আরও প্রাপ্তযৌবনা বলিয়া বোধ হইয়াছিল; যাহা হউক, আমি মেয়েটীর দিকে তাকাইয়া থাকিলে হাসিমুখে বিনীতভাবে সে আবার আমায় বলিল, 'দিজিয়ে সাধুজি! হামকো বড়ি ভুক লাগা।'

বালিকার করুণ দৃষ্টি ও কাতর অনুনয়ে আমি আত্মহারা হইলাম। 'ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাম্।' কোনরূপ সদসৎ বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বভূতে বিরাজমানা ক্ষুধাদেবীর তৃপ্তিকল্পে বালিকাকে রুটি দিবার জন্য যেমন আমি হাত

দাঁড়াইয়াছি, অমনই দূর হইতে 'ঝুঠা মৎ দিজিয়ে ; ঝুঠা মৎ দিজিয়ে ;' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বালক নিকটস্থ হইয়া কুপিত দৃষ্টি সহকারে বালিকাকে বলিল, 'তুম ঝুঠা খানে কো আয়া ?'

বালিকা আহতভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'কেয়া সাধুজি ? —ঝুঠা হ্যায় ?'

আহা ! মেয়েটী হাত পাতিয়া ক্ষুধার আহার লইতেছে ; আর এমন সময় এই বিড়ম্বনা ? হায় ! হায় ! বেচারা হয় ত ক্ষুধায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। পরণে জীর্ণ বসন, মাথায় আলুথালু কেশ, ঘর্ম্মাক্তদেহ মেয়েটীকে দেখিলে মনে হয় যেন সে কত কাঁদিয়াছে, যেন তাহার মুখে চোখে তখনও অশ্রুচিহ্ন রহিয়াছে ; তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় স্নেহ, বড় দয়া হইল। আমি উত্তর করিলাম, 'কোন বোল্‌তা ঝুঠা ?'

অমনই বালক বলিল, 'আলবৎ ঝুঠা ; হাম দেখা—আপ্‌ খায়া।'

আমি বলিলাম, 'খায়া ত কেয়া হুয়া ? খানে মে নেহি ঝুঠা বন্‌তা ; ঈ সব মায়িকা প্রসাদী হায় ; প্রসাদী কভি ঝুঠা নেহি হোতা।—তুম খা লেও মায়ি !—বলিয়া একখানি রুটি মেয়েটির হাতে দিলাম। এক জনের আহারের মত তিন খানি মাত্র রুটি আমার কাছে ছিল। সানন্দে হাসিতে হাসিতে বালিকা রুটি লইল। রুটির উপর ডাল ও মিষ্টান্ন দিলাম। তখন বালকও বলিল, 'তবু হাম্‌কো ভি দেও।'

ছেলেটীকেও একখানি রুটি ডাল ও মিষ্টান্ন দিয়া আমি কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। 'আচ্ছা, আভি তুম খা লেও সাধু বাবা!' বলিয়া উহারা উভয়ে আমার পিছন দিকে গঙ্গাতীরে বসিয়া রুটি খাইতে লাগিল। আমিও হৃষ্টমনে অবশিষ্ট অংশ ভোজনান্তে জল পান করিয়া পশ্চাৎ চাহিয়া দেখি উহারা আর কেহ নাই। বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে উহাদের সন্ধান করিতে করিতে দেখিলাম, যে কলসটী লইয়া উহারা জল লইতে আসিয়াছিল সেটি অদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন মনে হইল, তাহা হইলে উহারা চলিয়া যায় নাই ; হয় ত কোথাও গিয়াছে, এখনই আবার আসিবে। এই মনে করিয়া প্রায় এক ঘণ্টার উপর সে কলসের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু কই ? কেহ ত আসিল না ? আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলাম। তাই ত! ইহাও কি সত্য ঘটনা নয় ? ইহাও কি স্বপ্ন ? না মহামায়ার মায়া! ইতিমধ্যে দুই তিন জন সাধু সেখানে আসিলেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; তাঁহারা বলিলেন, 'হাঁ, এখানে পাহাড়িরা জল নিতে আসে বটে ; তবে ওরকম বয়সের দুটী বালক বালিকাকে ত কখনও আস্‌তে দেখি নি।—তা আপনি এক কাজ করুন না ; কলসীটী ত দেখ্‌ছি একেবারে নতুন ; এক দিনও ব্যবহার হয় নি। আপনার যদি জলের কলসী না থাকে ত ঐ কলসী করে এক কলসী জল নিয়ে

যান ; তারপর যদি এসে খোঁজ করে, তখন দিয়ে দেবেন। আপনাকে ত ওরা দেখে গেছে ?'

সাধুদিগের পরামর্শমত আমি এক কলস জল লইয়া কুঠিয়ায় গেলাম। কলস রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—সত্যই ত আমার জলের কলস নাই। তাই কি আজ এই কাণ্ড ঘটিল ? আরও কত কি যে মনে হইতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব ? ক্ষণে ক্ষণে সেই বালিকার হাসিমাখা মুখখানি—তাহার সেই করুণ দৃষ্টি ও কাতর অনুনয় আমার মনে পড়িতে লাগিল। বনপ্রবেশকালীন ঘটনার সেই বনচারিণীর সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিয়াও তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না,—এই দুঃখে হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া যাইতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া বৈকালে ভাগবত শুনিবার জন্য গঙ্গাতীরের সেই দ্বিতল গৃহে গিয়া বসিলাম। সেদিন প্রহ্লাদচরিত্র সম্বন্ধে কথা ছিল। একজন প্রৌঢ় পণ্ডিত কথকতা করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের মধুর চরিত্র সকলকে শুনাইলেন। শুদ্ধ অন্তঃকরণে সেই মধুর কাহিনী শুনিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গাতীরে বাঁধা ঘাটের অনতিদূরে এক শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিলাম। ঠিক সেই স্থানের পূর্ব্বেই একটী শিবালয় হইয়াছে ; তখন উহা ছিল না।

৮০

শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া অতীত জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিতে করিতে বৃন্দাবনের পথে কূয়ার ধারে সেই দর্শনের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল সেই ভুবনমোহন রূপ, সেই অপূর্ব্ব হাসি, সেই অমিয় বাণী, সেই স্নেহ-করুণ দৃষ্টি, সেই জল তোলা—জল খাওয়া ; যমুনাতীরের সেই প্রেমসঙ্গীত, সেই দর্শনের পর দর্শন, একে একে প্রাণবল্লভের অসংখ্য করুণার নিদর্শনের কথা মনে পড়িল। কিন্তু কই ? প্রাণনাথের সেই মনোমোহন বংশীবদন মূর্ত্তি ত কখনও দেখা হয় নাই। বৃন্দাবনধন আমার যে বাঁশীর সুরে সকলকে পাগল করিয়াছিলেন—কই ? আমার বংশীধারী সেই বাঁশীকরে ত কখনও আমায় দেখা দেন নাই। হাঁ—হাঁ—ঠিক বটে ; তাই আমি চিনিতে পারি নাই। তাই বারে বারে আমায় ভুলাইতে পারিয়াছিলেন ; বাঁশী দেখিলে নিশ্চয়ই আমি চিনিয়া ফেলিতাম। জ্ঞানে অজ্ঞানে, স্বপ্নে জাগরণে, যে অবস্থায়ই হউক, বাঁশীর সুর যদি কানে পেঁছিত, তাহা হইলে আর অমন ফাঁকি দিতে পারিতেন না। এইরূপ অনুশোচনা করিতে করিতে ক্রন্দনের আকুল আবেগে হৃদয় মথিত করিয়া গভীর প্রার্থনা চলিতে লাগিল। তখন আমি যেন আর আমাতে নাই ; আমি যেন আর এ ধরার এ মায়ারাজ্যের জীব নই ; তখন আমার আত্ম পর জ্ঞান নাই, স্বর্গ মর্ত্ত্যে ভেদ নাই, জীব শিবে পার্থক্য নাই, দেব ও দানবে দূরত্বের ব্যবধান নাই,

ভয় ভাবনা কিছুই নাই ; আছে শুধু অন্তর বাহির স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া এক আনন্দঘনশ্যাম মূর্ত্তি বিরাজমান। আর আমি সেই বিরাট বিশ্বব্যাপীকে ক্ষুদ্র আমারই মত নররূপ ধরিয়া বংশী করে আমারই সম্মুখে আবির্ভূত হইবার জন্য আরাধনা করিতেছি ; আমার হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি—আমার প্রাণের প্রাণ, প্রিয় দেবতা জ্ঞানে ভালবাসিতে চাহিতেছি ; যেন তিনি আমার কতই আপন—কত আত্মীয়। এইরূপ ভাবে নিমগ্ন অবস্থায় মাথার উপর দিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল ; তাহাতেও আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রেমানন্দে ডুবিয়া আমি আপন মনে গান ধরিলাম—

আহা! সে রূপ একবার দেখাও হরি!
যে রূপে গোকুলে ছিলে গোলকবিহারী!
নব-জলধর-রূপ শিরে শিখি পাখা—
পিঠে শোভে পীত ধরা হাসি প্রেম মাখা ;
মোহন তিলক ভালে ওহে ত্রিভঙ্গ মুরারী!
রাধা বলে আধ স্বরে বাজাতে বাঁশরী।
রুণু ঝুণু বাজে পায়ে সোনার নূপুর ;
চলিতে চঞ্চল গতি কিবা সুমধুর ;
দেখাও দেখাও হরি!
আহা! সে রূপ আমায় দেখাও হরি!
যে রূপ দেখায়ে ওহে! বঙ্কিমনয়ন!
হরে নিলে গোপবধূ-লাজ-কুল-মান।
শ্রীদাম সুদাম আদি সখা সঙ্গে লয়ে,
যে রূপে বেড়াতে বনে ধেনু চরাইয়ে।
দেখাও দেখাও হরি!
আহা! সেরূপ আমায় দেখাও হরি!

গান শেষ হইল। কিন্তু কই? প্রাণের জ্বালা ত নিভিল না? অভাব ত মিটিল না? বুক ভাঙ্গিয়া যেন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল ; হৃদয়ে যেন তীক্ষ্ন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। কি করি? কোথায় যাই? কোথায় গেলে শান্তি পাই? এইরূপ একটা দারুণ অস্থিরতা আমার অন্তর অধিকার করিয়া বসিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার নিজেকে নিজে উন্মাদ অজ্ঞ মূর্খ বোধে হেয় জ্ঞান করিতে ল্যাগিলাম। তথাপি শুধু মনে হইতে লাগিল, ভগবান কেন আমায় দেখা দিবেন না? বংশী হস্তে কেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন না? ভক্তের বাসনা তিনি কেন পূর্ণ করিবেন না? আবার মনে হইল, সে ভাগ্য কি আমার আছে? জানি না কোন ভাগ্যবলে ভক্ত ভগবানের সেই মোহন মূর্ত্তি দর্শন করে ; সেই মনমাতান, প্রাণ গলান, পাগল করা সুর শুনিতে পায় ;

সেই প্রেমরস আস্বাদন করিয়া পবিত্র হয়,ধন্য হয় ; পরম শান্তির অধিকারী হয়। এইরূপ কত কি ভাবনা ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখি—

আহা ! এমন সুন্দর কে ঐ বালক ! এমন রূপের আলোয় পার্ব্বত্য নদীতট আলোকিত করিয়া আসিতেছে কে ঐ বালক ! বেশভুষা দেখিলে মনে হয় যেন একটী বার তের বৎসরের পাঞ্জাবী বালক ; কিন্তু এত রূপ মাধুর্য্য ইতিপূর্ব্বে কোন বালককে দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। মাথার লম্বা চুলগুলি মোহনচূড়ারূপে বাঁধা ; তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ; সুঠাম সুন্দর অনাবৃত দেহে এক গোছা শুভ্র পৈতা বুকে উপর শোভা পাইতেছে। পরণে মালকোঁচা দেওয়া কাপড়, চরণে তাম্র পাদুকা, মৃণালভুজে একটী বাঁশী। বালকের দেহে যেন রূপ ধরে না। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম ! সে যখন আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আমার যেন কেমন একটা ধারণা হইয়া গেল যে, ছেলেটী নিকটেই বোধ হয় কোন কুঠিয়ায় থাকে ; পাঞ্জাবীর ছেলে, গঙ্গাতীরে বাঁশী বাজাইয়া গান করিয়া বেড়ায়। ভগবানের অপূর্ব লীলা কে বুঝিবে ? কে বুঝিবে এই ভ্রম কেন হয় ? ইহার তাৎপর্য্যই বা কি ? আমার আরও মনে হইল, যেন ঐরূপ পাঞ্জাবীর ছেলে, আরও কত দেখিয়াছি। কিন্তু এ ছেলেটি বড়ই সুন্দর, বড় সুদর্শন, বড় প্রেমিক। আহা ! কি সুন্দর সেই মুখখানি ! সেই আকর্ণ বিস্তারী যুগ্মভুরু, সেই বঙ্কিম নয়নের সেই মধুর দৃষ্টি, সে যেন এক সৃষ্টিছাড়া রূপের খনি ! সেই উন্নত নাসা, বিম্বাধরে সেই হাসির খেলা ; আহা ! সে যে অতুলন ; তাহার যে আর তুলনা নাই। এমন উজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি, এমন মুনিমনোহারী রূপ ত আর কখনও দেখি নাই !

স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টিতে বালক যখন আমার মুখের পানে চাহিল, আমার মনে হইল একবার উঠিয়া আলিঙ্গন করি ; কিন্তু পারিলাম না ! হৃদয়ের সাধ হৃদয়েই লয় পাইল। আমি শুধু বলিলাম, 'জেরা বাজায়কে শুনাইয়ে না ?'

বালক বাঁশী বাজাইতে লাগিল। আহা ! কি মধুর কি মনোহর সে সুর ! কী স্বর্গীয় আনন্দ, কি অফুরন্ত তৃপ্তি যে সেই সুরে নিহিত ছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সেই অপার্থিব সুরের অনির্ব্বচনীয় ভাবে আমায় উদাস করিয়া তুলিল। সে সুর থামিলে আমি বালককে পুনরায় বাজাইতে অনুরোধ করিলাম ; কিন্তু বালক শুনিল না। স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে সে বলিল, 'নেহি হামারা বহুত কাম হায় ; আউর বাজানেকো বকৎ নেহি। এই বলিয়া বালক প্রস্থান করিল।

৮১

বালক চলিয়া গেল। আমার পশ্চাতে গংগার ঘাটে সন্ন্যাসীরা গংগা আরতি করিতে আসিয়াছে, এমন সময় দূর হইতে আবার যেন সেই সুর আমারে কানে আসিল; মনে হইল, একি! এ আবার কে বাজায়?—এ ত সেই বটে। এই বলিল সময় নাই; আবার ওদিকে গংগার তীরে গিয়া বাজাইতেছে? আচ্ছা, দাঁড়াও! শুধু আমার কাছেই তোমার বাজাইবার সময় হয় না?—দেখি কেমন সময় না হয়; এই ভাবিয়া সেই সুর লক্ষ্য করিয়া আমি ছুটিলাম। সন্ন্যাসীরা আরতি করিতেছিল; সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; আমি তাহাদিগের পশ্চাৎ দিয়া ছুটিয়া চলিলাম; বাঁশী তখনও বাজিতেছে। আমি ছুটিতে ছুটিতে গংগার চড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আর খানিকটা গেলেই বালককে ধরিয়া ফেলিব, এমন সময় বাঁশীর সুর থামিয়া গেল; বালক আমায় দেখিয়া দক্ষিণমুখে ছুটিতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে অনেকটা দূর অতিক্রম করিয়া বালক আবার বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল। আমিও দ্রুত ছুটিয়াছি; এবার নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিব। আর কিছু করিতে পারি বা না পারি, বালককে একবার বুকে টানিয়া লইয়া বুকের জ্বালা তো মিটাইতে পারিব? কিন্তু বালক কি দুষ্ট!—আবার ছুটিল—আবার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিল। আমি অবিরাম ছুটিতে ছুটিতে এক একবার কাছে আসি; প্রায় ধরিয়া ফেলি আর কি—আর একটু গেলেই হয়, এমন সময় সে আবার দৌড়াইতে থাকে; আমিও পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকি। এইরূপে একবার দাঁড়ায়, আবার বাজায়, আবার ছুটিয়া পালায়; এইরূপ কয়েকবার বালকের সহিত ছুটাছুটি হওয়ার পর একখণ্ড প্রস্তরে আঘাত লাগিয়া আমি পড়িয়া গেলাম। আবার চমক ভাঙিগয়া গেল। তখন কোথায় আমি আর কোথায় বা সেই বাঁশির সুর! দেখি, আমি গংগার ঘাট হইতে বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তখন রীতিমত অন্ধকার রাত্রি।

হায়! এ কি হইল! এ কি দেখিলাম! ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা আমার মনে পড়িতে লাগিল। চোখের জলে তখন প্রস্তরগাত্র সিক্ত করিয়া আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মযাতনায় আমায় অস্থির করিয়া তুলিল। নিরাশ হৃদয়ে সেই গভীর রাত্রে অতি সন্তর্পণে কুঠিয়া অভিমুখে চলিলাম। কুঠিয়ায় উপস্থিত হইয়া শ্রান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করিলাম। এ কি অভিনয়! এ কোন রঙ্গ? এ কাহার লীলা? তাহাই চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নিদ্রায় অভিভুত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি পরমা সুন্দরী এক যুবতী আসিয়া আমাকে বলিল, 'আমায় একটু জল দাও।'

আমি অবিলম্বে সেই নূতন কলস হইতে জল ঢালিয়া তাহাকে দিলাম।

জল লইয়া সে বলিল, 'বাঃ! বেশ ঠাণ্ডা জল ত?'

আমি বলিলাম, 'এখানকার গঙ্গাজল আবার গরম কখন?'

তখন জলপান করিতে করিতে যুবতী বলিল, 'এই কলসীর গুণে ঠাণ্ডা হয়েছে বললে কি দোষ হয়?'

আমি বলিলাম, 'একটি পাহাড়ি মেয়ে এই কলসীটী সকালে ফেলে গিয়েছিল;—আমি এনে রেখেছি।'

যুবতী বলিল, 'তুমি আমাকে খেতে দিয়েছিলে। তাই তার বদলে কলসীটী আমি তোমায় দিয়ে গেছি।'

আমি তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'মিথ্যা কথা বলতে আপনার একটুও সংকোচ বোধ হচ্ছে না?'

দেখিতে দেখিতে সেই রূপের পরিবর্ত্তন হইল। আর আমি দেখিলাম—আমার সম্মুখে সেই পাহাড়িয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমি বালিকার পানে চাহিয়া রহিলাম। বালিকা বলিল, 'আমিই কি না দেখলে ত? এখন চিনতে পেরেছ—আমি কে?—আমিই তোমার আদ্যামা।'

বালিকার কথায় সসম্ভ্রমে আমি তাহাকে প্রণিপাত করিলাম; আর সেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। এমন সময় কে আসিয়া আমায় স্পর্শ করিল। আমি চমকিতভাবে চাহিয়া দেখি—সেই বংশীধারী পাঞ্জাবী বালক! তাড়াতাড়ি তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। আহা! কি স্নিগ্ধ মধুর সুখস্পর্শ। কি অপূর্ব্ব আনন্দ আস্বাদন! সে আলিঙ্গনে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল; আমি বলিলাম, 'আঃ আমার প্রাণ জুড়াল।—এতক্ষণ পরে তুমি আমায় আলিঙ্গন দিলে? আমার, যে কত কষ্ট হচ্ছিল,—তা কি তুমি বুঝতে পারছিলে না?'

বালক হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কষ্ট না হলে কি কেষ্ট মেলে?'

'এঁ্যা! তুমিই কৃষ্ণ! তুমিই আমার সেই তৃষাহারী ব্রজবিহারী তাপিতচিত-শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ!—তুমিই আমার সেই!—' বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া আমি পড়িয়া গেলাম; আর আমার ঘুম ভাঙিগয়া গেল। সব লীলা সব খেলা ফুরাইল। চকিতের মত আসিয়া প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের দেবতা আমার সব খেদ সব সাধ মিটাইয়া চকিতে অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর আমার বিবেক বৈরাগ্য, সাধ্য সাধনা সমস্তই যেন কোথায় লয় পাইল; আর তাহার সন্ধান পাইলাম না। কেবল দেখিলাম শুধু প্রাণভরা একটা তৃপ্তি রহিয়া রহিয়া যেন বলিতেছে—

'পরিপূর্ণ জীবনের সাধ; পরিপূর্ণ সকল কামনা।'

সেই দর্শনের পর প্রায় নয় বৎসর অতীত হইতে চলিল, তেমন আলিঙ্গন, তেমন অপরূপ দর্শন, তেমন আনন্দ, আর কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই। জীবনের

এই রঙ্গভূমিতে হৃদয়বল্লভ এ অধমকে লইয়া কত অভিনয় করিয়াছেন ; কিন্তু কোন দৃশ্যে অলৌকিক আনন্দের এমন অপূর্ব আস্বাদ আর পাই নাই। ইতিমধ্যে আরও দুই বার মথুরা বৃন্দাবন ও লছমণঝোলা আসিয়াছি ; পুষ্করাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি ; বনে জঙ্গলে বহু সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিয়াছি ; কিন্তু তেমনটি আর হইলই না। কিরূপেই বা হইবে ? সেবার যে অহং মমত্ব ভুলিয়া, জগৎ সংসার ভুলিয়া, আত্ম পর ভুলিয়া ভগবৎ ভাবে বিভোর হইয়া, স্বদেশ স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম ; অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। দীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া, সমস্ত বাসনারাশি দগ্ধ করিয়া, শুদ্ধ মনে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম। এইরূপে প্রস্তুত হইয়া, এমন ভাব লইয়া, এমন আদেশ পাইয়া ত, আর কখনও বাহির হই নাই ; কাজেই তেমন আনন্দ কিরূপে আর পাইব ? তাই বলি, কেহ যদি এমন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে চাও, পাইতে চাও, আলিঙ্গন করিতে চাও, তাহা হইলে আগে বিচার বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত কর ; বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর ; শুদ্ধচিত্ত হও। তীর্থে আসিতে হইলে, সংকল্প কর যে আর গৃহে ফিরিবে না ; সংসার সম্বন্ধে পুনরায় আবদ্ধ হইতে আর স্বজনসঙ্গমে ফিরিবে না ; এইরূপে সকল মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া যদি তীর্থে আসিতে পার তবেই আসিও। নতুবা দেখিবে, 'মন ভাল নয় তীর্থ করা, মিছে কাজে ঘুরে মরা।' কোন আনন্দ পাইবে না ; কাহারও দর্শন পাইবে না ; বিফলকাম, ব্যর্থবাসনা, অর্থশ্রাদ্ধ ও স্বাস্থ্যহানিই সার হইবে।

৮২

ঈশ্বরীয় দর্শনাদি ও আদেশপ্রাপ্তির কয়েক দিন পরে একদা আমি গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাষ্টক আবৃত্তি করিতে করিতে কুঠিয়া অভিমুখে ফিরিতেছি এমন সময় বিপরীত দিক হইতে দুইটী যুবক আসিয়া অতর্কিতে আমার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া 'আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের চরণে স্থান দিন ; আমরা আপনার কথা শুনেই স্বর্গাশ্রমে এসেছি ;—আপনিই ত কৃষ্ণানন্দ স্বামী ?' বলিতে বলিতে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তখন আর কিছু না বলিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আমি কুঠিয়ায় লইয়া গেলাম ; কুঠিয়ায় তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলাম সংসারের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা পরিত্রাণ পাইবার মানসে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছে। উভয়েই বাঙ্গালী ; এক জনের পিতা মাতা দুই আছেন ; আর এক জনের শুধু মাতা আছেন। যাহার দুই আছেন, তাহার পিতা পাণ্ডুয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কোন এক ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার ; সংসারের অবস্থা একরূপ মন্দ নহে ;

নিজেও আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। আর এক জনের সংসারের অবস্থা আদৌ ভাল নহে; এক বৎসর হইল প্রবেশিকা পাশ করিয়া ফার্স্ট ইয়ারে পড়িতেছে। আরও শুনিলাম যে উঁহারা এ পর্য্যন্ত তিন বার সংসার হইতে পলাইয়াছে এবং তিন বারই আত্মীয় স্বজন ও পুলিশের চেষ্টায় গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। এবার অনেক বুদ্ধি করিয়াই পলাইয়াছে, যাহাতে পিতা মাতা সহজে কোন সন্ধান না পান; এবার তাহাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ—ভগবান লাভ করিবেই।

আমার হৃদয় তখন নব বলে বলীয়ান; আশা আকাঙ্ক্ষা ও অসীম সাহসে ভরপুর। জীবের কল্যাণ কার্য্যে সংসারে আসিয়াছি। ভগবান কৃপা করিয়া জীবহিতে আমায় নিযুক্ত করিয়াছেন। যেখানে ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব হইবে এমন মন্দির নির্ম্মাণের ভার আমার উপর পড়িয়াছে। এ অবস্থায় আশা আকাঙ্ক্ষায় কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে? যাহা হইক, আমি যে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নই, তাহা যুবক দুইটীকে জানাইয়া গৃহে ফিরিবার জন্য তাহাদিগকে নানা উপদেশ দিতে লাগিলাম। গৃহে পিতামাতার সেবা করিয়াই সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করা যায়; সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায়; পিতা মাতাই প্রত্যক্ষ দেবতা ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মব্যাধের গল্প ও অন্যান্য কাহিনী শুনাইতে লাগিলাম। তাহারা কিন্তু কিছুতেই সে সব শুনিবে না। তাহাদের ভীষণ পণ ঈশ্বরদর্শন না করিয়া আর তাহারা গৃহে ফিরিবে না। তদ্ভিন্ন যে সদ্গুরুর নাম শুনিয়া তাহারা এতদূর আসিয়াছে আমি আবার সে মহাপুরুষ নই; কাজেই তাহাদের বুদ্ধিমত তাহারা নানাবিধ তর্কের অবতারণা করিল।

আমিও ছাড়িবার পাত্র নই। হাসিমুখে তাহাদের সমস্ত যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিলাম; এবং আমার সদ্‌বুক্তি তাহাদের বিচার বুদ্ধিকে পরাভূত করিল। আমি তখন দৈববলে বলী। আমার সাহস সরলতা, আমার তেজ বীর্য্য, তাহারা কিরূপে অতিক্রম করিবে? তাহারা ত সামান্য বালক; আর আমি তখন দুনিয়ার মালিক। প্রেমের পরশ তখন আমায় পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়াছে। আমি তখন বিশ্বজোড়া প্রেমের রাজ্য, প্রেমের হাট বাজার, প্রেমের বেচা কেনাই দেখিতেছি। দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশা বা সংসারের ত্রিবিধ তাপ, আর আমার হৃদয়ে ছায়াপাত করিতে পারিতেছে না। সর্ব্বদা মনে হইতেছে বিশ্ব যেন প্রেমের একটী জমাট মূর্ত্তি। সুখ শান্তি ও সন্তোষের আগার; জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। কোথায় এখানে জরা মৃত্যু ব্যাধি! কোথায় আতঙ্ক! কোথায় নিগ্রহ!

শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণাদি দ্বারা ক্রমে আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম—পিতামাতাই প্রত্যক্ষ দেবতা। এই পিতামাতার বিরোধী হইলে কোনরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিই লাভ হইতে পারে না। এইরূপ আলাপ আলোচনার ফলে দেখিলাম তাহাদের বৈরাগ্যের তীব্রতা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তখন উঁহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলাম; আমি যে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নই তাহা ত

ইতিপূর্ব্বেই উহাদিগকে বলিয়াছিলাম। তথাপি আমার পরিচয় পাইয়া বিচলিত না হইয়া তাহারা বরং আমার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইল। পরম বিশ্বাসভাজন শুভার্থী জ্ঞানে তাহারা আমায় ধরিয়া বসিল, 'ঠাকুর! বলুন, আমাদের এখন কি কর্‌তে হবে।—আপনি যা বল্‌বেন, আমরা অবনত মস্তকে তাই পালন কর্‌ব।'

তখন আমি বলিলাম, 'তোমরা দেশে ফিরে যাও; আমিও কিছুদিন পর বাংলায় যাচ্ছি। সম্ভবতঃ কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যেই থাক্‌ব; তখন তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করো। তোমাদের কি কর্‌তে হবে না হবে তখন সবিস্তারে বল্‌ব।'

মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যখন তাহারা আমার একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া পড়িল, তখন আমার শেষ সম্বল যে একটী আধুলী ছিল তাহার দ্বারাই উহাদের জনৈক অভিভাবকের ঠিকানায় তার করিয়া দেওয়া হইল; এবং যথাসময়ে পাথেয় আসিয়া পড়িলে, তাহারা জন্মভূমি অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৮৩

যুবকদ্বয়কে বিদায় দিয়া হৃষিকেশ হইতে স্বর্গাশ্রমে ফিরিবার পথে মনে হইল, কৈলাস আশ্রমের সাধুজীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। আশ্রমের সোপানবলী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইলাম শিষ্যমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া মহাত্মাজী বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক প্রান্তে আসন গ্রহণ করিয়া আমি উহাদের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। দেখিলাম নানাভাবের নানা কথা হইতেছে বটে; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার বিন্দু বিসর্গও উহাতে নাই। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর স্বামিজী হিন্দিতে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বালক! তোমার কি চাই? তুমি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত?'

আমি বলিলাম, 'মহারাজ! আপনার নিকট কিছু উপদেশ শুনিতে আসিয়াছি; আর আমি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু নহি; সামান্য গৃহস্থ মাত্র।'

চমকিত হইয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এ্যাঁ! সেকি! তুমি গৃহস্থ তবে তোমার পরিধানে গৈরিক বস্ত্র কেন?'

আমি বলিলাম, 'গুরুর আদিষ্ট কার্য্যে গুরুর আদেশ মত গৈরিক ধারণ করে বেরিয়েছি; তার বেশী আমি কিছু জানি না।'

তখন হাহা হোহো শব্দে হাসিয়া স্বামীজী বলিলেন,—কাল ভরত আশ্রমে যাইও; সেখানে ভাণ্ডারা আছে; তৃপ্তিপূর্ব্বক খাইতে পাইবে। ঐ গেরুয়ার মহিমা এমন যে অনাহারে থাকিতে হয় না। তোমার গুরু বুদ্ধিমান; তাই তোমাকে গৈরিক ধারণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

কথাগুলি আমার তেমন ভাল লাগিল না। লোকমুখে সুখ্যাতি শুনিয়াই মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তার ভাবে এবং তাঁহার আচরণে মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলাম। হায়! কলির সাধু সন্ন্যাসী! অন্তর্দৃষ্টি কি তোমাদের নিকট এতই অকিঞ্চিৎকর, যে নিতান্তই ভোগী দেহাভিমানীর মত তোমরা জীবভাবে ডুবিয়া আছ? তবে আর সাধুবেশ কেন? তবেআর সন্ন্যাসী সাজিয়া এত প্রতারণা কেন? কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া নিতান্ত অসহ্য বোধ হওয়ায় আমি বলিয়া ফেলিলাম, 'মহারাজ! আপনার ত দেখিতেছি খাওয়ার অভাব নাই; শুনিয়াছি বহু শিষ্য সেবকও হইয়াছে। তবে আর আপনি এখন গৈরিক ব্যবহার করেন কেন?'

ঠিক পূর্ব্ববৎ না হইলেও সাধুজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তুমি এখন ছেলেমানুষ; অল্প জ্ঞান; বোধ হয় লেখাপড়াও কিছু শিখ নাই। অতএব কেন যে আমি এখনও গৈরিক ধারণ করিয়া আছি, তা তোমায় কিরূপে বুঝাই বল?

আমি বলিলাম, তাহা হইলে গৈরিক ধারণের অন্য কারণও আছে?'

'হাঁ—হাঁ' আছে বৈকি;' বলিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাব ধারণ পূর্ব্বক স্বামীজী আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমিও সময় বুঝিয়া দুই চার কথা স্বামীজীকে শুনাইয়া দিলাম? তাহার সারমর্ম্ম এই যে—মহারাজ! আমি যেমন গৃহস্থ, আপনিও তেমনই গৃহস্থ; আমার না হয় সত্যকার পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী এবং পরিণীতা স্ত্রী আছে; আপনার না হয়তেমন সত্যকার কিছু না থাকিলেও পাতান অনেক কিছু আছে। পুত্রকন্যার পরিবর্ত্তে হাজার হাজার শিষ্য শিষ্যা, যাত্রীদল ও দর্শকবৃন্দের মধ্যে পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী সম্বোধনে সম্বোধিত কত কিছু রহিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রাসাদতুল্য আশ্রমবাটী, মান সম্ভ্রম, সুখ সম্পদ সবই রহিয়াছে—ভাল মন্দ, রাগ দ্বেষ, সন্তোষ অসন্তোষের অভিনয়ও বেশ চলিয়াছে; দেখিতেছি ভোগই আপনার প্রধান উপাসনা। এরূপ অবস্থায় আপনাদিগকে সন্ন্যাসী বলা আদৌ চলে না। তবে হাঁ, এক হিসাবে বলা চলে; কারণ আপনাদিগের 'কর্ত্তব্যসন্ন্যাস' অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্টিগোচর হয়। যাহা হউক, আপনার নিকট আসিয়া আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইল।

এইরূপ বলিয়া আমি ধীরে ধীরে বিদায় লইলাম। আসিতে আসিতে শুনিতে পাইলাম 'বাঙ্গালী সাধু—মছলিখোর হ্যায়—স্ত্রীজিত হ্যায়', ইত্যাদি ভাষায় স্বামীজী আমাকে সম্মানিত করিতেছেন। মনে মনে ভাবিলাম, একাল আর সেকাল—এই তফাৎ; সেকালেও আশ্রম ছিল; আর একালেও আশ্রম হইয়াছে। সেকালে কেহ আশ্রমে যাইলে অতিথি হিসাবে তাঁহার পূজা হইত, সাদর সম্বর্দ্ধনা হইত; আশ্রমের সেবা যত্নে শান্তি তৃপ্তি আনন্দলাভ হইত; হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইত—প্রেমে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত। আর একালের আশ্রমে এই ব্যবহার!

৮৪

স্বর্গাশ্রমে অবস্থানকালে আর একদিন গঙ্গাতীরে আমি জলের ধারে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিলাম—এমন সময় পেছন হইতে জনৈক সন্ন্যাসী আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবা! তুমি এত অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করেছ কেন? এর কারণ কিছু শুনতে পারি কি?'

চাহিয়া দেখি তেজঃপুঞ্জ কলেবর হৃষ্টপুষ্ট একটী বাঙ্গালী সাধু। তাহার কথার উত্তরে আমি বলিলাম, 'আমার কথা জেনে আপনার কি লাভ হবে বাবা?'

তিনি তখন বাষ্পাকুললোচনে ক্ষণকাল আমার মুখের পানে তাকাইয়া আমায় আলিঙ্গনপূর্ব্বক মস্তক চুম্বন করিয়া কহিলেন, 'বাবা! সন্ন্যাসী হলেও—এখনও আমি সংসারের মায়া কাটাতে পারি নি।'

সাধুটীর কথা শুনিয়া আমি একটু হাসিলাম। আমায় হাসিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'বাবা! হেসো না; ঠিক তোমারই মত অবয়ব, দেখ্‌তে শুন্‌তে ঠিক তোমারই ছাঁচে ঢালা, একমাত্র পুত্র আমার—আমাদের বুক ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল। পুত্রশোকে 'ছেলে ছেলে' করে এক মাসের মধ্যে স্ত্রীও দেহত্যাগ কর্‌লেন। আমি তখন উম্মাদের মত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ফেলে কে আমার সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিলে তার খোঁজে গৃহত্যাগ করি। তারপর বার বৎসর এই হিমালয় প্রদেশে পরিভ্রমণ করে সতর বৎসর কাল এক নিৰ্জ্জন গুহায় তপস্যা করেছি। তার পর আবার মানুষের মুখ দর্শন ইচ্ছায় এই মাত্র ছয় মাস লোকালয়ে এসেছি। কিন্তু বাবা! শান্তি নেই; সাধন পথে অনেক কিছু লাভ করেছি বটে; কিন্তু কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছি না। কোন কিছুই আমার প্রাণের জ্বালা মেটাতে পারছে না। তুমি হয় ত শুনে হাস্‌বে—এখনও আমার সেই স্ত্রী পুত্রের কথা মনে পড়ে; এখনও তাদের স্মৃতি আমায় চঞ্চল করে তোলে। আজ তোমায় দেখে আমার প্রাণে কত কি যে উঠ্‌ছে—তা বল্‌তে গেলে একটা কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়। তা সে যাই হোক, তোমায় দেখে আমার পুত্রস্নেহ জেগে উঠেছে; তুমি নিশ্চয় একবার আমার কুঠিয়ায় যাবে। নূতন কুয়ার কাছে মাঝের কুঠিয়ায় আমি আজ চার দিন হল এসে আছি। আমায় এখানকার সবাই খুব মানে; আমার এই দুর্ব্বলতার কথা তোমায় ছাড়া আর কাকেও এ পর্য্যন্ত জান্‌তে দিই নি।'

এইরূপ আরও অনেক কথার পর আমার কথা যখন তাঁহাকে কিছু কিছু বলিতে লাগিলাম, তখন আমার প্রতি তিনি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন; এবং তাঁহার নিকট যাইলে আমি অনেক কিছু পাইব—একথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দুএকটী ব্রহ্মচারী আমাদের দিকে আসিতেছে দেখিয়া তিনি স্থানান্তরে চলিলেন এবং যাইবার কালেও কয়েকবার স্নেহদৃষ্টিতে আমার পানে ফিরিয়া তাকাইলেন।

সাধ্‌টীর ব্যবহারে গীতার সেই শ্লোকটী আমার মনে পড়িল,—

দৈবী হ্যেষা গ্‌ণময়ী মম মায়া দ্‌রত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন, যিনি সম্যক প্রকারে আমাকে জানিতে পারিয়াছেন তিনিই আমার এই দৈবী দ্‌র্জ্ঞেয়া গ্‌ণময়ী মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন ; অন্য কেহ পারে নাই।'

মনে হইল, তবে কেন আমি সাধ্‌টীর নিকট যাইব ? যিনি এখনও মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি আমাকে এমন কি দ্‌র্লভ বস্তু প্রদান করিতে পারেন, যাহা দ্বারা আমার কিছ্‌মাত্র উপকার হইতে পারে ? আমি তখন ঠাক্‌রের কৃপা লাভ করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ; আমার প্রাণ তখন আনন্দে ভরপ্‌র। আমার কিসের অভাব ? কিসের অশান্তি ?—এ সন্ন্যাসী আমায় কি শ্‌নাইয়া গেল ?—নির্জন গ্‌হায় সতর বৎসর তপস্যা করিয়াও স্ত্রীপ্‌ত্রের মায়া কাটাইতে পারে নাই—স্ত্রীপ্‌ত্রের স্মৃতি এখনও তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে !—আমার যেন এ সকল কথা, পাগলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমারও ত পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী এবং য্‌বতী স্ত্রী আছে ; কই ? তাহাদের স্মৃতি ত কখনও আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না ;—কখনও ত আমার প্রাণে তাহাদের অভাব জাগাইয়া তোলে না ;—কখনও ত মনে হয় না যে তাহাদের সঙ্গ বা সাক্ষাৎ আমার প্রাণে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অধিকতর আনন্দ দান করিতে পারিবে।—তাহাও কি কখনও সম্ভব ?—আধ্যাত্মিক আনন্দের নিকট যে জাগতিক আনন্দ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর !—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ !

হায় ! আমার এই ভাব কি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অটুট থাকিবে না ? হায় ! না জানি আমার জীবন নাটকের পরবর্ত্তী দৃশ্যগ্‌লি ভগবান কোন ভাব অভাবের সমাবেশে কি বিচিত্র করিয়াই সাজাইয়া রাখিয়াছেন !

৮৫

আজ দ্‌ই দিন হইল আমি স্বর্গাশ্রম হইতে হৃষীকেশে আসিয়াছি। এখন আমার গৃহম্‌খী গতি। এক বৎসর গৃহে থাকিয়া পিতামাতার সেবা করাই আমার প্রতি ঠাক্‌রের প্রথম আদেশ। কিন্তু হৃষীকেশ পেঁাছিয়াই আমার জ্বর হইল। ১০৬ ডিগ্রি জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে আমি হাসপাতালে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। তখন জনৈক পাঞ্জাবী অথবা ভাটিয়া য্‌বক চিকিৎসকের হস্তে হাসপাতালের রোগী দেখার ভার ছিল। তিনি আমায় পৃথক একখানি ঘরে থাকিতে দিলেন ; এবং আমি বাঙালী, ১০৬ ডিগ্রি জ্বর আমার পক্ষে নিতান্ত ভয়ের কারণ, ইত্যাদি বেশ ব্‌ঝাইয়া আমাকে বলিলেন। জ্বরের তেজে আমার সর্ব্বশরীর রক্তিমাভ হইয়া

উঠিল। শুনিলাম আমার পাহাড়িয়া জ্বর হইয়াছে। দেখিলাম সেদেশী আরও কয়েকজন ঐ জ্বরে পড়িয়া হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সকলেই যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে। আমার কিন্তু ছট্ ফট্ করিবারও ক্ষমতা নাই; সমস্ত শরীর একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। অত্যধিক যন্ত্রণায় আমি ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য হারাইতেছি; মনে হইতেছে যেন কোন পেষণযন্ত্রে আমায় নিষ্পিষ্ট করিতেছে। নির্জীব নিস্পন্দ হইয়া আমি পড়িয়া আছি। এক একবার মনে হইতে লাগিল সেই সন্ন্যাসীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া আসাতেই বোধ হয় আমার এই দুর্ভোগ উপস্থিত হইয়াছে। কখনও বা মনে হইতেছে, এই বিপদ কোন এক অপূর্ব সম্পদ দানের জন্যই আমায় আশ্রয় করিয়াছে; আবার কখনও মনে হইতেছে, ইহাও ঠাকুরের এক পরীক্ষা। কে জানে? হয় ত বা এ দেহ এখানেই রাখিয়া যাইতে হইবে,

অতি কষ্টে দুই দিন হাসপাতালে অতিবাহিত হইল। হাসপাতালে সেবা যত্নের সেরূপ সুব্যবস্থা নাই; আবার ঔষধ পথ্যেরও এমন কিছু অভাব নাই। বোতলে ভরা ঔষধের সঙ্গে জ্বরের পথ্য ডাল ভাত দেখিয়াই ত আমি অবাক। পরে বুঝিলাম সেদেশী লোকের পক্ষে ডাল ভাত বাঙ্গালীর দুধ সাগু অপেক্ষা লঘু। সে যাহা হউক আমি শধু দুধ খাইয়াই দুই দিন কাটাইয়া দিলাম; তাহাও না হইলে কোন ক্ষতি ছিল না; কারণ সামান্য পিপাসা ছাড়া ক্ষুধার উদ্রেক ইতিমধ্যে হয় নাই। তৃতীয় দিনে আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল এবং মাথার যন্ত্রণা এত অধিক হইল যে তাহা বর্ণাতীত। সেই দিন সন্ধ্যা হইতে কি এক খেয়াল হইল যে, আমি যখন মরিতেই বসিয়াছি তখন নরক দেখিয়া যাইতে হইবে। কারণ আমি ত আর মরিয়া নরকে যাইব না;—আমি ত এমন কোন পাপকার্য্য করি নাই যে আমায় নরকে যাইতে হইবে; অতএব মরিবার পূর্ব্বেই নরক দর্শন করিয়া লইতে হইবে। এই ভাবিয়া 'ঠাকুর! আমায় নরক দেখাও; —ঠাকুর! আমায় নরক দেখাও;' বলিয়া রীতিমত চীৎকার আরম্ভ করিয়াছি। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমার ঘরে উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবকে দেখিয়া আমার বড়ই ভক্তি হইল; এবং মনে হইল বৈষ্ণব ঠাকুরের বয়স দুই শত বৎসরের কম হইবে না। সর্ব্বাঙ্গ বৈষ্ণবচিহ্নে, চিহ্নিত—কণ্ঠে তুলসীর মালা, হাতে একটী কাঠের কমণ্ডলু—বৈষ্ণব ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াই সস্নেহ দৃষ্টিতে আমায় আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'কি বল্‌ছ?—'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' বল।'

আমি বলিলাম, আর 'হরে কৃষ্ণ' বল্‌তে হবে না বাবা! এখন নরক দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে; কি কর্‌লে নরক দর্শন হয় তাই বল; আমায় নরক দেখাও।— শুনেছি স্বর্গ নরক দুইই সত্য; অতএব নরক না দেখ্‌লে স্বর্গসুখ আমি মোটেই পাব না; আমায় নরক দেখাও' এইরূপ বলিতে বলিতে আমি একেবারে

কাঁদিয়া ফেলিলাম।

অন্নায় রোদন করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবঠাকুর অশ্রুপূর্ণ লোচনে আমায় সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'গোর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। ইচ্ছাময়ের কাছে কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না।'

আমি বলিলাম, 'প্রভু! অন্ধকার যে দেখে নি—তার চোখে আলোর আবার সৌন্দর্য্য কি? দুঃখে যে কখনও পড়ে নি—তার পক্ষে সুখের মূল্য আর কতটুকু? বিপদে যে কখনও পড়ে নি—তার কাছে সম্পদ কি এমন মূল্যবান! অতএব নরক যে দর্শন করে নি—স্বর্গ তার সুখের আকর কি করে হতে পারে? তাই আমি বলছি—আগে আমায় নরক দেখাও; তারপর তোমাদের ইচ্ছা হয়, স্বর্গের দ্বার খুলে দিও।'

বৈষ্ণবঠাকুর বলিলেন, 'তুমি যে স্বর্গে যাবে তার প্রমাণ?'

সেই রোগযন্ত্রণার মাঝেও আমি অট্টহাস্য সহকারে বলিলাম, 'তার আবার প্রমাণ দিতে হবে? বৈষ্ণবঠাকুর! আমি আর অন্য কোন প্রমাণ দিতে চাই না। আমার শেষ সময় যে তুমি এসে আমায় দেখা দিলে, এই আমার প্রমাণ; তোমার ভক্তিভাবমণ্ডিত মুখখানি যে আমি আর ভুলতে পারব না ঠাকুর!—আরও কি প্রমাণ চাই?'

বৈষ্ণব স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া বলিলেন, 'বাবা! তুমিই বৈষ্ণব; না থাক তোমার ভালে তিলক, গলায় তুলসী, গায়ে নামাবলী; তুমিই প্রকৃত বৈষ্ণব।—যিনি বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন—বৈষ্ণবকে যিনি সম্মান করেন, শ্রেষ্ঠ স্থান দেন,—তিনি বিষ্ণুসদৃশ; তিনি বৈষ্ণবকুলের নমস্য। ইত্যাদিরূপে বহু কথায় আমায় উচ্চে উঠাইয়া 'হরে কৃষ্ণ— হরে কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে বৈষ্ণব ঠাকুর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৮৬

আমি ভাবিলাম, বৈষ্ণবঠাকুর ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ নহেন ত? আমার আরাধ্য পূজ্য প্রিয় কেহ নহেন ত? আমার প্রাণের ঠাকুর নহেন ত? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমঘোরে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। অকস্মাৎ দেখি যেন হাসিতে হাসিতে ঠাকুর আমার নিকটে আসিতেছেন।

ঠাকুর আসিয়া আমার শিয়রে বসিলেন এবং আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'এ আবার তোমার কি বাই হল?—'নরক, নরক' করে চেঁচাচ্ছ কেন?—নরক দেখবার জন্য হঠাৎ এ আগ্রহ তোমার কেন হল বল দেখি?'

সজল নয়নে তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া অতি করুণ স্বরে আমি বলিলাম, 'ঠাকুর! আমায় স্বর্গে স্থান দাও বা না দাও, একবার নরক দর্শন করাও;

নরক দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ বড়ই উতলা হয়েছে। ঠাকুর! প্রাণের ঠাকুর! দেবতা আমার!—আমার এই শেষ অনুরোধ 'রক্ষা কর।'

ঠাকুর আমায় নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি যখন কিছুতেই শুনিলাম না তখন ঠাকুর বলিলেন, 'তবে এস—চল যাই; তোমায় নরকের দৃশ্য দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

আমি তখন হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে ঠাকুরের সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে অতি দূরে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্ব্বক ঠাকুর বলিলেন, 'ঐ দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?-ঐ যে উঁচু মত রাস্তা দেখা যাচ্ছে ঐ হল স্বর্গের রাস্তা; আমাদের ঐ রাস্তায় গিয়ে উঠ্‌তে হবে।

আমি অবাক হইয়া নিবিড় দৃষ্টিতে দূরে কি যেন দেখিতে লাগিলাম। প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ খেলিতে লাগিল; আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঠাকুর! কোন পথ দিয়ে—কি করে যাওয়া হবে?

'এস—আমি আগে যাচ্ছি।' বলিয়া ঠাকুর শন্ শন্ শব্দে উড়িতে লাগিলেন। আমিও চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে শূন্যে উঠিতে লাগিলাম। আহা! সে যে কি আনন্দ-প্রয়াণ! কি অলৌকিক বিমান বিহার! যদি কেহ কখনও স্বপ্নে পাখীর মত আকাশে উড়িয়া থাকেন তিনি শুধু এ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকিবেন; অন্য কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। উভয়েই শন্ শন্ শব্দে উড়িতেছি; হাতগুলি যেন পাখার কাজ করিতেছে; পদদ্বয় পুচ্ছবৎ উড়িবার সাহায্য করিতেছে। উড়িতে উড়িতে বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি; রাস্তা যেন আর ফুরায় না। উভয়েই নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছি। কিছুক্ষণ পরে মৃদু মধুর বায়ু আমার গায়ে লাগিল। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, 'অন্নদা! এই স্বর্গের বাতাস; এরই নাম মলয় পবন; আর বেশী দূর নাই। তোমার কষ্ট হচ্ছে কি?'

আমি হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বলিলাম, 'না ঠাকুর! কষ্ট কোথায়? এ ত পরম আনন্দ! পরম শান্তি! তুমি যদি দিনের পর দিন এভাবে আমায় নিয়ে উড়ে বেড়াও—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আহা। তোমাদের স্বর্গের বাতাস কি মধুর! কি পবিত্র! কি স্নিগ্ধকর!'

কিছুক্ষণ পরেই আমরা এক নূতন পথে আসিয়া উঠিলাম। সম্মুখে সুদীর্ঘ প্রশস্ত রাঙ্গা পথ। পথের দুই ধারে নবদূর্ব্বাদল এবং তদুপরি নিয়মিত ব্যবধানে দণ্ডায়মান সমোচ্চশীর্ষ ফলফুলশোভিত বিটপীশ্রেণী পথের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। পথিপার্শ্বস্থ তৃণগুলি আবার নানা বর্ণের ফুলে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে; ফুলে ফুলে কত বিচিত্র বর্ণেরপ্রজাপতি মধুকর প্রভৃতি মধুপান করিয়া বেড়াইতেছে। বিটপীশ্রেণীর স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় মলয় পবনের মৃদু মন্দ হিল্লোলে যেন এক সঞ্জীবনী শক্তি ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। রাঙ্গা পথের

রাঙ্গা ধূলায় পদক্ষেপ করিতেই যেন মনে হইল সুকোমল মখমলের উপর পা দিলাম। স্বর্গের পথের সেই দৃশ্য যাহা দেখিলাম, ভাষায় তা বর্ণনা করা অসম্ভব। দেখিয়া শুনিয়া আমি যেন কি এক রকম হইয়া গেলাম; আমার বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিল। ঠাকুরের মুখের পানে চাহিয়া আমি শুধু বলিলাম, 'ঠাকুর! এ কি স্বর্গের রাস্তা?—আমরা স্বর্গের পথে এলাম কেন? —আমাদেরর যে নরকে যেতে হবে।'

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'এ স্বর্গেরই রাস্তা বটে;—অথচ এই রাস্তা দিয়েই নরকে যাওয়া যায়;—নরকের আলাদা রাস্তা নেই।—স্বর্গপথের দুধারেই নরক সাজান আছে।'

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে তাহার অর্থ করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল মানুষের জন্যই স্বর্গ নরক। যেটুকু স্বাধীনতা লইয়া যে মনুষ্যজন্ম লাভ করে—সেটুকু যথাযথ ব্যবহার না করিলেই তাহাকে নরকের যাত্রী হইতে হয়; তাই রাস্তা এক। স্বর্গপথে যাইতে যাইতেই মানুষ যখন আপাতমধুর নারকীয়ভাবে বিমুগ্ধ হইতে থাকে, বিবেকবিচারহীন অবিবেকের পথে অহংজ্ঞানে বিপথে চলিতে থাকে,—ইহকাল, পরকাল, সদসৎ, সুকু ভুলিয়া—আচার বিচার ভুলিয়া—সংসারের মজা লুটিতে চায়, তখনই তাহার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত হয়। যে যতদূর অগ্রসর হয়, স্বর্গের রাস্তা তাহার ততদূর অতিক্রম করা থাকে। তাহার পর কর্ম্ম অনুযায়ী সৃষ্ট নরক কিন্তু যে ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

অন্তর্যামী ঠাকুর মনের ভাব বুঝিয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'হাঁ, তুমি যা ভাবছ তার অনেকটাই সত্য, তবে স্বর্গের রাস্তার দুধারে যে নরক, সেও সামান্য হতে অসামান্য রৌরব নরক পর্য্যন্ত পরের পর ভাবে সাজান আছে; তুমি দেখতে পাবে। আমি তোমায় ঈশ্বরের অবিশ্বাস ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা নামক দুটী নরকদৃশ্য দেখাব। এই দুটী ভিন্ন অন্য নরক কোন দর্শক পাপী না হয়ে দেখতে পারে না।—চল তোমায় দেখিয়ে আনি।'

৮৭

ঠাকুর অগ্রসর হইলেন। আমিও দুই দিক দেখিতে দেখিতে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ঠাকুর আমায় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'অন্নদা! ঐ সামনের গাছটীর দিকে লক্ষ্য রেখে চল।'

চোখের উপর তখন একটী বৃক্ষের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ দেখিলাম বৃক্ষটী পত্রপুষ্পহীন; যেমন শীতান্তে বসন্ত

সমাগমের পূর্ব্বে কোন কোন বৃক্ষ পত্রপুষ্পবর্জ্জিত হয় সেইরূপ ; পরক্ষণেই দেখি যেন তাহার পত্রোদ্গম হইতেছে ; নব নব পল্লবে যেন বৃক্ষের নবযৌবন সূচিত হইতেছে ; দেখিতে দেখিতে আবার কোরকে কুসুমে বৃক্ষটী পরিপূরিত হইল। ঝাঁকে ঝাঁকে মধুলুব্ধ মধুকর ও প্রজাপতিদল আসিতে লাগিল। ফুলের পর ক্রমে ফল ধরিতে লাগিল। সংগে সংগে আবার কত বিচিত্র বর্ণের পক্ষী দলে দলে আসিতে লাগিল। পক্ষীর কাকলীতে স্থানটী আরও মনোরম বোধ হইতে লাগিল। আমরা তখন বৃক্ষতলে উপস্থিত। দুই একটী ফলও ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ফলগুলি দেখিতে সিংগাপুরী বাদামের মত বাংলা পাঁচের আকার ; উপরিভাগ পীতবর্ণ রেশমী আবরণে আবৃত ; ভিতরে টুকটুকে লাল। আমি ক্ষিপ্রহস্তে একটী ফল কুড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। ফলটী দুই তিন স্থানে ক্ষত। আমার কিন্তু এমনই লোভ হইল, যে ফলটীর আস্বাদ যেন না লইলেই নয়। তখন ঠাকুরকে বলিলাম, 'আপনি একটু খান ; আমি একটু খাই।'

ঠাকুর বলিলেন, 'সে কি! তুমি এফল কি করে খাবে ? তুমি যা খাও—তা ত ৺মাকে নিবেদন করে দাও।'

আমি বলিলাম, 'কেন ?—এও নিবেদন করে দেবো।'

তিনি বলিলেন, 'উচ্ছিষ্ট ফল নিবেদন কি রকম ?'

তখন আমি বলিলাম, রেখে দাও তোমার উচ্ছিষ্ট—এখানে আবার উচ্ছিষ্ট কি ? এ ত স্বর্গ !—এখানেও কি উচ্ছিষ্ট বিচার আছে—ছোট বড় আমি তুমি ভেদাভেদ আছে ? জাত কুল মান অভিমানের গণ্ডি আছে ? এই আমি ৺মাকে ফল উৎসর্গ করে দিলাম ; নাও প্রসাদ খাও। এই বলিয়া ঠাকুরের হাতে ফলটী দিলাম।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে ফলের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আমায় দিলেন। আমি মুখে দিয়া দেখি অমৃত !! এমন মধুর আস্বাদ ইতিপূর্ব্বে আমি রসনায় অনুভব করি নাই। পরম আনন্দে ফল খাইতে খাইতে ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। ঠাকুর বলিলেন, 'আর কিছু দূর গিয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা নামক নরকদৃশ্য তোমায় দেখাব।'

সত্যই কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম—পথের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তা হইতে নীচে নামিবার সিঁড়ি রহিয়াছে। ঠাকুর সেই সিঁড়ি দিয়া আমায় নামাইয়া লইয়া চলিলেন। অনেকটা নামিয়া আসিয়া কারখানার চিমনীর মত একটী অনতিউচ্চ চোঙ্গা দেখিতে পাইলাম। চোঙ্গার নিকট আসিয়া ঠাকুর এক সাংকেতিক শব্দ করিলেন। অমনি চারিজন বিকটাকার পুরুষ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিলে মানুষ বলিয়া মনে হয় না। তথাপি তাহারা মানুষেরই মত হস্তপদাদিবিশিষ্ট জীব। ঠাকুর পুনরায়

তাহাদিগকে সংকেত করায় তাহারা চোঙ্গার এক দিক খুলিয়া ধরিল। তখন ঠাকুর আমায় দেখিতে বলিলেন।

দেখিলাম—কি ভীষণ দৃশ্য!—কি পূতিগন্ধময় গভীর কূপ! প্রশস্ত কুপের মধ্যভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম—দুর্গন্ধময় পচা জলে মল মূত্র পুঁজ রক্ত কফ ক্লেদাদির সহিত জগতের যত দূষিত আবর্জ্জনা একত্র করিলে যে উৎকট পদার্থের সৃষ্টি হয়—তাহাতেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত কংকালসার অসংখ্য নরনারী পিপাসাতুর হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। সকলেরই মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া; কাহারও কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। দারুণ পিপাসায় অধীর হইয়া মধ্যে মধ্যে শুধু ঐ দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ মুখে লইতেছে—হায়! তাহাও কি কেহ গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছে?—মুখে লইবামাত্র উহা যেন শুকাইয়া যাইতেছে;—কেহ বা থুৎকার করিয়া ফেলিয়া দিতেছে;—কেহ বা উহাই গিলিয়া পুনরায় উগরাইয়া দিতেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখিয়া মানুষ স্থির থাকিতে পারে না। আমিও স্থির থাকিতে পারিলাম না। চোখের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমার অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর আমার হাত ধরিয়া দূরে লইয়া আসিলেন এবং গদগদকণ্ঠে বলিলেন, 'এরই নাম—কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা নরক।'

ঠাকুরও কাতর হইয়াছেন দেখিয়া আমি কিছু সুস্থ হইলাম এবং বলিলাম, 'ঠাকুর! কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলাতেই যদি এই নরকে আসতে হয়,—তাহলে পৃথিবীতে ক'জন এই নরকে না এসে নিস্তার পাবে?—পৃথিবীতে এমন ক'জন মানুষ আছে যে ঠিক ঠিক কর্ত্তব্য করে যেতে পারে?'

তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ অন্নদা! কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলতে তুমি যা বুঝেছ ওটা ঠিক তা নয়। শাস্ত্রকার তাকেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে গেছেন যা না করলে মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন হয় না। সে কর্ম্ম কি জান? প্রথমতঃ তিনটীর কথাই তোমায় বলি; শরীর রক্ষার—ব্রহ্মচর্য্য, মিতাহার ও ব্যায়াম; জ্ঞানার্জ্জনের—শাস্ত্রাধ্যয়ন, গুরুসেবা ও সৎসঙ্গ; আর উপাসনার—ভগবৎকীর্ত্তন এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন।'

আমি বলিলাম, 'তাই বুঝি শাস্ত্রকার বলে গেছেন,—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।'

ঠাকুর বলিলেন, 'হাঁ, আগে শরীর রক্ষা। তারপর জ্ঞানার্জ্জন; তারপর উপাসনা।'

আমি বলিলাম, 'এই যদি মানবজীবনের সূচীপত্র হল,—তাহলে সংসার ধর্ম্মের সময় কখন?—না, সবাই এখন ত্যাগের দিকেই যাবে?'

ঠাকুর বলিলেন, 'না, না, তা কেন?—আমি মোটামুটি দেহধারীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে যাচ্ছি।—জ্ঞানার্জ্জনের পর সংসার করাই নিয়ম; তারপর

উপাসনা।'

আমি বলিলাম, 'তা যদি হয়—তাহলে শাস্ত্রে যে ব্রহ্মচর্য্যাদি চার আশ্রমের উল্লেখ আছে,—আপনার কথার সঙ্গে তা ত মেলে না?'

'কেন মিল্‌বে না? শাস্ত্রে যে ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের সীমা নির্দ্দেশ করা আছে, সেই ২৭ বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য এবং জ্ঞানলাভ দুই কর্‌তে হবে; এখন আবার তাও কর্‌তে হয় না। ঠিক ঠিক ২০ বৎর যদি শরীর রক্ষা ও জ্ঞানলাভের দিকে দেওয়া যায় তা হলে ২১ বৎসরেই সংসারশ্রমে প্রবেশ করা যেতে পারে। আর এই কলিকালে সংসারধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই উপাসনায় মন দিতে হয়; তা না হলে যে জীবনে কুলায় না। তুমি মনে করো না যে সংসারের ভোগে ডুবে, প্রাণে প্রাণে তার অসারতা উপলব্ধি করে, লোকে পবিত্র জ্ঞান লাভ করেছে এবং কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়েছে।'

তা সত্য; সংসারেও জ্ঞান লাভের অনেক কিছু আছে। আচ্ছা, সংসারে প্রবেশ না করেও যদি জ্ঞান লাভ করে, আর সাধনায় মন দেয়, তা হলে কি তার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়?'

না, না; তা কেন হবে? সকলকেই যে সংসারে প্রবেশ কর্‌তে হবে তার কোন মানে নেই; সবাই যদি খেতে বসে পরিবেশন কর্‌বে কা'রা? তা ছাড়া সবাই যদি সংসারে প্রবেশ করে তাহলে সংসারের বাইরে যে এক পরম আনন্দের, পরম শান্তির পথ আছে, তা কে দেখাবে বল? আর সংসারের জীবই বা কি আদর্শ দেখে ত্রিতাপজ্বালার হাত থেকে মুক্তির চেষ্টায় ছুটবে? মনে কর তুমি এক অন্ধকার ঘরে আছ; আর এক ঘরে আলো না দেখ্‌লে—এঘর তুমি ছাড়্‌বে কেন? যারা কুমার ব্রহ্মচারী তারাই পথপ্রদর্শক; তারাই ত্রিতাপদগ্ধ জীবের আশা ভরসা ও আশ্রয়স্থল; তারাই সংসারবদ্ধ নরনারীর মুক্তির সোপান।

৮৮

অতঃপর রাস্তার অপর দিকে অবস্থিত দ্বিতীয় নরক দেখাইবার জন্য ঠাকুর আমাকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। আমরা যথাস্থানে উপনীত হইলে সেই বিকটাকার মূর্ত্তি চতুষ্টয় আমাদের নিকটে আসিয়া সাংকেতিক ভাষায় ঠাকুরকে কি বলিল। ঠাকুরও কি সংকেত করিলেন। তখন তাহারা পূর্ব্ববৎ এ স্থানের চোঙ্গাও একধারে খুলিয়া ধরিল।

সভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি দেখিলাম, এই নরক দৃশ্য ঠিক এক-রূপ নহে। এখানে জানু পর্য্যন্ত গভীর কর্দ্দমাক্ত জলে ছুটোছুটি করিতেছে অসংখ্য জীব। দেহ ক্ষীণ, বদন মলিন, চক্ষু কোটরাগত; যেন ক্ষুধার তাড়নায় সকলে অস্থির। এমন সময় একটী রাঙ্গা ফল অকস্মাৎ কোথা হইতে পড়িল।

পড়িবামাত্র ফলের আশায় নিকটবর্ত্তী নরনারী সকলে ছুটিল ; ফলের লোভে ঠেলাঠেলি মারামারি কাড়াকাড়ি কামড়া-কামড়ি চলিতে লাগিল। ক্ষণকাল এরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামার পর ফলটী কোন জন হস্তগতকরিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কামড় দিয়া দেখিল উহাতে দন্তস্ফুট করিবার উপায় নাই। ফলটী এমননই কঠিন যে, কোনমতেই উহা খণ্ডিত হইল না। তখন সে ব্যক্তি বিফলমনোরথ হইয়া ফলটী দূরে নিক্ষেপ করিল। পুনরায় সেখানে ঐ ফল লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি প্রভৃতি পূর্ব্বদৃশ্যের পুনরাভিনয় চলিল। মনে হইল দিবারাত্রি এইরূপই চলিতেছে। ঠাকুর বলিলেন, এরই নাম—ঈশ্বরে অবিশ্বাস নরক।' নরকদৃষ্ট রাঙ্গাফলের ব্যাপার দেখিয়া একটী গানের কিয়দংশ আমার মনে পড়িল—

সংসার রাঙ্গা ফলে ভুলিব না আর ;
খাইয়া দেখেছি তার নাহি যে কোন সুতার,
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে,
খেলে জ্ঞান হারাই পাছে তোমা ভুলে যাই,
অধম সন্তান দুঃখ নাশ মা ! দুখনাশিনী !
তনয়ে তার তারিণী !

নরকের অবস্থা দেখিয়া, জীর্ণ শীর্ণদেহে মলিনবদন ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত জীবগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া, আমার চোখের জলে বুকভাসিয়া যাইতে লাগিল। পর পর এই দুই হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমায় নিতান্ত অস্থির করিয়া ফেলিল। অশ্রুমোচন করিতে করিতে অচেতন হইয়া আমি ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। অতঃপর কি যে হইল আমার আর কিছু মনে নাই।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা অধিক হইলেও আমি দুয়ার খুলিতেছি না দেখিয়া অনেক ডাকাডাকির পর হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁহার সহকর্ম্মীদের সাহায্যে অর্গল ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আমি তখদ সত্য সত্যই ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছি। চোখের জলে গৃহতল ভিজিয়া গিয়াছে। আমার সমস্ত শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। চিকিৎসক বহু চেষ্টায় আমাকে জাগরিত করিয়া বলিলেন, 'সাধুজী ! আপ্ মরুনে বৈঠা ; কেঁও ঠাণ্ডা জমিন্‌সে পড় রহা ?'

এই বলিয়া চিকিৎসক আমার নাড়ী দেখিলেন। নাড়ী টিপিয়া তিনি আমার মুখের পানে ব্যথাভরা সজল দৃষ্টিতে চাহিলেন। সেই ব্যথিত দৃষ্টি আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। চিকিৎসকের ভাবে বেশ বুঝিলাম এ যাত্রা আমার আর রক্ষা নাই। নিজেই তখন নাড়ী পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিলাম। কিছুই অনুভব হইল না। কিন্তু চিকিৎসকের বহুবিধ চেষ্টায় আমার অনুমান মিথ্যা হইল। এই উপলক্ষ্যেই আমি সম্পূর্ণ জ্বরমুক্ত হইলাম। কিন্তু দেহের উত্তাপ আনিতে আরও দুই দিন চিকিৎসার প্রয়োজন হইল। এই দুই দিন সেই বৈষ্ণবঠাকুরের কৃপায় আমার পরম আনন্দে কাটিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণবঠাকুরের বয়স প্রায় দুই শত বর্ষের অধিক হইবে। তাঁহার গলায় মোটা তুলসীর মালা; ভাবভক্তিমণ্ডিত তাঁহার মুখখানি দেখিলেই ভক্তি হয়। গৌরাঙ্গদেবের প্রশিষ্য বলিয়াই তিনি আমার নিকট নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন; এবং দুই দিন ধরিয়া মহাপ্রভুর এক অপূর্ব্ব জীবনী শুনাইয়া আমায় ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহার তুলসীমালা দেখিয়া আমি তাঁহার নিকট একটি মালা চাহিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুমি এখনও মালা পাইবার যোগ্য হও নাই।'

গৌরাঙ্গজীবনী বৈষ্ণবঠাকুরের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম উহা যদিও চৈতন্যচরিতামৃত অথবা চৈতন্য ভগবতের বিরুদ্ধ এমন কিছুই নহে, তথাপি উহা সম্পূর্ণ নূতন ভাবপরিপূর্ণ। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি মহাপ্রভুর ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম উহা অতি অপূর্ব্ব—নিতান্ত চিত্তাকর্ষক; উহা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল চৈতন্যদেব ঈশ্বরতুল্য হইলেও, মানুষের মতই তাঁহার আচার ব্যবহার স্নেহ ভালবাসা, সমস্তই ছিল। সেই চৈতন্যস্মৃতি বহুদিন স্মৃতিমন্দিরেই রাখিয়া দিয়াছিলাম। পরে ঐ ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে যখন আমি আদেশ অনুযায়ী নবদ্বীপে গিয়া আদ্যাশক্তির আরাধনায় ব্রতী হই, তখন গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহণে বেড়াইতে বেড়াইতে ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ বসু ও ডাক্তার উমাপদ ঘোষ বন্ধুদ্বয়কে সেই চৈতন্যস্মৃতি শুনাইয়াছিলাম। সন্ন্যাস পর্য্যন্ত শুনিয়াই বন্ধুদ্বয় চোখের জলে ভাসিয়াছিলেন এবং উহা সাধারণে প্রকাশ করিবার জন্য আমায় সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু নানা দিক ভাবিয়া উহা এতদিন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি নাই। ইহারও প্রায় চারি বৎসর পরে যখন আমি পুরীধামে চারিমাস কাল অবস্থান করি, তখন কাশীবাসী জনৈক বৈষ্ণবের একান্ত অনুরোধে সমুদ্রসৈকতে বসিয়া সেই চৈতন্যস্মৃতি বলিতে থাকি এবং তিনি লিখিয়া লইতে থাকেন। সেই সময় খড়দহনিবাসী প্রভুপাদ সৌরীন্দ্র মোহন গোস্বামী মহাশয় সস্ত্রীক পুরীধামে ছিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় হয়। তাঁহারাও শুনিলেন যে বৈষ্ণব ভদ্রলোক আমার নিকট হইতে গৌরাঙ্গ জীবনী লিখিয়া লইতেছেন। সাধারণের প্রকাশিত চৈতন্যচরিতকথা হইতে এই গৌরাঙ্গজীবনের বিশেষত্ব আছে জানিতে পারিয়া তাঁহারাও স্বামীস্ত্রীতে অতঃপর জীবনী লিখাইবার সময় উপস্থিত হইলেন। সেদিন আর সমুদ্রসৈকতে না বসিয়া স্বর্গদ্বারে আমাদের বাসায় বসিয়াই লিখান হইতেছিল। সেদিনকার সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার চোখে ভাসিতেছে। তাঁহারা সস্ত্রীক বসিয়া আছেন। আমি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস কথা বলিয়া যাইতেছি; আর বৈষ্ণব ভদ্রলোক দ্রুত লেখনী চালাইতেছেন। চলিতে চলিতে হঠাৎ লেখনী থামিয়া গেল। অশ্রুধারায় কাগজপত্র ভিজিয়া যাইতে লাগিল। ভদ্রলোক মুহুর্মুহু চোখ মুছিতে লাগিলেন। এদিকে গোস্বামী-

মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রীও চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। উভয়েই নীরব নিস্পন্দ ; কাহারও মুখে কোন কথা নাই। তখন লেখা হইতেছিল,—

সন্ন্যাসগ্রহণে দৃঢ়সংকল্প মহাপ্রভু সেই রাতে সতী সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়াকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সুখসুপ্তা অর্ধাঙ্গিনীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সজল নয়নে একবার তাঁহার মুখের পানে চাহিলেন।—

এই পর্যন্ত লেখা হইতে এই অবস্থা। এখনও মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করেন নাই। ইহাতেই লেখকের লেখনী বন্ধ হইল, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল ; অশ্রুজলে খাতাপত্র নষ্ট হইল। অগত্যা আমি খাতাখানি সরাইয়া রাখিলাম ; এবং যথাসম্ভব সকলকে শান্ত করিতে লাগিলাম। সেদিন ঐ পর্যন্ত লেখা হইল। অতঃপর আরও কিছুদূর অর্থাৎ মহাপ্রভুর নীলাচল গমন পর্যন্ত লেখা হইয়াই এ যাত্রার মত মহাপ্রভুর জীবনী লেখান হইল। জানি না আর কবে উহা পূর্ণ হইবে।

এই গৌরাঙ্গজীবনীর আর এক বিশেষত্ব ছিল যে ইহাতে শুনিয়াছি মহাপ্রভু এখনও সশরীরে বাঁচিয়া আছেন। এখনও তিনি বার বৎসর অন্তর আসিয়া তাঁহার প্রিয় ভক্তকে দর্শন দেন। এবং তিনি নাকি বলিয়াছেন,—আমার এই দেহের বয়স যখন পাঁচ শত বৎসর পূর্ণ হইবে তখন এই দেহ ছাড়িয়া আমি পুনরায় দেহান্তর গ্রহণপূর্বক বাংলায় অবতীর্ণ হইব। এইবার বাংলায় গিয়া 'গৌরাঙ্গ অবতার' নামে অবহিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে হরিনাম বিলাইবার ব্যবস্থা করিব।

যদিও পুরাতন গ্রন্থগুলিতে মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়া সম্বন্ধে নানারূপ বর্ণনা আছে তথাপি আমি স্বকর্ণে সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপ্রভুর প্রশিষ্যের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাধারণে উহা প্রকাশ করিলাম। যদি কোন বৈষ্ণব এজন্য আমায় দোষী সাব্যস্ত করেন তাহা হইলে আমি নাচার ; যেহেতু বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণও এ বিষয়ে সমধিক দোষী ; কারণ তাঁহারাই এ বিষয়ে পরস্পর সিদ্ধান্তে উপনীত।

## ৮৯

বৈষ্ণবঠাকুর যেদিন গৌরাঙ্গজীবনী শেষ করিলেন, সেই দিন রাত্রে ঠাকুর আসিয়া আমায় আদেশ করিলেন, 'অন্নদা! তুমি আর এখানে বিলম্ব করিও না। দেশে যাও ; দেশে গিয়া কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হও।'

আমি বলিলাম, 'আবার কি দীক্ষা ?'

তিনি বলিলেন, 'তোমার কুলগুরু একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক ; তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলে তোমার মঙ্গলই হইবে।'

আমি তখন বলিলাম, 'আচ্ছা তাই হবে। তবে আমি গুরুদেবকে কোন

সংবাদ দেব না। তিনি স্বেচ্ছায় এসে যদি আমায় দীক্ষা দেন তাহলে আমি দীক্ষা গ্রহণ করব ; না হলে নয়।'

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া ভাবিতেছি, হৃষীকেশ হইতে চট্টগ্রাম যাইব কি উপায়ে ; পাথেয় কোথায় ? আমি কপর্দকশূন্য ; এমন সময় শুনিতে পাইলাম জনৈক পাঞ্জাবী ভক্ত সাধুদের কম্বল বিলাইতেছেন। এক জন আমায় বলিলেন, 'সাধুজী ! যাইয়ে ; ছেত্রপর একঠো কম্বল মিল যায়গা।'

ইহাও ঠাকুরের ইঙ্গিত ভাবিয়া সত্র হইতে একখানা কম্বল লইয়া আসিলাম ; এবং সেই কম্বলের বিনিময়ে কনখল পর্যন্ত যাইবার সুব্যবস্থা হইল। তখন আমার শরীর নিতান্ত দুর্বল। কনখলে আমি ঠাকুরের সেবাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। আশ্রম কর্তৃপক্ষ আমায় রোগী সাব্যস্ত করিয়া দুই জনের মত একটি ছোট কামরার এক ধারে আমায় স্থান দিলেন। সেবাশ্রমের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। সেবকগণ প্রাণপণ যত্নে রোগীদের সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেবা যত্নে আমিও মুগ্ধ হইলাম।

সেবাশ্রমে বেশ আনন্দেই আছি। বেশ শান্তিতেই কাটিতেছে ; এমন সময় অকস্মাৎ এক পূর্বপরিচিত সাধুর আবির্ভাবে চমকিত ও চিন্তিত হইলাম। স্বর্গাশ্রম হইতে ফিরিবার পূর্বে সেই যে সাধুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, যিনি পুত্রশোকে অধীর, সতর বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াও যিনি পুত্রশোক বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, সেই সাধু আজ সেবাশ্রমে উপস্থিত। আমাকে দেখিবামাত্র অনুযোগের স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ বাঃ—বেশ ত তুমি ;—সাধুবেশ ধরেও কথার ঠিক রাখতে পার না ?'

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম 'আপনার কাছে আমি কিছুই পাবার আশা রাখি নি ; তাই আপনার নির্দেশ সত্ত্বেও আপনার কুঠিয়ায় যাই নি ; তাতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন।'

আমার বিনয়বচনে সাধু নরম হইয়া বলিলেন, 'না, না ; তা কেন ? অপরাধ কিছুই নয়। তা সে যাই হোক—তুমি এখন দেশে যাচ্ছ ত ?

আমি উত্তর করিলাম, 'হাঁ, আমি জন্মভূমি অভিমুখেই চলেছি।'

'তা ভাল ভাল ; বেশ কথা ; আহা ! বাপ মা ভাই বোন, তার ওপর স্ত্রী পর্যন্ত ছেড়ে, এ বয়সে কি এই কঠোর ব্রত নেওয়া ঠিক ?—আচ্ছা, এখন থাক ; আমি সন্ধ্যার পর তোমার সঙ্গে দেখা করব ; কেমন ?'

সন্ন্যাসীর কথায় সম্মতি দিয়া আমি ঘরে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কে এই সন্ন্যাসী ? আমার সহিত ইহার প্রয়োজনই বা কি ? এমন সময় পার্শ্ববর্তী শয্যা হইতে জনৈক বৈষ্ণব সাধু আমায় নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সেবাশ্রমের যে কামরায় আমি ছিলাম তাহারই অপরার্ধে ইনি পূর্বদিবস আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইঙ্গিত মত তাহার নিকটে আসিয়া বসিলে তিনি আমাকে

আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁহার নিকট আমার পরিচয় দিলাম। আমার পরিচয়ে সাধুজী বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমি যে কিছুদিনের জন্যও ভগবানের নাম লইয়া বাহির হইতে পারিয়াছি ইহাই আমার মত সংসারী জীবের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, 'বাবা! তোমার কথা শুনে, আর মুখের ভাব দেখে, বেশ বোধ হচ্ছে, তুমি একজন মুক্ত পুরুষ; এই তোমার শেষ জন্ম; আর তোমার দ্বারা জীবজগতের অশেষ মঙ্গল হবে।'

সাধুর কথা শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম; এবং তাঁহার দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ উচ্চ ধারণা হবার কোন বিশেষ কারণ আছে কি?'

উত্তরে সন্ন্যাসী একটী নূতন কথা আমায় শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, 'আছে; কাল রাত্রে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে স্বপ্নে দেখেছি; তিনি বল্লেন, 'আমি একজন সাধুকে আশ্রয় করে এখানে এসেছি; কাল তাকে এক ভীষণ পরীক্ষায় ফেল্‌ব। যদি উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে তাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে।' —কে জানে মহাশয়? হয় ত আপনিই সেই সাধু।

সাধুর উক্তি শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। এ কি কথা! এখনও পরীক্ষা! কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অনন্যমনে ছুটিয়াছি; দিবারাত্রি সেই এক কর্ম্মের চিন্তা আমার সমস্ত চেষ্টা চরিত্রে ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। তথাপি পরীক্ষা! তথাপি সন্দেহ! তথাপি অবিশ্বাস! নীরবে সেস্থান হইতে উঠিয়া সমস্ত দিন পরীক্ষার কথাই ভাবিতে লাগিলাম! হায়! দুর্ব্বল জীব! ইন্দ্রিয়াসক্ত মুগ্ধ জীব! একবার ভাবিয়া দেখ সংসারসংগ্রামে জয়ী হওয়া কি ভীষণ ব্যাপার! সুখের কোলে মুখ লুকাইয়া কাল কাটাইতেছ। কি কঠোর! কি ভয়াবহ! কি শোচনীয় যে ইহার পরিণাম, আমার এই দশা দেখিয়া তাহা একবার অনুমান কর। একবার ভাবিয়া দেখ অমূল্য জীবন দিয়া কি নৈরাশ্যময় অন্ধকূপ খনন করিতেছ!

সংসারে যাহা কিছু তোমার অবলম্বন সমস্তই অসার—সমস্তই অস্থায়ী। পিতামাতার স্নেহ, পতিপত্নীর প্রেম, পুত্রকন্যার মোহ, অর্থের গরিমা—কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ইহার কোনটিই শেষ পর্য্যন্ত কাহাকেও সুখ দিতে পারে নাই। আজ হয় ত এই পিতামাতার স্নেহের বেষ্টনে বেশ আছ; কাল ত এই পিতা-মাতাই তোমার ব্যবহারে বিরূপ হইবেন; স্নেহের গণ্ডি হইতে তোমায় দূর করিয়া দিবেন; হয় ত বা আর তোমার মুখ দর্শন করিবেন না,—তুমি ত্যাজ্য পুত্র হইবে। আজ যাহাকে সুদীর্ঘ সংসারপথে একমাত্র সাথী জানিয়া প্রাণের

অধিক ভালবাসিতেছ, যাহার স্নিগ্ধ শীতল প্রেমের পরশে ভুবন মধুময় দেখিতেছ, দুই দিন পরে যখন তাহার যৌবন জোয়ারে ভাটা পড়িবে, রূপতরঙ্গ যখন অরূপে লীন হইবে, পুত্রকন্যার লালন পালন ও শিক্ষার ভারে যখন নত হইয়া পড়িবে, তখনকার অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তখন হয়ত রুক্ষ প্রকৃতি উগ্র স্বভাব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কি করিতে কি করিয়া বসিবে; ফলে হয়ত চিরজীবন দগ্ধ হইতে হইবে।

আর পতিপ্রেম? অয়ি সতী সাধ্বী মাতৃজাতি! ভুলিয়াও ভাবিও না এই পতিপ্রেম তোমাদের চিরশুদ্ধ চিরস্থায়ী চিরশান্তির ও চিরসুখের। এমন দিন রহিবে না মা! যদিও পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গুরু,—পতিসেবাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—পতিই সতীর গতি তথাপি বলি সাবধান! অতি সন্তর্পণে পথ চলিতে হইবে। সর্ব্বদা অনাসক্ত থাকিতে হইবে! কখন যে কিরূপে পতিদেবতা বিরূপ হইবেন তাহার কি কোন স্থিরতা আছে? তিনি যে দেবতা! দেবতার যে অনন্ত লীলা! একটু কিছু হইলে আর রক্ষা নাই! তারপর বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকন্যাগণ হয় ত,—হয় ত কেন? নিশ্চয়ই—তুমি যেমন পিতামাতার প্রতি ব্যবহার করিয়াছিলে—ঠিক তেমনি অথবা ততোধিক রূঢ় ব্যবহার করিবে।

ধনের ভরসা করিতেছ? যে ধনের গর্ব্বে তুমি গর্ব্বিত' সে ধন কি তোমার? —সে ধন কি অন্তিমে তোমায় শান্তি ও সুখ দিতে পারিবে? কখনই নয়, বরং মহা অশান্তির সৃষ্টি করিবে। যে ধন অর্জ্জনে যত দুঃখ, রক্ষায় তাহার দ্বিগুণ এবং ব্যয়ে তাহার দশগুণ; তাহার স্বার্থকতা কোথায়? দুঃখ উপাদানে যাহার সৃষ্টি, দুঃখের আধারে যাহার স্থিতি এবং দুঃখেই যাহার লয়, তাহাতে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? অতএব হে ধনোপাসক মূর্খ সাধক! এই ধনই তোমার ধ্বংসের কারণ ইহা নিশ্চয় জানিও। এই ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তুমি মানুষকে মানুষ জ্ঞান কর নাই। আর্ত্তের হাহাকার, ক্ষুধিতের ক্রন্দন, দরিদ্রের প্রার্থনা, কর্ম্মীর আবেদন, সমস্তই তুমি ভ্রূকুটীভরে উপেক্ষা করিয়াছ। কিন্তু স্মরণ রাখিও সংসারে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, পুত্র পিতারই অর্থবলে বলী হইয়া অর্থলিপ্সায় পিতার টুঁটি টিপিয়া ধরে, স্ত্রী স্বামীর ধনে ধনী হইয়া পাপলিপ্সা পরিতৃপ্তির অন্তরায় স্বামীকে বিষ প্রয়োগ করে, অর্থলোভী দস্যু অর্থলালসায় নিরীহ ধনীর বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বসাইয়া দেয়। কিন্তু অর্থই যদি তোমার পরমার্থ হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি বুঝিবে কিরূপে? মিথ্যার প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে পরিত্রাণ কোথায়?

১০

নানা চিন্তায় দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর কিছু আহার করিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রহরাধিক অতীত হইলে দেখি সেই লছমণঝোলার

সাধুটী আসিয়া আমার শিয়রে বসিলেন। আমিও উঠিয়া বসিলাম এবং তাহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কিছু বল্‌বার আছে কি ?'

উত্তরে সাধু অপর শয্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঐ লোকটী কি জেগে আছে ?'

আমি বলিলাম, 'না, উনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন; আপনার কি বক্তব্য বলুন; এখানে আর কেউ নেই।'

কিয়ৎক্ষণ নিব্বাক থাকিয়া সন্ন্যাসীঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 'বাবা! আমি যখন প্রথম তোমাকে লছমণঝোলায় গঙ্গাতীরে দেখ্‌তে পাই সেই প্রথম দর্শন থেকেই তুমি আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসে আছ। সে কথা ত আগেই বলেছি। ঠিক তোমারই মত দেখ্‌তে শুন্‌তে এবং তোমারই মত বয়সের এক পুত্র হারিয়েই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম। সে অনেক কথা। তারপর কঠোর তপস্যায় চৌদ্দ বৎসর অতীত হয়ে গেছে। একাদিক্রমে বার বৎসর পুষ্করতীর্থে এক গুহায় অবস্থান করে অনেক বিভূতি লাভ করেছি; কিন্তু আমার এখনও পরম বস্তু লাভ হয় নি। আর এজীবনে হবে কিনা সন্দেহ। কারণ গুরুবাক্য বিশ্বাস করেই বার বৎসর গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে থেকে সাধনা করেছিলাম। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যখন বস্তুলাভ হল না, তখন একটা সন্দেহের যবনিকা আমার সাধন পথ রুদ্ধ করে দিলে; গুহা পরিত্যাগ করে আমি গুরুসন্দর্শনে বাহির হলাম। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে আজও গুরুদেবের দর্শন পেলাম না। উদাসী গুরু আমার কোথায় যে আছেন তাও আমি জানি না। বেঁচে আছেন কি না তাই বা কে জানে? তাই আবার গুরু অন্বেষণে বেরিয়েছি।

তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্ব্বাশ্রমের কথা সব মনে পড়ে গেল। আমার উপযুক্ত পুত্রের সেই অপূর্ব্ব স্মৃতি মস্তিষ্কের অণু পরমাণুতে যেন সজীব হয়ে উঠ্‌ল। আমি যে কি রকম কি হয়ে গেলাম তা প্রকাশ করে বল্‌বার উপায় রইল না। তাই তোমাকে আমার কুঠিয়ায় যেতে বলেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, কঠোর সাধনার ফলে ভগবৎকৃপায় যে সকল বিভূতি আমি লাভ করেছি, সমস্ত তোমায় দান করে আমি পরিতৃপ্ত হব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কর্‌লে না। তবু তোমারই খোঁজ কর্‌তে কর্‌তে আমি এই কন্‌খলে এসে উপস্থিত হয়েছি। প্রবল পুত্রস্নেহের প্রচণ্ড পীড়নে আমি পীড়িত। আমি এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য! হায়! আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে বার বৎসর কঠোর সাধনার পরেও সামান্য স্নেহস্মৃতি আমায় এমন দুর্ব্বল করে তুল্‌বে। তুমি হয় ত মনে মনে হাস্‌ছ। কিন্তু বাবা! তুমি এখনও ছেলেমানুষ। পুত্র কন্যার পিতা হতে তোমার এখনও বিলম্ব আছে। যখন হবে তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে পুত্রস্নেহ কি ভীষণ! সন্তানের মায়া কি দুর্দ্ধর্ষ!'

সন্ন্যাসীঠাকুরের সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার অন্তরের ভাব যথাযথ বুঝিয়া বলিলাম, 'আচ্ছা ; আপনি বলুন দেখি, কি কি বিভুতি আমায় দান করতে আপনি প্রস্তুত হয়েছেন ? আরও বলুন বিনা সাধনায় ঐ সব বিভুতি লাভ করে, আমি রক্ষা করতে পারব কি না।'

তদুত্তরে সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন, 'বাবা ! আমি তোমায় যে সব উপায় শিখিয়ে দিচ্ছি, তাতে একটু সাবধান থাকতে পারলেই, তুমি সে সব বিভুতি রক্ষা করতে পারবে। সেগুলি অর্জ্জন করতে আমাকে যে কঠোরতা করতে হয়েছে, রক্ষা করতে তোমাকে তার পাইয়ের পাইও করতে হবে না। শুধু আমার বাক্যে বিশ্বাস, আর সামান্য নিয়ম সাবধানে পালন করলেই হবে।'

'আচ্ছা বেশ ; এখন বলুন কি কি বিভুতি আপনি আমায় দান করতে ইচ্ছা করেছেন।'

প্রকৃতপক্ষে বিভুতির কথায় কিছুমাত্র আকৃষ্ট না হইলেও সন্ন্যাসীঠাকুর কি কি বিভুতি লাভ করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতুহল হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আমি তোমায় চারটী বিভুতি দিচ্ছি। এই চারটি বিভুতি লাভ করে তুমি যদি লোকালয়ে বাস কর, সর্ব্বসাধারণে তোমার পূজা করবে ; রাজদুর্লভ মান সম্মান ও যশ গৌরবে তুমি দশ দিক মুখরিত করে তুলতে পারবে। অনতিকাল মধ্যে জগৎগুরু সেজে তুমি বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে।'

কথাগুলি সন্ন্যাসীঠাকুর যে ভাবেই বলুন না কেন, আমার তেমন ভাল লাগিতেছিল না। কারণ আমি তখন যে ধনে ধনী হইয়া দেশে ফিরিতেছি, তাহাতে মনে মনে ধারণা ছিল যে, তত বড় ধনী আর এ জগতে জন্মায় নাই। তথাপি নিবিষ্ট চিত্তে সন্ন্যাসীঠাকুরের কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, 'প্রথম যে বিভুতি তোমায় দিচ্ছি তার শক্তিতে তুমি যে কোন জীবের যে কোন ব্যাধি মুহূর্ত্তে আরাম করে দিতে পারবে।'

কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া আমি বলিলাম, 'কি রকম ?'

উত্তর হইল, 'এই ধর কোন বড় লোক শূলরোগ বা অন্য কোন কঠিন রোগে অস্থির হয়ে পড়েছেন। তুমি অনায়াসে তাঁর রোগ যে কোন দীন দুঃখী বা জন্তু জানোয়ারকে চালান করে দিয়ে তাঁকে রোগমুক্ত করে অশেষ খ্যাতি ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে।'

আমি চমকিয়া উঠিলাম। এ কি কথা ! সন্ন্যাসীর মুখে এ কি পাপজনক ঘৃণ্য কথা ! এ কি জঘন্য স্বার্থপরতার কথা ! আমার ভাব দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তুমি চমকে উঠলে যে ?'

কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া আমি বলিলাম, 'তারপর বলুন।'

সাধুটী আসিয়া আমার শিয়রে বসিলেন। আমিও উঠিয়া বসিলাম এবং তাহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কিছু বল্‌বার আছে কি?'

উত্তরে সাধু অপর শয্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঐ লোকটী কি জেগে আছে?'

আমি বলিলাম, 'না, উনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন; আপনার কি বক্তব্য বলুন; এখানে আর কেউ নেই।'

কিয়ৎক্ষণ নিশ্বর্বাক থাকিয়া সন্ন্যাসীঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 'বাবা! আমি যখন প্রথম তোমাকে লছমণঝোলায় গঙ্গাতীরে দেখ্‌তে পাই সেই প্রথম দর্শন থেকেই তুমি আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসে আছ। সে কথা ত আগেই বলেছি। ঠিক তোমারই মত দেখ্‌তে শুন্‌তে এবং তোমারই মত বয়সের এক পুত্র হারিয়েই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম। সে অনেক কথা। তারপর কঠোর তপস্যায় চৌদ্দ বৎসর অতীত হয়ে গেছে। একাদিক্রমে বার বৎসর পুষ্করতীর্থে এক গুহায় অবস্থান করে অনেক বিভূতি লাভ করেছি; কিন্তু আমার এখনও পরম বস্তু লাভ হয় নি। আর এজীবনে হবে কিনা সন্দেহ। কারণ গুরুবাক্য বিশ্বাস করেই বার বৎসর গুরুনির্দিষ্ট পথে থেকে সাধনা করেছিলাম। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যখন বস্তুলাভ হল না, তখন একটা সন্দেহের যবনিকা আমার সাধন পথ রুদ্ধ করে দিলে; গুহা পরিত্যাগ করে আমি গুরুসন্দর্শনে বাহির হলাম। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে আজও গুরুদেবের দর্শন পেলাম না। উদাসী গুরু আমার কোথায় যে আছেন তাও আমি জানি না। বেঁচে আছেন কি না তাই বা কে জানে? তাই আবার গুরু অন্বেষণে বেরিয়েছি।

তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্ব্বাশ্রমের কথা সব মনে পড়ে গেল। আমার উপযুক্ত পুত্রের সেই অপূর্ব্ব স্মৃতি মস্তিষ্কের অণু পরমাণুতে যেন সজীব হয়ে উঠ্‌ল। আমি যে কি রকম কি হয়ে গেলাম তা প্রকাশ করে বল্‌বার উপায় রইল না। তাই তোমাকে আমার কুঠিয়ায় যেতে বলেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, কঠোর সাধনার ফলে ভগবৎকৃপায় যে সকল বিভূতি আমি লাভ করেছি, সমস্ত তোমায় দান করে আমি পরিতৃপ্ত হব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কর্‌লে না। তবু তোমারই খোঁজ কর্‌তে কর্‌তে আমি এই কন্‌খলে এসে উপস্থিত হয়েছি। প্রবল পুত্রস্নেহের প্রচণ্ড পীড়নে আমি পীড়িত। আমি এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য! হায়! আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে বার বৎসর কঠোর সাধনার পরেও সামান্য স্নেহস্মৃতি আমায় এমন দুর্ব্বল করে তুল্‌বে। তুমি হয় ত মনে মনে হাস্‌ছ। কিন্তু বাবা! তুমি এখনও ছেলেমানুষ। পুত্র কন্যার পিতা হতে তোমার এখনও বিলম্ব আছে। যখন হবে তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে পুত্রস্নেহ কি ভীষণ! সন্তানের মায়া কি দুর্দ্ধর্ষ!'

সন্ন্যাসীঠাকুরের সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার অন্তরের ভাব যথাযথ বুঝিয়া বলিলাম, 'আচ্ছা ; আপনি বলুন দেখি, কি কি বিভূতি আমায় দান করতে আপনি প্রস্তুত হয়েছেন ? আরও বলুন বিনা সাধনায় ঐ সব বিভূতি লাভ করে, আমি রক্ষা করতে পারব কি না।'

তদুত্তরে সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন, 'বাবা ! আমি তোমায় যে সব উপায় শিখিয়ে দিচ্ছি, তাতে একটু সাবধান থাকতে পারলেই, তুমি সে সব বিভূতি রক্ষা করতে পারবে। সেগুলি অর্জ্জন করতে আমাকে যে কঠোরতা করতে হয়েছে, রক্ষা করতে তোমাকে তার পাইয়ের পাইও করতে হবে না। শুধু আমার বাক্যে বিশ্বাস, আর সামান্য নিয়ম সাবধানে পালন করলেই হবে।'

'আচ্ছা বেশ ; এখন বলুন কি কি বিভূতি আপনি আমায় দান করতে ইচ্ছা করেছেন।'

প্রকৃতপক্ষে বিভূতির কথায় কিছুমাত্র আকৃষ্ট না হইলেও সন্ন্যাসীঠাকুর কি কি বিভূতি লাভ করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আমি তোমায় চারটী বিভূতি দিচ্ছি। এই চারটি বিভূতি লাভ করে তুমি যদি লোকালয়ে বাস কর, সর্ব্বসাধারণে তোমার পূজা করবে ; রাজদুর্লভ মান সম্মান ও যশ গৌরবে তুমি দশ দিক মুখরিত করে তুলতে পারবে। অনতিকাল মধ্যে জগৎগুরু সেজে তুমি বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে।'

কথাগুলি সন্ন্যাসীঠাকুর যে ভাবেই বলুন না কেন, আমার তেমন ভাল লাগিতেছিল না। কারণ আমি তখন যে ধনে ধনী হইয়া দেশে ফিরিতেছি, তাহাতে মনে মনে ধারণা ছিল যে, তত বড় ধনী আর এ জগতে জন্মায় নাই। তথাপি নিবিষ্ট চিত্তে সন্ন্যাসীঠাকুরের কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, 'প্রথম যে বিভূতি তোমায় দিচ্ছি তার শক্তিতে তুমি যে কোন জীবের যে কোন ব্যাধি মুহূর্ত্তে আরাম করে দিতে পারবে।'

কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া আমি বলিলাম, 'কি রকম ?'

উত্তর হইল, 'এই ধর কোন বড় লোক শূলরোগ বা অন্য কোন কঠিন রোগে অস্থির হয়ে পড়েছেন। তুমি অনায়াসে তাঁর রোগ যে কোন দীন দুঃখী বা জন্তু জানোয়ারকে চালান করে দিয়ে তাঁকে রোগমুক্ত করে অশেষ খ্যাতি ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে।'

আমি চমকিয়া উঠিলাম। এ কি কথা ! সন্ন্যাসীর মুখে এ কি পাপজনক ঘৃণ্য কথা ! এ কি জঘন্য স্বার্থপরতার কথা ! আমার ভাব দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তুমি চমকে উঠলে যে ?'

কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া আমি বলিলাম, 'তারপর বলুন।'

তিনি বলিলেন, তারপর, দ্বিতীয় বিভূতি হচ্ছে এই যে, তোমায় এমন এক মন্ত্রকৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি, যার বলে তুমি লোকের ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করাতে পারবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে আবার কি ? কোনরূপ ইন্দ্রজাল নাকি ?—তাতে দর্শকের লাভ ?'

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, 'দর্শকের লাভ মাথা আর মুণ্ড ; তোমারই অশেষ লাভ। তুমি যাকেই শিষ্য করতে চাইবে, সেই তোমার ঐ রকম শক্তি দেখে, নিশ্চয় তোমার একান্ত অনুগত হয়ে পড়বে। তারপর তাকে দিয়ে তুমি তোমার যে কোন অভীষ্ট পূরণ করে নিতে পারবে।'

কথা শুনিয়া সত্য সত্যই আমার বুকের ভিতর হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল। ভাবিলাম—কি অত্যাচার ! সাধু সন্ন্যাসীরা কি তবে এই রূপেই সহস্র সহস্র শিষ্যের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া থাকে ? হায় ! আমাদের দেশ কি এই সাধুতারই পূজা করিয়া থাকে ? ইহা ত ইন্দ্রজাল ভিন্ন কিছুই নহে। সন্ন্যাসী আমায় চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন, 'বাবা ! তুমি এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছ কেন ? আমি যা বলছি সমস্তই অভ্রান্ত সত্য—আজই তোমায় সব শিখিয়ে দিয়ে যাব।'

আমি বলিলাম 'তারপর ?'

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তারপর তৃতীয় বিভূতি শিখলে তুমি যখনই ইচ্ছা করবে তখন থেকে—ছমাস কাল জলগ্রহণ পর্য্যন্ত না করে অনায়াসে থাকতে পারবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাতে আমার লাভ ?'

তিনি বলিলেন, 'ধর, তুমি কোন রাজা বা জমিদারকে কিছুতেই বশ করতে পারছ না ; তার দ্বারা কিছুতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে না। তখন তুমি যদি নিরম্বু উপবাস করে ছমাস সেই রাজবাড়ী বা জমিদার বাড়ীতে থাকতে পার, তাহলে সে লোক তোমায় সাক্ষাৎ ভগবান মনে করে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বেই। এও কি কম লাভ ?'

অবজ্ঞাভরে আমি শুধু বলিলাম, 'তারপর ?'

সন্ন্যাসী এইবার যা বলিলেন তাহা আরও নিন্দনীয়, আরও সাংঘাতিক ; অতীব গর্হিত। সন্ন্যাসী বলিলেন, 'চতুর্থ বিভূতি এই যে তোমাকে এমন এক মন্ত্র আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, যা এক শ আট বার জপ করে নরনারী নির্ব্বিশেষে যাকেই তুমি স্পর্শ করবে, সেই তোমার এমন বশ হবে যে, তাকে তোমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। তখন তাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেও, সে তোমার সঙ্গ ছাড়বে না। পরে যখনই তুমি ইচ্ছা করবে, তখনই তাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে।

কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। আমার হৃৎকম্প উপস্থিত

হইল। ক্রোধে আমি অধীর হইলাম। মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া রূঢ় স্বরে বলিলাম, পাষণ্ড! ভণ্ড সন্ন্যাসী! দূর হও এখান থেকে; নইলে এক চড়ে তোমায় শয্যাশায়ী কর্‌ব।'

ক্রোধে আস্ফালন করিয়া সন্ন্যাসীকে চড় দেখাইলাম বটে; কিন্তু দুর্ব্বৃত্তের ভয়ে নিজেই লাফ দিয়া শয্যা হইতে দূরে গিয়া দাঁড়াইলাম। কি জানি, যদি একশত আট বার জপ করিয়া আমায় ছুঁইয়া দেয়—তাহা হইলে যে আমার সমস্ত পণ্ড হইবে। তাই দূরে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর মুখ মলিন হইয়া আসিল। ভাবে বুঝিলাম তিনি আকাশ হইতে পড়িলেন। স্বপ্নে যাহা ভাবেন নাই তাহাই যেন ঘটিয়া গেল। তথাপি আমি ক্রুদ্ধ স্বরে পুনরায় সন্ন্যাসীকে কটূক্তি করিলাম। অবশ্য শেষ বার কিঞ্চিৎ ভদ্র ভাষায় বলিয়াছিলাম। কারণ তাঁহার মলিন মুখের করুণ দৃষ্টি তখনই আমার হৃদয়ে ব্যথার উদ্রেক করিয়াছিল; এবং অন্তরে বিবেক আমায় শত ধিক্কার দিয়া বলিতেছিল, তুমি সিদ্ধাই না চাও ভালই; সন্ন্যাসীকে অপমান করিবে কেন?' এই সব নানা কারণে অপেক্ষাকৃত ভদ্র ভাষায় বলিলাম, 'আপনি এঘর থেকে বেরিয়ে যান; আমি আপনার একটা কথাও শুনতে চাই না। আপনার ঐ সব বিভূতিকে আমার সহস্র নমস্কার। যদি বেঁচে থাকেন, চৌদ্দ বৎসর পরে এক বার বাংলায় গিয়ে অন্নদাঠাকুরের খোঁজ কর্‌বেন; আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হবে; আপনি বস্তু লাভ কর্‌তে পার্‌বেন।'

৯১

সন্ন্যাসী নিরুত্তর হইয়া কি এক অস্পষ্ট শব্দ করিতে করিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; এবং আমার চীৎকারে জাগরিত পার্শ্ববর্ত্তী বৈষ্ণব সাধুটী নির্ব্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমাদের অবস্থা দেখিয়া, সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হচ্ছিল বাবাজী?' কি সিদ্ধাইয়ের কথা হচ্ছিল? সন্ন্যাসী সিদ্ধাই টিদ্ধাই কিছু জানেন নাকি? সাবধান! খুব সাবধান! তুমি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত! ওসবের ধারেও যেও না। আমি কথামৃতে পড়েছি ঠাকুর সিদ্ধাইকে বড় ঘৃণা কর্‌তেন; একদিন ৺মার কাছে সিদ্ধাই চাইতে গিয়ে দেখেন, 'যুবতী বেশ্যার বিষ্ঠা আর সিদ্ধাই একই জিনিষ।'

আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। আমি যেন কোন হিংস্র জন্তুর কবল হইতে কৌশলে রক্ষা পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবঠাকুরের সেই পরীক্ষার কথাও আমার মনে পড়িল। আমি হৃষ্ট মনে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে সত্যসত্যই ভীষণ পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি। করুণাময়ী মা আমায়

রক্ষা করিয়াছেন।

এই ঘটনার বিবরণ পাঠ করিয়া হয় ত অনেকে প্রশ্ন করিবে অন্নদাঠাকুর বড় বড় সিন্ধাই এইরূপ ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া অর্থ সাহায্যের জন্যে আবার লোকের দ্বারস্থ হইলেন কেন। ৺মায়ের মন্দিরের জন্য তিনি যাহার তাহার নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন। কত জায়গায় উপেক্ষিতও হইয়াছেন; কেন তিনি ৺মায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই? যিনি আদেশ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার আদেশ কার্য্যে করিবেন, এই বিশ্বাস অন্নদাঠাকুর হারাইলেন কেন? এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার ক্ষমতা আমার না থাকিলেও এ সম্বন্ধে এই স্থানে দুই এক কথা বলিব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, 'আমিই সকলের মূল বটে; তথাপি তোমাকে নিমিত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে; নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।' তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করিয়া থাকেন; মানুষ নিমিত্ত মাত্র; নিমিত্তের ভাগী হইতে হইলে নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। তদ্ভিন্ন স্থির-বিশ্বাসী সাধুপুরুষগণও সাধারণ জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীও কর্ম্মত্যাগ করেন না। সন্ন্যাসের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নহে; কর্ম্মফলত্যাগ ও কর্ম্মে আসক্তিত্যাগ। একমাত্র ব্রহ্মবিৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া জড়ভরত সাজিতে পারেন সাধারণ জীব তাহা পারে না। আমার উদ্যোগী হইতেই হবে।

জগতের হিতকল্পে যে মহান কর্ম্মের ভার লইয়া আমি আসিয়াছি, সেই কর্ম্মভার গ্রহণের সময়ে যিনি আমায় কর্ম্মভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনিই বলিয়াছিলেন, 'এই কর্ম্ম করিতে তোমায় নাকের জলে চোখের জলে হইতে হইবে। একশত বৎসর পরে যে কার্য্য হইবার কথা, এক শত বৎসর পূর্ব্বে সে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে আমাকে যে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে অথবা সাধারণ সমাজে উপেক্ষিত হইতে হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? এ জগতে যিনিই কোন সৎকর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন তাঁহাকেই যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে; পীড়ন প্রহার এমন কি জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সেই সকল মহাপুরুষদিগকে কত লোকে কত গালি বর্ষণ করিয়া আসিতেছে। আর আমি ত তাহাদের তুলনায় তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। তাহাতে আবার আমি লোকের অর্থ চাহিতেছি।

অর্থ লোকের প্রাণাধিক প্রিয়। সেই অর্থে যে ব্যক্তি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে যে অর্থশালীর চক্ষুশূল হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! অর্থ কি সামান্য বস্তু? অর্থে পুত্রশোক নিবারিত হয়, পতিপ্রেম ভুলিয়া যায়, ভায়ের বুকে ভাই, পিতার বুকে পুত্র, বন্ধুর বুকে বন্ধু তীক্ষ্ন ছুরিকা বসাইয়া জন্মের মত বিদায় দেয়। পরমার্থের পরই এই অর্থ। এই অর্থই মানুষকে পরমার্থ

ভুলাইয়া দেয়। অর্থের শক্তি কি কম? এ হেন অর্থ, লোকের বুকের রক্ত, আমি দুই কথায় বাহির করিয়া লইতে গেলে—কয়জন ধৈর্য্যশীল দাতা উহা সহ্য করিবেন। যাঁহারা সহ্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আজীবন আমি তাঁহাদের পূজা করিব; জীবনের সমস্ত সাধনা দিয়া তাঁহাদের মঙ্গল চিন্তা করিব; তাঁহাদের পুণ্য নাম যশগৌরবের পুণ্য পতাকায় অঙ্কিত করিয়া মন্দির শীর্ষে উড়াইয়া দিব। দূর ভবিষ্যতের নরনারী তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি সমস্বরে কীর্ত্তন করিবে।

সন্ন্যাসীকে প্রত্যাখ্যানের পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম মহাত্মাটি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাই। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার বিফলতার কথা চিন্তা করিয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই কিন্তু সে দুর্ব্বলতা দূর হইয়া গেল। আমি আপনার মনে খুব হাসিতে লাগিলাম এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও মহাত্মাজীর নিবুর্দ্ধিতায় শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। তৎপরে সেবাশ্রমের ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া বারান্দায় লেবুর আচারের ঘটা দেখিতে পাইলাম। আচারের গন্ধেই রসনা সরস হইয়া উঠিল; স্বাদ গ্রহণের উপায় হইল না।

সেবাশ্রমে সকাল সন্ধ্যায় আমি ঠাকুরঘরে গিয়া বসিতাম। সেখানকার নীরবতায় আমার বেশ আনন্দ বোধ হইত। কয়েক দিন আনন্দে কাটাইবার পর একদিন শুনিলাম, চণ্ডীর পাহাড়ে আজ মেলা; বহুলোক সমাগম হইবে। আমার শরীর তখন অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিয়াছে; তাই স্থির করিলাম মেলা দেখিতে যাইব। মধ্যাহ্নে আহারান্তে মেলা দেখিতে যাইব স্থির হইলে মঠাধ্যক্ষ মহারাজ ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ বাবাজি! সন্ধ্যায় আগে আসা চাই—এই নিয়ম; না হলে রাত্রে এখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

মহারাজের মুখপানে ক্ষণকাল তাকাইয়া 'যে আজ্ঞা, তাই হবে, বলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। মনে মনে ভাবিলাম—এ কি? এমন কড়া কথা কেন? সঙ্গে সঙ্গে একটী কথা মনে পড়িতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। কথাটা এই যে আগের দিনে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া আমায় বলিয়াছিলেন, 'আপনি সুস্থ হয়েছেন; এখন যেতে পারেন।' তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, 'আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। আরও দু'চার দিন এখানে থাকলে আমার ভাল হয়; শরীরটাও সুস্থ হয় আর এক বন্ধুর কাছে ভাড়ার জন্য লিখেছি; টাকাটাও এসে যেতে পারে।' আরজি পেশ হইলে আমার টাকা না আসা পর্য্যন্ত আমাকে থাকিতে দেবার অনুমতি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আম্বালা হইতে বন্ধুবর ধীরেন্দ্রনাথ বসু টাকা পাঠাইয়া লিখিয়াছেন, 'আপনি আম্বালায় আসুন। আজ সেই টাকা পাইয়াছি। মঠাধ্যক্ষ মহারাজের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিয়াছে। কাজেই, টাকা আসা সত্বেও আমি এখানে রহিয়াছি; ইহাতেই

মহারাজ বিরূপ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল। আবার মনে হইল—না, না; মহারাজ কি এতই সংকীর্ণ হৃদয়? বোধ হয় এখানকার নিয়মই এইরূপ। রোগী সুস্থ হইয়া উঠিলে আর তাহাকে রাখা হয় না; অথবা সন্ধ্যার পর কোন রোগী বাহিরে থাকিতে পারে না।

৯২

চিন্তা করিতে করিতে বাজারের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছি। স্থানে স্থানে নানাবিধ মিঠাই প্রস্তুত হইতেছে। কোথাও বা চানাচুরের ডালা সাজান রহিয়াছে; আর পেয়ারার ত কথাই নাই। এক রকম ছোট ছোট পেয়ারা ওদেশে হয়; যেমন প্রচুর জন্মায় তেমনি সুলভ; এক পয়সায় বিশ পঁচিশটী পাওয়া যায়। আমি এক পয়সার ডাঁসা পেয়ারা লইলাম। দুই একটী পেয়ারা চিবাইয়া সমস্তই দীন দুঃখীদিগের দিয়া দিলাম। আনন্দে রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। সংকীর্ণ রাস্তার দুই ধারে পেয়ারা বাগান; মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পেয়ারার দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। পথে যাত্রীও নিতান্ত কম নয়; তবে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। রঙ বেরঙের কাপড় পরিয়া গান গাহিতে গাহিতে তাহারা পল্লীপথ মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালীর চক্ষে হয়ত ইহার কোনও সৌন্দর্য্য নাই। আমার চোখে কিন্তু বড়ই সুন্দর লাগিতেছিল। আমি মেয়েদের সাজসজ্জা দেখিতে দেখিতে এবং গান শুনিতে শুনিতে আনন্দে পথ চলিতে লাগিলাম। মেয়েদের এই শোভা এবং সঙ্গীত ব্যতীত আমার আনন্দের আরও একটী কারণ ছিল। বঙ্গনারীদুর্লভ তাহাদের সেই নিঃসঙ্কোচ স্বাধীন গতিবিধি আমার বড়ই ভাল লাগিতেছিল। তাহাদের লোক দেখান লজ্জা নাই, চাল চলনে ভয় ভীতি নাই, দৃষ্টিতে কটাক্ষ নাই; স্ত্রী স্বাধীনতার উজ্জ্বল মধুর জ্যোতিতে তাহারা পথ আলো করিয়া চলিয়াছে। কেনই বা তাহাদের দেখিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিবে না? হায় বঙ্গনারী! না জানি কতদিনে এই পবিত্র স্বাধীনতার অধিকার তোমাদের আয়ত্ত হইবে! কতদিনে তোমাদের এই স্বাধীনতার আলোকে আলোকিত করিয়া আমরা ধন্য হইব!

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম এক দরিদ্রা যুবতী সম্মুখে কতকগুলি পেয়ারা রাখিয়া মধুর স্বরে গান ধরিয়াছে এবং তাহাকে ঘেরিয়া কতকগুলি বিদেশী যুবক গান শুনিতেছে। আমিও উহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন একটী গান শেষ হইল; সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটী পয়সাও মেয়েটীর হাতে পড়িল। উপস্থিত সকলের অনুরোধে মেয়েটী পুনরায় গান ধরিল। গানখানি বড় সুন্দর; মেয়েটীও বেশ সুকণ্ঠ। মেয়েটীর পরিধানে লাল রঙের একখানি

ছিন্ন বসন, গায়ে একটী হাতকাটা জামা, হাতে কয়েকগাছি কালো চুড়ি, হাতের আঙ্গুলে দুই তিনটী সীসার উপর পাথর বসান আংটী ও দুই কানে দুইটী রূপার ঝুমকা। মেয়েটীর বয়স অনুমান ষোল বৎসর হইবে; সঙ্গে আট দশ বৎসরের একটী বালক; মুখের অবয়বে মনে হয় উহারই ছোট ভাই।

পেয়ারা বিক্রয় করিতে করিতে আসিয়া মেয়েটী ব্যবসায় ভুলিয়া আপন মনে গান ধরিয়াছিল। তাহাতে পেয়ারা বিক্রয় হইল না বটে; কিন্তু তাহার গান শুনিয়া অনেকে পয়সা দিল। যে গানটী আমি শুনিলাম তাহার ভাষা মনে না থাকিলেও ভাবটী বেশ মনে আছে। ভাবটী এই—শ্রীমতী রাধা একদিন যমুনায় জল আনিতে গিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন; শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া, তাঁহার বাঁশীর সুর শুনিয়া শ্রীমতী বাহ্যজ্ঞান হারাইলে যমুনার জলতরঙ্গে তাঁহার কলসী ভাসিয়া গেল। ভাসিতে ভাসিতে কলসী যখন কদমতলায় পেঁছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ সকৌতুকে তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীমতীর নিকট লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'এই নাও তোমার কলসী; কেমন? এখন সন্তুষ্টহয়েছ ত? ছিঃ ছিঃছিঃ! একটী কলসীর জন্য তুমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লে? আমার এক মাত্র প্রিয় জনের অভাবেও ত আমার এমন দশা হয় না। তখন শ্রীরাধা মৃদুহাস্যে কলসীটি লইয়া চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন, 'গাগরি রে! তুই যে আমার কত আপনার, এই অরসিক তা বুঝবে কি?'

চণ্ডীদাসের ভাঙ্গা কীর্ত্তন ছন্দে রচিত গানের মতই গানটী এমন মধুর ভাব ও ভাষার সমাবেশে রচিত ছিল যে তাহাশ্রবণে আমার মত আরও অনেকেরই মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছিল; মেয়েটীরও সঙ্গীতে অধিকার কম ছিল না। তাহার গান শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দের অনেকেই তাহাকে কিছু কিছু পুরস্কার দিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দুইটী পয়সা তাহাকে দিয়া সেস্থান হইতে বিদায় লইলাম।

সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেই আমি সেস্থান হইতে বিদায় হইলাম? কারণ, এদিকে মেয়েটীর গান বেশ ভাল লাগিতেছিল; ওদিকে বেলা অবসানপ্রায়; আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমায় মেলা দেখিয়া আশ্রমে ফিরিতে হইবে। যাহা হউক, সেই স্থান হইতে মেলায় উপস্থিত হইতে আমার অধিকক্ষণ লাগিল না। মেলায় গিয়া কি যে দেখিলাম তাহা আর কিছুই আমার মনে নাই। শুধু মনে আছে, আসিবার সময় পাহাড়ের উপর দেবীর ঘটের সম্মুখে একটী নমস্কার করিয়া নামিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে মনে হইল এই মেলা দেখা অপেক্ষা সে মেয়েটীর আর একটী গান শুনিলে মন্দ হইত না। দুই দণ্ডের অধিককাল আমি মেলাস্থলে থাকি নাই; তথাপি প্রত্যাগমনকালে কানন পথে সন্ধ্যাসমাগমে আলোর অভাব অনুভব হইতেছিল; তখনও কিন্তু মেলার যাত্রী প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই।

৯৩

মেলা দেখিয়া ফিরিবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই অকস্মাৎ এক করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলাম। একটী বালকের হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ও বামাকণ্ঠনিঃসৃত 'পাকড়াও পাকড়াও' শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেই আমি অনুমানে ধরিয়া লইলাম, সেই গায়িকা মেয়েটির উপরই বোধ হয় কোন দুর্বৃত্তের পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। ত্বরিৎপদে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বালকটী আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে; আর দুইজন পুরুষ মেয়েটিকে ধরাধরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে; দুইটী স্ত্রীলোক তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়াই ভীষণ চীৎকার করিয়া আমিও উহাদের পিছনে দৌড়াইলাম 'কে কোথায় আছ! শীঘ্র এস' বলিয়া চীৎকারে চারি দিক কাঁপাইয়া ছুটিতে লাগিলাম। দুর্ব্বল হইলেও আমার ক্ষিপ্র গতি আমায় ক্রমশঃ তাহাদের সন্নিকট করিল। ধাবমানা স্ত্রীলোক দুইটী তখন কত দূর পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহার ঠিক নাই। নির্য্যাতিতা বালিকা তখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া 'বাবা! বাবা! সাধু বাবা!' বলিয়া আকুল কণ্ঠে আমায় আহ্বান করিতে লাগিল। দুর্বৃত্তদ্বয় আমায় দেখিয়া বোধ হয় একটু ভয় পাইয়াছিল। তাহারা রাস্তা দিয়া আর না দৌড়াইয়া বাম পার্শ্বস্থ একটী বাগানে মেয়েটীকে নিক্ষেপ করিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া উভয়ে বাগানে প্রবেশ করিল। আমিও অধিক দূরে ছিলাম না। ছুটিয়া আসিতে আসিতে দেখিলাম রোদন-পরায়ণা বালিকাকে পুনরায় তুলিয়া দুষ্টদ্বয় উদ্যানমধ্যে অদৃশ্য হইল।

আমার বীরত্ব তখন বিষম বাধাপ্রাপ্ত হইল। বাগানের বেষ্টনী লঙ্ঘন করিয়া কিছুতেই আমি অন্ধকারে সেই নির্জ্জন বাগানে প্রবেশ করিতে সাহস করিলাম না। মনে হইল, আমি একা ক্ষণজীবী বাঙ্গালী; যদি মেয়েটীকে ছাড়িয়া উহারা উভয়ে আমাকে আক্রমণ করে—তখন কিরূপে আত্মরক্ষা করিব?

হায়! ধিক আমার কাপুরুষতায়! ধিক আমার বীর্য্যহীন বিবেচনায়! আজ যদি ঐ মেয়েটী অপরিচিতা হিন্দুস্থানী না হইয়া আমারই কোন আত্মীয়া হইত, আমার সহোদরা ভগ্নী হইত তাহা হইলে কি ঐরূপ বিচার বিবেচনা আমায় মনে স্থান পাইত?—না অতদূর আততায়ীর অনুসরণ করিয়া শেষে পশ্চাৎপদ হইতাম? কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না;—শত ধিক্কারেও বিপদ বরণ করিতে আমার সাহস হইল না। অগত্যা আমি বিপন্নের সাহায্যার্থে লোক জড় করিবার চেষ্টায় প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলাম। অল্পকাল মধ্যেই দুইজন লগুড়ধারী কৃষক আমার আহ্বানে আসিয়া পড়িলে, উহাদের ভরসায় ত্বরিৎপদে বাগানের বেষ্টনী লঙ্ঘন করিয়া, উহাদের সহিত বাগানে প্রবেশ করিলাম।

হৃদয়ে সাহস ও দেহে নব বল অনুভব করিয়া পুনরায় চারিদিক দেখিতে দেখিতে যে পথে দুর্বৃত্তদ্বয় অদৃশ্য হইয়াছিল সেই পথে ছুটিলাম। দণ্ডধারী

কৃষকদ্বয়ও আমার অনুসরণ করিল। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই বনভূমি কাঁপাইয়া মেয়েটীর করুণ আর্ত্তনাদ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দ্বিগুণ উৎসাহে শব্দ লক্ষ্য করিয়া কিয়দ্দূর ছুটিয়া গিয়া দেখিতে পাইলাম দুর্ব্বৃত্তদ্বয় রোরুদ্যমানা বালিকার দুই হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। নজর পড়িবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মেয়েটী আমার শব্দ শুনিয়া একবার আমার পানে ফিরিয়া চাহিয়া সংজ্ঞাশূন্যবৎ ভূপতিত হইল। তৎসত্ত্বেও গুণ্ডাদ্বয় দুই একবার উহাকে টানাটানি করিয়া যখন দেখিল তিন ব্যক্তি মেয়েটীর উদ্ধারার্থ ছুটিয়া আসিতেছে তখন আর উপায় না দেখিয়া মেয়েটীকে ফেলিয়া উহারা রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে গুণ্ডাদ্বয়ের এক জন বাগানের অদূরে প্রবাহিত গঙ্গার এক শাখা নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অপর জন স্রোতস্বিনীর তীরে তীরে প্রাণপণে দৌড় দিল। আমি মেয়েটীর নিকটবর্ত্তী হইতেই বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া সে আমায় জড়াইয়া ধরিয়া পুনরায় সংজ্ঞা হারাইল। অমনই দণ্ডধারী কৃষকদ্বয়ের একজন 'মায়ি! মায়ি! বলিয়া মেয়েটীকে কোলে লইতে চেষ্টা করিল; আমিও ছাড়িয়া দিলাম। মেয়েটী তখন সেই কৃষকের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। অপর কৃষকটী নিবৃত্ত না হইয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। আমরা উভয়ে তখন মেয়েটীকে তুলিয়া নদীতীরে লইয়া গেলাম এবং তাহার মুখে চোখে জল দিয়া তাহাকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিলাম।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেয়েটী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আমি বলিলাম, 'আর এখানে এভাবে থাকা উচিৎ নয়; এবং মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই লোকটীকে তুমি চিন?' চোখ চাহিয়া কৃষককে দেখিয়াই মেয়েটী কাঁদিয়া ফেলিল। সজলনয়ন কৃষকও 'মায়ি! আওর কোই ডর নেহি:' বলিয়া স্নেহের কোলে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। আমি তখন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ তোমার কে হয়?' কৃষক বিনীত ভাবে উত্তর করিল, 'হামারা লড়কী; বাবাজি!' আমিও ভাবে তাহাই অনুমান করিয়াছিলাম।

এক্ষণে পিতাপুত্রীর মিলন দেখিয়া আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কৃষকও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। দুর্ব্বৃত্তদ্বয়ের একজনকেও পাকড়াও করিতে পারিল না বলিয়া সে বড়ই আফশোষ করিতে লাগিল। পরে আমায় অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে বারম্বার আমার পদস্পর্শ করিয়া সে আমায় আপ্যায়িত করিল। অতঃপর আমরা সকলে বাগানের বাইরে আসিলে উহারা সজলনয়নে আমায় বিদায় দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমিও পরমপিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সেবাশ্রমে ফিরিলাম। পর দিবস আশ্রমের সকলের নিকট বিদায় লইয়া, আম্বালা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

৯৪

আম্বালা ষ্টেশনে আসিয়া পেঁাছিলে কয়েক জন পুলিশ কর্ম্মচারী আমার পিছন লইল। অনেক কথা কাটাকাটির পর আমার নাম পরিচয়াদি লিখিয়া লইয়া উহারা আমায় নিষ্কৃতি দিল। তখন একজন আমায় জিজ্ঞাসা করিল, সেই রাত্রে আমি কোথায় যাইব। আমি উত্তর করিলাম 'ডাক্তার এফ,এন,বোস মহাশয়ের বাসায়।' তখন আর এক জন এই কথা শুনিয়া বলিল, 'আপনি আসুন; আমি আপনাকে পেঁাছাইয়া দিব।'

ক্ষণকালমধ্যে আমরা যথাস্থানে উপনীত হইলে ফণীদা আসিয়া আমায় সাদর সম্ভাষণে গৃহে তুলিলেন। তারপর ক্রমে ধীরেনভায়া, তারপর মায়ের দল, ছেলে মেয়ের দল, একে একে সকলে আমার কাছে আসিল; সকলেয় মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতদিন পরে তাহাদের আদরের ঠাকুরকে আবার তাহারা কাছে পাইয়াছে। ঠাকুর এত দূর আসিয়া তাহাদিগকে দেখা দিয়াছেন। তাহাদের আনন্দ দেখে কে? সুদূর প্রবাসে আত্মীয় সমাগমে এইরূপ আনন্দ হইবারই কথা।

সকলকে আনন্দ উৎফুল্ল দেখিয়া আমিও পরম প্রীত হইলাম। ক্ষণেক পরে ধীরেনভায়া আমায় ডাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটী ঘরে লইয়া গেল। আমাকে বসাইয়া সে প্রথমে লছমনঝোলার সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিতে আমায় অনুরোধ করিল। আমি বলিলাম, 'সে অনেক কথা; আজ আমার শরীর তেমন সুস্থ নয়; সে সব কাল বলবে।'

ধীরেনভায়া বলিল, 'তা না হয় বলবেন; কিন্তু একটী কথা আজ আপনাকে বলতেই হবে। আপনি সত্য করে বলুন দেখি—আপনার উপর কোনরকম মন্দির করবার আদেশ হয়েছে কি না?'

ধীরেনের কথা শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম; এবং সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। তাই ত! ধীরেনভায়া একথা কোথায় শুনিল? কেমন করিয়াই বা জানিতে পারিল? মনে হইল; বোধ হয় ধাপ্পা দিয়া সে আমার ভিতরের কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমিও ছাড়িবার পাত্র নই। আচ্ছা, দেখি তোমার কতদূর দৌড়; এই ভাবিয়া বলিলাম, 'আচ্ছা ভাই! মন্দির করবার আদেশ হয়েছে কি না—হঠাৎ একথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করলে।'

ধীরেন স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অশ্রু ভারাক্রান্ত গদগদ ভাব দেখিয়া আমি অধিকতর বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, তবে কি সত্য সত্যই ঠাকুর তাহাকে কিছু জানাইয়াছেন? জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ধীরেন! বল ভাই, সত্য সত্যই কি তুমি কিছু জানতে পেরেছ?'

'হাঁ ভাই! পেরেছি; ঠাকুর আমাকে জানিয়েছেন। তুমি যে মন্দির

কর্‌বার আদেশ পেয়েছ, ঠাকুর আমায় সে মন্দির দেখিয়েছেন। দেখ দেখি সে এই রকম কি না? এই বলিয়া পেনসিল সাহায্যে সে একটী মন্দিরের আভাস অঙ্কিত করিয়া আমায় দেখাইল।

চিত্রার্পিতের মত অবাক হইয়া আমি ধীরেনের পানে চাহিয়া রহিলাম। তাহার এই অলৌকিক দর্শনের কথা চিন্তা করিয়া আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্র হস্তে আমি তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলাম। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে তাহাকে বলিলাম, 'ধন্য ভাই! তুমিই ধন্য। আর ধন্য তোমার সাধনা! তুমি এই সুদূর কর্ম্মস্থলে থেকে ঠাকুরের এমন কৃপা লাভ কর্‌লে একথা ভাব্‌তেও আমার হিংসা হয়। আমায় ঠাকুর কত কষ্ট দিলেন; আর তুমি! * * * যাক্‌ তোমরাই প্রকৃত ভক্ত; তোমাদেরই জীবন ধারণ সার্থক।'

তখন ধীরেনভায়া নিজ স্বভাবের পরিচয় দিয়া বিনয়বচনে কহিল, 'না ঠাকুর! আমার কোন সাধনায় কিছু হয় নি। বোধ হয় মন্দিরের ছবি তুমি নিজে এঁকে সাধারণকে দেখাতে পার্‌বে না। তাই তোমরই সুবিধার জন্য ঠাকুর আমায় আগে থেকেই ছবি দেখিয়ে রাখ্‌লেন; এ ঠাকুর! তোমারই ইচ্ছা! তোমারই দয়া!

এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ধীরেন বিদায় লইলে আমি শয্যা গ্রহণ করিলাম ও অবিলম্বে গাঢ় নিদ্রায় অভিভুত হইলাম। কোথা দিয়া যে স্বপ্নরাজ্যে পেঁাছিয়াছি কিছুই জানি না। অকস্মাৎ দেখি আনন্দময়ী ৺মা আমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, 'অন্নদা! আজ তোমায় তিনটী মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছি! এই তিনটী মন্ত্র যথাক্রমে তোমার অমলমা, বিমলমা ও কমলমাকে দিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে! তারা তোমার কাছ থেকে মন্ত্র প্যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করেছে। তাই তোমাকে এই অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছি।'

৺মায়ের এই আদেশ শুনিয়া আমি বিব্রত বোধ করিলাম। ভয় হইল, আমি কি এখন হইতে গুরুগিরি আরম্ভ করিব? অন্তর্য্যামিনী মা আমার অমনই অন্তরের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, 'অন্নদা! এ গুরুগিরি নয়; তোমায় দিয়ে আমিই তাহাদের দীক্ষা দিচ্ছি বলে জেনো। আর এই মন্ত্র তুমি কানে দিও না! চন্দনে বা আলতায় লিখে তাদের হাতে দিয়ে বিধিমত জপ কর্‌তে বলে দিও; তাহলেই তাদের কার্য্য সিদ্ধি হবে।' এই বলিয়া ৺মা চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতেই ধীরেন ভায়া আসিয়া আমার শয্যার উপর বসিল। আমি চোখ চাইতেই সে বলিল, 'ঠাকুর! বৌদিদির একান্ত অনুরোধ, আর তোমার কমলমারও বড় ইচ্ছা, এই যাত্রায় তাদের মন্ত্র দিয়ে যেতে হবে; না হলে

তারা কিছুতেই ছাড়বে না।'

ধীরেনের কথা শুনিয়া আমি লাফ দিয়া উঠিয়া বসিলাম। আনন্দে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। আমার পুলকিত ভাব দেখিয়া ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমায় বুঝি ৺মা ওদের কথা কিছু বলে গেছেন ?'

আমি শুধু বলিলাম, 'ধন্য অমলমা! ধন্য বিমলমা! ধন্য কমলমা! আর তোমরাও ধন্য যে এমন স্ত্রীরত্ন সব লাভ করেছে।—কে পায় ?—কয় জনের ভাগ্যে এমন স্ত্রী লাভ হয়—যার প্রাণের ডাক এক রাত্রেই ৺মায়ের কানে পেঁছায় ? ভাই! আমি তিন জনের জন্যই ৺মার কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছি। এখনই পুজোর আয়োজন কর। আমি অমলমা আর কমলমাকে আজই মাতৃদত্ত মন্ত্র দান করে ধন্য হব। কিন্তু ভাই! একটী কথা ভেবে আমার প্রাণে যেন একটা ধাক্কা লাগ্‌ছে। সেটী এই যে এদের তিন জনের জন্য মন্ত্র পেলাম ; আর সরলার জন্য পেলাম না।'

আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে এই সরলাই শচীনের সেই আদরিণী স্ত্রী। তাই আমার মনে হইতেছিল, আমি যখন কলিকাতায় গিয়া বিলমাকে মাতৃদত্ত মন্ত্র দিব আর সরলাকে দিব না ; তখন শচীনের মনে বড় দুঃখ হইবে। আমার কথা শুনিয়া ধীরেনভায়া বলিল, ঠাকুর! তুমি সেজন্য নিশ্চিন্ত থাক। শচীন শ্রীমার শিষ্য। আমার মনে হয় সরলাকে শ্রীমার কাছেই দীক্ষিতা কর্‌বার শচীনের একান্ত ইচ্ছা ; তাই ৺মার কাছ থেকে তুমি আর তার জন্য কোন মন্ত্র পাওনি।'

অগত্যা আমি তাহাই মানিয়া লইলাম ; এবং স্বপ্নাদেশমত শুভক্ষণে ফণীদার স্ত্রী অমলার এবং ধীরেনভায়ার স্ত্রী কমলার দীক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেল। তাহারা দুই জনে বিমল আনন্দে ভাসিতে লাগিল। আমিও নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া আম্বালা হইতে কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

## ৯৫

আমি বাঙ্গালী ; বাড়ীমুখো পায়ে আমার তখন এক ঘণ্টা এক দিনের মত বোধ হইতেছে। তাহাতে আবার আমাকে তিন চারি জায়গায় নামিতে হইবে। কাশীধামে আমার বৃদ্ধা পিসিমায়েরা আছেন ; এবং স্নেহের মাসতুতো পিসতুতো ভাই ভগ্নীরা আছে। তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তাহার পর সংবাদ পাইয়াছি শচীনের সেই ছোট ভাই, যাহাকে ঠাকুর ঔষধ দিয়া ভাল করিয়াছেন, সে মধুপুরে আছে ; তাহাকেও দেখিয়া যাইতে হইবে। ইহার পর কলিকাতায় ত নামিতেই হইবে ; সে যে আমার কর্ম্মক্ষেত্র ; সেখানে যে আমার মন প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে। পরে আবার চন্দ্রনাথ হইয়া যাইতে হইবে। সেখানে আছে

আমার কৈশোর সঙ্গিনী কুলবালা ; সম্পর্কে সে আমার পিসতুতো ভগ্নী হয়। বহুদিন তাহাকে দেখি নাই ; তাহার নিকট পত্র লিখি নাই। আহা ! সে অবীরা বিধবা ! তাহার ভবিষ্যৎ আশা ভরসার একমাত্র স্থল সে আমাকে জানে। আমার মুখ তাকাইয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা সে নীরবে সহিয়াছে ; তাহাকে একবার দেখিয়া যাইতেই হইবে। এই সব সারিয়া তবে বাড়ী যাইব। ওঃ—সে কত দূর ! এখনও কত দূর ; এমন কত শত ঘণ্টা—কত দীর্ঘ দিনের পথ ! এই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে পারিলে তবে আমার সেই পিতামাতার স্নেহ-সম্ভাষণ, ভ্রাতাভগ্নীর আদর, জ্ঞাতি বন্ধুর আপ্যায়ন এবং বিরহবিধুরা বধূর কণ্ঠে মিলন মধুর বাণী শুনিতে পাইব। সে যে এখনও অনেক দেরী, অনেক দূর ; অনেক যোজন পথ !

গাড়ী যতক্ষণ চলিতে থাকে ততক্ষণ এইরূপ কাটিয়া যায়। আর যখন কোন ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায় তখন যদি এক মিনিটের উপর দুই মিনিট দেরী হয়, অমনই অধীর হইয়া পড়ি। মনে হয় বড়ই বিলম্ব হইতেছে ; কখন গাড়ী ছাড়িবে ? গাড়ীর জানালায় মাথা গলাইয়া দেখি গার্ড সাহেব কি করিতেছে। উৎকর্ণ হইয়া শুনি বাঁশী বাজিল কি না। এইরূপ অস্থির চিত্তে চলিয়াছি। মনে হইতেছে আজিকার এক্সপ্রেস যেন মালগাড়ী হইতেও মন্থরগতি ; গাড়ী যেন বোঝাই লইয়া চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

আমার হাহুতাশের সঙ্গে সঙ্গে হুস্ হাস করিতে করিতে গাড়ী ক্রমে দিল্লী আসিয়া পেঁছিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। দিল্লীতে অত্যধিক যাত্রী। সে এক মজার দৃশ্য ! আমি নিজ আসন আরও লম্বা করিয়া বিছাইলাম ; এবং যাত্রীদের অসুবিধা ঘটাইয়া অক্লেশে অর্ধ্ব শায়িত অবস্থায় শুইয়া রহিলাম। প্রথম প্রথম সাধু দেখিয়া অনেকেই আমাকে কিছু না বলিয়া আশে পাশে সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একসঙ্গে প্রায় পাঁচ ছয়জন ইরাণী রমণী উঠিয়া পড়িল। উহাদের আচার আচরণ দেখিয়া আমি একটু সংযত হইতে লাগিলাম। সঙ্গে একজনও পুরুষ নাই। জনৈকা প্রৌঢ়ার সহিত পাঁচটী যুবতী ; তাহার মধ্যে দুইজনের ক্রোড়ে শিশুসন্তান আছে। নিঃসঙ্কোচে এই রাত্রিকালে উহারা ট্রেনযোগে চলাফেরা করিতেছে। স্ত্রীলোকগুলি দেখিতে যে একেবারে বাজারে বেদেনীদের মত তাহা নয় ! বরং উহাদের আকার প্রকার ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া ভদ্রশ্রেণী বলিয়াই অনুমান হয়। সে যাহা হউক, উহারা ত গাড়ীতে উঠিয়া প্রথমেই আমার উপর লক্ষ্য স্থির করিল। প্রৌঢ়া অগ্রণী হইয়া কহিল, 'এই সাধু ! উঠ্‌কে বৈঠিয়ে ; হমলোককো বৈঠ্‌নে দিজিয়ে।'

আমার সাড়া শব্দ নাই। আমি নির্ব্বিকার ! একেবারে জন্ম অন্ধ জন্ম বধির সাজিয়া বসিয়া আছি ! যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ; কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। কিন্তু মনে মনে ভয় হইতেছে ইহারা যদি জোর করিয়া

আমার আসনেই বসিয়া পড়ে, তখন আমি কি করিব? ভাবিতে না ভাবিতে দেখি দুইটী যুবতী আমার আসনপ্রান্ত সরাইয়া দিয়া একরূপ আমার পায়ের উপরই বসিয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়া আমি পা গুটাইলাম। দেখিতে দেখিতে আর দুইজন আমার শিয়রদেশে আসন লইল; এবং সেই সসন্তানা রমণীদ্বয় জবরদস্তি যাত্রীদিগকে সরাইয়া আমার সম্মুখের বেঞ্চে আসন গ্রহণ করিল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে দিতে বোকা বনিয়া উঠিয়া বসিলাম। চারি দিক হইতে বিদ্রূপের হাসি ও করুণার দৃষ্টি আমার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। আমিও লজ্জিত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

## ৯৬

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার অবস্থা দেখিয়াই বোধ হয় রমণীর দল একসংগে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। গভীর মর্ম্মবেদনায় আমি চোখের জল চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু অন্তরের ভাব মুখে ফুটিয়া উঠে। আমারও বোধ হয় সেইরূপ হইয়া থাকিবে; কারণ আমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিতা যুবতীটি বার বার আমার মুখের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সরল এবং আরক্তিম মুখে করুণার চিহ্নও পরিস্ফুট ছিল। অল্প ক্ষণ পরে সে তাহার পার্শ্বস্থিতা রমণীর কানে কানে কি বলিলে সেও বারে বারে আমার পানে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে সরলতা অপেক্ষা যেন স্বাধীনতার ভাবই ফুটিয়া উঠিতেছিল। যাহা হউক সে আমার পার্শ্বস্থিতা রমণীকে তাহার আরও নিকটে টানিয়া লইয়া এবং নিজেও যথাসম্ভব সরিয়া বসিয়া আমার বসিবার স্থান প্রশস্ত করিয়া দিল। আমি মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম; এবং মনে মনে উহাদিগের উদ্দেশ্যেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলাম।

রমণীদ্বয়ের করুণায় আমি ভদ্রলোকটীর মত বসিতে পারিলাম দেখিয়া যাত্রীদের মধ্যে কেহ বলিয়া উঠিল, 'সাধুবাবা উনলোককা বহুৎ মেহেরবানী।'

মস্তক নত করিয়া আমিও তাহা স্বীকার করিলাম। পার্শ্বস্থিতা যুবতী আমার নত স্বভাব সন্দর্শনে যেন একেবারে গলিয়া গেল; এবং আমার প্রতি তাহার ব্যবহার যেন আরও সংযত, আরও মধুর হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার পানে চাহিয়া অতি সংযতকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপ্ বাংগালী সাধু?—না ফকির আছে?'

দুষ্ট বুদ্ধি উত্তর করিয়া বসিল, 'হামি ফকির আছে।'

উত্তর কর্ণগোচর হইবামাত্র রমণী তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিতান্ত অপরাধিনীর মত দুই তিন বার ললাট স্পর্শ করিয়া আমায় সেলাম করিল।

গম্ভীরভাবে প্রতিনমস্কার জানাইয়া আমি বলিলাম, 'বৈঠিয়ে মায়ি ! কাহে উঠা ?'

'নেহি নেহি—ফকির সাহাব ! হম দুসরা জগহমে বৈঠেংগে।' বলিয়াই রমণী আমার সম্মুখের বেঞ্চে তাহার সংগিনীদের মধ্যে কোনরূপে বসিয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি দ্বিতীয়া যুবতীও নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া বলিল, 'আপ এক কিনার হোকে মজেসে বৈঠিয়ে ; হমলোক এক তরফ বৈঠেংগে।'

তখন আমি এক ধারে সরিয়া গেলে উহারা প্রায় অর্ধেক বেঞ্চ আমায় ছাড়িয়া দিল। আমিও যথেষ্ট স্থান পাইয়া পূর্ববৎ আসন বিছাইয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

পাঠক পাঠিকা কি লক্ষ্য করিতেছেন ? ধীরে ধীরে আমার স্বভাবের কেমন পরিবর্ত্তন হইতেছে ? আমার বিবেক বৈরাগ্য শনৈঃ শনৈঃ কেমন অলক্ষ্যে আমার চৈতন্যকোষ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে ? যতই আমি জাগতিক আমার দিকে অগ্রসর হইতেছি ততই আমি আধ্যাত্মিক আমাকে কত দূরে ফেলিয়া আসিতেছি —তাহা কি আপনারা অনুভব করিতেছেন ? কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিলেই লৌকিক অলৌকিক ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবেন ; এবং এই স্বপ্ন-জীবন প্রকাশও সার্থক হইবে। অন্যথা ভস্মে ঘৃতাহুতির মত সমস্তই ব্যর্থ হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি পার্শ্বস্থিতা যুবতীর দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সরল এবং তাহার আরক্তিম মুখে করুণার চিহ্ন পরিস্ফুট। ক্রমে কিন্তু আমার চোখে আর অপেক্ষাকৃত বলিয়া কিছুই রহিল না ; প্রকৃতই সরল মুখখানি বড় সুশ্রী ও সুন্দর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। প্রথমে যাহাকে আরক্তিম ও করুণার চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, এখন দেখি উহাই তাহার স্বাভাবিক ভাব। ঐরূপ অল্প বয়স্কা সুন্দরী যুবতীর পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকাও অসংগত। আবার উহার পানে না চাহিয়া যেন থাকাও যায় না। কে যেন ঘাড় ফিরাইয়া চোখে চোখে মিলন ঘটায়।

আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। অনেক চিন্তার পর স্থির হইল এই যুবতীর দীপ্ত উজ্জ্বল আয়ত নয়নদ্বয় ঠিক আমার স্ত্রীর চক্ষু দুইটীর মতই মাদকতা পরিপূর্ণ এবং মুনিমনোহারী সৌন্দর্য্যের আধার। ছিঃ ! ছিঃ ! ছিঃ ! আমি এ কি ভাবিতেছি ! এ সব কি চিন্তা ? আমি না সাধু সাজিয়াছি ? অন্তরে কিন্তু কে যেন আবার বলিয়া উঠিল,—কি হইয়াছে ? সত্যই ত মণির চোখের মত চোখ ; দেখিতে দোষ কি ? বহুদিন দেখ নাই ; ভাল করিয়া দেখিয়া লও।

বিবেক অবিবেকের জোর দ্বন্দ্ব চলিল। এখন কে মীমাংসা করিবে কেন আমার এমন দশা হইল ? হায় ! কেন আমার এমন হইল ? কেন আমি ইরাণীর ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া ক্রমে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। আমি ত কত

সুন্দরী এ জীবনে দেখেছি, অতীত জীবনে এমন কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত সুন্দরী যুবতীকে উপেক্ষার ভাব দেখাইয়াছি, কর্ত্তব্যবোধে কত সুন্দরীর মুখের পানে তাকাই নাই,—করুণ ক্রন্দন অগ্রাহ্য করিয়া, সোহাগ সহানুভূতি দূরে রাখিয়া, পরিণয় সম্ভাবনার পাশ কাটাইয়া, আপন মনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়াছি ; এমন ঘটনা কত যে ঘটিয়াছে তাহার ত সংখ্যা হয় না। আর—আজ আমার এ কি হইল ! এ দুর্ব্বলতা কেন আসিল ! এ যে মহাপাপ !

এইরূপ চিন্তা করিতেছি আর মধ্যে মধ্যে রমণীর মুখের পানে তাকাইতেছি ; মনে হইতেছে সত্যই যেন দেববালা ! সরলাসুশীলা সাধ্বী নারী। এমন সময় কোন ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। অমনই ইরাণীর দল 'আ গিয়া ! আ গিয়া ! উঠিয়ে উঠিয়ে বলিয়া আসন হইাত উঠিয়া পড়িল এবং আমায় সেলাম জানাইয়া প্রত্যেকেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। শুধু সেই রমণী নামিবার সময় বারম্বার আমার পানে তাকাইতে লাগিল। উহার হাতে একখানি ছোট পাখা ছিল ; ভুলক্রমে পাখাখানি ফেলিয়াই সে নামিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ পাখার উপর আমার দৃষ্টি পড়ায় ক্ষিপ্রহস্তে পাখাখানি লইয়া আমি তাহাকে আহ্বান করিলাম ; এবং পাখাখানি হাতে দিয়া বলিলাম, মাপ কিজিয়ে মায়ি।'

'কুছ হামারা বেয়াদবি হুয়া হোগা ত মাফ্ কিজিয়ে গা' বলিয়া হাসিমুখে আমার হাত হইতে পাখাখানি লইয়া ইরাণী উহা মাথায় ঠেকাইয়া বার বার সেলাম করিতে করিতে গিয়া সঙ্গিনীদের সহিত মিলিত হইল। গাড়ীও ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিল। এখন আর গাড়ীর গতি মাল গাড়ীর মত মোটেই মনে হইতেছে না ; গাড়ী যেন মেল ট্রেনের দ্বিগুণ দ্রুত চলিয়াছে। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে যেন কোথায় কত দূরে লইয়া চলিয়াছে।

৯৭

ট্রেন দ্রুত চলিয়াছে। নিদ্রাদেবী যেন দুবাহু বিস্তার করিয়া আমাকে কোলে লইতে আসিতেছেন। আমিও যাত্রীদের সহৃদয়তায় বেঞ্চখানিতে আমার অবসন্ন দেহ ঢালিয়া দিয়া অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলাম। ঐহিকের সকল সম্বন্ধ হইতে মনকে সরাইয়া লইয়াও সেই বঙ্কিমনয়না ইরাণীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

স্বপ্ন দেখিলাম আমি যেন এক নিভৃত কক্ষে শুইয়া আছি। নির্জ্জন গৃহে একা পাইয়া মৃদু হাস্যবিমণ্ডিত বদনে ধীরে ধীরে ইরানী আমার আমার কাছে আসিতেছে। কিন্তু এ কি ! তাহার পোষাক পরিচ্ছদ যে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ইরাণীর বেশভুষা যে একেবারে বৈষ্ণবীর মত ! পীতবাসা ইরাণীর অঙ্গে নামাবলী, হস্তে কমণ্ডলু, ললাটে তিলক, বাহুতে ও গণ্ডে নামের ছাপ।

ইরাণীর মূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সে মূর্ত্তি দেখিয়াই ব্যস্তভাবে আমি শয্যায় উঠিয়া বসিলে 'জয় রাধে!' বলিয়া ইরাণী শয্যার উপরই আমার নিকট বসিয়া পড়িল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! এ আবার তোমার কি মূর্ত্তি? তুমি এত শীঘ্র কেমন করে এ বেশ ধারণ করলে? আর এই বৈষ্ণবী বেশ ধারণ কর্‌বারই বা তোমায় উদ্দেশ্য কি?'

ইরাণী আমার আরও কছে সরিয়া বসিল এদং হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ঋষিবর! তোমার কাছে আস্‌তে হলে এই বেশেই ত আসা ঠিক; এ বেশ না হলে তোমার কাছে আস্‌ব কি করে?'

কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঋষিবর! এ কি কথা! ইরাণী রমণীর মুখে এ কি শুনিতেছি! এরূপ সম্বোধন ত এ পর্য্যন্ত আমায় কেহ করে নাই। ঠাকুর, সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, বাবাজী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কত উপাধি এ যাবৎ পাইয়াছি। কিন্তু ঋষিবর বলিয়া ত কেহ আমায় কখনও ডাকে নাই। ইহারও হয় ত কিছু অর্থ থাকিতে'পারে মনে করিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম, 'মা! তুমি আমায় ঋষিবর বল্‌লে কেন? এর কি কোন উদ্দেশ্য আছে?'

না; উদ্দেশ্য আর কি থাক্‌বে? যা সত্য তাই বলেছি; তুমি যে ঋষি ছাড়া অন্য কিছু নয়।—সাধু?—সাধু ত অনেকেই; সৎপ্রবৃত্তি নিয়ে যাঁরা এই সংসারে বিচরণ কর্‌ছেন তাঁরা সকলেই সাধু; সাধুতে তোমাতে ঢের তফাৎ।—ঠাকুর? ব্রাহ্মণমাত্রই ত ঠাকুর; কেউ গুরু ঠাকুর, কেউ পূজারী ঠাকুর, কেউ বা পাচক ঠাকুর; তুমি ত তা নও।—সন্ন্যাসী? সে কথাও মিথ্যা; তোমার সন্ন্যাসী হবার যো নেই বাপু; একমাত্র সেই সন্ন্যাসী যে আত্মজন সম্বন্ধ হতে চির-পৃথক।—যোগী? শুন্‌লেও হাসি পায়; তুমি যোগের কি জান? যোগী সেই যে স্বীয় মনকে আত্মযুক্ত করে সদা সর্ব্বদা পরমাত্মাতে যুক্ত হয়ে আছে; তুমি তাও নয়—বাবাজী? না না, তাও নয়; তুমি তাও নয়।—আর ব্রহ্মচারী? সে ত যেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তাকেই ব্রহ্মচারী বলা যায়। তুমি ত এখন সংসারী। তোমাকে ব্রহ্মচারী বলে ডাক্‌লে এখন উপহাস করা হয়।—ঋষি? হাঁ; এই এখন তোমার পক্ষে উপযুক্ত উপাধি। ঋষি প্রদর্শিত পথ পুনরাবিষ্কার করে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্যই তোমার পৃথিবীতে আগমন। ঋষি প্রদর্শিত পথেই তোমার জীবনস্রোত প্রবাহিত হবে। তুমি স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়েই জীবের মঙ্গল সাধন করবে। দূর ভবিষ্যতে তোমারই অনুকরণে দেশ ছেয়ে যাবে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের খরস্রোতে দেশের মরা গাঙ্গে আবার জোয়ার আস্‌বে। দেশের লোক দেশের হিতে জীবন উৎসর্গ করে আবার মনুষ্য জন্ম সার্থক কর্‌বে।'

এইরূপ আরও অনেক কথার পর বৈষ্ণবী তাহার স্বভাবসুলভ সরল ভাবেই

আমায় আলিঙ্গন করিল। আমিও প্রাণ খুলিয়া 'রাধে!' 'রাধে!' রবে চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

আমার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর বোধ হয় লোকের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল এবং কেহ কেহ হয় ত 'রাধে!' শব্দও শুনিয়াছিল। আমি জাগিয়া উঠিয়া দেখি গাড়ী থামিয়াছে; এবং এক দল কীর্ত্তনীয়া আমাদের কামরায় উঠিয়া আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে এক জনের সজল চক্ষু ও সরল দৃষ্টি আমায় যেন কি এক ভাবে বিভোর করিয়া তুলিল। আমি ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিলাম এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বারম্বার প্রণিপাত করিতে লাগিলাম।

তখন তাহারা সকলে সমস্বরে 'জয় রাধে' 'শ্রীরাধে' বলিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল; গাড়ীময় আনন্দের রোল উঠিল। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে ষ্টেশন মুখরিত হইয়া উঠিল। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কোন ষ্টেশন?'

উত্তর হইল, 'এলাহাবাদ।'

দেখিতে দেখিতে হরিধ্বনির মধ্য দিয়া খোল করতালের ঝংকায় উঠিল এবং বৃদ্ধ কীর্ত্তনীয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল,—

'তারা দুভাই এসেছে রে!

যাদেন হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে, তারা, দুভাই এসেছে রে!

কীর্ত্তনের তালে তালে ট্রেনখানি যেন নাচিতে নাচিতে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেল। যাত্রীরা সকলেই নীরব নিস্তব্ধ! সকলেই হরিনামামৃত পানে বিভোর; সকলের চোখেই করুণ দৃষ্টি, মুখে কোমল ভাব ও অঙ্গভঙ্গী আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। কীর্ত্তনের মাদকতায় আমায় আত্মহারা করিয়া ফেলিল। জানি না কতক্ষণ কিভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। গাড়ী যখন মোগলসরাই পৌঁছিল তখন চোখ মেলিয়া দেখি সেই বৃদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবের কোলে মাথা রাখিয়া আমি শুইয়া আছি। দুইজন আমায় বাতাস করিতেছে এবং একজন জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'আপনি কি কাশী যাবেন? যদি যান ত এখানে নাম্‌তে হয়; এ মোগলসরাই ষ্টেশন; আমরা এখানেই নাম্‌ব।'

আমি মাথা নাড়িয়া নামিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করাইলে তাহারা ধরাধরি করিয়া আমায় গাড়ী হইতে নামাইল। আমি লজ্জিতভাবে তাহাদের সকলকে অভিবাদনপূর্ব্বক হাতজোড় করিয়া সকলের নিকট ক্ষমা চাহিলাম। আহা! বৈষ্ণবদের স্বভাব কি সুন্দর! কি কোমল! কি মধুর! আমার একান্ত বাধা সত্ত্বেও সকলে আমার পদধূলি লইয়া মুখে ও বক্ষে ধারণ করিল। আমি একেবারে লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলাম।

যথাসময়ে সকলে কাশী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে আমাকে বিদায়

লইতে হইবে দেখিয়া সকলে আমায় বিদায় আলিঙ্গন দিলেন ; সে এক মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য। বৈষ্ণবকুল শতমুখে আমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন অল্প বয়সে যে আমার এইরূপ ভাব হয়, ইহাই তাঁহাদের প্রশংসার প্রধান বিষয়। আমি যতই বলিতে লাগিলাম—উহা এক প্রকার রোগ, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে ঐরূপ হয় ;—ততই তাঁহারা অধিকতর দৃঢ় আলিঙ্গনে আমায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। অবশেষে বিদায় অভিনয়ান্তে তাঁহাদের জন্য এক জমিদার বাড়ীর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। আমিও একাদেবীর কোলে চড়িয়া গোধূলিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

## ৯৮

কাশীতে পিসামহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ কেহ আমায় চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমার স্নেহের ভগ্নী আশালতাই দ্বিতল হইতে প্রথম আমাকে দেখিয়া 'বরণ দাদা এসেছে, বরণ দাদা এসেছে' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন আমাকে হঠাৎ না চিনিবারও যথেষ্ট কারণ ছিল। আমার যে তখন একেবারে সন্ন্যাসীর বেশ ; এবেশে ত ইতিপূর্ব্বে কাশীর কেহ আমায় দেখে নাই। কিন্তু বুদ্ধিমতী ভগ্নী আশালতা তখন মাত্র নয় দশ বৎসরের ছোট মেয়ে ; সে আমায় প্রথম দর্শনেই চিনিয়াছে। গৃহে প্রবেশ করিতেই ছোট পিসিমা আসিয়া আমায় স্নেহালিঙ্গনে পরিতৃপ্ত করিলেন। তারপর মামার আলিঙ্গনে ধন্য হইয়া আমি দোতালায় উঠিলাম। উপরে উঠিতে না উঠিতেই বৃদ্ধা মেজপিসিমা আসিয়া আমায় বুকে টানিয়া লইলেন এবং সজল নয়নে আমার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'বাবা! একি বেশ! এ বয়সে এই বেশে তোমায় কে সাজালে বাবা!

নত মস্তকে পিসিমার পদধূলি লইয়া আমি বলিলাম, 'পিসিমা! সাজাবার যিনি মালিক, জীবজগতের যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে যিনি সাজিয়ে রেখেছেন, নিত্য নূতন সাজে চরাচর বিশ্ব যিনি সাজাচ্ছেন, আমাকে এবেশে তিনিই সাজিয়েছেন। কেন পিসিমা? আমার এ বেশ দেখে কি আপনার দুঃখ হচ্ছে? মানুষের এ বেশ কি কুৎসিত বেশ?'

'না বাবা! তা নয় ; এ অতি পবিত্র বেশ। তবে'—বলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে পিসিমা পুনরায় চোখ মুছিতে লাগিলেন। এমন সময় আমার ভক্তিমতী ছোটমা আসিয়া বলিলেন, 'দিদি! কাদ্‌ছ কেন? আনন্দ কর ; বাছার উপর যে আদেশ হয়েছিল, বাছা যেখানে গিয়ে পড়েছিল, তাতে বাছাকে যে আবার দেখতে পাচ্ছ—এতেই আনন্দ কর্‌বার কথা। বাছা আমার যে সাজেই সাজুক না কেন ;—বাছাকে আশীর্ব্বাদ কর। কেঁদো না দিদি!—কেঁদো না।'

পিসিমা বলিলেন, 'আমার চোখের জলে তোমার বাছার অমঙ্গল হবে না মনোরমা! কেন যে এ চোখের জল পড়্‌ছে তা তোমার বাছা বুঝতে পার্‌ছে। মনোরমা! এতদিনে আমাদের সতী সাধ্বী বৌয়ের কথা সফল হতে চল্‌ল। বৌ আমার প্রায়ই বল্‌ত, 'দিদি! এ ছেলে আমাদের নয় এ ছেলেকে তুমি যতই আদর যত্ন কর না কেন,—এ সকলকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে। যতই সংসারের বাঁধনে একে বাঁধ না কেন,—আমি জানি এ শিকলি কাটা টিয়ে;—সব বন্ধন ছিন্ন করে এ চলে যাবে।—কেউ একে ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না।' তখন মনে হত, বৌ আমাদের পাগল; পোয়াতি অবস্থায় কে জানে কি স্বপ্ন দেখেছে,—তার অর্থ না বুঝ্‌তে পেরে এইসব বল্‌ছে।'

এইরূপ বলিতে বলিতে পিসিমা আবার চক্ষু মুছিলেন। আমি পিসিমাকে দুই একটী সৎকথা বলিয়া আসন গ্রহণ করিলে ছোটমা আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। কালী, তারা, শিবু, আশা প্রভৃতি একে একে সকলে আসিয়া আমায় প্রণাম করিল। কালী বলিল, 'বরণদাকে এবার বেশ মানিয়েছে।'

তারা বলিল, 'গেরুয়া না পর্‌লে কি ধর্ম্ম হয় না?—বরণদা!'

উহারা সকলে আমাকে বরণদা বলিয়াই ডাকিত। আমি যখন প্রথম কাশীধামে যাই, পিসামহাশয় যখন আমায় কাশীধামে লইয়া যান, তখন ভ্রাতা কালীপদই আমায় প্রথম 'বরণদা' বলিয়া সম্বোধন করিল। সেই অবধি সকল ভাই ভগ্নীরই আমি বরণদা হইলাম।

কিছুক্ষণ পরে হরিপদ আসিল। হরিপদ পিসামহাশয়ের বড় ছেলে; এখন হরিপদ শাস্ত্রী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রী ভায়া আঁকা বাঁকা দুই চারিটী কথার পর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, 'দাদা। আমার ঘরে আসুন। নির্জ্জনে দুজনে কথা হবে, কেমন?'

আমি বললাম, 'হাঁ ভাই! যাচ্ছি;—একটু পরে।'

হরিপদ ভায়া চলিয়া গেলে আমিও সেদিনকার মত স্নানাদি সারিয়া আহারান্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম। স্নেহের ভগ্নী আশালতা আসিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইল; জানি না ইহাতে কাহারও ইঙ্গিত ছিল কি না। আমার নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত সে আমার গা হাত পা টিপিয়া দিল ও কতক্ষণ বাতাস করিল। আহা! সেদিনকার সে ভাব কি সুন্দর!

অপরাহ্নে হরিপদর ঘরে হরিপদর সঙ্গে কথা কহিতেছি এমন সময় ছোটমা আসিয়া বলিলেন, 'হরি! পান্না দিদি এসেছে বাছাকে দেখ্‌তে;—বাছার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।'

ব্যস্তভাবে হরিপদ বলিল, 'দাদা! পান্না মাসিমা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে; অদ্ভুত স্ত্রীলোক; আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন; তারপর তাঁর অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাব। আপনি যে রকম কোমলচিত্ত, তাতে

মাসিমার সে জীবনী শুনলে আপনি অশ্রু সম্বরণ করতে পারবেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! যেন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা! সম্মুখে দণ্ডায়মান মাসিমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি আর ভাবিতেছি, হায়! ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত এমনই হৃদয়বিদারক যে শুনিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিব না? ইতিমধ্যে মাসিমা আসিয়া আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমিও নত মস্তকে নমস্কার করিতেই মাসিমা বলিলেন, 'ও কি বাবা। আমাকে নমস্কার কেন? তুমি যে দেবশিশু; তুমি যে আমাদের বড় আদরের—বড় আরাধনার বস্তু।'

আহা! মাসিমার কি ভাব! প্রথম দর্শনেই মনে হয় যেন কত যুগ যুগান্তের পরিচয়,—যেন কত আপনার; প্রথম দর্শনে পরস্পরের প্রতি এমন আকর্ষণ কি সম্ভব? পুণ্যপ্রতিমা মাসিমা সত্য সত্যই আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। ভক্তিভরে তাঁহাকে পুনঃ প্রণাম করিয়া আমি বলিলাম, 'মাসিমাতে আর মায়েতে প্রভেদ কি? মাসিমা! আপনি যে মাতৃতুল্যা; আপনি যে আমাদের সকলের নমস্য।'

ভক্তিমতী মাসিমা সসম্ভ্রমে আমায় প্রতিনমস্কার করিয়া অপর এক জনকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইনি আমার মা।' আমি দিদিমা সম্বোধন করিয়া তাঁহাকেও প্রণাম করিলাম। তাঁহারও ভাব অতি চমৎকার। তাঁহাদের বাড়ী একদিন নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিলাম। সেখানে আমার আরও দুইজন বন্ধু জুটিল; এক জনের নাম যজ্ঞেশ্বর, আর একজনের নাম ইন্দু।

কাশীর বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত এবার আর আমি স্বেচ্ছায় দেখা করিতে গেলাম না। কারণ আমি দেখিলাম বন্ধুবান্ধবগণ আমার ভাবের পোষকতা করিতে পারিতেছেন না। একদিন রাস্তায় যাইতে যাইতে আমার ছাত্রজীবনের বন্ধু বিনোদ দাদার সঙ্গে আমার দেখা হইল। আমার সাধুবেশ দেখিয়া তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন 'অন্নদা! এ তোমার কি বেশ! তোমার এখনও পিতামাতা বর্ত্তমান; আর তুমি এই বেশ ধরেছ? তুমি বিবাহ করেছ; ঘরে তোমার যুবতী স্ত্রী; তোমার এই মতি গতি এ বয়সে কে ঘটালে অন্নদা?'

ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমি শুধু বলিলাম, 'যিনি রাত দিন করছেন।' তারপর হইতে ভাবিলাম, এ যাত্রায় এ বেশ লইয়া আর কাহারও সহিত দেখা করিব না; কার্য্যেও তাহাই হইল। কোন রকমে তিন রাত্রি কাটাইয়া আমি মধুপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে শচীনের সেই যে ভায়ের জন্য আমি দক্ষিণেশ্বর গিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া আসিয়াছিলাম, সেই ভাই আনন্দমোহন বসু (হারুকু) আজ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছে; সঙ্গে মা ও বাবা আছেন। আনন্দমোহনের নবজীবন দর্শন মানসে আমি মধুপুর যাত্রা করিলাম।

৯৯

যথাসময়ে মধুপুরে আসিয়া পৌঁছিলে আমাকে পাইয়া শচীনের পিতা মাতা ও ভ্রাতা আনন্দমোহন পরম আনন্দ লাভ করিল। মার ত আনন্দের সীমা নাই, মা আমার যেন হারান ধন কুড়াইয়া পাইলেন। বাবারও ভাব অতি সুন্দর। নানাবিধ অধ্যাত্ম আলোচনাতে আমাদের এক দিন এক রাত্রি কাটিল। পরদিন প্রত্যুষে আসিলেন গৃহস্বামী স্বনামধন্য চিকিৎসক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা ধর্ম্মপ্রাণ তেজচন্দ্র বসু মহাশয়। আহা! তাঁহার ধর্ম্মভাব ও মহাপ্রাণতার আদর্শ কত উচ্চ! কত মধুর! তিনি আসিয়াই বলিলেন, 'ঠাকুর! এবার আর ছাড়্ছি না; এবার আমায় দীক্ষা না দিয়ে যেতে পাচ্ছ না।'

ইতিপূর্ব্বে যখন আমি উন্মাদবৎ বিচরণ করিতেছিলাম তখনও একদিন সিদ্ধেশ্বর ভবনে আসিয়া তিনি গোপনে আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর আমি চিরদিন ব্রহ্ম উপাসক; কিন্তু তোমার ভাব ভক্তি দেখে আর যুক্তিপূর্ণ করা বার্ত্তা শুনে আমার প্রাণে সাকার উপাসনা কর্‌বার ইচ্ছাই যেন জেগে উঠ্‌ছে। ঠাকুর! আমায় দীক্ষা দেবে ত?'

আমি তখন হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলাম, 'দাদু! এ বয়সে আবার আপনার এ মতিভ্রম হল কেন?—যা কর্‌ছেন তাই করুন। আমায় বরং আপনি কিছু উপদেশ দিন। আপনি যে আদর্শ গৃহী; আপনাকে যে আমি জনক ঋষির মত দেখি।'

তখন আর কথাটা অধিক দূর গড়ায় নাই। আজ কিন্তু দাদু আমার নাছোড়বান্দা। সিদ্ধেশ্বর বসু মহাশয়কে ঘরের বাহিরে যাইতে বলিয়া আমায় দৃঢ় আলিংগনে আবদ্ধ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর! আর ফাঁকি দিলে চল্‌বে না। আমি কাল রাত্রেও তোমায় স্বপ্নে দেখেছি। কি দেখেছি জান? তুমি যেন আমায় দীক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছ; বুঝ্‌লে? আমার এখন বয়স হয়েছে। চারু আমার মধুপুরে বাড়ী করেছে; বেশ নির্জ্জন বাড়ী। আমি এখন ইচ্ছা কর্‌ছি তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে এই নির্জ্জন কুটীরে বসে যে কদিন বাঁচি ঈশ্বরচিন্তা করি।'

লজ্জায় আমার মাথা নত হইয়া আসিল। আমি দাদুকে দীক্ষা দিব! সে কি কথা! দাদুর নিকট হইতে যে কতদিন কত ধর্ম্ম উপদেশ শুনিয়াছি। কত প্রেমের কথা, জ্ঞানের কথা, ভক্তির কথা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আর আজ দাদুর মুখে এ কি কথা!

দাদু আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'ঠাকুর! তুমি আমায় দীক্ষা দাও;— দেখ্‌বে এই শচীনের বাপও তোমার কাছে দীক্ষা নেবে;—এমন আরও অনেক আত্মীয় স্বজন তোমার কাছ থেকে দীক্ষা পেয়ে ধন্য হবে। আমরা সকলে তোমায় নিয়ে পরম আনন্দ কর্‌বে। সিধু বাবুর বহু ভাগ্যে তুমি তার বাড়ী

এসে উঠেছিলে। বাড়ী পবিত্র করেছ ;—ওরা ধন্য হয়েছে।'

আমি হাত জোড় করিয়া দাদুকে চুপ করিতে বলিলাম। দাদু চুপ করিলেন বটে ; কিন্তু প্রেমের অশ্রু তাঁহার গণ্ড ভাসাইতে লাগিল। তাঁহার অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি প্রাণে প্রাণে ঠাকুরকে জানাইলাম—ঠাকুর! আমার দাদুকে শান্তি দিন।

কিছুক্ষণ পরে দাদু কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সিদ্ধেশ্বর বসু মহাশয়কে ঘরে ডাকিলেন। তারপর কত তত্ত্বকথা হইল। কথায় কথায় দাদুর কর্ত্তব্য অতি সংক্ষেপে দাদুকে জানাইলাম। সমস্ত শুনিয়া সাগ্রহে দাদু আমার পদধূলি লইয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! আর আমার কিছু বল্‌বার নেই। বেশ কথা ;— তোমার যখন সময় হবে তুমি তখন দীক্ষা দিও। আমি যা পেলেম এখন এই আমার অনেক দিনের খোরাক্ হবে।'

সিদ্ধেশ্বর বাবুও আজ আর এ রাজ্যের লোক নহেন। তিনিও কোন বাধা না মানিয়া আমার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক আমায় যথেষ্ট লজ্জা দিলেন। বন্ধুর পিতা তিনি, আমি তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকি ; তাঁহাকে পদধূলি দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব ?

বাবা কিন্তু ছাড়িলেন না ; আমার পদস্পর্শ করিয়া তিনি বলিলেন, 'ঠাকুর! তুমি এখন যে রাজ্যের লোক, তাতে আমি ত আমি, আমার * * *।' পাঠক পাঠিকা ক্ষমা করিবেন, ইহার অধিক লিখিতে আমি অক্ষম।

## ১০০

লছমণঝোলা হইতে কলিকাতা আসিয়া পেঁাছিলাম। বন্ধু বান্ধব যে যেখানে ছিল আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সকলে আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। আমি যেন এক নূতন মানুষ। আমার ভাব ভাষা আচার ব্যবহার সবই যেন সকলের নিকট নূতন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য যেন সকলে উৎসুক।

হায় মানব প্রকৃতি! তোমায় চিনিতে পারে সাধ্য কার? আর হে ভাগ্যবিধাতা! তোমাকেও ধন্য! দেবতারাও তোমায় সম্যক্ জানিতে সক্ষম নহেন। মানবের পক্ষে ত তোমার তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় রহিবেই। আজ দুই দিন কলিকাতায় আসিয়াছি। শচীনদের বাড়ীর দোতালার একখানি ঘরে শচীন ও নির্ম্মলকে আমার লছমণঝোলার ঘটনা শুনাইতেছি। শুনিতে শুনিতে উহারা উভয়ে যেন কোন এক ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে ; চক্ষু সজল, দৃষ্টি প্রায় স্থির, দেহ অচঞ্চল ; আমি সোৎসাহে উভয়কেই সেই বংশীবাদকের কথা শুনাইতেছি, এমন সময় নির্ম্মল গদগদকণ্ঠে চীৎকার করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

বলিতে বলিতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অচেতন হইয়া তক্তাপোশের উপর পতিত হইল। ব্যস্তভাবে শচীন তাহার মস্তক নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। অশ্রুধারায় উভয়ের গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় বাহির হইতে কে যেন দুয়ারে মৃদু করাঘাত করিতে লাগিল। শচীনের ইঙ্গিতে দুয়ার খুলিয়া যে মূর্ত্তি দর্শন করিলাম তাহা ভুলিবার নয়।

আহা! যেন সাক্ষাৎ ভাবময়ী জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি! অশ্রুভারাক্রান্ত চারু বদনমণ্ডলের কি অপূর্ব্ব শোভা! কি দিব্য দৃষ্টি! কি অমিয়মধুর ভাব! হস্তস্থিত একখানি পত্র আমার পায়ের উপর রাখিয়া গললগ্নীকৃতবাসে আমায় নমস্কার করিতেই আমি পা সরাইয়া লইয়া বলিলাম, বিমল মা! এ কি করছেন? আমি যে আপনার ছেলে; আপনি যে আমার মা।'

'ঠাকুর! ঠাকুর! না জানি কত জন্মে কত পুণ্য করে তোমার মত নরদেবতার দর্শন পেয়েছি। ঠাকুর! সত্যই কি তুমি আমার জন্য মন্ত্র পেয়েছ? মা তোমাকে এ দাসীর জন্য মন্ত্র বলে দিয়েছেন!'

বিমলমার কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল। ভাবে বুঝিলাম পত্রখানি আম্বালার; প্রমীলা মা কিংবা কমল মা আমার বিমলমাকে মন্ত্র পাওয়ার কথা লিখে পাঠিয়েছেন। সোৎসাহে আমি বলিলাম, 'হাঁ বিমলমা! পেয়েছি; তোমার জন্যও ৺মা মন্ত্র বলে দিয়েছেন; কিন্তু—'

এই বলিয়া আমি নীরব হইলে বিমলমা বলিলেন, 'ঠাকুর! কিন্তু কর্‌বার কিছুই নেই; সেজঠাকুরপো সরলাকে ও মেজদিদিমণিকে শ্রীমার কাছে নিয়ে গিয়ে দীক্ষিত—'

কথা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। বিমলমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিলাম, 'সরলার দীক্ষা হয়ে গেছে? সরলাকে শ্রীমা দীক্ষা দিয়েছেন? হায়! মূর্খ জীব! এততেও তোমাদের চৈতন্য হয় না?— এখনও এ অপূর্ব্ব স্বপ্নাদেশ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার না?—আর কবেই বা পার্‌বে?'

পরদিবস সিদ্ধেশ্বরভবনে ৺আদ্যামায়ের পূজার ঘটা পড়িয়া গেল। বিমলমা ও যতীনবাবু উভয়ে ৺মায়ের ঘরে বসিয়া ঠাকুরের পূজা দেখিতে লাগিল এবং পূজা অন্তে বিমলমা মাতৃদত্ত লাভ করিয়া আনন্দাশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিল। ভক্তের গভীর বিশ্বাস আমাকেও ধন্য করিল, পবিত্র করিল এবং সিদ্ধেশ্বরভবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিল।

ক্ষণকাল পরে আসিল ভক্তপ্রধান যোগেনদা ও তাহার পুত্র ভূপতিভূষণ সরকার। যোগেনদার কথা ইতিপূর্ব্বে দুই একবার উল্লেখ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও তাহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তির কথা আপনাদিগকে বলিব। ভূপতি যোগেনদার একমাত্র পুত্র; মাতৃহারা বালক পিতার আদরেই প্রতিপালিত

হইতেছে। যোগেনদার উপযুক্ত পুত্র ও স্ত্রী কন্যা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া যখন একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন এই ভূপতির বয়স মাত্র আড়াই বৎসর ছিল। তদবধি যোগেনদা ইহাকে মাতৃসুলভ স্নেহ যত্নে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। যোগেনদার ধৈর্য্য অসাধারণ এবং পত্নী-প্রেমও উল্লেখযোগ্য; অন্য কেহ হইলে অবাধে দ্বিতীয় পক্ষ বিস্তার করিয়া স্বীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতার ব্যবস্থা অবশ্যই করিয়া লইতেন।

যোগেনদা আমায় দেখিবামাত্র অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন; এবং ঠাকুরের কি আদেশ পাইয়া আমি ফিরিলাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য আমায় বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি সংক্ষেপে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলে তিনি বলিলেন, 'এক বৎসর দেশে থেকে সস্ত্রীক পিতামাতার সেবা; আর এক বৎসর গঙ্গাতীরে সস্ত্রীক মন্ত্রপুরশ্চরণ।—এ ত সহজ কথা নয় ভাই! দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু গঙ্গাতীরে থেকে—সে যে অনেক টাকার কাজ। অত খরচ কেমন করে সংগ্রহ হবে?'

শচীন বলিল, 'দাদা! ঠাকুরের ইচ্ছায় কিছুর কি অভাব হবে মনে কর? —সব যোগাড় হয়ে যাবে।'

যোগেনদাও এই কথায় সায় দিয়া বলিলেন, 'হাঁ ভাই! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় কিনা হয়?'

ইহার পর শচীন আমাকে ভক্তপ্রধান শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। কারণ তাঁহার লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে ঠাকুরের মুখে কর্ম্মমার্গের ও জ্ঞানমার্গের কথা বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না; অথচ আমার উপর এইরূপ কর্ম্মের আদেশ হইল। ইহার কারণ কি? মাষ্টার-মহাশয়ের নিকট ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য ছিল। তাহা ভিন্ন ঠাকুর স্বয়ং আবার সশিষ্য আসিবেন—একথা মাষ্টার মহাশয় স্বীকার করেন কি না;—এবং আসিলে কতদিন পরেই বা আসিবেন,—সেকথা আমাদের আদেশের সহিত মিলে কি না, ইত্যাদি বিষয় জানিবার একটা কৌতুহলও ছিল।

## ১০১

আমি আর শচীন একখানি ৺আদ্যামায়ের মূর্ত্তি লইয়া মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের স্কুলগৃহ অভিমুখে চলিয়াছি এমন সময় রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র কুমার নরেন্দ্রনাথ গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে আমায় লক্ষ্য করিয়া নমস্কার করিলেন। অন্যমনস্ক থাকায় আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না দেখিয়া শচীন বলিল, 'ঠাকুর; তুমি বোধ হয় চিনতে পার নি; ঐ যে নরেন বাবু গেল।'

সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে ?—লাহা ?'

শচীন উত্তর করিল, 'হাঁ ; নরেন লাহা।'

আমি বলিলাম, 'কি লজ্জার কথা ! উনি কি মনে কর্‌লেন ?'

শচীন বলিল, 'না ; তা কিছু মনে কর্‌বার লোক উনি নন্‌।'

'হাঁ ; তা বটে ; ওঁরা দুভাই বেশ সৎপ্রকৃতির। ওঁদের বাড়ীতে যখন তোমার বাবার সঙ্গে ভাগবতকথা শুনতে যেতাম তখন ওঁদের চাল চলন আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি ওঁরা যথার্থই নম্র এবং বিনয়ী। তা ছাড়া নরেনবাবু ত দিন দিন ফলভারাক্রান্ত বৃক্ষের মতই নতশির হয়ে পড়্‌ছেন। শাস্ত্রে যে বলে 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌যাতি পাত্রতাম্‌' একথা নরেনবাবুর স্বভাবে অক্ষরে অক্ষরে মেলে।'

কথা কহিতে কহিতে যখন আমরা মাষ্টার মহাশয়ের স্কুলগৃহে গিয়া উঠিলাম তখন আমাদের আগমনসংবাদ শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় আমাদের সহিত দেখা করিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের শহজ সরল ভাব ও প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম এবং এক এক করিয়া সমস্ত কথার পর শচীন বলিল, 'আচ্ছা মাষ্টার মহাশয় ! তাই যদি হয়,—আপনি যদি এই স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস করেন,—তাহলে বল্‌তে পারেন কি, ঠাকুর কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে এত উদাসীন ছিলেন কেন ?'

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'তোমায় কে বল্‌লে ঠাকুর উদাসীন ছিলেন ?'

'কই ?—আপনার কথামৃতে ত সে রকম কিছু নেই ?'

'তা নাই বা থাক্‌ল ; কথামৃতের জন্য ত আমি ঠাকুরের সকল কথা নোট করি নি ; আমার যা ভাল লেগেছে আমি তাই লিখেছি। সময় সময় নরেন বলত—'মাষ্টার ! ঠাকুরের এ কথাটা লিখে রাখ না ; আমার হয় ত সেটা ভাল লাগ্‌ত না বলে কিছু লিখ্‌তুম না। তা ছাড়া আমার তখন এমন কোন ভাব ছিল না যে ঠাকুরের কথাগুলি লিখে নিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ কর্‌ব। নিজেরই প্রাণের শান্তির জন্য আমার ভাবের যে সব কথা হ'ত—আমি তাই নোট করে রাখ্‌তুম। ঠাকুর আমাদের ভাবের রাজা ; তাঁর কি কোন ভাবের অকুলন ছিল ? না তিনি সাধারণ সাধুদের মত একটা ভাবকেই প্রধান করে গেছেন ? তিনি বল্‌তেন—যত মত তত পথ। ভাবসমন্বয়ই তাঁর প্রাণের কথা। তিনি বল্‌তেন—ভাব সরোবরে চার ঘাট দিয়ে চারজন লোক নাম্‌ল ; চারজনেই এক বস্তু নিয়ে উঠে এল ; জিজ্ঞেস কর্‌লে ভিন্ন ভিন্ন নাম বল্‌তে লাগল ; কেউ বল্‌লে ওয়াটার, কেউ বল্‌লে একোয়া, কেউ বল্‌লে পানি।

বলিতে বলিতে আকাশের গায়ে এক খণ্ড মেঘের উপর মাষ্টার মহাশয়ের দৃষ্টি স্থির হইয়া আসিল। সজল চক্ষে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে তিনি বলিলেন, 'ঐ দেখ্‌, দেখ্‌তে পাচ্ছ ; মেঘ উঠেছে ;—বর্ষণ

হবেই।'

আমরা অবাক হইয়া ভাবুকের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। মাষ্টারমহাশয় ভাবের ভাষায় আরও কত কি বলিতে লাগিলেন; তাহার অধিকাংশ আমরা বুঝিতেও পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে 'জয় গুরু! জয় গুরু!' বলিতে বলিতে যখন চক্ষু মুদিয়া তিনি আবার আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন তখন সুযোগ বুঝিয়া শচীন জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখুন, আপনি যে বল্লেন, তিনি উত্তর পশ্চিম হতেই আবার আস্‌বেন বলে গেছেন—তার কি কোন সময় নির্দ্দেশ কারও কাছে কখনও করেন নি?—আপনি ঠিক জানেন?'

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'হয় ত করেওছেন; আমি ত আর সব সময় ঠাকুরের কাছে থাকতাম না।—কত ভক্ত এসেছেন—কত কি হয়েছে; তিনি যে কত লোককে কত কি বলেছেন—কে আর তা লিখে রেখেছে?'

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, তাঁর অন্তরংগ ভক্তদের আস্‌বার কথা?'

মাষ্টার মহাশয় উত্তর করিলেন, 'সে ত কথামৃতের চতুর্থ ভাগেই আছে। তিনি তাঁর ভক্তদের কি বলেছিলেন একবার পড়ে দেখ্‌লেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটে যায়।'

এইরূপ আরও দুই চারিটী কথার পর মহাশয়ের অন্যান্য ভক্তদিগকে আসিতে দেখিয়া আমরা বিদায় লইলাম। মাষ্টার মহাশয়ও অতীব সৌজন্য সহকারে আমাদিগকে বিদায় দিবার সময় ৺মায়ের পূজার নামে কিছু অর্থ দিয়া ভক্তের কর্ত্তব্য এবং তাঁহার বিশ্বাসের গভীরতা দেখাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন।

## ১০২

স্কুলগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শচীন নিজ বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল; আর আমি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ভুপেনবাবুর শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে চলিলাম; ভুপেনবাবুর শ্বশুরবাড়ীর নিমন্ত্রণ ভুলিবার নয়। তাঁহাদের আদর যত্ন ও ভালবাসা সত্য সত্যই স্বর্গীয় ও পবিত্র। এখনও আমি সে বাড়ীতে যাতায়াত ছাড়ি নাই। প্রায় প্রতি মাসেই এক বার সেখানে আমার ভুরিভোজনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

যাইতে যাইতে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট ও মেছুয়াবাজারের মোড়ে পেঁছিয়া দেখি আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের পশ্চিম ফুটপাত দিয়া নৃপেন সাধু মহাশয় উত্তর দিক হইতে আসিতেছেন; ইতিপূর্ব্বে সেই যে তাঁহার বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম তাহার পর আর তাহার সহিত দেখা হয় নাই। বহুদিন পরে তাঁহার দর্শনে সেই সব পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়ায় আমি যেন কেমন এক রকম হইয়া গেলাম।

আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা তুমুল ঝড় বহিয়া গেল ; মাথ নত হইয়া আসিল।

আমায় দেখিবামাত্র 'কি হে ? অন্নদা নাকি ?' বলিয়া সাধুবাবা আমার দিকে অগ্রসর হইলেন। আমিও যন্ত্রচালিতবৎ ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। আমরা পরস্পর সন্নিকট হইলে সাধুবাবা প্রথমে আমার হাত ধরিলেন এবং পরে আমার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'বাঃ বাঃ—বেশ মানিয়েছে। যোগেন বল্লে,—এবার নাকি তুমি আরও অনেক নূতন নূতন আদেশ পেয়েছ ?'

আমি নত মস্তকে চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'তা বেশ ; উত্তম কথা ; পাবে বৈ কি।—ঠাকুরের দয়ায় কত লোক কত কি পাচ্ছে। তারপর ? এখন কল্‌কাতায় ক'দিন থাকা হবে ?'

আমি বলিলাম, 'আজকের কিম্বা কাল সকালের গাড়ীতে দেশে রওনা হব মনে করেছি।'

'হাঁ, যোগেন বল্লে বটে ; এক বৎসর দেশে থেকে পিতামাতার সেবা কর্‌বার আদেশ হয়েছে। তা বেশ,—তাই কর ; এই ত জীবের ধর্ম্ম।'

'আর বাবা ধর্ম্ম ? আপনি আমার মাথায় যে পাহাড় চাপিয়েছেন ; কোথায় আপনাকে কর্ত্তা সাজিয়ে কাজ কর্‌ব ;—না নিজেই এখন কর্ম্মকর্ত্তা সেজে ছুটোছুটী করে মর্‌ছি।'

'সে কি ! আমায় কর্ত্তা সাজিয়ে ?—রাম বল ! আমি কর্ত্তা টর্ত্তা সাজাবার ধার ধারি না ; আমি এখন ওসব আলোচনা উপদেশ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। কাউকে বাড়ীতেও বড় ঢুকতে দিই না ;—চুপ চাপ পড়ে থাকি। আচ্ছা—এখন তবে—' বলিয়াই সাধুবাবা অগ্রসর হইলেন।

উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া এক দৃষ্টিতে সাধুবাবার গতি লক্ষ্য করিয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে কত কি ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে যথাস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া শচীনদের বাড়ীতে আসিলাম। সেখানে দোতলায় একটী ঘরে শুইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে দেওয়ালে টাঙ্গান আমার স্ত্রীর একখানি ফটোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভাব তরঙ্গে ভাসিতেছি এমন সময় হঠাৎ শচীন ঘরে ঢুকিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ভাই ?'

শচীন উত্তর করিল, 'আর—কি ভাই।—ঠাকুর ! এত পেয়েও ঐ মূর্ত্তিখানি ভুল্‌তে পার্‌লে না ?—তা কেই বা পারে ? আচ্ছা, বল দেখি ভাই ! ঐ ফটোখানি দেখে তুমি কি সুখ পাও ? ফটোখানি যখন আনিয়েছিলাম তখন তা দেখে চিন্‌তে পার নি। তখন বুঝি আমাদের সঙ্গে চালাকি করেছিলে ?

—না ?'

আমি প্রথম একটু অপ্রস্তুত হইলাম বটে; কিন্তু শচীনের কাছে আমার প্রস্তুত অপ্রস্তুত দুই সমান। তাহার নিকট আমার লজ্জা ঘৃণা ভয় বড় একটা ছিল না; যাহা হউক তাহার কথার উত্তরে বলিলাম, 'ভাই! এখন যে ওর চেহারা অনেক বদলে গেছে। তা ছাড়া বল দেখি কত দিন ওকে দেখি নি? তুমি যখন ফটো আনিয়েছিলে সত্যই তখন আমি সে ফটো দেখে চিনতে পারি নি! কি করেই বা চিনবে বল? এই পাঁচ বৎসর বিবাহ হয়েছে; এর মধ্যে পাঁচ মিনিটও আমি ওর মুখ দেখি নি। তার পর ওর স্বভাবের কথাও তোমাদের আগেই বলেছি। এই শেষ বার দেশ থেকে আসবার সময়ও বৌ আমাদের বাড়ী ছিল না; ওর বাপের বাড়ীতেই ছিল। তার ওপর আবার আমাদের দেশে বৌয়ের বাপের বাড়ীর ব্যাপার ত জান না? দশ দিন দশ রাত সেখানে পড়ে থাকলেও বৌয়ের সাড়া শব্দ, গন্ধ বাতাস পর্য্যন্ত পাবার যো নেই। তবু আমি বেহায়ার মত দেশাচার না মেনে আসবার সময় ঝিকে দিয়ে লুকিয়ে আমার কাছে ওকে একবার আনিয়েছিলুম। তা এসেছিল বটে; কিন্তু লজ্জায় জড়সড় হয়ে সেই যে ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; কিছুতেই মুখ দেখালে না। আমার একটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল। তাই জিজ্ঞেস করে ঘরের বাইরে চলে এলুম; এই ত ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।'

শচীন প্রশ্ন করিল, 'যা জিজ্ঞেস করেছিলে, তার উত্তর পেয়েছিলে ত?'

'হাঁ, তা পেয়েছিলুম; তবে মুখে উত্তর তখনই দেয় নি; পরে কাগজে লিখে পাঠিয়েছিল।'

'কথাটা কি—তা শুনতে পারি না?'

'কেন পারবে না? দেশ থেকে এসে বোধ হয় তোমাদের তা বলেছি। কথাটা আর কিছু নয়; বাড়ী থেকে আসবার আগে যখন মনে হয়েছিল—আমার বোধ হয় এক বার হিমালয়ে যেতে হবে,—তখন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি আমায় অনুমতি দেবেন কি না।'

'কি জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'তাই ত বলছি। একদিন মাকে বললাম, মা! আমায় বোধ হয় হিমালয়ে গিয়ে পাঁচ বৎসর তপস্যা করতে হবে; আপনি আমায় অনুমতি দেবেন ত?'

মা আমার খানিকক্ষণ মুখের পানে চেয়ে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাবা! তোমায় আবার হিমালয়ে যেতে হবে?'

'হাঁ মা! হতেও পারে; আমার ওপর ঐ রকম একটা আদেশ বোধ হয় হবে; আমার প্রাণে তাই বলছে।'

যদি আদেশই হয়, তাহলে আর আমার অনুমতির প্রয়োজন কি বাবা?'

'প্রয়োজন আছে বই কি মা! হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতা যদি এক সঙ্গে আমায় আদেশ করেন, তাহলেও আপনার বিনা অনুমতিতে আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে না।'

স্নেহময়ী মা আমার আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে চিবুক স্পর্শ করিয়া উদ্দেশ্যে আমায় চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, 'অন্নদা! আমি ত তোকে জানি। তুই কেন এসেছিস্, তোর কি কাজ, আমাদের সঙ্গেই বা তোর কতটুকু সম্বন্ধ, তা কি আমি জানি না? তবে একটি কথা। মার কর্ত্তব্য হতে পারে পুত্রকে ধর্ম্মকার্য্যে বাধা না দেওয়া! বা পুত্রের যাতে মঙ্গল হয় সেই বুঝে ধর্ম্মকার্য্যে অনুমতি দেওয়া;—কিন্তু যিনি তোমার সহধর্ম্মিণী হয়ে তোমার কাছে এসেছে, অগ্নিসাক্ষী করে তুমি যাকে গ্রহণ করেছ, গুরু পুরোহিত সমক্ষে যার সমস্ত সুখ দুঃখের ভার তুমি মাথা পেতে নিয়েছ, সেই মেজবৌমা এখন এখানে নেই। তাকে তোমার এ বিষয় আগে জিজ্ঞেস করা উচিত। আমার মনে হয় তোমার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব এখন আমা হতে তোমার স্ত্রীর প্রতি অধিক। এ মুখের কথা নয় বাবা! এ ধর্ম্মতঃ সত্য। তুমিই ত আমায় শুনিয়েছ বাবা!—স্বামী পুণ্য করলে স্ত্রী অর্দ্ধেক পায়; আর স্ত্রী পাপ করলে স্বামী তার অর্দ্ধেক পায়। এ অবস্থায় ধার্ম্মিক লোকের স্ত্রীর প্রতি ষোল আনা দৃষ্টি রাখা উচিত নয় কি? মা ত মা হয়েছেন, পেটে ধরেছেন বলে; এই ত মার সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ; ধর্ম্ম কর্ম্ম পাপ পুণ্যের এমন কোন সম্বন্ধ ত নেই। কেমন? —তাই নয় কি?'

আমি লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিলাম। মা আমায় আবার বলিতে লাগিলেন, 'দেখ অন্নদা! তুমি যাই কর না কেন,—আমি তোমায় বাধা দেবো না; বা দুঃখ করব না। কিন্তু বৌমা—আহা! সে যে কেবল তোমারই পথ চেয়ে আছে;—তুমি কবে আসবে, কবে এসে তাকে আপনার করে নেবে, সেই চিন্তায় সে দিন কাটাচ্ছে; সে যে তোমার পতিব্রতা স্বাধ্বী স্ত্রী। তার প্রাণে কখনও ব্যথা দিও না! তাকে জিজ্ঞেস করে, তারপর যা করতে হয় করো।'

আমি আর কোন কথা না বলিয়া সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তিজ্ঞানে মাকে নমস্কার করিলাম। এবং 'তাই হবে মা!' বলিয়া ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—

'তোরা দেখ রে! আমার কেমন মা।
এমন মায়ের তুলনা কভু
জগত মাঝারে মেলে না মেলে না।' ইত্যাদি।

কথা শুনিতে শুনিতে শচীন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি শচীন! কি ভাবছ?'

প্রকৃতিস্থ হইয়া শচীন বলিল, 'না না; তারপর?—বৌদি তোমায় কি লিখে

জানালেন ?'

'সে লিখেছিল—প্রাণের ঠাকুর ! আপনার ধর্ম্মকার্য্যে আমি কখনও বাধা দেবো না ; তবে আমাকে আরও সহ্যগুণ দেবেন ; আমি যেন মুখ বুজে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারি ; চিন্তাদ্বারাও যেন আপনাকে কোন রকম জ্বালাতন না করি ।.* * *

'ব্যস্ ? এই মাত্র ? আর কিছু লেখেন নি ?'

'হাঁ, আরও বল্‌ছি ; শোন না । —তারপর লিখেছে—আপনি যেখানে থাক্‌বেন মাসে একখানি করে চিঠি লিখ্‌বেন । আপনি সুস্থ আছেন এইটুকু জানলেই আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌ব ।'

কথা শুনিয়া শচীন হো হো শব্দে হাসিয়া বলিল, 'বেশ ত ; তুমি তপস্যা কর্‌তে যাবে বলে হিমালয়ে যাবার অনুমতি চাইলে ; আর তিনি লিখে জানাচ্ছেন—মাসে একখানি করে পত্র লিখো ।—সেখানে তোমার ওসব যোগাবে কে ?'

'ভাই ! সে সব বুদ্ধি ওর খুবই কম ; হিমালয়ের ধারণা ওর কতটুকু হতে পারে বল দেখি ?'

'তা বটে ; আমারই প্রথম প্রথম কত রকম ধারণা ছিল ; তারপর গিয়ে দেখি সব অন্য রকম ।

১০৩

কলিকাতায় একদিন থাকিয়া পরদিন সকালের ট্রেনে আমি চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলাম । মেলট্রেন বেশ দ্রুত চলিয়াছে ; তথাপি গৃহে পেঁ ৗছিবার আগ্রহ আমার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতেছে । কতক্ষণে স্নেহময়ী মা ও স্নেহময় পিতাকে দেখিতে পাইব, স্নেহের সহোদর সহোদরাকে বুকে লইব, অবগুণ্ঠনাবৃতা অর্দ্ধাঙ্গিনীর ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হইব, এই চিন্তাই সর্ব্বদা আমার মনে জাগিতেছে ; আর জাগিতেছে অর্দ্ধমুকুলিত কুসুম কোরকের ন্যায় দাদার স্নেহের দুলাল দুলালীর দুখানি কচি কচি মুখ ও বৌঠাকুরাণীর সরল হাসি ভরা পবিত্র দৃষ্টি । মনে হইতেছে দুই বাহুর পরিবর্ত্তে যদি আমার দুইখানি পক্ষ থাকিত তাহা হইলে উড়িয়া গিয়া অবিলম্বে গৃহে পেঁৗছিতাম । পাগলের মত কত কি যে ভাবিতেছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই । দেখিতে দেখিতে ট্রেনখানি যথাসময়ে গোয়ালন্দ গিয়া পেঁৗছিলে তাড়াতাড়ি স্টীমারে উঠিয়া সকলকে জিজ্ঞসা করিতে লাগিলাম স্টীমার ছাড়িতে আর বিলম্ব কত ? আগ্রহের আতিশয্যে খাওয়া দাওয়ার কথা আদৌ মনে পড়িতেছে না ; ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি ।

রাত্রি আটটার সময় ষ্টীমারখানি যখন চাঁদপুর ঘাটে গিয়া ভিড়িল তখন সর্ব্বপ্রথম আমি তীরে উঠিলাম। ছুটিয়া গিয়া চট্টগ্রাম মেলট্রেনে আসন লইয়া শুনিলাম গাড়ী ছাড়িতে তখনও দুই ঘণ্টা বিলম্ব। ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে গার্ডসাহেবকে যথেষ্ট গালাগালি দিলাম; রেলওয়ে বিধি ব্যবস্থার আদ্য শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ করিয়া ছাড়িলাম এবং অবশেষে সাব্যস্ত করিলাম আমি ভিন্ন সকল লোকই হৃদয়হীন নির্দ্দয় পাষাণ; কাহারও কোন কাণ্ডজ্ঞান বা দয়া মায়া কিছুই নাই। নিরুপায় হইয়া শেষে গাড়ীর মধ্যে বেঞ্চের উপর গা ঢালিয়া দিয়া অবিলম্বে হতচেতন হইয়া সমস্ত দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে ট্রেনখানি যখন সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে আসিয়া পেঁাছিল তখন মানস নয়নে আর একখানি মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। দুঃখিনীর দুঃখকাতর কোমল মুখখানি মনে পড়িতেই আমি যেন সকল কথা ভুলিয়া গেলাম। সে দুঃখিনী আর কেহই নয়; সে সম্পর্কে আমার পিসতুতো ভগ্নী হয়; তার নাম কুলবালা; সে আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং বালবিধবা। হতভাগিনী বাল্যকাল হইতেই আমায় যথেষ্ট ভালবাসিয়া আসিতেছে; এখন সেই ভালবাসার সহিত যুক্ত হইয়াছে ভক্তি ও বিশ্বাস। ভক্তি বিশ্বাসের সংমিশ্রণে ভালবাসাটী এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আমিই যে তাহার একমাত্র গতিমুক্তি ইহাই যেন সে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে শিখিয়াছে।

বিলম্ব অবিধেয় ভাবিয়া ষ্টেশনে পেঁাছিয়া লাফ দিয়াই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম; এবং কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া ভগ্নীর বাসা অভিমুখে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছি এমন সময় 'ও মহাশয়! ও সাধু! শুনুন; শুনুন; কোথায় যাচ্ছেন? টীকেট দিয়ে যান।' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে জনৈক টিকিট সংগ্রাহক দৌড়িয়া পিছন হইতে একেবারে সম্মুখে আসিয়া আমায় বাধা দিল। তখন আমার চৈতন্য হইল। টিকেটখানি দেখাইয়া এক নিঃশ্বাসে স্বনামধন্য পাণ্ডা ৺রামকুমার অধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র সারদাপ্রসাদ পাণ্ডা মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সারদাপ্রসাদ পাণ্ডাই আমার ভগ্নীর ভাশুর; বেশ সরল ও বিনয়ী; যাত্রীরা তাঁহার স্বভাবে বড়ই সন্তুষ্ট তাই তাঁহার উপার্জ্জনও বড় মন্দ হয় না।

গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া 'কুলবালা' বলিয়া ডাকিতেই কুল ছুটিয়া আসিয়া সাদর আহ্বানে আমায় বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল; এবং বসিতে আসন দিয়া নমস্কারান্তে এক দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার স্থির অচঞ্চল অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন যুগলের দৃষ্টিতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাব জাগাইয়া তুলিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা-বলী এক একটী করিয়া আমার মানস নয়নে আমি দেখিতে লাগিলাম। সে

সকল দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী স্মরণ করিয়া আমার নয়ন যুগল বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্তরে যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম ; মস্তিষ্ক ক্রমশঃ উষ্ণ হইয়া উঠিল। বুদ্ধিমতী কুলবালা আমার অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া নিজেকে নিজে সামলাইয়া লইল এবং কার্য্যের ভান করিয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেল। এই প্রসঙ্গে তাহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করিব না। ভবিষ্যতে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ যখন ঘনীভূত হইতে থাকিবে তখন বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরদিন প্রত্যুষে বিদায় লইবার সময় কুলবালা নমস্কার করিয়া শুধু বলিল, 'দাদা! আপনাকে আমার বিশেষ কিছু বল্‌বার নেই। তবে আমার শেষ প্রার্থনা এই যে যদি আমায় রক্ষা কর্‌তে চান, এই অনন্ত দুঃখের মাঝে যদি একটুও শান্তি দিতে চান ত আমায় চরণে স্থান দেবেন। আপনার ও বৌদির সেবা করে আমি জীবন সার্থক কর্‌ব ; আপনার এ করুণা থেকে আমায় বঞ্চিত কর্‌বেন না।'

কুলর কথা শুনিয়া আমি আর মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে ভাষা নীরব হইয়া গেল। শুধু হাত তুলিয়া তাহাকে অভয় দিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম। যাইতে যাইতে আমাদের সমাজের দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

হায় হিন্দু সমাজ! হায় বাংলার সমাজপতি! না জানি কোন মোহ মদিরার মোহাবেশে মগ্ন হইয়া আজ তোমরা আত্মবিস্মৃত হইয়াছ। নারী-জাতির প্রতি, বিশেষতঃ এই অবীরা বিধবাদিগের প্রতি, নিজ নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া, কি লইয়া, কোন সুখে যে তোমরা স্ব স্ব প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস পাইতেছ, তাহা ভাবিতেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই বালবিধবা-দের কথা তোমাদের মনে কখনও জাগে কি ? হায়! তাহারা যে আজ দাস দাসীদিগের অপেক্ষাও ঘৃণিতা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, স্বজন সমাজে পর্য্যন্ত চিরনির্য্যাতিতা! বাড়ীর দাস দাসীদিগের সম্বন্ধেও গৃহস্থকে হিসাব করিয়া চলিতে হয় ; কর্ম্মের বিনিময়ে তাহাদের রীতিমত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকে এবং তাহাদের কাজ কর্ম্মের একটা সীমা থাকে। সীমা অতিক্রম করিলে তাহারা বিদ্রোহ করে ; কাজ ছাড়িয়া দিবে বলিয়া গৃহস্থকে ভয় দেখায়। কিন্তু বাড়ীর বিধবা কন্যা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া বা ভাদ্রবধূ নিতান্ত ইতর জীবের মত দিনরাত নীরবে পরিশ্রমে করিয়াও বিনিময়ে শুধু তাড়না ও তিরস্কার লাভ করে ; এবং বিদ্রোহ করিলে প্রহার পর্য্যন্ত পুরস্কার পাইয়া থাকে। অশন বসন ভূষণ ভ্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারে যাহা কিছু আনন্দের, তাহার প্রত্যেকটী হইতে তাহারা চিরবঞ্চিত। হায় সমাজপতি! তোমার কি মানুষের প্রাণ নাই ? না ঐ অভাগী বিধবার শরীরে মানুষের প্রাণ নাই ? যে—পতিহীনা হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে সমস্ত কামনা বাসনা হইতে চিরমুক্ত মনে করিয়া নির্জ্জলা উপবাস হইতে একাশন অর্দ্ধাশন ব্যবস্থায়, প্রয়োজনীয় বসন ভূষণে পর্য্যন্ত চিরবঞ্চিত রাখিতে চাও ? ছিঃ ! ছিঃ ! ছিঃ ! জাতির অর্দ্ধ অঙ্গ এইরূপ মর্ম্মাহত পক্ষাঘাতগ্রস্থ রাখিয়াই কি তোমরা পরাধীনতার গ্লানি হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে চাও ! শান্তি তৃপ্তি আনন্দের অধিকারী হইতে চাও ? ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইতে চাও ? দুরাশা ! একান্ত দুরাশা ! সর্ব্বাগ্রে এই মাতৃজাতির সম্মান করিতে শিক্ষা কর। মাতৃজাতির দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে যত্নবান হও ; মাতৃজাতিকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত কর। মাতৃপূজায় ব্রতী হও। তবে যদি কোন উপায় হয় ! তবেই যদি এই নির্জীব জাতির বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চয় হয়। এই নারীজাতির চোখের জল মুছাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমাদের চোখের জল শুকায় ত শুকাইবে ; নতুবা—

'জাগিবে না ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ;
ঘুচিবে না অধীনতা ; শুনিবে না দাবী।'

## ১০৪

বেলা আটটা না বাজিতেই ট্রেন চট্টগ্রামে গিয়া পৌঁছিল। চাট্‌গেঁয়ে চাল-চলন ও ভাব ভাষা অর্থাৎ জন্মভূমির আবহাওয়া আমার বেশ উপভোগ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আনন্দে হৃদয় ভরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া যেখানে আমাদের বাড়ীর ঘাটে যাইবার নৌকা পাওয়া যায়, সেই চাক্‌তাই নামক এক ছোট খালের ধারে যাইবার জন্য ছুটিয়াছি ; এমন সময় ষ্টেশনে এক ভদ্রমহিলার গায়ে ধাক্কা লাগা উপলক্ষ্য করিয়া দুই ভদ্রলোক এমন এক অনর্থের সৃষ্টি করিলেন, যে তাঁহাদের মাতামাতি ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হইয়া অবশেষে একের প্রহারে অপরে প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় উপনীত হইলেন। কি দুর্দ্দৈব !

আমি যতদূর বুঝিলাম প্রহৃত ভদ্রলোকটীর বিশেষ কোন অপরাধ ছিল না। লোকের ভিড়ে ঠেলাঠেলির ফলেই বেচারা ঐ মহিলাটীর গায়ের উপর পড়িয়াছিল। কিন্তু মহিলার আত্মীয় লোকটী নাছোড়বান্দা ; নিদারুণ প্রহার দিয়াও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না ; নিরীহ ভদ্রলোককে পুলিশের হাতে দিলেন। পুলিশ উভয়কে থানায় লইয়া চলিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণের জন্য বাড়ীর কথা ভুলিয়া, ভদ্রলোককে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য, আমিও উহাদের সহিত থানায় চলিলাম। আমার দেখাদেখি আরও দুইজন ভদ্র সন্তান থানায় চলিলেন।

থানায় পোঁছিলে থানার দারোগাবাবু প্রথমতঃ আমার মুখেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। আমিও আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে তাঁহাকে শুনাইলাম। অপর ভদ্রলোক দুইটীও আমার সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দিলেন। শেষে দারোগাবাবু রাগান্বিতভাবে বাদী ভদ্রলোককে মিঠে কড়া কেশ দুই চারি কথা শুনাইয়া দিয়া পাহারাওয়ালাকেও ধমক দিয়া বলিলেন, 'ছোড় দেও, ছোড় দেও ;—উ বেচারা কুছ খারাবি নেই কিয়া।—তুমলোক কেয়া জানওয়ার হায় ? কুছ নেহি জানতা ?—জিসকো মিলেগা উসিকো পাকড়কে লে আয়েগা ?'

ঈশ্বরেচ্ছায় ভদ্রসন্তান মুক্তি পাইল দেখিয়া পরম আনন্দে আমি চাক্‌তাই অভিমুখে ছুটিলাম। কিন্তু হায়! গিয়া দেখি সব অন্ধকার! বহুক্ষণ জোয়ার হইয়া গিয়াছে ; সমস্ত নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে। সহর হইতে আমাদের বাড়ী বিশ মাইলের অধিক দূর। নৌকা ভিন্ন বাড়ী যাইবার জন্য অন্য কোন উপায় নাই ; আবার জোয়ার ভিন্ন নৌকা পাওয়া যায় না। কর্ণফুলী নদী অতিক্রম করিয়া ফাঁড়ি খাল দিয়া মগদাই নদীতে গিয়া পড়িতে হয় ; তাহার পর আবার কালাচাঁদ নদ অতিক্রম করিয়া, কাগতিয়া নদী বাহিয়া আমাদের বাড়ীর ঘাটে গিয়া উঠিতে হয় ; এই সব নদ নদীর মধ্যে কর্ণফুলী নদী অতি খরস্রোতা এবং বিশালকায়া ; কলিকাতার গঙ্গার প্রায় দ্বিগুণ। নৌকা পাওয়া গেলে যাত্রী পিছু চারি আনা হইতে আট আনায় আমাদের বাড়ী যাওয়া যায় ; তদন্যথায় নৌকা বা সামপান ভাড়া করিতে দুই টাকা হইতে চারি টাকা পর্য্যন্ত লাগে ;

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেমন করিয়া বাড়ী যাইব ভাবিতেছি এমন সময় আমাদের পাড়ার একজন মাঝিকে দেখিতে পাইলাম। মাঝিটী মুসলমান ; তাহার একখানি সামপান ছিল। তাহাকে দেখিয়া কতক আশ্বস্ত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ী যাওয়ার কি উপায় করা যায় কালা মিঞা ?

বহুদিন পরে প্রতিবেশীকে দেখিয়া মাঝি সেলাম করিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিল 'অ'নে আস্তুক না ;—আঁই অ'নারে যেনে পারি পোঁছাই দিয়ুম্।' এই বলিয়া কালা মিঞা চলিতে থাকিলে আশ্বস্ত চিত্তে তাহার সহিত গিয়া 'জয় মা!' বলিয়া সামপানে উঠিলাম। মাঝি নিজ প্রয়োজনীয় কয়েকটী জিনিষ পত্র খরিদ করিয়া লইয়া সামপান ছাড়িয়া দিল। চাক্‌তাই ছাড়িয়া সামপান যখন কর্ণফুলীতে গিয়া পড়িল তখন ভগবৎকৃপায় এমন একটা বাতাস উঠিল যে পালের সাহায্যে সামপান যেন ঝড়ের মুখে কুটোর মত তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। মাঝি আনন্দে গান ধরিল—

'ত্বরা পার করে নাও নেয়ে!
ওপারে সে বসে আছে পথপানে চেয়ে।' ইত্যাদি

মাঝির গান শুনিতে শুনিতে সুখে সামপানের কোণে শুইয়া এক মনে কত কথাই চিন্তা করিতেছি ; এমন সময় মাঝি বলিল, 'ঠাকুর মশাই ! ফাঁড়ি খালে এসে পড়েছি ; এখনও আল্লার দোয়ায় এক পোয়া জোয়ার আছে। আল্লা বোধ হয় আমাদের বেশী কষ্ট দেবেন না।'

বাহিরে মুখ বাড়াইয়া আমি একবার দেখিয়া লইলাম মাঝির কথা সত্য কিনা ; দেখিলাম কথা সত্য। বেলাবেলি বাড়ীর ঘাটে পেঁাছিতে পারিব মনে করিয়া আনন্দে প্রাণ ভরিয়া গেল। মাঝিকে উৎসাহ দিয়া বলিলাম, 'তোমাকে না পেলে আজ আমায় শহরে পড়ে থাক্‌তে হত কালা মিঞা!—ধন্য তোমার সাহস!'

ইহার পর আর একটী কথা মনে পড়ায় আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। আপনাদের সম্ভবতঃ স্মরণ আছে, আমি যখন হৃষীকেশ হইতে বাংলা অভিমুখে রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইলাম তখন আদেশ হইল,—বাড়ী গিয়া কুলগুরুর নিকট হইতে কুলধর্ম্মানুয়ায়ী দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে আমি বলিয়াছিলাম,—যদি বাড়ী গিয়া গুরুদেবকে দেখিতে পাই, তবেই দীক্ষিত হইব ; অন্যথা নহে।

সমাপ্ত

# পরিশিষ্ট

এই স্থানেই গ্রন্থ শেষ হইল। কারণ স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ইহার অধিক অগ্রসর হয় নাই। অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায় এবং সেই পীড়ায় তাঁহার দেহান্ত হওয়ায়, 'স্বপ্নজীবন গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু পাঠকগণের মনে পরবর্ত্তী ঘটনাবলী জানার ঔৎসুক্য থাকিয়া যায়। নিবারণের জন্য পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মচারী জ্ঞান ভাই "আদ্যাপীঠ পরিচয়" নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন।

উক্ত পুস্তকে ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশ প্রাপ্তির পর গ্রন্থকার শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় ভগবানের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কিভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার সারসংক্ষেপ সন্নিবিষ্ট হইল।

স্বর্গাশ্রমে আদেশ পাওয়ার পর শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় এক বৎসর পিতামাতার সেবায় তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রামেই অতিবাহিত করেন। পিতৃমাতৃসেবায় নিযুক্ত থাকার সময় 'মনঃশিক্ষা' নামক একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থের পরিচয় পাইয়া ঠাকুর উহা পাঠ করার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন এক রাত্রে ভগবান রামকৃষ্ণদেব স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন—'আমি তোমাকে মনঃশিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিব।' ইতিমধ্যে ঠাকুর মহাশয়ের পিতৃদেব তাঁহার নিকট হইতে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন। সেই রাত্রিতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী লিখিয়া লইতে বলেন। এইরূপে দিনের পর দিন রামকৃষ্ণদেব স্বপ্নে আসিয়া বলিতে থাকেন ও ঠাকুর মহাশয় লিপিবন্ধ করেন। এইভাবে লিপিবন্ধ উপদেশগুলি 'রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রের সার কথাগুলি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও জ্ঞান উপদেশপূর্ণ এই জাতীয় কবিতা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় একান্ত বিরল। বর্ত্তমানে 'রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা' দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

আদেশানুযায়ী ঠাকুর মহাশয় এক বৎসর পিতৃমাতৃসেবার পর কঠিন নিয়মের বশে দক্ষিণেশ্বরেই এক বৎসর সস্ত্রীক সাধনা করেন। এক বৎসরর কাল পুরশ্চরণ ব্রতে অতিবাহিত হওয়ার পর ৺মা পুরশ্চরণ ব্রত উদ্‌যাপনের আদেশ দেন। তদনুযায়ী বিগত ১৩২৭ সালে পৌষ সংক্রান্তি দিবস সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উহাই আদ্যাপীঠে প্রথম সিদ্ধোৎসব। এখনও সেই পবিত্র তিথি স্মরণে প্রতি বৎসর আদ্যাপীঠে এই উৎসবের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র নরনারী যোগদান করিয়া উৎসবের বিমল আনন্দে অংশ গ্রহণ করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর কার্ত্তিকের কৃষ্ণা সপ্তমীতে শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের জন্মোৎসব, আদিষ্ট মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন স্মরণে মাঘী পূর্ণিমা উৎসব; শ্রীশ্রী৺আদ্যামায়ের আবির্ভাব দিবস স্মরণে বাসন্তী নবমী উৎসব, জ্যৈষ্ঠের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রী৺মাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি উৎসব, শ্রীশ্রী৺মন্দির নিৰ্ম্মাণের আদেশপ্রাপ্তি দিবস স্মরণে ঝুলন পূর্ণিমা উৎসবও যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উপরে উল্লিখিত প্রথম সিদ্ধোৎসবের পর ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নাদেশ কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কৰ্ম্মে ব্রতী হন এবং দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ সংঘ গঠন করেন। ঠাকুর মহাশয়ের আদর্শ চরিত্রের পূত স্পর্শে পবিত্র হইয়া কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদিষ্ট কৰ্ম্ম সম্পাদনের জন্য সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তদীয় কৰ্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া বহু গৃহী ভক্তও ঠাকুর মহাশয়ের ভাবাবেশ, সমাধিনিষ্ঠা ও চরিত্রমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া আদিষ্ট কৰ্ম্ম সম্পাদনে ব্রতী হন।

মন্দিরের আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবে মুনি-ঋষিদের আদর্শানুযায়ী বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য ঠাকুরমহাশয় স্বয়ং বালিকা আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেন। আদর্শ জননী ও আদর্শ গৃহিণী সৃষ্টি করাই এই আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। বৰ্ত্তমানে আশ্রমটী আদ্যাপীঠেরই সংলগ্ন এক সুবৃহৎ ত্রিতল গৃহে অবস্থিত।

অতঃপর ১৩৩৩ সালে দক্ষিণেশ্বরে আদিষ্ট মন্দির নিৰ্ম্মাণের জন্য জমি ক্রয় করিয়া ঠাকুর মহাশয় আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। আদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে বৰ্ত্তমানে ছয়টী শিবমন্দির ব্যতীত আদিষ্ট মন্দিরের আভাসে শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূর্ত্তি, শ্রীশ্রী৺আদ্যাশক্তি মূর্ত্তি ও প্রণব মধ্যস্থ শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি সমন্বিত ৺মায়ের মন্দির, শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণজীর মন্দির ও আরও ছয়টী শিবমন্দির আছে। মন্দিরের সেবা পূজা মঠের সাধু ব্রহ্মচারীগণের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

জমি ক্রয় করার এক বৎসর পর বিগত ১৩৩৪ সালের পুণ্য মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে আদিষ্ট মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। তাহার এক বৎসর পরে ৺ঠাকুর মহাশয় ৺পুরীধামে দেহরক্ষা করেন।

শ্রীশ্রী৺ঠাকুর মহাশয়ের সহধৰ্ম্মিণী সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রী৺মণিকুন্তলা দেবীকে কেন্দ্র করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই মায়েদের জন্য একটি 'মাতৃ আশ্রম' গড়িয়া উঠিয়াছিল। ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিতা সাধিকা শ্রেণীর মায়েরা এখানে অবস্থান করেন। সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এই অনুষ্ঠানটী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

ঠাকুর মহাশয়ের দেহাবসানের অব্যবহিত পরে সঙ্ঘের কৰ্ম্মে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং সঙ্ঘের কৰ্ম্মীদের এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়।

কিন্তু গুরু কৃপায় তাহারা সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অবিচলিত নিষ্ঠায় সহিত অগ্রসর হইতে থাকেন।

অতঃপর সংঘের কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আদ্যাপীঠে একটী বালকাশ্রম, বালিকাদের জন্য সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, মণিকুন্তলা জুনিয়ার হাই ও প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। পরে সাধকাশ্রম, সাধিকাশ্রম, ও বাণপ্রস্থাশ্রমকেও রূপ দান করা হইয়াছে। কিন্ত সমস্ত আশ্রমই ক্ষুদ্রাকারে আরম্ভ করা হইয়াছে মাত্র। আশ্রমগুলির সম্প্রসারণ একান্ত আবশ্যক ও অপরিহার্য্য। বিশেষভাবে বাণপ্রস্থাশ্রম। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে এই আশ্রমগুলি স্বপ্নাদেশের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইহা ছাড়া প্রয়োজন বোধে একটী অতিথিভবনও নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ৪টী ঘরও নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই ভবনেরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। অতিথির সংখ্যা বাড়িয়া গেলে মাত্র ৪টী ঘরে স্থান সংকুলান হয় না। ইহা ছাড়া আদিষ্ট মন্দিরের প্রচার ও প্রসার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ৭।২ ডি, নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ ঠিকানায় সংঘের একটি কর্ম্মী কেন্দ্র আছে। বিগত ১৯৭৩ সালে সংঘের তত্ত্বাবধানে সেই বাড়ীটী ক্রয় করিয়া আদ্যাপীঠের 'শ্রীশ্রী৺আদ্যামায়ের বাড়ী' নামকরণ করা হইয়াছে। এই স্থানে বরাবরই ত্রিমূর্ত্তির পটে পূজা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে আদ্যাপীঠের অনুসরণে ক্ষুদ্রাকারে মন্দির নির্ম্মাণ ও ত্রিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। মণিকুন্তলা জুনিয়ার হাই বিদ্যালয় বালিকাশ্রম ভবনেই হইতেছিল। তথায় স্থানাভাব বশতঃ বর্ত্তমানে উহার জন্য একটি নিজস্ব বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

'জীবে শুনাইয়া কর নাম সংকীর্ত্তন।
নামের সমান নাই অমূল্য রতন॥
নাম তন্ত্র গুরুমন্ত্র নাম ব্রহ্ম হয়।
ভব পারাবার তরে যেবা নাম লয়॥'

"রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা"

এই বাণীর পরিকল্পনাকে মূর্ত্ত করিবার জন্য আদ্যাপীঠ ও সংঘের কলিকাতা কেন্দ্রে প্রত্যহই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর রচিত—

"নমো রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরামচন্দ্রায়।
নমঃ কৃষ্ণরামচন্দ্রায় নমঃ রামকৃষ্ণদেবায়॥
নমো যুগ অবতার নমঃ সর্ব্বদেবদেবায়।
নমঃ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সর্ব্বভাবরক্ষায়॥'

এই রামকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বিভিন্ন পল্লী পরিক্রমা করা হয়। ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন আদ্যাপীঠে স্বয়ং সংঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী৺ঠাকুর মহাশয় সন ১৩৩৪ সালে।

শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদেশে ৺আদ্যামন্দির

নির্ম্মাণের যে আদেশ কার্য্যে পরিণত করার জন্য দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ গঠন করিয়া যান সেই আদেশানুযায়ী মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হয় বাংলা ১৩৪০ সালে শ্রীশ্রী৺ঠাকুর স্থাপিত ভিত্তির উপর। তখন হইতে সাত দফায় এই মন্দির নির্ম্মাণের কাজ সমাপ্ত হইলে বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ সালের মকর সংক্রান্তিতে আদি অন্ত ও মধ্যস্থ মর্ম্মর ও অষ্টধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তিত্রয় সহ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে; এবং স্বপ্নজীবনে লিখিত বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী নিত্য পূজা পাঠাদির অনুষ্ঠান যথানিয়মে চলিতেছে।

এক্ষণে ৺স্বপ্নজীবনে বর্ণিত আদেশানুযায়ী প্রত্যহ তিন দেবতার জন্য সাড়ে বার সের, সাড়ে বাইশ সের ও সাড়ে বত্রিশ সের চালের অন্নভোগ এবং রাত্রিতে শীতল আরতির পূর্ব্বে আড়াই সের চালের অমৃত ভোগ প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করার ব্যবস্থা চলিতেছে। উল্লিখিত ভোগের প্রসাদ আদ্যাপীঠের সাধু সেবকগণ, আদেশের আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবে সংঘ যে জনহিতকর পৃথক পৃথক ব্রহ্মচর্য্য বালক-বালিকাশ্রম, মাতৃআশ্রম, সাধিকা আশ্রম বাণপ্রস্থাশ্রম প্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছেন সেই আশ্রমবাসীদের এবং দীনদুঃখীদের দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতার দিনেও ৺মায়ের কৃপায় সমবেত অতিথি ও দরিদ্র নারায়ণদের ৺মায়ের অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সংঘের সেবকগণের পক্ষে উল্লিখিত ভোগ সংস্থান যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা যে কোন দানশীল ভক্ত একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আদেশকর্ত্তা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাবাণী—"আমার কথা কখনও মিথ্যা হবার নয়"—সেই মহাবাণী স্মরণ করিয়া দেশবাসী জননী ও ভক্ত সাধারণের নিকট আমাদের এই আবেদন যে প্রত্যহ যথারীতি উল্লিখিত ভোগের ব্যবস্থার সহায়তা করিয়া দৈবাদিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনে সাহায্য করুন। জগজ্জননী অবশ্য আপনার মঙ্গল করিবেন।

আদ্যাপীঠে সংঘ-প্রতিষ্ঠাপক শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহোদয় এবং তদীয়া সহধর্ম্মিণী সংঘজননী মণিকুন্তলা দেবীর জন্য মন্দির নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা গৃহীত হয় উহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ৺ঠাকুর মহাশয় যে ঘরে থাকিতেন তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া শ্রীশ্রী৺ঠাকুর ও মা ঠাকুরাণীর জন্য মন্দির নির্ম্মাণ আংশিক সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা পাঠাদি চলিতেছে। কিন্তু মন্দিরগুলির চূড়া এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। ঐ কার্য্য অবশিষ্ট আছে। বলা আবশ্যক ঐ কার্য্যে উৎসাহী দাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী ৺ঠাকুর ও ৺মাঠাকুরাণীর মন্দিরের মধ্যস্থানে যুগল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি চলিতেছে।

বর্ত্তমানে উক্ত মন্দিরগুলির চূড়া নির্ম্মাণ আবশ্যক। তাছাড়া পূর্ব্বে উল্লিখিত সমস্ত আশ্রমগুলির ও অতিথিভবনের পরিসর বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য্য হইয়াছে। দাতা ভক্তগণ উৎসাহী হইলে এই সকল কার্য্যের যথাযথ রূপদান সম্ভব হইবে।



# আদ্যাস্তোত্রম্

ওঁ নম আদ্যায়ৈ

—::•::—

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্ ।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ ॥
মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে ।
অপুত্রা লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি ॥
দ্বৌ মাসৌ বন্ধনান্মুক্তির্বিপ্রবক্ত্রাৎ শ্রুতং যদি ।
মৃতবৎসা জীববৎসা ষন্মাসং শ্রবণং যদি ॥
নৌকায়াং সংকটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াৎ ।
লিখিত্বা স্থাপয়েদ্ গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিৎ ॥
রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্নাঃ সর্বদেবতাঃ ।
ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা ॥
ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে ।
যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা ॥
মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী ।
নৈঋর্ত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশান্যাং শূলধারিণী ॥
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী ।
সুরসা চ মণিদ্বীপে লংকায়াং ভদ্রকালিকা ॥
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে ।
বিরজা ঔড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে ॥
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী ।
বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী ॥

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।
দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মাহেশ্বরী ॥
ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
নবমী শুক্লপক্ষস্য কৃষ্ণস্যৈকাদশী পরা ॥
দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিণী ॥
চণ্ডমুণ্ডবধে দেবী রক্তবীজবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী মধুকৈটভঘাতিনী ॥
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।
আদ্যাস্তবমিমং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ॥
সর্ব্বজ্বরভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
কোটীতীর্থফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী ॥
শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা ॥
চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।
দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী ॥
নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী ॥
ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদসংবাদে আদ্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নাম

(কীর্ত্তনীয়)

"নমো রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরামচন্দ্রায়।
নমঃ কৃষ্ণরামচন্দ্রায় নমো রামকৃষ্ণদেবায় ॥
নমো যুগ অবতার নমঃ সর্ব্বদেবদেবায়।
নমঃ সর্ব্বধর্মসমন্বয় সর্ব্বভাবরক্ষায় ॥"

—অন্নদাঠাকুর

# আদ্যাস্তব অনুবাদ

হে বৎস! মহাফলপ্রদ আদ্যাস্তোত্র বলিব শ্রবণ কর। যে সর্বদা ভক্তিপূর্বক ইহা পাঠ করে সে বিষ্ণুর প্রিয় হয়। এই কলিযুগে, তাহার মৃত্যু ও ব্যাধির ভয় থাকে না, অপুত্রা তিন পক্ষকাল ইহা শ্রবণ করিলে পুত্র লাভ করে, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে দুই মাস শ্রবণ করিলে বন্ধন মুক্তি হয়, ছয় মাসকাল শ্রবণ করিলে মৃত-বৎসা নারী জীববৎসা হয়। ইহা পাঠ করিলে নৌকায়, সংকটে ও যুদ্ধে জয়লাভ হয়, লিখিয়া গৃহে রাখিলে, অগ্নি বা চোরের ভয় থাকে না, রাজস্থানে নিত্য জয়ী হয় এবং সর্ব দেবতা সন্তুষ্ট হন। হে মাতঃ! তুমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী, বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমংগলা, অমরাবতীতে ইন্দ্রাণী, বরুণালয়ে অম্বিকা, যমালয়ে কালরূপা, কুবের ভবনে শুভা, অগ্নিকোণে মহানন্দা, বায়ুকোণে মৃগবাহিনী, নৈঋতকোণে রক্তদন্তা, ঈশানকোণে শূলধারিণী। পাতালে বৈষ্ণবীরূপা, সিংহলে দেবমোহিনী, মণিদ্বীপে সুরসা, লঙ্কায় ভদ্রকালিকা, সেতুবন্ধে রামেশ্বরী, পুরুষোত্তমে বিমলা, ঔড্রদেশে বিরজা, নীল পর্ব্বতে কামাখ্যা। বংগদেশে কালিকা, অযোধ্যায় মহেশ্বরী, বারাণসীতে অন্নপূর্ণা, গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজে শ্রেষ্ঠা কাত্যায়নী, দ্বারকায় মহামায়া, মথুরায় মাহেশ্বরী।

হে মাতঃ! তুমি সমস্ত জীবের ক্ষুধাস্বরূপা, সমুদ্রের বেলা, তুমি শুক্ল পক্ষের নবমী এবং কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী। তুমি দক্ষের দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী কন্যা, তুমি রাবণধ্বংসকারিণী রামের জানকী। তুমি চণ্ডমুণ্ড বধকারিণী দেবী এবং রক্তবীজ বিনাশিনী, তুমি নিশুম্ভ শুম্ভমথনী ও মধুকৈটভ ঘাতিনী। তুমি বিষ্ণুভক্তিপ্রদা, সর্ব্বদা সুখদা ও মোক্ষদা দুর্গা।

যে মনুষ্য এই পবিত্র আদ্যাস্তব সর্ব্বদা পাঠ করে, তাহার সর্ব্ববিধ জ্বরের ভয় থাকে না এবং সর্ব্বব্যাধি বিনাশ হয়। তাহার কোটী তীর্থের ফল লাভ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। জয়া আমার সম্মুখ ভাগ, বিজয়া পশ্চাৎ ভাগ, নারায়ণী মস্তক ভাগ এবং সিংহবাহিনী আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। শিবদূতী, উগ্রচণ্ডা, পরমেশ্বরী, বিশালাক্ষী, মহামায়া, কৌমারী, শঙ্খিনী, শিবা, চক্রিণী, জয়দাত্রী, রণমত্তা, রণপ্রিয়া, দুর্গা, জয়ন্তী, কালী, ভদ্রকালী, মহোদরী, নারসিংহী, বারাহী, সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা, ভয়ঙ্করী, মহারৌদ্রী, মহাভয় বিনাশিনী আমার সমস্ত প্রত্যঙ্গ রক্ষা করুন।

ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদ সংবাদে আদ্যাস্তোত্র সমাপ্ত।

## সারকথা

সাধন ভজন কর বা না কর
বাসনা ভীষণ ভুলিয়া যাও ;
দানে মতি গতি হোক বা না হোক
আসক্তি-নিগড় কাটিয়া দাও।

বলি না ছাড়িতে সংসার স্বজন
যেন না ছলিতে রিপুরা পারে ;
থাক ভোগসুখে সতত মগন
পাপ বোঝা যেন মাথে না পড়ে।

আচার বিচার রাখ বা না রাখ
সাত্ত্বিক আহার করিও ভাই ।
জাত কুল শীল গণ বা না গণ
সতের সংসর্গ সতত চাই।

বিদ্যা বুদ্ধি যত থাক বা না থাক
বিবেকের পথে চলিতে হবে ;
কর বা না কর সংসারের কাজ
পিতৃ-মাতৃ-সেবা স্বহস্তে নেবে।

মান বা না মান পরম পুরুষ
পর উপকার করিবে সদা ;
বুঝ বা না বুঝ পাপ পুণ্য দুই
অন্তর সতত রাখিবে সাদা।

জান বা না জান ইহ পরকাল
সকাল সকাল প্রস্তুত হও ;
মরণ সময়ে মায়া অভিনয়ে
মনে রেখো তুমি কাহারও নও।
তুমি মনে রেখো শুধু 'কাহারও নও' ॥

**শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুর কর্তৃক লিখিত ( রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা হইতে সংকলিত )**